নবপর্য্যায়, ৬ষ্ঠ ভাগ] বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। [২১ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধীয়

মাসিকপত্র

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ

পন্থা

সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্

সম্পাদিত।

পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ

সহকারি-সম্পাদক।

CALCUTTA.

সূচী।

নিবেদন।

পন্থার সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন পন্থা বাহির হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইল। গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে কাগজের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে ও গ্রাহক সংখ্যা কম থাকাতে, পন্থা দুই মাস করিয়া একত্রে বাহির হইবে। আর একটি বিশেষ নিবেদন এই—আপনাদের অনেকের নিকট গত বৎসরের চাঁদা পাওনা আছে। আপনার অনুগ্রহ করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিবেন এবং ১৩২৪ সালে অগ্রিম মূল্যের জন্য পরবর্ত্তী মাসে ভি পি করিব। বোধ হয় আপনারা তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

ইতি—

ম্যানেজার।

পন্থার নিয়মাবলী।

১। "পন্থার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সমেত ২৲ দুই টাকা, ভি পিঃতে ২/০ দুই টাকা এক আনা। শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ মূল্যে দেওয়া হয়। এক সংখ্যা নমুনার জন্য ।০ চারি আনা দিতে হইবে।

২। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর সংখ্যা পাইবামাত্র না জানাইলে, আমরা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী নহি।

৩। গ্রাহকগণ পত্রে এবং টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্টরূপে লিখিবেন। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবার জন্য টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা কুপনে "নূতন" এই কথাটি যেন লিখিয়া দেন। গ্রাহকগণ কোন বিষয়ের উত্তরের প্রত্যাশা করিলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৪। "পন্থা"য় বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য মলাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেজ মাসিক ৪৲ চারি টাকা হিঃ, চতুর্থ পেজ ৫৲ পাঁচ টাকা হিঃ এবং অন্যত্র ২৷০ আড়াই টাকা হিসাবে লওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে পত্রিকা প্রচারের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইবে।

৫। "পন্থা"য় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বা দ্বেষভাবাপন্ন প্রবন্ধ গৃহীত হয় না। প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী হইবেন।

৬। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট না পাঠাইলে, তাহা ফেরত দেওয়া হয় না।

৭। "পন্থা" সম্বন্ধীয় টাকা, পত্রাদি, প্রবন্ধ এবং বিনিময়ার্থ পত্রিকা [illegible]র নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

"পন্থা" কার্য্যাধ্যক্ষ,

১৪৫ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৬ষ্ঠ ভাগ।] বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। [১ম ও ২য় সংখ্যা।

খোলরে প্রকৃতি আজি খোলরে তব দুয়ার।

গাহরে বিহঙ্গ আজি গাহ তব গান,
উর্দ্ধে নীল শূন্যে উড়ি
অনন্ত আকাশ জুড়ি
পাপিয়া, গাহিয়া যাও মাতাইয়া প্রাণ।
উচ্চ হ'তে উচ্চে তু'ল
তোমার মধুর বুলি
কুহু কুহু ডাকে পিক, সুধা কর দান,
গাহরে বিহঙ্গ আজি গাও তব গান।
বহরে বহরে আজি বসন্ত পবন,
কামিনীর গন্ধ নিয়া
যাও দেহ পরশিয়া
হাসিয়া উঠুক বিশ্বে জীবের জীবন,
দূর করি শ্রান্তি ক্লান্তি
বহি আন আন শান্তি
নবীন উৎসাহে ফেল ভরিয়া ভুবন,
বহরে বহরে আজি বসন্ত পবন।

হাসরে হাসরে আজ বিমল গগন,
ব্যাপি' বিশ্ব চরাচর
হাস আজি নীলাম্বর
হাসুক নক্ষত্র তারা চন্দ্রমা তপন ;
বিচিত্র সজ্জায় সাজি
অই জলধররাজি
হাসিয়া উঠুক আজি সৌন্দর্য্যে আপন
হাসরে হাসরে আজি বিমল গগন।

নাচলো যমুনা, পদ্মা, নর্ম্মদা, তাপতী,
লক্ষ্মা, গোদাবরী, আজি নাচ ভাগীরথী.
রবি শশী লয়ে বুকে
গাহিয়া মনের সুখে
নেচে নেচে চলে যাও যেথা তব পতি ;
প্রেমের আবেগে ভুলি
প্রেমের লহরী তুলি
দুকূল ভাসায়ে চলে যাও শীঘ্রগতি,
নাচলো কাবেরী, কৃষ্ণা, নাচ কংসাবতী।
জাগলো জাগলো আজি প্রকৃতি রমণি !
যেথা সে রূপের রাশি
লুকায়ে রেখেছ, আসি
খুলে ধর আজিকে সে সুষমার খনি ;
সাজিয়া নবীন বেশে
এস গো মা হেসে হেসে
চিত্তমুগ্ধকর রূপে দাঁড়াও আপনি,
সে রূপে হেরুক সবে বিশ্বের জননী।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত এম্, এ, বি, এল্।

যোগশক্তির বিকাশ।

আমাদিগের সাধারণ বিশ্বাস যে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির বিকাশই যোগ বা যোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রকারে দেখিতে গেলে অর্থাৎ চিত্ত-বৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলিয়া বুঝিতে হইলে তাহাতে কোনও বিশেষ শক্তি-বিকাশের স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ চিত্তের ও তদনুকারি মন, বুদ্ধি ইত্যাদির বৃত্তি লইয়াই শক্তির অনন্ত প্রকারের ক্রীড়াভিনয় হইয়া থাকে; সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে আর শক্তি কাহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশিত হইবে? সুতরাং দেখা যায় যে যাঁহারা যথার্থ যুক্ত বা যাঁহাদের চিত্তের বৃত্তিভাব নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাদের যোগে শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হইতে পারে না। অপিচ আমরা সচরাচর শক্তির বিকাশ দ্বারাই যোগীর পরিমাপ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকি। ইহা প্রদীপের আলো জ্বালিয়া সূর্য্য দর্শন চেষ্টায় ন্যায় হাস্যাস্পদ হইলেও ইহার মূলে একটি সত্য এই যে সাধনপথে প্রবৃত্ত যোগীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। তাহা দেখিয়া ঐ সকল শক্তি-বিকাশসমূহকেই যোগের প্রধান অঙ্গ বলিয়া অনুমান করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও শাস্ত্রদর্শী ধীর ব্যক্তি তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে যোগে আরুরুক্ষু, মননশীল সাধকগণের পক্ষে এই সকল শক্তিলাভ তাঁহাদিগের চরম গন্তব্য লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিবার বিঘ্নস্বরূপ। অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলার বশে এইরূপ বিশেষ বিশেষ শক্তিবিকাশ তাঁহাদিগের লভনীয় হইলেও ইষ্টনিষ্ঠ গুরুভক্ত চতুর সাধক ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় গন্তব্য-পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী শ্রীরাধিকার মুখে এই যোগশক্তিসমূহকে ভুজঙ্গ বলিয়া বর্ণন করাইয়া কহিয়াছেন—

চলিতে চরণে কত বিষধর বেড়িত—

সেই পরম পুরুষের অনুরাগোদ্দীপ্তা শ্রীমতী এই শক্তিগুলিকে তাঁহার নিভৃত-নিকুঞ্জবাসরবিলাসের "মণিময় নূপুর" মানিতেন। কিন্তু সেই পরমপুরুষের ক্ষণিক-বিরহ-বিধুরা শ্রীমতীর নিকট ভূষণ ভুজঙ্গে পরিণত হইত। তাই আবার বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।

পিয়া যদি তেজল কি কাজ শৃঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সিথার সিন্দূর, মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে॥—

যোগারূঢ় যোগীর সেই পরম পুরুষই লক্ষ্য। সেই অপ্রাকৃত মন্মথমদনই তাঁহার পরম আশ্রয়। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে সে তাহার এই সকল প্রাকৃতিক আভরণ বিস্মৃত হইয়া যায়। তবে যদি তাঁহার পরমাত্মীয় পরম পুরুষের লীলারস সেবায় আবশ্যক হয় তবেই ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে সামান্য যোগশক্তি ত দূরের কথা, দৈবীসম্পদেরও কোনও মূল্য থাকে না। বস্তুতঃ যোগের যাহা লক্ষ্য তাহা ছাড়িয়া এই সকল অভিনব শক্তির খেলায় মজিয়া থাকা—সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ মায়াবিভ্রান্তি বশে জীব তাহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বোধ করে। এই পৃথক্ বোধের একান্ত বিলোপ হইলেই জীবের পরমাত্মার সহিত যোগ হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহারই নাম চিত্তবৃত্তির নিরোধ। অনন্তশক্তিমান্ ব্রহ্ম, ভগবান্ বা পরমাত্মার অংশস্বরূপ জীবে শক্তির সর্ব্বপ্রকার অভিব্যক্তি সমভাবে সম্ভব না হইলেও শক্তিবীজই যে তাহাতে নিহিত রহিয়াছে ইহা নিশ্চয় সেই জন্যই জীবের ক্ষেত্রে শক্তির নূতন নূতন অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হইয়া থাকে। যাহা নাই তাহা হয় না; যাহা আছে তাহারও অভাব হয় না। গীতোক্ত "নাসতোহবিদ্যতে ভাবঃ" শ্লোকের ইহাই মর্ম্ম বলিয়া অনুমিত হয়।

জীব শব্দটী অতিব্যাপক ভাবে সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এমন কি সামান্য অণু (protoplasm) হইতে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ধীমান্ মানব পর্য্যন্ত সকলেই জীব সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। মানব ব্যতিরেকে অপর প্রাণীদিগকে আমরা 'ইতরপ্রাণী' ও পাষাণ, বৃক্ষাদিকে 'জীব' বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাদিগের মধ্যে আমাদিগেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়নিচয়ের বিকাশ দেখিতে পাই না বলিয়া তাহাদিগকে প্রায়ই জড় বলিয়া ভাবি। ইহাই আমাদিগের সাধারণ ধারণা। কিন্তু চৈতন্যময়ী প্রকৃতির অঙ্কে কিছুই অচেতন নাই। সামান্য বালুকাকণার অন্তরালেও বিশ্ব-প্রকৃতি অতন্দ্রিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই তাঁহাকে ও তাহার অন্তরালে অবস্থিত পর পুরুষোত্তমকেও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দেখিতে পাইয়াই ভাগবতকার উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন—

বৃহদুপলব্ধমেতৎ *

অর্থাৎ এতৎ—'এই' বলিয়া যাহা কিছু উপলব্ধ হয় তাহাই বৃংহনশীল—বৃহৎ।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে জীবের ক্রমবিবর্ত্তন বা বিকাশ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আবহমান কাল হইতে জীবকুল নানারূপে বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। মাতৃগর্ভ নিষিক্ত জীবাণুর সুগঠিত মানবদেহে পরিণতি ও তাহার অন্তরালে মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদির অবস্থিতির বিষয় ধৈর্য্যসহকারে চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে কি আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা পরিচালিত একটী সামান্য কৃমিতে চক্ষুঃশ্রোত্রাদি নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়া থাকে, অভিনব যোগশক্তিলাভেচ্ছুদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয় সন্দেহ নাই। অবশ্য অনেকেই বলিবেন প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহা হইয়া থাকে; তাহা ঠিক। প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলার তথ্য অবগত হইয়াই মানব সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন করিয়াছে, করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। আর্য্যভট বা নিউটনের আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণ ছিল, বেঞ্জমিন ফ্রাঙ্কলিনের পূর্ব্বেও তড়িৎশক্তি ছিল, গ্যালিলিওর পূর্ব্বেও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিত, জগদীশ বসুর পূর্ব্বেও সর্ব্বভূতে জীবনস্পন্দন ছিল। এই সকল মনীষিগণের আবিষ্ক্রিয়ার পর হইতে এই সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে লোকের ব্যবহারোপযোগী করিয়া মানবগণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহুবিধ সুগম উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রাকৃতিক শক্তিবিকাশের নিয়ম সর্ব্বত্রই এক প্রকার; কারণ প্রকৃতি সর্ব্বাত্মিকা, তাহার খেলা সর্ব্বত্র সমান একই প্রকার, সর্ব্বদা একই নিয়মে তাহার কার্য্য হইয়া থাকে;—মানব, পশু বা বৃক্ষাদির দেহে আহার্য্য বস্তুর পরিণতির একই প্রকার নিয়ম—মানবদেহে ও বাহিরের অন্নাদির অণুসমূহ দেহ গঠন করে বৃক্ষাদি শরীরেও তাহাই; তবে মানবের মানবোচিত দেহ, পশুর পশূচিত এবং বৃক্ষের বৃক্ষোচিত দেহ গঠিত হয়; এইমাত্র দ্রষ্টব্য প্রভেদ।

যোগশক্তি লাভ সাধারণ-চক্ষে অতিশয় লোভনীয় বটে; কিন্তু শক্তিলাভ হইলে তদানুষঙ্গিক বিপদ্ ও দুঃখরাশিরও আগমন অবশ্যম্ভাবী; কাজেই সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যে তাহার নিকট অবশ্যই যাইবে তাহা সহ্য করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ সে বৃক্ষচ্ছায়ায়, বা মন্দালোকে স্বকপোলকল্পিত নানাপ্রকার মূর্ত্তি দর্শনে ভূতের ভয় পায় না, এই বিপদ্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য দর্শনে

সুখানুভব করে তেমনি বিভীষিকা দর্শনে সন্ত্রস্ত ও ভীত হয় এবং তাহা নিবারণ-কল্পে বহুবিধ প্রযত্নপরায়ণ হয়। যোগশক্তি লাভ করিতে হইলেও তাহার অন্ধকার অংশটী হইতে বাঁচিয়া চলিবার পথ করিয়া লইতে হইবে—ঘোড়া চড়িতে শিখিতে হইলে পড়িতেও শিখিতে হইবে। এই নিমিত্ত যোগী গুরুগণ সাধক-শিষ্যের চরিত্রগঠনে প্রথমে সবিশেষ যত্নবান্ হয়েন। যেমন উসর তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে অযত্নবিক্ষিপ্ত বীজে সুফল আশা করা যায় না, তেমনি অগঠিত চিত্তেও যোগশক্তির বিকাশে সুফল আশা করা যায় না।

যোগশক্তির বিকাশ কি প্রকার ও তাহার নিয়ম কি? প্রথমতঃ আমাদিগকে তাহ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তার পর তাহা কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ যোগবলে কি কি শক্তির বিকাশ হইতে পারে তাহা দেখা যাউক। যোগবলে আমাদের ইন্দ্রিয়ে নূতন শক্তির বিকাশ, নূতন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইতে পারে। তারপর আরো উচ্চতর পর্য্যায়ে জীব চৈতন্যে অণিমা, লঘিমা, প্রকাম্য প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইতে পারে। এবম্বিধ বহু প্রাকৃতিক শক্তির সিদ্ধিলাভ সম্ভব। এতদ্ব্যতীত আরো একপ্রকার সিদ্ধি আছে তাহা প্রকৃতির ক্ষেত্রে সিদ্ধ হয় না; সেই অপ্রাকৃত পৌরুষেয় শক্তি পুরুষোত্তম ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না।

আমরা স্থূলদেহাভিমানী জীব। আমাদিগের এই স্থূলদেহের পতনেই আমাদিগের মৃত্যু বা সত্তার ঐকান্তিক বিলোপ হইল মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইও সেই জন্য মরণের হাত এড়াইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে যত্নবান্ হই। আমির স্থূলাভিমান কিয়ৎ পরিমাণে বর্জ্জন করিতে পারিলে বহুবিধ সিদ্ধি লাভ হয়। আমাদিগের এই স্থূলাভিমানী আমি ভাবটীকে স্থূলভাবে রক্ষা করিয়াই কতকগুলি অভিনব সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। পাশ্চাত্যজগতের উদ্ভাসিত clairvoyance, clairaudiance প্রভৃতি বা থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর লক্ষীকৃত ভুবর্লোক বা স্বর্লোকে গমন প্রভৃতি এই জাতীয় সিদ্ধি। ইহাতে আমি যে দেহাত্মক ও নামরূপ সংস্কারের সীমাবদ্ধ আছি আমি তাহাই থাকিয়া যায়, আমার আমি যে বিশ্বেশ্বরের অংশ সেই বোধ হয় না অথচ প্রাকৃতিক বিলাসের অভিনব স্তরে স্বীয় চৈতন্য জাগ্রত রাখিতে পারা যায়। আমরা সচরাচর আমাদের দেহ-শয্যায় শায়িত থাকা সত্বেও যেমন স্বপ্নজগতে বিচরণ করিতে পারি ও নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ ও সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, ইহাও সেই প্রকার। তবে প্রভেদ এই যে, আমরা ইচ্ছা করিয়াই স্বপ্ন আনয়ন

করিতে পারি না ; স্বপ্নের সহিত জাগ্রত জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি না বলিয়া অনেক সময়েই স্বপ্ন অলীক হইয়া পড়ে ; কিন্তু এই শক্তির উন্মেষ হইলে স্বপ্ন সত্য হয় ও সেই স্বপ্নের দৃষ্ট কার্য্য বা ঘটনাবলিদ্বারা জাগ্রতের কার্য্য বা ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে, তন্নিবন্ধন কিয়ৎপরিমাণে ভূত-ভবিষ্যতের সামান্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ।

নূতন ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি ও ইন্দ্রিয়ে নূতন শক্তির উন্মেষ এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্ত সাধন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। অনুকূল কিম্বা সাহায্যে ইহা কিয়ৎ-পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। অতএব ইহার মূল তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক ।

নূতন ইন্দ্রিয় স্ফুরণ হইতে হইলে কি কি আবশ্যক তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এস্থলে আমাদের দেহ মন ইত্যাদির সংস্থানপ্রণালী সম্বন্ধেও একটু আলোচনার আবশ্যক। আমাদিগের পারিপার্শ্বিক জগৎ লইয়া আমরা অবস্থিত আছি। আমির বাহিরে জগৎ শূন্যময় হইয়া গেলে আমাদের আমি সুষুপ্ত হইয়া পড়ে, আমার বা আমির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সেই অবস্থায় সম্ভবপর হয় না। আমা-দিগের বহিস্থ এই বিশাল জগৎকে আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করি। অর্থাৎ জগৎ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় পথে (অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা অণু অর্থে—) 'অণু'রূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের আমি বোধে সংযুক্ত হয় : যেমন আমরা চক্ষুদ্বারা দর্শন করি ; যাহা দেখি তাহাই দৃশ্য বা রূপ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চতুর্দ্দশ লক্ষগুণ বড়। কিন্তু আমরা একবার দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আকাশের যে অংশ দেখিতে পাই সেই স্থানে বহুকোটী সূর্য্য থাকিতে পারে। অত বড় স্থান আমাদিগের ক্ষুদ্র নয়নগোলকে অতি ক্ষুদ্র আকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া কি আশ্চর্য্য কৌশলে অত বড় বৃহৎভাবে আমাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। এই প্রকার বৃহৎভাবের উন্মেষণ কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের স্বায়ত্ত সম্পদ নহে, অপিচ সকল চক্ষুষ্মান্ প্রাণিমাত্রেরই সাধারণ সম্পদ। এইপ্রকার সকল ইন্দ্রিয়পথে জগতের এক একটী ভাব বিশেষিত হইয়া আমাদের গ্রাহ্য হয়। জগতের বা বিশ্ব-প্রকৃতির যেই ভাবনিচয় আমরা ইন্দ্রিয়পথে গ্রহণ করি, তাহাতেই বিশ্বের স্বরূপানুভূতি হইল বলিয়া বলিতে পারা যায় না। এই পাঁচটীর অতিরিক্ত কোনও ইন্দ্রিয় থাকিলে হয় ত আমরা প্রকৃতির আরো অভিনব ভাব অনুভব করিতে পাইতাম। কৃমি-কীটাদি বহুপ্রকার প্রাণী একমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়-সাহায্যে প্রকৃতিকে উপভোগ করিতেছে ; বৃক্ষপত্রে বা ত্বকে দর্শনজ্ঞান গ্রহণোপ-

যোগী পদার্থ বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে পাইয়াছেন। যেই বীজাণু হইতে আমাদের এই সুগঠিত মানবতনু উৎপন্ন, তাহাও একটী সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত প্রাণী বা কীট। কিন্তু উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত হইলেও সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসবিরহিত নহে। তাহা হইলে তাহার এইপ্রকার মানবদেহে পরিণতি হইত না। ইহাতেই বুঝা যায় যে উহা ইন্দ্রিয়গুণাভাসসম্পন্ন ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত চৈতন্য স্বত্তার অতি প্রাথমিক স্থূল অবয়ব মাত্র।

ইচ্ছাময়ী প্রকৃতির অঙ্কে অতি প্রাথমিক জীবাণু তদতিরিক্ত বহির্ব্বিশ্বকে উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল তদনুসারে তাহার ইন্দ্রিয়নিকর ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিল। চিকিৎসা-শাস্ত্রে গর্ভাধান হইতে জড়ায়ুজের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে এবং ইংরাজি শরীর-বিজ্ঞানে উহার ক্রমবিবর্ত্তিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয় উন্মেষের পূর্ব্বে জীবের চৈতন্যে একটী বিশেষ ভাবের (function) উন্মেষ হয়। তাহার পরে উহা বাহিরের সহিত সমতানবদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদিগণ বলেন—the function procedes organism. ইন্দ্রিয়ের কোনও শক্তি বিকাশ হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে একটী ব্যাকুলতা জন্মে; মন সেই ব্যাকুলতার চাপে বহির্ম্মুখী হইয়া তাহার প্রশমন-পদ্ধতি আপনার বাহিরে বা বিশ্বে অন্বেষণ করে। চৈতন্যের বা চিত্তবৃত্তির অভিনব আকুলতা প্রভাবে জীবের অবয়বী ভাবের মধ্যে একপ্রকার অভিনব স্পন্দন বা বিক্ষোভ আরম্ভ হয় ও শারীরিক অণুসমূহ তাহার অনুকূলে নূতন ভাবে বিধৃত হইতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে দেহাভ্যন্তরস্থ কতকগুলি অণুরূপ পদার্থ বিশেষিত হইয়া পড়ে; এবং স্বদেহাতিরিক্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে তত্তৎ চৈতন্যবৃত্তির স্বজাতীয় প্রবাহের সমানুপাতে বাহিরে ও ভিতরে সমতানতা সম্পন্ন হইলে একটি ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। জীবদেহান্তর্গত ইন্দ্রিয়নিচয়ের সমতানবদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ হিন্দুশাস্ত্রে দেবতা নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃরূপে যে পৌরুষেয় শক্তি বিরাজমান তাঁহারই নাম হৃষীকেশ। ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাশেও ঐপ্রকার ভিতরে ভাব ও বাহিরে স্বজাতীয় প্রবাহের সম-তানতা নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। সমুদ্রের অতি গভীর জলনিয়ে কয়েক প্রকার মৎস্য বাস করে, তাহারা প্রায়ই চক্ষুরিন্দ্রিয়-বিহীন। তাহারা স্পর্শেন্দ্রিয়সাহায্যে আপনাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী খাদ্যাদি আহরণ করে। অধিকাংশ সময়েই

তাহাদিগের দেহাগ্রভাগ সিন্ধুগর্ভস্থ শৈলাদি বা অপর কোন জীবদেহে আহত হইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। এই প্রকার আঘাত যন্ত্রণা বারংবার অনুভব করিতে করিতে তাহাদিগের মধ্যে ঐ যন্ত্রণা ভোগের প্রতিকূলে একটা প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সেই প্রবৃত্তির কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় বলিয়া কিছু বিশেষ বোধ নাই, কেবল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য বা যন্ত্রণায় যন্ত্রণাবোধ ও তাহাতে বীতস্পৃহা। এই প্রকার প্রবৃত্তি যখন তাহার ভিতরে নিরন্তর জাগরিত থাকে, তাহাতে সে তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎকে এক অভিনব সাবধানতা সহকারে অনুভব করিতে থাকে। সেই প্রকার প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া সে তখন অপেক্ষাকৃত অগভীর জলে আগমন করে ও সূর্য্য-রশ্মির সাহচর্য্য-নিবন্ধন প্রথমতঃ এক প্রকার ভীতি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার সুখানুভূতিস্বরূপ কৌতূহলপরবশ হইয়া সে সেই আলোকের লোভে ও ভয়ে পরিচালিত অবস্থায় বারংবার সেই আলোক-রশ্মির নিকটে আগমন করে ও তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিতে থাকে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরস্থ অণুসমূহ আলোক স্পন্দনের সহিত সমানুপাতে স্পন্দিত হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রণা প্রশমন ভাবের সহিত সমানুপাতে একটি অভিনব ইন্দ্রিয় গড়িয়া তোলে। গভীর জলের অ মৎস্য চক্ষুষ্মান্ হইয়া ইচ্ছামত বিচরণে সমর্থ হয়।

এই ক্ষেত্রে প্রথমতঃ যাতনায় কাতরতা ও তাহাতে অনভিষঙ্গপ্রযুক্ত উহার প্রাণে এক প্রকার ভাবের দয়, তাহার অর্থ সে নিজেই বুঝে না। চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বরূপ তাহার কোনও আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নাই। একটা ভাবের প্ররোচনায় তাহার দেহের অণুসকল তদনুসারে স্পন্দিত হইয়া এক অভিনব ভাবের আণবিক সংস্থান-ক্রমে দেহ গঠিত হইল। সেই দেহ তাহার পূর্ব্বকার কঠিন কর্কশতর দেহ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত লঘু আঘাতে ব্যথিত হয়। সুতরাং আঘাত প্রাপ্তি ও তজ্জনিত ক্লেশানুভূতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় যদি কখনও অগভীর জলে আসিয়া পড়ে তবেই তাহার দেহে বাহিস্থ আলোক-রশ্মির পতনজনিত কি একটা অভিনব ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, অন্যথা আঘাতজনিত ক্লেশ অনুভূতির পূর্ব্বে স্থূলতর ক্লেশানুভূতিহীন দেহে আলোক-রশ্মির কোনও প্রকার অনুভূতি হওয়াই তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। পরে আলোকের সমবর্ত্তিতানিবন্ধন সেই নূতন কিছুর প্রতি একটা আসক্তি ও কি জানি-কি-ভাবের একটা ভীতি উভয়ই থাকে সুতরাং সে বারংবার ইহার কাছে আসে ও দূরে পলায়। এই প্রকারে বারংবার উহার সম্মুখীন হওয়াতে উহার

ভীতির লাঘব ও সঙ্গলাভেচ্ছা প্রবলতর হইয়া উঠে। পরে যখন বিভীষিকা একেবারে দূর হইয়া একমাত্র আশক্তিই থাকে তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় বিকশিত হয়। ইহা কেবল মৎস্য-জীবনেই সত্য নহে, সর্ব্বজীবের পক্ষেই এই প্রকারে কার্য্য হইয়া থাকে। তবে মৎস্যের জীবনে যেমন বহিস্থ শৈলাদির ঘাতপ্রতিঘাত হইতে তাহার একটা ক্লেশ বোধ ও তাহার তাদৃশ জীবন যাপনে একটা বিরক্তি বা বৈরাগ্য আসে, আমাদিগের জীবনেও দুঃখ, শোকাদির সেই প্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বারংবার শোক দুঃখ জড়া ব্যাধি ইত্যাদি ভোগ করিতে করিতে চিত্তে যখন অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় তখন সংসারে বিরাগ আসে ও ইহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ হয়, তাহাতে অভিনব শক্তি এমন কি আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রবাসী পুত্রের স্নেহময়ী জননী বা পতির অনুরক্তা পত্নী প্রিয়ের বিরহে নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া একান্ত আকুলতা সহকারে কেবল তাহারই চিন্তায় নিরতা থাকেন। কাহারও কাহারও ঈদৃশ চিন্তা কালক্রমে এ প্রকার একাগ্রীকৃত হইয়া যায় যে তাহারা শেষে তাঁহাদের সন্নিকটে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে অথবা তাহারাই তাহাদিগের সেই বাঞ্ছিতের নিকট উপস্থিত বোধ করেন ও তাহার নানাবিধ সেবা করেন বলিয়া মনে করেন। এই প্রকার অবস্থায় হয় ত কখনও তাহার পত্র বা কোনও সংবাদ পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পারেন ও পত্রের সংবাদ বা লোকপ্রমুখাৎ শ্রুত সংবাদও তাহাদের দৃষ্ট ঘটনা এক হইয়া গিয়াছে দেখিতে পান। কখনও বা এই প্রকার সংবাদ আগমনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ পত্র বা লোকের আগমন-পথ ও কি কি প্রকারে উহা আসিল তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান। বারংবার এই প্রকার হইতে হইতে তাঁহাদের ঐ এক প্রকার সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে।

রোগযন্ত্রণায় দীর্ঘকাল যাবৎ কাতর রোগীও কখনও কখনও এই প্রকারে নিজের ব্যাধি ইত্যাদি পরিজ্ঞাত হইয়া রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থানেই তাহারা এবম্বিধ ঘটনানিচয়কে এক প্রকার স্বপ্নের খেলা বলিয়া মনে করে ও শক্তি লাভের প্রয়াস-পরায়ণতা না থাকাপ্রযুক্ত তাহা লাভ হয় না।

যাহা হউক সকলেরই মূলে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকার আবশ্যক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি লাভকেই মুখ্য পদ প্রদান

করিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন। অপিচ শক্তির লব্ধ ফল বা গতির লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কেবল ছুটাছুটিই সার হয়। তাহাতে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগের পরে শিশুর হাঁটিতে শিখার ন্যায় অনেক আছাড় পড়িয়া শেষে শক্তি লাভ ঘটে।

স্বজনবিয়োগ, দারিদ্র্য দুঃখ নানাপ্রকার কায়িক ও মানসিক ক্লেশ-রাশি হইতে মানবের চিত্তে অনেক সময়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়া কোনও উচ্চ শক্তি লাভে তাহার পরিণতি হয়। এবম্বিধ পরিণতির ফলে তখন মানুষ বুঝিতে পারে যে আমারই ভিতরে ঈদৃশ অভিনব শক্তি বীজরূপে উপ্ত রহিয়াছে এবং আমি কেবল স্থুল দেহই নহি, পরন্তু স্থূল সূক্ষ্মাদি বহু অবয়বের মধ্যেই আমি বিতত রহিয়াছি। তখন তাহার নিকট দুঃখের ও একটা মধুময় ভাষা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে।

এই প্রকারেই আবার নৈসগিক উৎপাতরাশি যথা দাবানল, জলপ্লাবন, প্রভঞ্জন, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতির উৎপাত, ভূকম্পন ইত্যাদি হইতে ইতর প্রাণী-দিগের মধ্যেও এক একটা মানসিক বৃত্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রকৃতির বিশাল অঙ্গনে, সর্ব্ববিধ সুখ দুঃখদ প্রক্রিয়ারই এক একটা উচ্চতর বিলাস আছে। নৈসগিক উৎপাতসমূহ বাহ্য দৃশ্যে অতিশয় ভয়ানক ও বিসদৃশ মনে হইলেও এই সকল উপায়ে প্রকৃতি জননী তাহার মোহাচ্ছন্ন সন্তানদিগকে যে জাগরিত রাখিয়া মোহমদিরার প্রাণান্তক বিষক্রিয়া হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইলে এই জগতের জীবনিবাস আনন্দধামের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হউক, বহিস্থ উৎপাতের তাড়নাতেই হউক বা অন্য কোনও প্রকার পরেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই হউক, কোন কোন বিষয়ে জীবের এক একটা মানসিক প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয় ও তাহা হইতে কোনও অভিনব ইন্দ্রিয়ের বিকাশ বা ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। একজাতীয় জীবের মধ্যে কোনও একটী বিশেষ জীবের ইন্দ্রিয়শক্তির অভিনব বিকাশ হইতে পারে এই টুকু অধিকার-বিশিষ্টতা সর্ব্ব জীবেরই আছে। কিন্তু কোনও একটী ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় যন্ত্র বিকাশিত হইলে তজ্জাতীয় সর্ব্বজীবের না হইলে তাহা হয় না। যেমন আমাদিগের দর্শন শ্রুতি স্পর্শাদি সকল ইন্দ্রিয়েরই এক একটি বিশেষ দ্বার বা যন্ত্র আছে। কিন্তু মন বা বোধের তাদৃশ কোনও বিশেষ দ্বার নাই, অথচ প্রায় সমগ্র মানব জাতিই অল্লাধিক মননশীল। উচ্চতম সাধক হইতে নিম্নতম স্তরের বন্য, পিশিতাসী মানব পর্য্যন্ত কাহারই মননের জন্য একটা

বিশেষ কোনও বহিরিন্দ্রিয় নাই। শরীরতত্ত্বজ্ঞগণ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মননশীল ব্যক্তিদিগের ভ্রূমধ্য (pituitary body) ও ধীমান্ ব্যক্তিদিগের দ্বিদলাঙ্কুর (pineal gland) সাধারণ মানব অপেক্ষা অনেক পরিপুষ্ট। এবং অনেকে ইহাও অনুমান করিয়া থাকেন যে ভবিষ্যৎ মানব দেহে (অর্থাৎ অপর মন্বন্তরে) ভ্রূমধ্যস্থানে একটী তৃতীয় লোচন স্ফুরিত হইবে। অপিচ শক্তিসম্পন্ন যোগিগণও ভ্রূমধ্যাস্তর্ব্বর্ত্তী লোচন বা প্রজ্ঞাদৃষ্টি সাহায্যে অলৌকিক বিষয়সমূহ দেখিতে পারেন ইহাই সাধারণেরও ধারণা এবং যোগিগণও বলিয়া থাকেন। তাই বোধ হয় আমরা বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে আরম্ভ করিয়া দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি কাহারও তৃতীয় লোচনের কথা শুনিতে পাই না। একমাত্র কালাতীত শঙ্কর শঙ্করী ও তদাত্মজ গণনায়কেই তৃতীয় লোচনের অস্তিত্ব পুরাণাদিতে দেখিতে পাই। মহামায়ার সমস্ত বিকাশ শক্তির রূপই ত্রিলোচনা। ইহা হইতে কি ইহা অনুমান করা যায় যে তৃতীয় দর্শনেন্দ্রিয় ও শক্তির বিকাশ পর্য্যন্ত এই কল্পের জীবসাধারণের চরম পরিণতি ?

যাহা হউক আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম যে কোন শক্তি বা ইন্দ্রিয় বিকশিত হইতে হইলে একটা প্রবল অভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ দূরীকরণের বোধ থাকা আবশ্যক। সমদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। দ্বন্দ্বাতীত হইলে আর ইন্দ্রিয় থাকা না থাকা সমান হয়। ইন্দ্রিয়দিগের অপর নাম "মাত্রা" অর্থাৎ ইহাদ্বারা জগতের মাপ করা যায় (মিয়তে অভিঃ) এজন্য ইহারা মাত্রা ও ইহারাই আবার ভগবান্ বা ব্রহ্মের ইঙ্গিত করে (ইঙ্গতে ইতি) বলিয়া ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুখের স্পৃহা ও দুঃখের উদ্বেগ এই উভয় বিমুখী ভাবের মিলনস্থানেই এক একটী ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় মধ্যে একটা সুখস্বরূপত্ব ভাব আছে। উহাই জীবের আমির সহিত ঐক্যতার বা সমতানতার চিহ্ন আর ইন্দ্রিয়ের দুঃখানুভূতিজনিত উদ্বেগ প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যের লক্ষণ। ইন্দ্রিয়ের সুখ ও দুঃখ ভাবের সাহায্যে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবের মধ্যে দেহাত্মক বা ইন্দ্রিয়াত্মক আমি ভাবটি স্থির থাকে। ইন্দ্রিয় যদি কেবল সুখ ভাবই গ্রহণ করে তাহা হইলে আমি ইন্দ্রিয় বোধের মধ্যে অপর হইতে আমাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারি না। আমির প্রতিকূলে তুমি বা সর্ব্ব না থাকিলে 'আমি' স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, ইহা সাধারণ বা সর্ব্ব হইয়া পড়ে অবশেষ ভাবে সুখে মিলিয়া যায়। আর দুঃখের উদ্বেগ আমিকে বাহির হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রত্যহৃত করিয়া আত্মস্থ করিয়া দেয়। কাযেই দুঃখময়

অনুভূতি না থাকিলে আমির সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে আমভাব দূরে সরিয়া পড়ে, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আমির সংস্পর্শ বিহীন হইয়া থাকিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগের পক্ষে প্রকৃতির পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ। ইহাদ্বারা আমরা প্রকৃতিকে পাঁচটি বিশেষ ভাবে মাপিয়া থাকি বা প্রকৃতির স্পন্দন আমাদিগের অনুমোদিত পাঁচটি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করি। অপিচ প্রকৃতি কেবল এই পঞ্চভাবাত্মিকা কি তদতিরিক্ত আরো ভাবময়ী তাহা আমরা জানি না। আমরা এই পাঁচটির অতিরিক্ত ভাব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল প্রকৃতিতে দেখিতে পাই না। প্রকৃতির যে ভাব আমরা শ্রবণপথে গ্রহণ করিতে পাই তাহাকেই আমরা শব্দ বলি ও সেই প্রাকৃতিক ভাবকে আকাশতত্ত্ব নামে অভিহিত করি। দৃশ্যে অগ্নি, স্পর্শে বায়ু, স্বাদে রস বা জল ও গন্ধে ক্ষিতিতত্ত্বরূপে আমরা প্রকৃতিকে অনুভব করিয়া থাকি। আমাদিগের এক এক প্রকার বোধ বা অনুভূতির প্রতিকূলে এক একটী প্রাকৃতিক তত্ত্বের বিদ্যমানতা দেখিতে পাই। আমাদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এই সকল তত্ত্বের সহিত সমানুপাতে গঠিত একই জ্যোতিঃ ভাব আমার ভিতরে দৃষ্টি শক্তি এবং বাহিরে সর্ব্বত্র রূপ বা দৃশ্যরূপে বিতন্বত না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না; দৃষ্টিশক্তিমান্ বর্ণান্ধগণের দৃষ্টিতে বাহঃ প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণরূপ সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই তাহারা কোন কোন বর্ণের বস্তু দেখিতে পায় না এক বর্ণে অপর বর্ণ অনুভব করিয়া থাকে। এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়েরই বাহিরে একটা না একটা তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য থাকা চাই। সেই সামঞ্জস্যের যতটুকু অভাব ইন্দ্রিয়ের ততটুকু অপূর্ণতা থাকিবে এবং উহা যত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে ইন্দ্রিয় শক্তিও তত প্রখর ও কার্য্যকরী হইবে। এই নিয়মের বশেই (caid audience) দূর শ্রবণ ও দূর দর্শনাদি নানাবিধ শক্তি প্রবর্ত্ত-সাধকদিগের মধ্যে বিকশিত হইতে দেখা যায়। যাহার বহিঃস্থ তত্ত্বে বিশ্বাস নাই বা তত্ত্বের জ্ঞান হয় নাই অথবা নিজের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় নাই সে কোনও প্রকার যোগশক্তি লাভ করিতে পারে না। কাহারও কথায় বা অনুরোধ উপদেশে যোগ হয় না। প্রাণের অন্তস্থলে যখন দারুণ পিপাসার উদ্রেক হয় ও তাহার তাড়নে শান্তিনিকেতন খুঁজিতে ছুটে, তখনই সৌভাগ্যবান্ জন সন্নিহিত গুরুকে দেহ-রথের সারথিরূপে দেখিতে পাইয়া তাঁহার বাক্য যথার্থ বলিয়া মানিতে পারে। তখন আপনার মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি যে কোনও ব্যক্তির মুখে শুনুক না কেন তাহাই পরম সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে ও সেই ব্যক্তিকে গুরু স্বীকার করিতে পারে, তাহার রূপ, গুণ, বিদ্যাদির বিচার আর হৃদয়ে উদিত হয় না; তাহাকেই আচার্য্যরূপী ভগবান্ বোধে আত্মসমর্পণ করে। তাহার উপদেশ একমাত্র সার সত্য বোধে সাধন পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহারই সাধন ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। পোষাকী ভাবের সাধন ভজনে যোগশক্তি লাভ হয় না। প্রাণে আকুল পিপাসার উদ্রেক হওয়া চাই।

শ্রীযোগানন্দ দাস।

প্রার্থনা।

বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মরত, হউক ব্রাহ্মণগণ
ধর্ম্মকর্ম্ম ব্রত উদ্‌যাপনে।
ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ, হউক রাজন্যবর্গ,
মহারথ বীর ধীর রণে॥
দুগ্ধবতী ধেনুগণ বলিষ্ঠ বৃষভদল
তুরগ সুন্দর দ্রুত গতি।
রূপবতী কুলাঙ্গনা, পতিরতা সুভাষিণী
রত্নগর্ভা হ'ক গুণবতী॥
যজমান সুসন্তান বীর্য্যবান্ আয়ুষ্মান্
মহাবল হউক সুমতি।
স্বেচ্ছামত প্রজাকুল, লভুক পর্জ্জন্য-বারি
সুজলা সুফলা বসুমতী॥
ফলবান্ বনস্পতি করুক সতত সার
প্রচুর সুপক্ক ফলদান।
হে প্রভো! প্রার্থনা এই মোদের এ ধরাতলে
যোগক্ষেম করুন বিধান॥

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ।

আঁধারে।

পথের ধূলিতে নয়ন অন্ধ
দেখিতে কিছু যে পাই না,
ঘন ঘোর ঘটা ঘেরিল আকাশ
আঁধারে যেতে যে পারি না।
যে পথে চলিলে গৃহে ফিরে যাব
সে পথে চলিতে চাহ না,
কে আসি আমারে জোর করে করে
বিপথে ঘুরায় বুঝি না॥
যে আমার এসে নয়ন জুড়ালো
সে হৃদয়ের আলো কোথা গো,
এ যে আঁধারে আঁধারে ঘুরি চারি ধারে
কোথা যেতে কোথা যাই গো॥
অন্ধ-নয়নমণি করুণামৃতখনি
হৃদয়জুড়ানো সখা কোথায় লুকালে গো?
আমি যে আঁধারে পড়ে পথ কোথা নাহি হেরে,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরি পথে পথে ধাই গো॥
সে ভাগ্য আমার নাই তোমার মুরতি দেখা,
তোমার অমৃত আলো চাহি না চাহি না সখা,
শুধু পরশ করগো মোরে ঐ দুটি বাহু দিয়ে
শুধু ডাকিয়া লহগো তব শীতল চরণ ছায়ে॥
দেখি দেখি করি জীবন কাটিল
তোমার দেখা তো হলো না।
যাই যাই করে জীবন ফুরালো
তব পথে চলা হলো না;
অন্ধ নয়ন বধির শ্রবণ
পঙ্গু চলিতে পারি না,
তুমি প্রভু মোরে ডেকে নাও ঘরে,
আর তো কাহারে চিনি না॥

হৃদয় বন্ধু চির সখা মোর
তবু তো তোমায় বুঝি না,
কে এসে আমায় ভুলাইয়া দেয়
চিনেও তাহারে চিনি না॥

ভূপেন্দ্রনাথ।

---

(২) জৈন দর্শন।

(তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)

প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ (সূঃ ১-১ ৬)।

অন্বয়ার্থ.— প্রমাণে দ্বে-প্রত্যক্ষং পরোক্ষঞ্চ নয়ৈঃ নয়সমূহৈঃ,— দ্রব্যার্থিক নয়ৈঃ পর্য্যায়ার্থিকনয়ৈশ্চ। অধিগমঃ—(তেষাং জীবাদিতত্ত্বানাং) জ্ঞানং ভবতি ইত্যর্থঃ॥

প্রমাণ (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) দ্বারা এবং নয়সমূহ দ্বারা চতুর্থ সূত্রোক্ত জীবাদি সপ্ততত্ত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৬॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা,—উক্ত জীবাদি তত্ত্বের জ্ঞান ও সম্যক্ দর্শনাদি পদার্থের জ্ঞান বা স্বরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দুই প্রমাণ দ্বারা এবং দ্রব্যার্থিক ও পর্য্যায়ার্থিক নয় সকল দ্বারা হইয়া থাকে। যে পদার্থ যদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উক্ত হয় বা জানা যায় তাহাকে প্রমাণ বলে। অথবা পদার্থের একদেশ যাহা দ্বারা উক্ত হয় বা জানা যায় তাহাকে নয় কহে। যথাক্রমে উক্ত নাম স্থাপনাদিদ্বারা নিক্ষেপ-বিধি হইতে উপন্যস্ত, জীবাদি সপ্ততত্ত্বের জ্ঞান প্রমাণ ও নয়দ্বারা যথার্থরূপে হয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণের বিশেষ বিবরণ পরে বলা যাইবে। অপর কোন দার্শনিক প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ (নয়বাদ দ্বারা) এই চারি প্রকার প্রমাণ বলিয়া থাকেন। নৈগম সংগ্রহ পভৃতি নয় পরে বলা হইবে। আত্মা (জীব) অপরের সাহায্যশূন্য হইয়া যে জ্ঞানদ্বারা পদার্থের স্বরূপ (স্বচ্ছত্ব প্রভৃতি) স্পষ্টরূপে জানে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং শাস্ত্রদ্বারা যে পদার্থের একদেশ স্পষ্টরূপে জানা যায়, তাহাকে পরোক্ষ প্রমাণ বলে। ইহার এক অংশকে অনুমানও বলে। যে, পর্য্যায়ের প্রতি উদাসীন ভাবে দেখে এবং দ্রব্যকে মুখ্যরূপে প্রকাশ করে, তাহাকে

'দ্রব্যার্থিক নয়' বলে এবং যে, দ্রব্যকে মুখ্যভাবে জ্ঞাপন না করিয়া কেবল পর্য্যায়কে বলে তাহাকে 'পর্য্যায়ার্থিক নয়' কহে॥ ৬॥

নির্দ্দেশ-স্বামিত্বসাধনাধিকরণ-স্থিতি-বিধানতঃ (সূ ১-১-৭)।

অন্বয়ার্থঃ—নির্দ্দেশঃ (নাম্না বস্তুকীর্ত্তনম্) নির্দ্দিশ্যতে ইতি নির্দ্দেশঃ। স্বামিত্বং (আধিপত্যং), সাধনং (উৎপত্তিনিমিত্তং), অধিকরণং (অধিষ্ঠানং), স্থিতিঃ (কালপরিচ্ছেদঃ), বিধানঞ্চ (প্রকার ভেদসংখ্যা) এভ্য এভির্ব্বা জীবাদি সপ্ত তত্ত্বানাং (সম্যক্ দর্শনাদীনাঞ্চ) জ্ঞানং জায়তে ॥ ৭ ॥

বস্তুর স্বরূপ কথন, স্বামিত্ব, সাধন, অধিকরণ, স্থিতি, বিধান (পদার্থের প্রকারভেদ) প্রভৃতি দ্বারা জীবাদি সপ্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ এই নির্দ্দেশ আদি ছয় পদার্থ অনুযোগের দ্বারস্বরূপ, উক্ত ষট্ পদার্থ দ্বারা জীবাদিতত্ত্বের বিকল্প এবং বিস্তাররূপে জ্ঞান হইয়া থাকে। যথা—জীব কাহাকে বলে? ঔপশমিক ক্ষায়িক প্রভৃতি যে জীবভাব, এই ভাবসমূহের সহিত ভাব বা বিশিষ্ট পদার্থই জীব নামের বাচ্য।

ভাষ্য-ব্যাখ্যা—সম্যক্‌দর্শন পরীক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—সম্যক্‌দর্শন কাহাকে বলে? দ্রব্য পদার্থই সম্যক্‌দর্শন, সংখ্যা দৃষ্টিজীবরূপশূন্য স্কন্ধ ও নয়, গ্রাম ও নয়। স্বামিত্ব,—সম্যক্ দর্শন কাহার? কিংবা কাহার হইয়া থাকে? (উত্তর) না এই সম্যক্‌দর্শন আত্মার সংযোগদ্বারাই আত্মা হইতে ভিন্ন পুদ্‌গল-ধর্ম্ম প্রভৃতি সংযোগদ্বারা ও আত্মা এবং অনাত্মা এই উভয়ের সংযোগ হয় ইহাই বক্তব্য। আত্মার ও অনাত্মার সংযোগে জীবের সম্যক্‌দর্শন হইয়া থাকে। অর্থাৎ সম্যগ্‌-দর্শনের অধিকারী সামান্যরূপে জীব হইয়া থাকে। সেইরূপ অন্যের (আত্মা হইতে ভিন্ন) সংযোগ দ্বারা জীবের এবং অজীবের (জীবপ্রায় বা অল্পজীবের) এইভাবে দুই জীব কিংবা দুই অজীবের, তিন জীব বা তিন অজীবের বিকল্প হয়। এবং উভয়ের সংযোগে অর্থাৎ আত্মা এবং অন্যের সংযোগে ঈষদ্‌জীবের ও একাধিক জীবের ও একাধিক অজীবের (সম্যক্‌দর্শন বিকল্প' হয় না। কিন্তু শেষ বিকল্প হয়। সাধন (যদ্দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়) যথা সম্যক্‌দর্শন কিসের দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়? নিসর্গ ও অধিগম দ্বারা সম্যক্‌দর্শন প্রাদুর্ভূত হয়; ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। নিসর্গের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। অধিগম সম্যক্‌দর্শন ব্যায়াম—অর্থাৎ গুরু প্রভৃতির নিকটে বাসকারী শিষ্যের যে, সম্যক্‌দর্শনের প্রাদুর্ভাব-কারক শুভ ও ন্যায্য কর্ম্ম তাহাকে 'ব্যায়াম' বলে, (ইহা চরক সংহিতোক্ত ব্যায়াম নয়) নিসর্গজ ও অধিগমজ এই প্রকার সম্যক্‌দর্শন।

সম্যক্‌দর্শন আবরণীয় যে, কর্ম্ম তাহার ক্ষয়ে ও উপশমে অথবা ক্ষয়-উপশম— এই দুই দ্বারা হয়। অধিকরণ তিন পকার। প্রথম—আত্মার সান্নধান হইতে হয়। দ্বিতীয় আত্মার সামীপ্য হইতে হয়। তৃতীয় আত্মা ও অনাত্মার সামীপ্য হইতে হয়। আত্মার সন্নিধান—অর্থাৎ তদীয় আন্তরিক সামীপ্য হয়। এবং অপর সন্নিধানের তাৎপর্য্য এই যে, তাহা আত্মার বাহ্য সন্নিধান হইতে হয়। উভয় সন্নিধানের অর্থ বাহ্য সন্নিধান ও আন্তরিক সন্নিধান জানিবে। আত্মার সন্নিধানেব উদাহরণ—জীবেব সম্যক্‌দর্শন হইয়া থাকে তাহাতে জীবের জ্ঞান হয়। সেইরূপ জীবের চরিত্রও জানিবে। এবং বাহ্য সম্যক্‌দর্শনের উদাহরণ— জীবের সম্যক্‌দর্শন, অন্য জীবের সম্যক্‌দর্শন ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তরূপ বিকল্প হইয়া থাকে। এবং উভয় সামীপ্যে উভয় সন্নিধান দ্বারা অপ্রাপ্য ও সদ্ভূত পূর্ব্বোক্ত ভঙ্গ বিকল্প হয়। স্থিতি অর্থাৎ জীবে সম্যক্‌দর্শন কতকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিবে? জীবের সম্যক্‌দৃষ্টি দুই প্রকারে হয়। প্রথম সাদি সান্ত, অর্থাৎ আদি (উৎপত্তি) ও অন্ত (বিনাশ) যুক্ত। এবং দ্বিতীয় সাদি অনন্ত,—অর্থাৎ উৎপত্তির পর যে সম্যক্‌দৃষ্টির অন্ত বা বিনাশ হয়। অপর সম্যক্‌দর্শন আদি অন্তযুক্ত হইয়া থাকে। এই সম্যক্‌দর্শন প্রায় সংখ্যায় অন্তমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অতি ন্যূন সংখ্যায় অন্তমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সম্যক্‌দর্শনের অবস্থিতি থাকে। অধিক সংখ্যায় তাহা ছিষষ্টি (৬৬) পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এইভাবে সম্যক্‌দৃষ্টি ও সাদি এবং অনন্ত। যেরূপ সংযোগ, ত্রিবিধ যোগের সহিত শৈলেশী প্রাপ্ত, কেবলী এবং সিদ্ধ হয়। বিধান অর্থাৎ ক্ষয় প্রভৃতির হেতু তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া তিন প্রকার। ইহার তিন পকাব বিধান (ভেদ) দর্শনাবরণীয় কর্ম্মদ্বারা দর্শন ও মোহের ক্ষয় প্রভৃতি তিন প্রকার হেতু হইতে হয়। যেরূপ ক্ষায়িক সম্যক্‌দর্শন ঔপশমিক সম্যক্‌দর্শন। এবং ক্ষায়োপশমিক সম্যক্‌-দর্শন। এই ঔপশমিক, ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশমিক ত্রিবিধ সম্যক্‌দর্শন দ্বারা পর পর অর্থাৎ উত্তরোত্তর বিশুদ্ধি বা প্রকর্ষতা হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্ম-শাস্ত্রী
সাংখ্য, বেদান্ত, দর্শন, তীর্থ।

গঙ্গা।

(১)

যেদিন স্বরগ ত্যজিয়া মর্ত্ত্যে নামিলে জননী গঙ্গে!
পবিত হইল ভারতবর্ষ পরশি' লহরী ভঙ্গে।
নাশি' কলুষ "সগরবংশে" যখন মোক্ষ দানিলে,
ঝাঁপায়ে পড়িল ভারতবাসী তোমারি পুণ্য সলিলে।
অমর-মধুর-ধীর কণ্ঠে গাহিল সবে রঙ্গে
পতিত-পাবনী সুরধুনী জয় মা জননী গঙ্গে।

(২)

যেদিন তোমার বক্ষ সুধা পড়িল উছলি মোক্ষদে!
হইল ভারত পতিত ক্ষেত্র উর্ব্বর, শস্য-সম্পদে।
জননি তোমার মহিমা-প্রভায় আসিল স্বর্গ নামিয়া ধরায়
হইল ভারত, তীর্থ মহত তোমারি অমিত করুণায়।
অমর মধুর-ধীর-কণ্ঠে গাহিল সবে রঙ্গে,
পতিত-পাবনী সুরধুনী জয় মা জননী গঙ্গে।

(৩)

ধূর্জ্জটি-জটা ত্যজিয়া যেদিন নামিলে জননী গঙ্গে!
উঠিল বিকাশি' দিব্য অলোক মিলনমধুররঙ্গে।
যেদিন জননী বিমল-ভঙ্গে বিপ্লাবি তট বহিলে;
হইল ধন্য অবগাহি' সবে তোমারি পুণ্য সলিলে।
জননী তোমার গরিমা দৃপ্ত মত্ত-তীর্থ মোদেরি প্রাণ,
তাইত আবেগে হরষে গাহি মা তোমারি পুণ্যমহিমা গান।

শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী।

---

(৬) কাঞ্চীর অন্যান্য মন্দির।

কাশী, অবন্তি প্রভৃতি অন্যান্য সপ্তপুরীর ন্যায় কাঞ্চীতেও অসংখ্য শিবলিঙ্গ এবং দেবমন্দির বিরাজমান ছিল। এসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে,—কোন সময় একাম্বরনাথ একমুষ্টি বালুকা ছড়াইয়া ছিলেন, তাহাতে যতগুলি বালুকাকণা ছিল প্রত্যেক বালুকাকণা এক একটী শিবলিঙ্গরূপে

পরিণত হয়েন। বর্ত্তমানে শিবকাঞ্চীতে নিম্ন লিখিত দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরগুলি প্রসিদ্ধ এবং অবশ্য দর্শনীয়।

(১) একাম্রনাথ (২) কামাক্ষী দেবীর মন্দির, কৈলাসনাথের মন্দির, কচ্ছপেশ্বরের মন্দির, ত্রিবিক্রম বা বামন অবতারের মন্দির। ত্রিলোকেশ্বরের মহাদেবের মন্দির বিষ্ণুকাঞ্চীর পথে ইন্দ্রতীর্থের নিকটবর্ত্তী।

কামাখ্যা দেবী।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির অতি বৃহৎ ও উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দাক্ষিণাত্যের রীত্যনুসারে গোপুরম্ সরোবর, মণ্ডপম্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মন্দির দ্বারা সুশোভিত। সমস্ত চত্বরই প্রস্তরের টালিদ্বারা আবৃত ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু মন্দিরটী অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বহুদিন সংস্কার হয় নাই। আমরা প্রথমতঃ শুক্রতীর্থ নামক পুণ্য সরোবরে আচমনাদি করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী কামাক্ষা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরের চূড়া প্রভৃতি অতি সুন্দর কারুকার্য্যে খচিত কিন্তু বিমানটী ক্ষুদ্র। দিবালোকেও প্রদীপ না জ্বালিলে দেবী দর্শন হয় না। শ্রীভগবতী "গুহাস্থিতং গহ্বরেষ্টং" "নিহিতং গুহায়াং' অন্ধকারময়ী "বুদ্ধিগুহায়" তাঁহার অধিষ্ঠান। সাধকহৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইলে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়রূপ দর্শন হয়। তাই প্রাচীন মন্দির মাত্রেরই গর্ভগৃহ অর্থাৎ যে গৃহে দেবতার অধিষ্ঠান তাহা অন্ধকারময়। মন্দিরটী অন্ধকূপ বিশেষ হইলেও কর্পূরালোক, ঘৃতপ্রদীপ, পুষ্পচন্দন ও সুগন্ধি ধূপ ধুনার গন্ধে আমোদিত। কামাক্ষাদেবীর নানাভরণভূষিতা শ্রীমূর্ত্তিটিও মনোমুগ্ধকর। প্রতিমা জীবন্ত বলিয়া মনে হইল। তাঁহার দর্শন মাত্রেই আমাদের হৃদয় মন মুগ্ধ হইল। ভক্তির এক অনির্ব্বচনীয় অমৃতধারায় আমরা অভিষিক্ত হইয়া যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তখন সেই চিদানন্দঘনের আনন্দস্বরূপা মহাবিদ্যা দেবীর শরণাগত হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলাম,—

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে ॥
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।

নমস্তে চিদানন্দানন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

মা সচ্চিদানন্দরূপিণী মাহেশ্বরী ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী পরমেশ্বরী মা তোমাকে পূজা করি। তুমিই "মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহাদেবী, মহাস্মৃতি"। মা! তুমিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে খেলিতেছ। আমার ন্যায় অহং বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের নিকট মা তুমি মহামায়া অবিদ্যা। মহামায়া সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখিয়াছ। আর দৈবীসম্পদসম্পন্ন ভগবৎ-ভজন-পরায়ণ সাধকের নিকট তুমি মহাবিদ্যা। মা মহাযোগিনী জ্ঞানরূপিণী তুমিই ভক্তের সহিত ভগবানের যোগ করিয়া থাক। মা তুমি কৃপা না করিলে ভেদজ্ঞান ঘুচিবে না, তাই করযোড়ে বলি—মা ভেদজ্ঞান ঘুচাইয়া দাও, অবিদ্যা গ্রন্থি ছেদন কর, মা তুমি মহাবিদ্যারূপে প্রকটিতা হও। মা তুমি সর্ব্বস্য বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে উদিতা না হইলে সাধনায় অনুরাগ হইবে না। তোমার কৃপা না হইলে চিত্ত ভগবৎমুখীন হইবে না। মা ভগবৎ-বাণী শ্রবণ করিয়াছি—"দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায় বিনাশায়াসুরীমতা।" মা দৈবী সম্পদ সঞ্চয় করিতে না পারিলে তাঁহার কৃপা হইবে না জানি, কিন্তু তুমি ত মা শক্তি, তোমার কৃপা না পাইলে, তুমি দয়া করিয়া হৃদয়ে বল না দিলে কেমন করিয়া দৈবী সম্পদ সঞ্চয় করিতে পারিব? তাই করযোড়ে ডাকিতেছি—মা তুমি ভিন্ন আর গতি নাই।

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

পূজারি মহাশয় দেবীর কর্পূরালোকে আরত্রিক ও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করিলেন। আমরাও তাঁহার অনুমতিক্রমে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। আমাদের ইচ্ছা হইল আরও কিছুক্ষণ এই হৃদয়দ্রবকারিণী নয়নমনোরম অপরূপ রূপ দর্শন করি। সমস্ত নামরূপের যিনি অধীশ্বরী তাঁহার রূপ দেখিয়া কাহার নয়ন তৃপ্ত হয়? তাইত বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

মন্দিরটী ক্ষুদ্র, বাহিরে অনেক যাত্রী দাঁড়াইয়া, কাজেই আমাদিগকে এই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতে হইল। মন্দিরসংলগ্ন একটী গৃহে একটী প্রস্তরের উপর শ্রীযন্ত্র অঙ্কিত আছে। ইহারই উপর সেই মহামায়া ব্রহ্মশক্তির উদ্দেশ্যে পূজা হয়। পুরোহিতেরা বলেন—এই শ্রীচক্র বা যন্ত্রটী আদি শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে কামাক্ষী দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরাবলীও শঙ্করাচার্য্যের নির্ম্মিত। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় আচার্য্য শঙ্কর এই কাঞ্চীনগরীতে এক

মাস কাল বাস করিয়া তথাকার তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া বৈদিক পূজা পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন।

সুরধাম সতন্ত্র কারয়িত্বা পরবিদ্যা চরণানুসারিচিত্রম্।
তান্ত্রিকাল তানীস্তগবত্যাঃ শ্রুতি সম্মতাং সপর্য্যাম্॥

(শঙ্কর বিজয় ১৫ অধ্যায়।)

ঐ কাঞ্চীনগরীতে পর বিদ্যার চরণানুসারি বিচিত্র সুরধাম নির্ম্মাণ করাইয়া তান্ত্রিক ব্যক্তিগণকে নিবারণ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ভগবতীর বেদোক্ত পূজা বিস্তার করিলেন। কাঞ্চীপুরী হিন্দুর সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমা হইলেও বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবে এই সমস্ত হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রায় হয় এবং বিকৃত তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাব হয় শঙ্কর কাঞ্চীতে বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধান্য নষ্ট করিয়া একটী মঠ স্থাপন করেন। এই মঠ হাইদর আলীর কাঞ্চীপুর আক্রমণ সময়ে কুম্ভকোনমে উঠিয়া যায়। অদ্যাপি কুম্ভকোনমে উক্ত মঠটী আছে। পূজারি-দের নিকট অবগত হওয়া যায় যে পূজাপদ্ধতি প্রভৃতির জন্য তাঁহাদের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি আছে, উহা শঙ্কর-বিরচিত। প্রতি শুক্রবার দেবীর অভিষেক হয়; অপর বারে পুষ্পাভিষেক মাত্র হইয়া থাকে। শুক্রবারে আভরণ বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া হরিদ্রা মাখাইয়া তীর্থসলিলে অভিষেক হয়। তৎপরে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া অলঙ্কৃত ও পুষ্পমাল্য পরিশোভিত করিয়া দেবীর কপালে কুঙ্কুমের তিলক দেওয়া হয়। অভিষেক কালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শ্রীসূক্ত পুরুষসূক্ত পাঠ করেন। অভিষেকে আরত্রিক ষোড়শোপচারে পূজন ও ভোগ হইয়া থাকে।

শিবশক্তি কামাক্ষী দেবীর দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীদেবী এবং পশ্চিমদিকে ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী দেবী বিরাজিতা। আর একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে যাহার চূড়ায় গেরুয়া রঙ্গের পতাকা শোভা পাইতেছে একটী উচ্চ চতুষ্কোণ প্রস্তরের উপর যোগাসনস্থ উপদেশ মুদ্রাবিশিষ্ট কৃষ্ণপ্রস্তরবিনির্ম্মিত শঙ্করমূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাদদেশে করযোড়ে দণ্ডায়মান দণ্ডধারী শঙ্করের ছয়টী শিষ্যমূর্ত্তি খোদিত। শঙ্কর মূর্ত্তির দণ্ডকমণ্ডলু শোভিত গৈরিকবসন পরিহিত গম্ভীর বেশ। প্রস্তর মূর্ত্তির নিকটেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পিত্তলনির্ম্মিত শঙ্করের উৎসব মূর্ত্তি। প্রতি-দিন শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তির পূজাভোগ ও আরত্রিক হইয়া থাকে। উৎসব কালে উৎসব মূর্ত্তিরও পূজাদি হইয়া থাকে। এখানে প্রবাদ আছে— শ্রীশঙ্কর এই কাঞ্চীপুরীতেই দেহত্যাগ করেন। এবং তাঁহার সমাধি স্থানেই

এই শঙ্করমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না; কারণ, কাশী, পুরী, শৃঙ্গেরী প্রভৃতি নানা স্থানে শ্রীশঙ্কর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। মাধবাচার্য্যের শঙ্করবিজয় ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কেদারনাথ তীর্থে অবস্থান করিয়া কৈলাসে কৈলাসনাথের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পরবর্ত্তী শঙ্করের ইহা সমাধি।

কচ্ছপেশ্বরের মন্দিরটীও সুন্দর। প্রবাদ আছে কূর্ম্মরূপী ভগবান্ বিষ্ণু এইস্থানে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কচ্ছপেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি। তাঁহার ভোগমূর্ত্তির রত্নালঙ্কার বহু মূল্যবান্। আমরা যে সময় কচ্ছপেশ্বর দেবের দর্শনার্থ যাই সেই সময়ে তাঁহার ভোগমূর্ত্তি বহু মূল্যবান্ রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া উৎসবার্থ প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার বক্ষে একটী বৃহৎ হীরক শোভিত হইতেছে। এত বড় হীরক আমরা কখনও দেখি নাই। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক তীর্থেই বিগ্রহের উৎসব মূর্ত্তিকে কোন কোন পর্ব্ব দিনে শোভাযাত্রাসহ নগর প্রদক্ষিণ করান হয়। সাধারণতঃ মহাদেবের সোমবারে এবং বিষ্ণুবিগ্রহের একাদশী বা দ্বাদশীর দিন এইরূপ উৎসব হয়। ইহা ব্যতীত শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে শোভাযাত্রা হয়। সে দৃশ্য মনোরম ও হৃদয়দ্রবকারী কচ্ছপেশ্বর দেবের উৎসব দর্শনের সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছিল, মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া একটী উৎসবমণ্ডপে শোভাযাত্রাসহ দেবতাকে আনা হইল। প্রথমতঃ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতাকে উৎসবমণ্ডপে স্থাপন করা হইল। এখানকার প্রধান নর্ত্তকীদ্বয় নৃত্যসহকারে দেবমহিমা গান করিলেন। গীত তামিল ভাষায় রচিত সুতরাং আমরা এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু গীতের সুর তাল ও ভক্তি উদ্দীপনা এবং নৃত্যের মাধুরী ও সৌন্দর্য্য প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। তামিল নৃত্য ও বাদ্য একটু নূতন ধরণের। একটী বৃদ্ধের মাথায় পাগড়ীর সহিত ডুগডুগির ন্যায় একটী বাদ্যযন্ত্র বাঁধা। বৃদ্ধ রহস্যজনক মুখভঙ্গী সহকারে দুই হাতে দুইটী কাঠী দ্বারা উহা বাজাইতেছিল এবং মাথা নাড়িতেছিল। বৃদ্ধের হাস্যোদ্দীপক চেহারা এবং মুখভঙ্গী আমাদের ইচ্ছা হইল ফটোতে তুলিয়া রাখি। উৎসব উপলক্ষে কাঞ্চীনগরীর নরনারী একত্রিত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে নারীর অবরোধপ্রথা নাই। সুতরাং রত্নাভরণালঙ্কৃতা ভদ্রমহিলাগণ দলে দলে আসিয়াছেন। তাঁহাদের রূপে ও অলঙ্কারের স্বর্ণ ও হীরকের ঔজ্জ্বল্যে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। এক একটী যেন শান্তিময়ী দেবীমূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের প্রতিমা। সমাগত জনগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হইল, আমরাও প্রসাদ পাইলাম।

অতঃপর নর্ত্তকীকে প্রসাদ দিয়া পুরোহিত মহাশয় নৃত্য বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় দেবতা শোভাযাত্রাদি সহ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দুইএর এক।

ডাকিতে যদি দিবেই হরি
ডাকি যেন পরাণ ভরে,
আধেক প্রাণ ডাকে না যেন
আধখানাকে রাখি ঘরে!
ডাকিব না ত ডাকিবই না
মায়াবন্ধেই বাঁধা রব;
কামনার স্রোতে ভাসি' ভাসি'
ভোগ করিব এই ভব!
আধেক মন সংসারে রাখি
দিব আধেক তব পায়;
এমন ভক্তি চাই না নাথ,
আপোষ! চাইনাক তায়।
নীরব যদি রহিতে হয়
নীরব (ই) রব চিরকাল,
গাহিতে বসে থামিয়া যাব,
স'ব না এ মায়ার চাল।
গাহিব যদি গাহিব গান
ভরিয়া যাবে নীলাকাশ,
বৈশাখের মেঘ স্তব্ধ হবে,
স্তব্ধ রবে ঘূর্ণী বাতাস;
শিউরে উঠ্‌বে হর্ষে ধরা,
মত্ত সিন্ধু শান্ত হবে',
কাম কামনা ভুলিবে তারা
হিংস্র পশু মুগ্ধ রবে;

রুদ্ধ কণ্ঠ যবে মুক্ত হবে,
　　মত্তে প্রেমে নিলাজ প্রাণ,
এমন শক্তি যেদিন দিবে
　　সে দিনই গাহিব গান ।

(২)

'আমায়' যে দিন ফেলব ছুঁড়ে
　　'তোমায়' 'আমায়' থাক্‌ব না ;
সবই তোমায় দিব যে দিন
　　আমার কিছুই রাখ্‌ব না ।
ভুলিয়া যে দিন যাব ভাবায়
　　নয়নের ধারা থামিবে না ;
প্রেমের বন্যা আসিবে হৃদয়ে
　　কামের পঙ্ক থাকিবে না ।
মহাপ্রলয় দেখেও যেদিন
　　চোখের পলক পড়িবে না,
জগৎস্রষ্টা মনটা যেদিন
　　ভুলিয়া ভাঙ্গিবে গড়িবে না,
স্বপন যে দিন হইবে সত্য
　　'সত্য'—'অবাঙ্মনসোগোচরম্'
দেখ্‌ছি কি বলিব না যেদিন
　　সে দিন বলব "হরি-ওম্" ।
দিবসে যেদিন আঁধার হবে,
　　আঁধারে আলো উঠবে ফুটে,
মর্ত্ত্য যেদিন যাইবে ভাসিয়া
　　"স্বর্গীয়" পায়ে পড়িবে লুটে ।
তপন যে দিন দিবে না তাপ
　　চন্দ্রমা শীতল করিবে না,
দুঃখ যেদিন আনন্দে হাসিবে
　　সুখই হাসিতে পারিবে না ;

সে দিন আমায় ডাকিতে দিও
সে দিন দিও পরাণে টান,
নইলে আধেক দিয়া মোরে,
লয়োনাক আধেক প্রাণ।

৩

ভক্তি দাও প্রহ্লাদ হইব,
নইলে আমায় রাবণ কর,
দু-নৌকায় পা রাখিব নাক
বরং র'বই চির স্বার্থপর।
এমন ডাকা ডাকিয়ে দাও
ডাকিতে যেন হয় না আর,
নইলে হতে চাই না প্রভো
(আমি) 'খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার'।
পাপিষ্ঠ আমি নরক হবে,
বিশেষ চিন্তিত নাহি গো তায়,
ধার্ম্মিক আমি স্বর্গে যাব
মুগ্ধ নহি এ মায়া বাসনায় ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি না কিছুই,
স্বর্গ নরক কিছুই জানি না,
তুমি থাকিতে ভাসিয়া যাব
এমন কথাও কভু মানি না ;
জানি মাত্র নাথ পাঠায়েছ
করিতে হেথা কিছু অভিনয়,
জলে উঠিতেছি জলবিম্ব
আবার জলেতেই হব লয় ;
ভুলিয়া থাকি ঘুমায়ে থাকি,
আছ তুমি ত সদা জাগরিত,
ল'বার কালে লবেই তুমি,
ভাবিয়া কেন তা মরিবে চিত !

কোটি কোটিবার জন্ম হোক,
　　কিম্বা কোটি কোটিবারই মরি,
জানি একদিন দিবে স্থান
　　পায়ে তুমিই দয়াল হরি !
তবে বলিবার প্রথা আছে
　　জানায়ে এখন রাখ্‌ছি তাই,
'এস্পার' 'ওস্পার' এক(টা) করো
　　এই দয়া টুকুই আমি চাই।

শ্রীঅনাদিনাথ রায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম।

(মহাপ্রভুর মত কি ?)

যাঁহার কৃপায় বৃন্দাবিপিনের মহামাধুরিমা এই জগতের জীবকুলের গোচরীভূত হইয়াছিল, যাঁহার চরণ-কল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় প্রাকৃত মানব অপ্রাকৃত-ধামের আভাস হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিল, যাঁহার প্রেমবিগলিত নয়নাশ্রুধারার অবিরাম গতি ভক্ত-মণ্ডলীর প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্দীপন করিত, সেই পতিতপাবন দীনদয়াল শ্রীমৎ চৈতন্যদেবের প্রচারিত বিশুদ্ধমত আজকাল এরূপ উপশাখাবৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই উপশাখার ভিতরের বস্তুটী সহসা নয়নগোচর হইতেছে না।

যে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-লীলা কালে লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বিশেষরূপ প্রচারের জন্য মহাপ্রভু, রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে কৃপামৃত দ্বারা অভিষিঞ্চিত করিয়াছিলেন, প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ সহজাতিরূপ, নিজানুরূপ ও একরূপ—এতাদৃশ রূপগোস্বামীকে আপন স্বরূপ ও বিলাস সংক্রামিত করিয়া যে ধর্ম্মের প্রচার করিলেন, সে ধর্ম্মের জীবনীশক্তি এত শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া গেল কেন ? সেই চৈতন্যানুগৃহীত ভক্তমণ্ডলীর বংশধর এখনও বর্ত্তমান—তাঁহারা থাকিতে এই উপশাখার এতদূর বৃদ্ধি হইতেছে কেন, ইহা ভাবিলে হৃদয়ে বড়ই ব্যথা অনুভব হয় ! সেই ভাগবত শাস্ত্র—সেই গোস্বামিগ্রন্থ আদর্শ করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়া এরূপ ব্যভিচারস্রোত কেন প্রবাহিত হইতেছে ইহার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না।

একদিকে সংশয়াত্মক জড়বাদমূলক প্রবল ঝড় প্রবাহিত হইয়া হিন্দুর আজন্মের কোমল ধর্ম্মবিশ্বাস, বাত্যাবিতাড়িত পত্রের ন্যায় কোথায় উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে এবং কোথা হইতে তথায় ধর্ম্মহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্জ্জনা আসিয়া হৃদয়দেশ পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মাচরণে তৎপর, তাঁহারা আমাদের সংবাদ লইতে চাহেন না এবং দেশকালপাত্রানুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে প্রকাশ করাও প্রয়োজন বোধ করেন না। কাজেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নামে কত কত সম্প্রদায় লীলারহস্যের অন্তর্নিহিত ভগবৎ-ভক্তি-পঙ্কজের মূল না দেখিয়াই উপরে ভাসমান কামকুসুমের মালা গাঁথিয়া লোকের বাহ্যমুখী চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। বাহিরের এই কামচিত্রের অভিনয় দেখিয়া ধর্ম্মপিপাসু অনেকেই দূর হইতে এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চরণে নমস্কার করে। বঙ্কিমবাবুর ন্যায় একজন ধর্ম্মপ্রাণ মনস্বী ভাগবতের নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব স্বীকার করিয়াও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাময় মনে করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

তাঁহার প্রণীত "কৃষ্ণচরিত্রের" শ্রীকৃষ্ণ একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন মনুষ্য। কাজেই মনুষ্যরূপ বজায় রাখিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তিনি তাহাই করিয়াছেন। ব্রজলীলা স্বীকার করিলে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ পারদারিক পাপাচারী হইয়া পড়েন, তাই তিনি প্রক্ষিপ্তবাদের শাণিত ছুরিকায়—যাহা তাঁহার বিরোধী তাহা অনায়াসে ছেদন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হওয়ার কারণ এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় অনেকেই তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র" পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহার মত অনুসরণ করিয়া অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণমনুষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। এ বিষয়ে হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞই বলিতে হয়। কারণ এমন দুর্দ্দিনও আমাদের আসিয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও আমাদের কুণ্ঠা আসিত। এখন সে দিনের যেন একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত কথঞ্চিৎ মন্দীভূত; কিন্তু শ্রীভগবানের লীলাবিলাস, যাহা মহাপ্রভুর মতে নিত্য, ভাগবতে প্রচারিত, তাহাতে বিশ্বাস করিতে অনেকের আপত্তি আছে।

মহাপ্রভুর প্রকৃত অভিমতটী কি এবং সেই মতটী প্রকৃতপক্ষে আমাদের গ্রহণীয় কি না, এ বিষয়ের আলোচনা করা অতিব দুরূহ। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত অংশটী অতিশয় কঠিন—তাহাতে প্রবেশ করা আমার ন্যায়

অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিতান্ত দুরাশার কথা, কিন্তু লোভনীয় এই অমূল্য সিদ্ধান্তরত্নটী মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী গোস্বামিগণ তাঁহাদের তীক্ষ্ণীকৃত ভক্তি দ্বারা ভেদ করিয়া অতি কোমল সূত্রাদিরও প্রবেশাধিকার দিবার জন্য ছিদ্র রাখিয়া দিয়াছেন—সেই পন্থা অনুসরণ করিয়াই সিদ্ধান্ত অংশ বুঝিতে হইবে—সিদ্ধান্ত অংশ না জানিলে লীলাবিলাসের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে কেন? সিদ্ধান্তই ধর্ম্মের প্রাণ। তাই কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহাতে লাগিবে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥

মহাপ্রভুর মতপ্রতিপাদক গ্রন্থসকল সমালোচনার ফলস্বরূপ একটী কারিকার কথা প্রায় বিজ্ঞ-বৈষ্ণবেই অবগত আছেন—কারিকাটী আমি পূর্ব্বেও অন্য প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি—কারিকাটী এই—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থোমহান্।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্ম্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরং॥

মহাপ্রভুর মতের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত আর প্রমেয় তিনটী। তাঁহার মতে (১) উপাস্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, (২) উপাস্যের ধাম শ্রীবৃন্দাবন এবং (৩) ব্রজবধূগণের উপাসনাই এ সম্প্রদায়ের মতে শ্রেষ্ঠ।

এই তিনটী প্রমেয় ভগবত-সাধন-ব্রতমণ্ডলীর সকলেরই সাধারণ নিয়ম। আমি যাঁহাকে উপাসনা করিব, যাঁহার উদ্দেশ্যেই আমার জীবন পরিচালিত করিব, যাঁহাকে পাওয়াই আমার ব্রত, তিনি কে? তাঁহার স্বরূপ কি এবং আমি কাহার মত হইয়া উপাসনা করিব? তাঁহারই বা স্বরূপ কি? এই উপাস্য ও উপাসকতত্ত্বের জ্ঞান ভিন্ন এপর্য্যন্ত কোন উপাসনা-বিধিই প্রচলিত হয় নাই। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুসারে উপাস্য ও উপাসকতত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত সাহায্যেই করিতে হইবে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বেদান্তের তাৎপর্য্য অন্তর্নিহিত। তবে সে তত্ত্ব এমন গূঢ়ভাবে উপদিষ্ট যে তাহা সহজে আমাদের নয়নপথে প্রতিভাত হইতে চাহে না। তাই শ্রীধর স্বামী জগৎমঙ্গলের জন্য ভাবার্থদীপিকা ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বরূপতত্ত্বের সম্মুখে জ্বালিয়া দিয়াছেন। সেই দীপিকাই আমাদের অবলম্বন। মহাপ্রভু আপনার সম্প্রদায়কে স্বামীর অনুগামী হইবার জন্য যে কঠোর শাসন করিয়াছেন তাহাতেই

বুঝা যাইতেছে যে, স্বামীর দীপিকাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। শ্রীধর স্বামী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ভগবান্ কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ॥

সেই শ্রীধর স্বামী শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকা এই ত্রিবিধ লীলার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, বৃন্দাবনের লীলা দেবতাগণেরও দুষ্কর অর্থাৎ দুরধিগম্য।—

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং ততঃ ক্রমাৎ।
কৃষ্ণলীলা ত্রিধা প্রোক্তা তত্তদ্ভেদৈস্ত্বনেকধা॥
সপঞ্চত্রিংশতাধ্যায়ৈর্বৃহদ্‌বৃন্দাবনাদিষু।
গোকুলে বসতো লীলা বর্ণ্যতে সুরদুষ্করা॥

স্বামীর এই বাক্যে বৃন্দাবনলীলার রহস্যত্বই প্রতিপাদিত হয়, অনস্তিত্ব ইঙ্গিত করে না। সুতরাং গোস্বামীদিগের "কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে" এ বাক্য স্বামিপাদের আশয়কে অতিক্রম করে নাই। অতএব আমরা স্বামীর মতের অনুসরণ করিতে গেলে বৃন্দাবনলীলার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে বাধ্য। বঙ্কিমবাবু এই লীলার মধ্যে "রাধার নাম গন্ধ" পান নাই, একজন প্রধানা গোপিকাকে সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণ বিজনে লইয়া যান নাই ও কেবল "গোপীদিগের ঈর্ষাজনিত ভ্রমমাত্র" এই উক্তি করিয়া রাসলীলার মধ্যে অনেক কথা অন্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল বিষয়ের আলোচনার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। তবে "যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণ" এই কথা বলিবার পর "সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোষিতাং" শুকদেবের এই উক্তি শুনিয়াও ইহা যদি ঈর্ষা-জনিত ভ্রম হয় তবে আর কিরূপে সে ভ্রম যাথার্থ্যে আসিবে।

বঙ্কিমবাবুর ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের প্রতিবাদ করা আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির আদৌ অসম্ভব, আমি তাঁহার ছাত্রস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তবুও কর্ত্তব্যবোধে দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। বঙ্কিমবাবুর প্রধান প্রমাণ মহাভারত, সেই মহাভারতে রাসলীলার কথা নাই, তাই তিনি এ লীলা কাল্পনিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি "মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। * * যদি মহাভারত প্রণয়নকালে ব্রজ-গোপীগণঘটিত কৃষ্ণের কলঙ্ক বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে শিশুপাল অথবা

শিশুপাল-বধবৃত্তান্ত যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে আদিম মহাভারত প্রণয়ন-কালে একথা প্রচলিত ছিল না, তাহার পরে গঠিত হইয়াছে। কেবল সভা-পর্ব্বে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে "গোপীজনপ্রিয়" কথাটীর উল্লেখ আছে। * * কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর ক্রীড়াশীল মাধুর্য্যময় বালক ছিলেন। * * *, অতএব গোপীজনপ্রিয় শব্দে শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ ভালবাসা ভিন্ন কিছুই বুঝায় না।" বঙ্কিমবাবুর একথা সকলেই স্বীকার করিবে যে মহাভারতের কোন প্রসঙ্গেই রাসলীলার কথা বর্ণিত হয় নাই। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণলীলার অনেক কথা অবগত ছিলেন, এমন কি শ্বেতদ্বীপাধিপতি নারায়ণ নারদ ঋষিকে ভবিষ্যৎ কৃষ্ণলীলার বর্ণনাকালে গোপীরমণ-লীলার কোন আভাস দেন নাই। কৃষ্ণের পূতনাবধ সবাই শুনিল, গোবর্দ্ধনধারণ সকলেই জানিল, অথচ বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা জন-সাধারণ জানিল না; বিশেষতঃ ভীষ্মের ন্যায় ভক্ত, অর্জ্জুনের ন্যায় সখা এ লীলার কোন উল্লেখ করিলেন না; ইহাতে ভাগবতে প্রক্ষিপ্তবাদদর্শী মহাভারত পাঠক মাত্রেরই সন্দেহ স্বাভাবিক। অথচ মহাপ্রভুর ন্যায় কঠোর সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই এই লীলারসে মত্ত থাকিতেন, ভাগবতের এক একটী শ্লোক শুনিয়া তাঁহার বাহিরের জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া সমাধির শেষ অবস্থায় যিনি সেই লীলার আস্বাদন করিতেন, তিনি যে গ্রন্থ "গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ," সর্ব্ববেদান্তের সার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগ-বতকে অবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—সেই ভাগবতকে অপ্রামাণ্য বলিতে সাহস হয় না। যে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অমিততেজা নারায়ণের অংশাবতার ব্যাস-দেবের অমৃতময় লেখনীনিঃসৃত মহাভারত, ভারতের এক উজ্জ্বল রত্ন, ভাগবত-বক্তা শুকদেব ত সেই ব্যাসদেবের নিকটেই ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তবে তিনি এ লীলা মহাভারতে প্রকাশ করেন নাই কেন? ভাগবত হইতে আমরা এইটুকু জানিতে পারি যে মহাভারত রচনার পরে ভাগবত প্রণয়ন। সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলেচ্ছাবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া মহাভারত প্রণয়ন করিলেও চিত্তে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া একদিন সরস্বতীতটে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নারদঋষি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিত্তের এইরূপ অস্বাচ্ছন্দ্যতা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

কৃতবান্ ভারতং যত্ত্বং সর্ব্বার্থপরিবৃংহিতং।

* * *

তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো॥

তাই নারদঋষি কৃপা করিয়া বলিলেন যে তুমি মহাভারতে ধর্ম্মাধর্ম্মের চিত্র বেশ স্ফুরণ করিয়াছ কিন্তু ভগবানের অমল যশ বর্ণনা কর নাই; অতি বিচিত্র পদ-বিন্যাসে "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ম" এই চিত্রটী বেশ চিত্রিত করিয়াছ; কিন্তু যাহাতে শ্রীহরির জগৎপাবন যশ পরিকীর্ত্তিত হয় না, সুধীগণ তাহাকে কাকতীর্থ বলিয়া মনে করেন, পরমহংসগণ কদাপি তাহাতে রত হন না; কিন্তু যাহার প্রতি শব্দে প্রতি বাক্যে শ্রীভগবানের ইঙ্গিত করে—শ্রীভগবানের লীলাব্যঞ্জক এইরূপ পুরাণ প্রণয়ন কর নাই বলিয়া তোমার চিত্তের অদ্যাপি অপ্রসন্নতা যায় নাই—"যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলং॥" সেই উপদেশে সরস্বতীর পশ্চিমতটে উপবেশন করিয়া সমাধিদ্বারা ভগবৎচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া যে জ্ঞানলাভ করিলেন তাহাই—

শুকং অধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিং।

প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়া ভাগবত অধ্যয়ন হয় না। মহাভারতকার ব্যাসদেব ও ভাগবতবক্তা শুকদেবের পার্থক্য আছে। শৌনক ঋষিমুখে আমরা অবগত আছি যে, যে সময়ে প্রব্রজ্যাবলম্বনকারী শুকদেব উলঙ্গবেশে বনগমন করেন, তৎকালে পথিপার্শ্বস্থ কোন সরোবরে কতকগুলি অপ্সরা ক্রীড়া করিতেছিল। নগ্ন শুকদেবকে দেখিয়া তাহারা কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। কিন্তু যখন ব্যাসদেব পুত্রের অনুগমন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন, তখন সুরকামিনীরা ব্যস্ততার সহিত নিজ নিজ বসন পরিধান করিলেন। নগ্ন শুকদেবকে দেখিয়া যাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, তাঁহারাই ব্যাসদেবকে দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণা, ইহা দেখিয়া ব্যাসদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এরূপ আচরণের তাৎপর্য্য কি? তাঁহারা তদুত্তরে বলিলেন—

স্ত্রী-পুংভিদা নতু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ।

আপনার স্ত্রীপুরুষ ভেদ আছে, শুকদেবের তাহা নাই। একথা শুনিয়া ব্যাসদেব শুকদেবের সহিত স্বীয় পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন। মহাভারতের সহিত ভাগবতের ইহাই পার্থক্য। মহাভারতের ক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ড—সগুণ ভক্তি, ভাগবতের ক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ডের অতীত—নির্গুণ ভক্তি। মহাভারতে ধর্ম্মাধর্ম্মের আলোচনা, ভাগবতে—ভগবানের অমল যশ; ভারতে বৈধী ভক্তি, ভাগবতে—বেদাতীত রাগ ধর্ম্ম। ভারতে—জ্ঞানবাক্‌চাতুর্য্যের পরিপূর্ণতা, ভাগবতে—ত্যাগের চরম উৎকর্ষতা। ভারতে—বেদধর্ম্ম, ভাগবতে—প্রেমধর্ম্ম। ভারতে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বীজরূপে আছে; ভাগবতে উহা

কল্পলতারূপে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া গোলোক পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এক কথায় ভারতের যেখানে শেষ, ভাগবতের সেখানে আরম্ভ।

এইবার মহাপ্রভুর মতের প্রথম প্রমেয় "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" এই কথাটীর সিদ্ধান্ত আলোচনা করা যাউক। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সকল শাস্ত্রই একবাক্যে এক অদ্বয় "একমেবাদ্বিতীয়ং" তত্ত্ব স্বীকার করেন। ভাগবতও সেই "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকেই" আদিতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বকেই ব্রজেন্দ্রনন্দন বলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা সেই অদ্বয়তত্ত্বেরই উপাসনা। ইহাকে রূপগোস্বামী "স্বয়ংরূপ" আখ্যা দিয়াছেন। "অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপ স উচ্যতে।" অর্থাৎ যাহা স্বতঃসিদ্ধ, অন্যের অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে। ভাগবতে "অনন্যসিদ্ধং" (১০।৪৪।১৪) বলিয়া সেই আদিতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। ইঁহাকে উপাসনা করিতে বলিলে অনেকের আপত্তি নাও হইতে পারে, কিন্তু সেই অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে যখন প্রকট হইলেন, তখন সেই "মায়ামনুষ্য" ত সাধারণ জীবের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা করি কেন? ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবানের মনুষ্যের লীলানুকরণ দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানীরই মোহ উপস্থিত হয়—সাধারণ লোকেব ত কথাই নাই—

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নং।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥ ভাগবত ৩।৪।১৬

সেই নিষ্ক্রিয় ভগবানের কর্ম্ম—অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ, কালস্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারাম হইয়াও ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বদর্শীরও ভ্রম আসিতে বিচিত্রতা নাই। ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা ছাড়িয়া দিলেও বৈদিক সম্প্রদায় মাত্রেই অবতারবাদী। শাস্ত্র এইরূপ অবতরণের কিরূপ অর্থ বুঝেন তাহা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া পরে ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশেষত্ব কি দেখা যাইবে।

অবতার শব্দটী অব-পূর্ব্বক তৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। অবতরণাৎ অবতারঃ। স্থূল ভাবে অবতরণ অর্থে আমরা যাহা বুঝি, এ অবতরণত্ব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানগুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিলেন—"স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নঃ

ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানাং ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবান্ ইব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে।" আধুনিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শঙ্করাচার্য্যের উপর একটু কটাক্ষ দৃষ্ট হইলেও, শিক্ষিত এবং জ্ঞানী বৈষ্ণবমাত্রই অবগত আছেন যে, শ্রীজীব গোস্বামী পাদ আদরপূর্ব্বক তাঁহার ব্যাখ্যাকে স্বসিদ্ধান্তোপযোগী বলিয়া অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলেই শঙ্করমতেও সেই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব অব্যয় জন্মরহিত সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ মূল প্রকৃতিকে বশীকৃত করিয়া আত্মমায়াদ্বারা লোকানুগ্রহ নিমিত্ত দেহবানের ন্যায় এবং জাত হওয়ার ন্যায় লক্ষিত হয়েন। লোকানুগ্রহই এই অবতরণের মূল। যখন দেহবানের ন্যায় প্রতীত হয়েন অথচ তিনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি দ্বারা সদাসম্পন্ন তখন এ অবতরণ—স্থূল অবতরণ হইতে পৃথক্ বলিতেই হইবে।

এই জন্মগ্রহণাদি লীলা সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও ঐরূপ। তাঁহার মানুষী তনু নাই, প্রকৃতিসঞ্জাত দেহ বা ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহ প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন না। এজন্য কেবল প্রতীতি হয় মাত্র। "জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধঃ" ইহাই শ্রীধর স্বামীর অভিমত। (ভাগবত ১০।২।১৬) ভাগবতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবটী কিরূপে আছে দেখুন—

আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।১০।৩৯—এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বদিকে চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন। *পূর্ব্বদিকে চন্দ্রোদয় যেমন আবির্ভাব মাত্র, পূর্ব্বদিক্ চন্দ্রের প্রকাশ* মাত্র, দেবকীতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবও ঠিক ঐরূপ। এই বিশেষত্ব রক্ষা করিবার জন্যই—

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ। ১০।২।১৬—এই বিশেষত্ব রক্ষার জন্যই শ্রীধর স্বামী সমাহিতং (১০।২।১৮) শব্দে বসুদেব কর্ত্তৃক "বৈধদীক্ষয়া অর্পিতং" এই কথার উল্লেখ করিলেন। উপরোক্ত বাক্যাবলী দ্বারা ভগবানের অবতারত্ব সিদ্ধ হইল। অবতারত্বের স্থিরত্ব হইলেই যে ব্রজেশতনয়ের প্রাধান্য দিতে হইবে ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কোন কোন অবতার তাঁহার বিভূতি, কোন কোন অবতার পরমেশ্বরের অংশ। মৎস্যাদি অবতারে সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্ব শক্তিমত্ব থাকিলেও যথোপযোগী জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। কুমার চতুষ্টয়ে এবং নারদে অধিকারী অনুসারে অংশের আবেশ হইয়াছিল। কুমারাদিতে জ্ঞানের আবেশ ও পৃথু আদিতে শক্তির আবেশ। "কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ

ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতঃ সর্ব্বশক্তিমত্বাৎ।" অবতারপ্রসঙ্গে এইরূপ অংশ বা কলাব আবির্ভাব ইহা বলার তাৎপর্য্য যে যাঁহাতে সর্ব্বদা শক্তির অল্প পরিমাণে প্রকাশ হয় তাঁহাকে অংশ এবং যাঁহাতে স্বেচ্ছাক্রমে নানা শক্তি প্রকাশ হয় তাঁহাকে পূর্ণ বা অংশী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণে এই পূর্ণ শক্তির প্রকাশ আছে, অতএব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। কিন্তু ভাগবতেব অনেক স্থলে যে "অংশভাগেন" "অচ্যুতাংশং" প্রভৃতি শব্দদ্বারা অংশের প্রতি লক্ষণা করে। তবে তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান্ বলিব কেন? এরূপ সন্দেহ আমাদের করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্ববেত্তা শ্রীধর স্বামী 'অংশভাগেন' এই শব্দটীর দুই প্রকারে এক পরিপূর্ণতাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ "অংশৈঃ শক্তিভির্ভজতেঽধিতিষ্ঠতি সর্ব্বান্ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তানিত্যংশভাগস্তেন পরিপূর্ণরূপেণ।" অর্থাৎ শক্তি দ্বারা যিনি ব্রহ্মাদি স্থাবব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত হন সেই পরিপূর্ণরূপে। দ্বিতীয়তঃ "অংশৈঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্য-বলাদিভিঃ ভাজয়তি যোজয়তি স্বীয়ানিতি তথা তেনেতি।" অর্থাৎ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও বলাদি দ্বারা যিনি আত্মীয়দিগকে যোজনা করেন সেই পরিপূর্ণরূপে। তৃতীয়তঃ "অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনমীক্ষণং যস্য তেন।" অর্থাৎ পুরুষরূপে যিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন সেই পরিপূর্ণরূপে। চতুর্থতঃ "অংশেন ময়য়া গুণাবতারাদিরূপা ভাগাভেদা যস্য তেন।" মায়াদ্বারা ব্রহ্মাদি গুণাবতার আখ্যা যিনি প্রাপ্ত হন সেই পরিপূর্ণরূপে। পঞ্চমতঃ "অংশা এব মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপা ভজনীয়া নতু সাক্ষাৎস্বরূপং যস্য তেন।" মৎস্যকূর্ম্মাদি ভজনীয় অবতার যাঁহার অংশ অর্থাৎ সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে সেই পরিপূর্ণরূপে। ষষ্ঠতঃ "অংশৈঃ জ্ঞান-বলাদিভির্ভজনং অনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন সর্ব্বথা পরিপূর্ণরূপেণ বিবক্ষিতং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" ভক্ত সকলে জ্ঞান বলাদি দ্বারা ভজন অর্থাৎ অনুবর্ত্তন যাঁর সেই পরিপূর্ণরূপে—সর্ব্ব ভাবেই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই সিদ্ধান্তই শ্রীধর স্বামীর অনুমোদিত।

"শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য" এ কথার তাৎপর্য্য বুঝা গেল, কিন্তু ব্রজেশতনয় শ্রীকৃষ্ণ বলা হইল কেন? তিনিত বসুদেবগৃহেই আভির্ভূত। ভাগবতেও ত দেখিতে পাই—

"বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ জনিষ্যতে"—এই বাক্যে সাক্ষাৎ এবং পর এই দুইটী বিশেষণে পুরুষোত্তম অবতারী শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হন। তোষণীকার সনাতন গোস্বামী "পরপুরুষঃ পুরুষোত্তম অবতারী শ্রীভগবান্ প্রকট-সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সন্ সাক্ষাৎ স্বয়ং এব জনিষ্যতে।" শঙ্কর এই অবতারের প্রয়ো-

জনীয়তা বলিতে গিয়া লোকানুগ্রহই প্রয়োজন বলিয়াছেন—বৈষ্ণবেরাও এই লোকানুগ্রহে তাঁহার করুণা দেখিয়া তাঁহার প্রেমানন্দ বিতরণ, বিশুদ্ধভক্তি প্রচারণ ও নিজ রসাস্বাদনদ্বারা সেই মধুর চিত্রের যবনিকা উন্মোচন প্রভৃতি হেতু দেখিয়া থাকেন। যুগধর্ম্ম সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার অংশদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু স্বয়ং ভগবন্ ভিন্ন নির্ম্মল মধুর প্রেম, অহৈতুকী জ্ঞান শিক্ষা আর কেহই দিতে পারে না। যিনি জগতের স্বামী, যাঁহার প্রেমে শুধু মানুষ কেন পশুপক্ষী লতা পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়াছিল, তিনি পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নহেন। তাই বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবেৎ।

সেই স্বয়ং ভগবান্ বসুদেবনন্দন হইয়াই প্রকট হইলেন, তবুও তাঁহাকে নন্দনন্দন-রূপে উপাসনার তাৎপর্য্য কি? এই নন্দনন্দন ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ লইয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক মতবিরোধ দেখা যায়। সাধারণ ভাবে ভাগবতের দুই-কথা আলোচনা করিয়া কূট বিরোধের কথা আলোচনা করা যাইবে। শ্রীধর স্বামীর কথা হইতে ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, বসুদেব-হৃদয়ে সেই পরম পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বসুদেব কথাটীর অর্থও শ্রীধর স্বামী "বিশুদ্ধং সত্ত্বং অন্তঃকরণং বসুদেবশব্দিতং যৎ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্ত্বে পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। অপগতমাবৃতমাবরণং যস্মাৎ সঃ। অয়মর্থঃ—বসুদেবে প্রতীয়তে বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে।" অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ব বা অন্তঃকরণ বসুদেবশব্দিত, কেননা সেখানে সে সত্বে পরমপুরুষ বাসুদেব লক্ষিত বা প্রকাশিত হন। কিরূপভাবে—না অপগত আবরণ বা আবরণশূন্য হইয়া। সেই ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অহংকারের কর্ষণমূলকশক্তি হৃদয়গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হইবে—তাই আপনা-আপনি সেই কারা-গারের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই লৌহশৃঙ্খল পড়িয়া গেল, কারা-গারের কপাট খুলিয়া গেল—এই আবির্ভূত ভগবান্ যতদিন পরিপুষ্ট না হন ততদিন মায়ার নিগড়ে বদ্ধ থাকিতে হইবে কিন্তু এখন আর বদ্ধভাব নাই, এখন ত বসুদেব দেখিয়াছেন যে শৃঙ্খল কাটিবার জন্য অস্ত্রের বা কারাগারের দ্বার ভাঙ্গিবার জন্য কোন যন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই। তাই আবির্ভূত ভগবানকে পরিপুষ্ট হওয়ার জন্য নন্দের আলয়ে রাখিয়া যোগমায়াকে লইয়া আসিলেন। যশোদা প্রসব হইয়াছে ইহা জানিয়াও যোগমায়া কর্ত্তৃক অচেতন থাকিয়া এসব ব্যাপার অবগত ছিলেন না, কাজেই তাঁহার এই সন্তানকে আপনার গর্ভজ

বলিয়াই প্রতীতি হইল। অবতারতত্ত্বে সবই ত প্রতীতি হয়। তাঁহার দেহও অপ্রাকৃত, দেহ দেহীর ভেদ নাই। তবুও যশোদা তাঁহাকে আপন অঙ্গজ পুত্র জ্ঞানে উদূখলে বন্ধন করেন, বামপদের ধূলি মস্তকে প্রদান করেন। সাধারণ ভাবে এই কথাই বুঝা যায়। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে স্বয়ং ভগবান্ এবং অংশরূপী ভগবানের পার্থক্য আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি, স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হন কেবল—

প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥

অন্যান্য যুগাবতারের কার্য্য প্রচার বা দ্বিতীয় পুরুষ দ্বারা সমাধা হইলেও, এই লীলার মূল পরব্যোমাদিপতি বৈকুণ্ঠনাথ। যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইল তিনি গোলোকবিহারী—তিনি একান্ত প্রেমময় স্নেহময় পূর্ণমাধুর্য্যময়। বৈষ্ণবগণ এই বৈকুণ্ঠপতি এবং গোলোকপতির স্বরূপতঃ পার্থক্য বলেন না, কেবল আকারে বিভিন্নতা বলেন। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতি সৃষ্টিকর্ত্তা আর গোলোকপতি সৃষ্টি দ্বারা অপরামৃষ্ট অবশেষামৃত। তাই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠনাথ ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি—ব্যক্তের সহিত সম্পর্কিত আর গোলোকনাথ নবনটবরবপুর হস্তে—"ইতররাগ-বিস্মারক বেণু।—

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারিহাত।
ইঁহো বেণু ধরে তিঁহো চক্রাধিক সাথ॥

এই পার্থক্যটী আমরা আর একটু বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। সৃষ্টি-কর্ত্তারূপে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই। ব্যক্ত প্রকাশের মধ্যে, অনন্ত প্রকাশের মধ্যে তাঁহার খেলার বিলাস অনন্তভাবে ছুটিতেছে—সর্ব্বজগৎ তাঁহার একাংশে অবস্থিত। যাঁহার বিভূতি ব্রহ্মাও গণনা করিতে পারেন না, সেই বিভূতির ভিতর দিয়া—সেই ব্যক্ত অনন্ততার মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে বটে কিন্তু এই প্রকাশের দ্বারা কি তাঁহার পরিমাণ করা যায়। "কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা। তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত সাগরী লহরী সমানা।" তাই এই সাগরের তরঙ্গমালার কি ইয়ত্তা আছে—ইহার কূলে দাঁড়াইয়া ওই তরঙ্গের দিকে লক্ষ্য করিলে ডুবি ডুবি করিয়া ডুবিতে পারা যাইবে না, কিন্তু একবার ডুবিয়া সমুদ্রের ভিতরে যাইতে পারিলে আর বিক্ষেপ নাই,

সেখানেই চিরশান্তি বিরাজিত ; তাই একবার ডুব দিতে হইবে—"যো ডুবা হ্যায় সো পায়া হ্যায়"—সমাধির ভিতর যে আত্মচৈতন্য প্রকাশ পাইবে তাহাতে ডুব দিতে পারিলেই আর ভয় নাই, বাহিরের তরঙ্গমালাও তাহার রূপ বটে কিন্তু এ অনন্ততা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বুঝা যাইতেছে না। যে ভাবে ভগবান্ বাহিরে তীর্য্যক্ নর সুর প্রভৃতি ছোট ছোট সত্তার প্রকাশ করিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও মর্য্যাদা সংরক্ষণ করেন সেত তাঁহার ধর্ম্মরূপী অবয়বী ভাব—

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপধৃক্।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন বিশ্বং তির্য্যক্‌নরসুবাদিভিঃ॥

অবতারের খেলা এই ধর্ম্মরূপী অবয়বী ভাবের খেলা। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় না হইলে ত এ লীলা প্রকট হয় না, তাহা হইলেই অনন্যাপেক্ষি হইল না। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ত ভূভার হরণের জন্যই অবতীর্ণ—সেখানকার কার্য্য ত অংশ দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। তাই এই কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনের কিশোরশেখর শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় বাহ্য বলা হয়। জগৎব্যাপার, কার্য্যকারণকর্তৃত্বশৃঙ্খলার ভিতর দিয়া ভগবৎবুদ্ধি জন্মান ত পরম পুরুষের তাৎপর্য্য নয়, বিশ্বের জন্মাদি ব্যাপারে বস্তুতঃ সেই পরপুরুষের কর্তৃত্ব নাই, তিনি বিশ্ব তিগ এবং তাঁহার এই সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম তাঁহার স্বরূপতার ব্যঞ্জক নহে। ভাগবতও বলিলেন—

ইত্থং ভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ।
নেত্থং ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ॥
নাস্য কর্ম্মাণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়া রোপিতং হি তৎ॥

তবে পূর্ণ ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন তখন অন্যান্য অবতার তাঁহার সহিত মিলিত হয়। তাই সেই পূর্ণ ভগবানই যেন যুগাবতারের কার্য্য করিতেছেন বলিয়া প্রতীত হয়, নতুবা কুরুক্ষেত্রে এবং বৃন্দাবনের প্রকট লীলায় একই শ্রীকৃষ্ণ। রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত হইতে আমি তত্ত্বটী দেখাইবার চেষ্টা করিব। অনেকে মনে করেন যে বসুদেবগৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব এবং নন্দালয়ে ভগবতীর সহিত শ্রীভগবান্ পূর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। যদুবর গোষ্ঠে গমন করিয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া কেবল কন্যাটীকেই দেখিতে পান। বাসুদেব শ্রীলীলাপুরুষে স্বয়ে প্রবেশ করিলেন।

এ মতটী বহু পূর্ব্ব হইতে জনশ্রুতি রূপে চলিয়া আসিতেছে। ইহা গৌড়ীয়

বৈষ্ণ-সম্প্রদায়ের মত বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন কল্পে এরূপ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরাবসানে এ লীলা এরূপভাবে ভগবানে প্রতীয়মান হয় নাই, ইহাই বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তানুযায়ী কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সেই লীলাপুরুষোত্তম পরিপূর্ণরূপে বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। রূপ গোস্বামী যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আপনাদের সম্মুখে তাহার উল্লেখ করি—

যদ্বিলাস মহাশ্রীশঃ সলীলাপুরুষোত্তমঃ।
আবির্বুভূষুরত্রাবিষ্ণভ্য সংকর্ষণং পুরঃ॥
অন্তঃস্থিতাবিষ্কর্ত্তবা তদন্য ব্যূহ ঈশ্বরঃ।
হৃদয়ে প্রকটস্তস্থ ভবত্যানকদুন্দুভেঃ॥—লঘু ভাগবতামৃত ৪৪২

মহালক্ষ্মীপতি নারায়ণ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি সেই লীলাপুরুষোত্তম, আবির্ভূত হইবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ সংকর্ষণব্যূহের আবির্ভাব করেন, তৎপরে আপনার অন্তঃস্থিত অন্য দুইটী ব্যূহ যথাসময়ে প্রকট করিবেন ইচ্ছা করিয়া বসুদেবের হৃদয়ে প্রকট হন। তৎপরে দেবগণের প্রার্থনায় এবং পৃথিবীর ভার অপহরণার্থ বৈবস্বত মন্বন্তরাবর্ত্তী অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরশেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বসুদেবের হৃদয়স্থ লীলাপুরুষোত্তমের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার হৃদয় হইতে দেবকীহৃদয়ে প্রকট হন।

ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া।
দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মিন্ অষ্টাবিংশে চতুর্যুগে॥
ক্ষীরাব্ধিশায়ী যদ্রূপং তদনিরুদ্ধতয়া স্মৃতং।
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ।
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি॥

সেই দেবকী-হৃদয়ে বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃত দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় শ্রীভগবান্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া দেবকীর শয়নাগারে প্রাদুর্ভূত হইলেন। বসুদেব দেবকী ভাবিলেন বুঝি লোকরীতি অনুসারেই বালক প্রসূত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে এই বালক অতি অদ্ভুত—বালকের নয়নযুগল নীলকমল সদৃশ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এই বালকের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ মণি, বর্ণ নবজলধরকেও জিনিয়াছে, মস্তকে মহার্হ বৈদূর্য্যমণি শোভিত কিরীট, কুণ্ডলের কান্তিদ্বারা কুন্তলগুলি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কাঞ্চী

অঙ্গদ কঙ্কণ প্রভৃতি সর্ব্বালঙ্কারই যেন কি এক অসমোর্দ্ধ লাবণ্যের বিকাশ করিতেছে।

এই চতুর্ভুজত্বকে লক্ষ্য করিয়াই—শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, বৈকুণ্ঠনাথের আয়ুধ বলিয়া কোন কোন বৈষ্ণব বসুদেবনন্দনকে নন্দনন্দন হইতে পৃথক্ মনে করেন। বৈষ্ণবগণের ইহা সিদ্ধান্ত নহে। রূপ গোস্বামী নিজেই বলিলেন—

অয়ং চতুর্ভুজত্বেঽপি দ্বিভুজত্বেঽপি কৃষ্ণতাং।

ন ত্যজত্যেব তদ্ভাব গুণরূপাত্মবৃত্তিতঃ॥ লঘুভাগবতামৃত ৪৪৬

এই শ্রীকৃষ্ণ কি দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ উভয় রূপেই মনুষ্যের ন্যায় চেষ্টা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মুগ্ধতা এবং তদনুযায়ী প্রভাবের অনুবর্ত্তন করেন, সুতরাং কখনই কৃষ্ণত্ব পরিত্যাগ করেন না। তবে যে চতুর্ভুজের প্রকাশ এ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত—

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।

এ পর্য্যন্ত বুঝিতে গোলযোগ হইল না—স্বয়ং ভগবান্ বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইলেন, বসুদেব সেই পুত্রকে লইয়া নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন এবং যোগমায়াকে আনয়ন করিলেন। এই বার রূপ গোস্বামী স্পষ্ট কথা বলিলেন না, একটু আবরণের মধ্য দিয়া বলিলেন—

সোঽয়ং নিত্য সুতত্বেন তস্যা রাজন্ত্যনাদিতঃ।

কৃষ্ণ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূৎ তথা॥ লঘুভাগবতামৃত ৪৩০

সেই এই কৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যশোদার নিত্য পুত্ররূপে বিরাজিত থাকায় প্রকটলীলায় দেবকীর ন্যায় তাঁহাকেও দ্বার করিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং অনন্তর সেই নন্দালয়ে ক্রমে ক্রমে বাল্যাদিলীলা প্রকাশ করেন। নন্দ যশোদার অসমেই বাৎসল্য বশে ভগবান্ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদিগের পুত্র বলিয়া জানেন। এই "অপি" শব্দটী দ্বারা উভয়ত্র প্রকাশই যেন রূপ গোস্বামীর অভিমত। যিনি সহস্র সহস্র রমণীর সহিত এক সময়ে ততরূপে বিলাস করিয়াছেন, সেই তিনি যে উভয় স্থলে প্রকট হইতে পারেন ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। ভক্তেরাই যখন তাঁহার প্রকাশের মূল, তখন একান্ত বাৎসল্যপরায়ণ ঐশ্বর্য্যশূন্যভাবে যশোদা যদি ভগবানের কামনা করিয়া থাকেন, তবে সেখানে তিনি প্রকাশ না হইবেন কেন? যশোদালয়ে প্রকাশকে উপলক্ষ্য করিয়াই শুকদেব প্রসঙ্গক্রমে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, রূপগোস্বামীর ইহাই অভিমত। তাই তিনি প্রমাণস্বরূপ বলিতেছেন—

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ। ১০।৫।১

এই শ্লোকের 'তু' শব্দে বসুদেবগৃহে আবির্ভাবের ন্যায় নন্দগৃহেও আবির্ভাবের সূচনা আছে। হরিবংশের মতে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে এবং যোগমায়া নবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুরাণ মতে যশোদার দুইবার প্রসববোধ হইয়াছিল। 'তু' শব্দটী পাদপূরণে ব্যবহৃত হইয়াছে বলা যায় না; কারণ 'তু' শব্দটী ব্যবহার না করিলেও ছন্দের ব্যতিক্রম হয় না। হরিবংশে যুগপৎ প্রকাশের কথাই আছে—

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা।

সমং অর্থে যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে। যোগমায়া যে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের পরে আবির্ভূতা তাহা শুকমুখে আমরা জানিতে পারি।

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রযোজিতঃ, সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুং মিয়েষতর্হ্যজা, যা যোগমায়া জনি নন্দজায়য়া॥

হরিবংশের "যুগপৎ" আবির্ভাব স্বীকার করিতে হইলে ঠিক সময়ে যশোদার গৃহে কেহ প্রকাশ হইয়াছেন নিশ্চিতই, কারণ যোগমায়া ত ঠিক সেই সময়ে আবির্ভূতা হন নাই। আর "একজন কেহ" হইলেই শ্রীকৃষ্ণই হইবেন, কারণ শুকদেব যোগমায়াকে বিষ্ণুর অনুজা বলিয়াছেন—

অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা। ১০।৪।৯

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তর ভাবে এক অধিকরণ হইতে আবির্ভূত না হইলে "অনুজা" শব্দটী নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং উভয় গৃহেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন—স্থিতি হইল নন্দগৃহে একদেহে। এরূপ হইলে নন্দের আত্মজ, নন্দের স্বপুত্র, গোপিকাসুত, পশুপাঙ্গজ প্রভৃতি কথার সহিত দেবকীপুত্র, বসুদেবনন্দন প্রভৃতি কথার বেশ সামঞ্জস্যও হইতে পারে।

নন্দ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ। ১০।৬।৪৩
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। ১০।৯।২১
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়। ১০।১৪।১

কিন্তু একটা কথা মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, দুইরূপে প্রকাশ হইয়াও যখন একদেহেই স্থিতি হইল—আর যখন মানুষের জন্মের ন্যায় জন্ম বলিয়াই প্রতীত হইল, তখন এই দুই দেহ মিলিত হইল কখন? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন—স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই ইহার মূল—ইচ্ছামাত্রই দুই স্থলে প্রকট হইলেন, আবার ইচ্ছামাত্রই দুই দেহ এক হইলেন; তবে যশোদার যখন শুদ্ধ বাৎসল্য

তখন যশোদালয়ে দ্বিভুজরূপে জন্মগ্রহণই স্বাভাবিক ; আর দেবকীর যখন ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত বাৎসল্য তখন এখানে চতুর্ভুজ হইয়াও দ্বিভুজ হইলেন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। "বভূব প্রাকৃতশিশুঃ" হইবার সময়ে এই দুইএ মিলিয়া এক হইলেন বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। প্রাকৃত শিশু অর্থে প্রকৃতিজাত শিশুর ন্যায় দ্বিভুজবিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দ্বিভুজ বালগোপাল মূর্ত্তি এই মূর্ত্তি যশোদার হৃদয়ের ধন। এ ধনই আবার বসুদেব-হৃদয়ের মূর্ত্তি—তাঁহাকেই নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন। যশোদা এসব ব্যাপার অবগত ছিলেন না—

যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥

তাই কৃষ্ণশব্দ শ্যামলকান্তি যশোদা স্তনন্ধয় পরব্রহ্মের বাচক। তত্ত্বতঃ সম্পূর্ণ অভেদ, কেবল লীলাভেদে এই পার্থক্য ;—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ কৃষ্ণ স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপমেষা রসস্থিতিঃ।

ভক্তিরসামৃত ২।৩১

সিদ্ধান্ত দ্বারা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণে এবং গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই, কেবল রস-মাধুর্য্যে উৎকর্ষ। যখন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দ্বারকায় প্রকটলীলা করিতেছেন ; তখনও সেই শ্রীকৃষ্ণ ; কিন্তু সেখানে নন্দনন্দনস্বরূপ স্বরূপভাবটী আচ্ছাদিত, তাই মহাপ্রভু আদি রসের একটী শ্লোক বলিয়া সেই পার্থক্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন—বহুকাল বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে আপন প্রাণবঁধুয়ার দর্শন পাইয়াও মন যমুনা-পুলিনবর্ত্তী সেই বৃন্দারণ্যের জন্য লালায়িত।

অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশত্ব আচ্ছাদন করিয়া কখন "বাসুদেবতা" প্রকাশ করেন আর কখনও বৃন্দাবিপিনে কিশোররূপে নন-নন্দনত্ব বজায় রাখিয়া স্বরূপের আভাস দেন। প্রথমটী ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবের খেলা বলিয়া বাহ্য আর দ্বিতীয়টী স্বরূপতত্ত্বের আভাস বলিয়াই এক স্বরূপতঃ শ্রীভগবান্ "রসো বৈ সঃ" বলিয়াই "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়" এই প্রমেয়টী ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্রজেশনন্দন একদেহেই যখন মথুরাদি গমনাগমন করিলেন অথচ কখন দ্বিভুজ এবং কখন চতুর্ভুজমূর্ত্তি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের একত্র সম্মিলনরূপ অপূর্ব্ব মনোহর মূর্ত্তিদ্বারা কখন নন্দনন্দন, কখনও বসুদেবনন্দনরূপে প্রকটতা দেখাইলেন, তখন—যামল বচনের সহিত সামঞ্জস্য থাকে কৈ—তাহাতে ত দেখা যায়—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃপরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥

অর্থাৎ যিনি যদুসম্ভূত কৃষ্ণ অন্য—যিনি পূর্ণ তিনি ইঁহার পর অর্থাৎ মূলতত্ত্ব, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যান না। তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভুজ; কোনকালেই চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন। এই শ্লোকের বিচার করিতে গেলে অর্থাৎ এই প্রকটকালে তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন না বলিতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন, ব্রজবাসিগণের বিরহ, উদ্ধবের প্রেরণা, ব্রজবাসিগণের কুরুক্ষেত্রে গমন, দন্তবক্রবধানন্তর শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন, এ সকল বর্ণনা অনর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং এ বচনটীর বিচার করিতে গেলে গোস্বামীদিগের গ্রন্থদ্বারা ইহার বিচার করিতে হইবে।

অপ্রকট ও প্রকট ভেদে লীলা দ্বিবিধ। প্রপঞ্চের গোচরীভূত লীলা প্রকট-লীলা, তদ্ভিন্ন সমস্তই অপ্রকটলীলা। প্রকটলীলায় গমনাগমন হয়—

তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বাবাবত্যাঞ্চ সাঙ্গিণঃ॥

প্রকটলীলায় ব্রজগোপিকার সহিত বিরহ আছে—রূপগোস্বামীর উক্তি—

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহো মুদা॥ ৪৬৭

কাজেই যামল বচনের উক্তি অপ্রকট লীলাবিষয়ক। এ সিদ্ধান্তে কোন গ্রন্থের সহিত বিরোধ হয় না। সেই ভাবে উহার অর্থ এই যে বসুদেবনন্দন বলিয়া বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ সেই অপ্রকট শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রকাশ। এই প্রকটলীলা নিত্য, তাই উজ্জ্বল নীলমণিতে নিত্য বিয়োগশূন্য স্থিতির কথা বর্ণিত হইয়াছে—

বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদারাসাদিবিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ॥

এই নিত্যলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের উপাস্য এবং আরাধ্য কারণ এখন ত আর প্রকটলীলা নাই। এই অপ্রকটলীলার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মহাপ্রভু বলিলেন—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥

এই ব্রজলীলা আর পুরলীলা স্বতন্ত্র। সেই ব্রজলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণই—রাধার কৃষ্ণ, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ, বিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামা—অন্যাভিলাসশূন্যা ব্রজরামাগণের কৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরাধ্যদেবতা।

এইবার দ্বিতীয় প্রমেয় তাঁহার ধাম। 'তদ্ধাম বৃন্দাবনং" বৃন্দাবনের স্বরূপবুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে বোধগম্য হওয়া দুরূহ। আমাদের এ জগৎ—ভেদাত্মক দুঃখের ক্রীড়াভূমি। আর বৃন্দাবন আনন্দের রাজ্য, সেখানকার সবই আনন্দময়। বৃন্দাবন অতিগোপ্য স্থান—শ্রীরাধার ষোড়শ নামের মধ্যে একটী নাম বৃন্দা, সেই বৃন্দাদেবীর অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় মধুর গোপ্য স্থানের নাম বৃন্দাবন। পদ্মপুরাণে—

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ং।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়ং অমৃতং রসপূরিতং॥

* * *

অদুঃখসুখবিচ্ছেদং জরামরণবর্জ্জিতং।
অক্রোধগতমাৎসর্য্যং অভিন্নমনহঙ্কৃতং॥
পূর্ণানন্দরসামৃতং পূর্ণপ্রেমসুখাবহং।
গুণাতীতং পরং ধাম পূর্ণপ্রেমস্বরূপকং॥

যেখানে দুঃখ নাই, সুখের বিচ্ছেদ নাই, জরামরণের অস্তিত্ব নাই, ক্রোধমাৎসর্য্যহীন, ভেদজ্ঞান ও অহমিকাশূন্য, অমৃতরস প্রবাহিত, গুণাতীত সেই পরমধামই শ্রীবৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অবিচ্ছেদে একরূপেই হইতেছে। এ ত অপ্রকটলীলার কথা—প্রকটলীলার কথা কি তবে কাল্পনিক? —শাস্ত্রকারেরা সেই নিত্যলীলার আভাস দিবার জন্য, জীবকুলকে চরম সিদ্ধান্ত জানাইবার জন্য লীলার ছলে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। যে লীলা শ্রবণ করিয়া—মহারাজ পরীক্ষিতের মনে পরদারাভিমর্ষণের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, স্বয়ং মহাপ্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে যে ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিলেন, যে পার্থিব বৃন্দাবনের

লুপ্ত অংশ মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে গোস্বামিগণ প্রকট করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বজ্র-প্রতিষ্ঠিত যে শ্রীমূর্ত্তি আজিও যে প্রকটতার ইঙ্গিত করিতেছে, সে লীলা যে এই পার্থিব বৃন্দাবনে হয় নাই ইহা কিরূপে বলিব। তাঁহার পাদস্পর্শ-মাত্রই ব্রজের অপরূপ পরিবর্ত্তন হইল। গোলোকবিহারী যেথানে অবতীর্ণ সেখানেই নিত্য আনন্দের প্রস্রবণ। তাঁহার প্রকটের পরই নন্দের ব্রজ সর্ব্ব-সমৃদ্ধিমান্ হইয়া উঠিল এবং আনন্দের আর সীমা থাকিল না, সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবের বিকাশ হইল—ব্রজরামাদিগের বিহারের স্থান হইল—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈরমাক্রীড়মভূন্নৃপ॥ ১০।৫।১৮

এইবার ব্রজ হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য দূরীভূত হইবে, সে ধামে দর্প অহংকার থাকিবে না, ভেদ থাকিবে না। বর্ণাশ্রম বিধি নিষেধ ঐশ্বর্য্যময় জগতে থাকুক—মধুর বৃন্দাবনে থাকিলে সেই নিত্যলীলার প্রকটতা হইবে কিরূপে। ভেদ থাকিলে, লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলে সে প্রেমমিলনে বাধা পড়িবে। বৈকুণ্ঠের অতীত সেই লীলার প্রচার করিতে হইলে ব্রজধামকে গোলোকধামে পরিণত করিতে হইবে। তাই একে একে সকল রিপুর নাশ করিলেন। কামচারিণী পূতনা হননেচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে গিয়াও স্তন্যদানমাত্রফলে পরাগতি লাভ করিল, তাহার দহ্যমান দেহ হইতে অগুরু-সৌরভ উত্থিত হইয়া ধূম্রসেবীর সম্যক্ পাপ বিনষ্ট করিয়া দিল। শুকদেব বলিলেন যে এই পূতনামোক্ষ শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে, যাঁহারা পূতনার এই গতি দর্শন করিয়াছে তাঁহাদের রতি শ্রীকৃষ্ণে না জন্মিবে কেন? এইরূপে শকটভঞ্জন তৃণাবর্ত্ত যমলার্জ্জুন প্রভৃতি ব্রজ হইতে এক একে উৎপাটিত হইল। যেমন যেমন হৃদয়ের আবিলতা দূর হইল তত তত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণা করিতে লাগিলেন। যশোদা পুত্রের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, গর্গ আসিয়া ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝাইয়া দিলেন। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ অঘ-মর্ষণ করিয়া বৃন্দাবনকে প্রপঞ্চাতীত করিয়া তুলিলেন। অঘমর্ষণের পর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিদ্বারা গোপবালকদিগের পুনর্জ্জীবন। যাহার অঘমর্ষণ হইয়াছে সে ত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। এইবার ব্রহ্মার বৎসহরণ, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা সেই সকল গোপ ও বৎস সৃষ্টি করিয়া "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" ভাবের খেলা প্রকাশ করিয়াও তিনি ঠিক আপনার স্বরূপভাবেই অবস্থিত থাকিলেন। এইরূপে বৃন্দাবন গোলোকধামে পরিণত। যাহা কিছু তাহার বিরোধী ছিল

তাহার বধ—যাহা কিছু কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায় তাহার নাশ হইল; বৃন্দাবনের তরুলতা পর্য্যন্ত তমোগুণবিবর্জ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এখনও নিত্যলীলা প্রকাশের সময় আসে নাই—এখনও তাহার পূর্ণভগবত্তা প্রকট হয় নাই। তবে ব্রজবাসিগণের এখন শ্রীকৃষ্ণই ভরসা।

দেবরাজ ইন্দ্র সাত্ত্বিক দেবতা, কিন্তু ইন্দ্রত্ব অভিমানে শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিলেন না। তাই ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ মানভঙ্গচ্ছলে তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রেরিত বারিবর্ষণ হইতে ব্রজকে রক্ষা করিবার জন্য অবলীলাক্রমে ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া একহস্তে গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন—ব্রজে এইবার শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ভগবান্ হইলেন—গোপবৃদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন—

ক সপ্তহায়নো বালো ক মহাদ্রিধারণং।
ততো ন জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজ ॥ ১০।২৬।১৪

নন্দও মনে মনে পরম আহ্লাদিত হইয়া গর্গের কথা সাধারণের নিকট বলিয়া ফেলিলেন। দেবতাগণ জানিলেন, ব্রজবাসিগণ জানিল যে পার্থিব বৃন্দাবনে শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনকে গোলোকধামে পরিণত করিলেন—আর দেবতাদের অধিকার থাকিল না, বিধি নিষেধের অপেক্ষা থাকিল না—এইবার "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥" এই অপ্রপঞ্চাতীত শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনই তাঁহার ধাম— "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

এইবার তৃতীয় প্রমেয়—উপাসনা, অর্থাৎ কাহার ন্যায় হইয়া সেই ব্রজেশ-তনয়ের উপাসনা করিতে হইবে? তদুত্তরে "ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।" এই উপাসনাই মহাপ্রভুর অভিমত। ভাগবতে ধ্রুব প্রহ্লাদ পাণ্ডব উদ্ধব প্রভৃতি বহু ভক্তের উল্লেখ থাকিলেও ব্রজবধূগণের উপাসনাই মহাপ্রভুর অভিমত হইল কেন? ধ্রুব না হয় সকাম ভক্ত, কিন্তু প্রহ্লাদ ত সম্পূর্ণ নিষ্কাম এবং নৃসিংহদেবও বলিলেন—

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ। ৭।১০।২১

প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্ত দুরূহ হইলেও পাণ্ডবের সৌভাগ্য ইহা অপেক্ষা অধিক—কারণ প্রহ্লাদের গৃহে সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম বাস করেন নাই, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রহ্লাদের গৃহে মুনিগণও গমন করেন নাই, প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদিরূপেও পরব্রহ্ম বর্ত্তমান ছিলেন না, সুতরাং নারদঋষির বাক্যানুসারে পাণ্ডবদিগের ভাগ্যের সীমা নাই। (ভাগবৎ ৭।১৫।৭৫)

পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা যাদবগণ শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদিগের সহিত

দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, বিবাহ ও দৈহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গ দ্বারা তাঁহাদিগকে তৃষ্ণাশূন্য করিয়াছেন। (ভাগবত ১০।৮২।৩০) যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণচেতা—শয়ন উপবেশনাদি বিষয়ে আপনাদের অস্তিত্বই অবগত ছিলেন না।

শয্যাসনাটনালাপাস্নানক্রীড়াশনাদিষু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ॥ ১০।৯০।৪৬

সমস্ত যাদব অপেক্ষা উদ্ধবের শ্রেষ্ঠত্ব ভাগবতে শুনা গিয়া থাকে ; এমন কি শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মা শঙ্কর সংকর্ষণ ও লক্ষ্মী এবং নিজের আত্মাও তোমার ন্যায় প্রিয়তম নহে। (১১।১৪।১৫।) বিভূতির উল্লেখকালে বলিলেন- (১১।১৬।২৯) "ত্বঙ্ক ভাগবতেস্বহং"। উদ্ধবের ন্যায় ভক্ত অতীব বিরল ; যখন উদ্ধব পাঁচ বৎসরের বালক, সেই সময়ে বাল্যলীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি গঠন করিয়া কল্পিত উপহার দ্বারা পূজাকালেও জননী ভোজন করিতে ডাকিলেও ভোজনে ইচ্ছা করিতেন না, তাই লীলা সম্বরণকালে জ্ঞানিবর উদ্ধবকেই ভগবান্ উপদেশ করিলেন—(৩।২।২) সুতরাং তাঁহার ন্যায় ভক্তিরসাস্বাদপটু সেকালে আর কেহই ছিল না। সেই উদ্ধব বলিলেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ১০।৪৭।৬১

অর্থাৎ যে সকল গোপী দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া—বেদে যাহার অন্বেষণ করিতে হয়, সেই গোবিন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণরেণুর স্পর্শপ্রাপ্ত তরুলতার মধ্যে যেন আমি কোন একটী হই। ইহা অপেক্ষা দীনতার কথা আর কি হইতে পারে। অতএব গোপীগণের যে ত্যাগ ইহা জগতের চরম আদর্শ—সে আদর্শের অনুভব না হইলেও সেই চরম আদর্শ সম্মুখে রাখিতে রাখিতে একদিন আপনি অনুভবে আসিতে পারে। তাই এই শ্রেষ্ঠত্যাগের আদর্শ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের মতে উপাসনা।

গোপীগণের সহিত ভগবানের যে মিলনরূপ রাসলীলা বিশেষরূপে নিবৃত্তি-পরায়ণ। শ্রীধরস্বামী তাই বলিয়াছেন—"শৃঙ্গারকথোপদেশেন বিশেষতঃ নিবৃত্তি-পরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তি করিষ্যামঃ।" শৃঙ্গারকথার ছলে বিশেষরূপে এই পঞ্চাধ্যায় নিবৃত্তিপরায়ণ। আমাদের মনে থাকা চাই যে এই রাসলীলার নায়ক

অনাবৃত ব্রহ্ম হৃষীকেশ—আর—গোপিকাগণ ভগবানের হ্লাদিনীশক্তি। গোপীরা দেহাত্মজ্ঞানশূন্য জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত সেই গোপীগণের সহিত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়া রমণ করিয়াছিলেন—

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকস্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ১০।৩৩।১৬ যেমন বালক দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া খেলা করে, রমাপতির সহিত ব্রজযুবতীগণেরও ঠিক এমনি ভাবে মিলন হইয়াছিল। গোপীগণের কাম নাই, ক্রোধ নাই, সংসারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তাহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে নাই। যাহাদের ভেদ আছে, দ্বৈধ আছে, দেহাভিমান আছে, তাহারা মায়ার অধীন। মায়ার অধীন জীবের এ লীলায় প্রবেশাধিকার নাই।

ঐ প্রেমলীলা মায়ানদীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের চক্ষে প্রেমের বীপরিত 'কাম'রূপে প্রতীয়মান হয়। ছায়ার ধর্ম্মই ঐরূপ; ছায়ার বা প্রতিবিম্বের যেমন বাস্তব সত্তা নাই, এ লীলাতেও এইরূপ কামের সংস্পর্শ নাই। এ বোধ কেবল মায়ার মধ্যে সেই চিত্র দেখিতেছি বলিয়া।

একটুকুও বাহিরের টান থাকিলে তাঁহার সহিত মিলন হইবে না। ঋষি-পত্নীরাও গোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনলালসায় পতি পুত্র ভ্রাতা বন্ধু কর্তৃক নিবারিত হইয়াও সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গাধারার ন্যায় 'ত্যক্ত সর্ব্বাশ" হইয়াই বনমালা-সুশোভিত নীলমহোদধির নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এখনও একটু বিশিষ্টতা আছে, এখনও মনের নিভৃত অন্তরালে পতিপুত্রের স্থান আছে, ভেদের লেশ এখনও তাহাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। আমিত্বের অভিমান থাকিতে দেহাত্মজ্ঞানের অধ্যাস থাকিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইতে পারে না। তাই তাহারা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গোপীদিগের ত্যাগ জগতের আদর্শ,—শুধু মনে মনে ত্যাগ নয়,—সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন—এ ত্যাগের নিকট স্বয়ং ভগবান্ ঋণী হইলেন। এ মিলন 'ত্বম্'রূপী গোপীর সহিত 'তৎ'রূপী শ্রীকৃষ্ণের মিলন, এ মিলন 'অহং'রূপী রাধিকার সহিত 'স'রূপী শ্রীকৃষ্ণের মিলন; এ মিলন যোগমায়ার ক্ষেত্রে। এ লীলার প্রধান সহায়ক যোগমায়া, তাই বলি মা যোগমায়া—একবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ করিয়া দাও—সম্বন্ধ করিয়া দিলে আমরা রক্ষা করিতে জানি, এই দেখনা কোন্ অনাদিকালে মায়াদেবী আমাদিগের সহিত সংসারের এই সম্বন্ধ পাতাইয়া দিয়াছে—সেই সূত্রে আজ পর্য্যন্ত আমরা অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছি—একবারাও চ্যুতি ঘটে নাই—একটুও অনাদর করি নাই।

মা তোমার কৃপাতেই ব্রজবালাগণ বিষয় ভুলিলেন, আপনাকে ভুলিলেন—সেই লীলার সহায়তার জন্যেই তুমি "গোপগোভিরলঙ্কৃত" ব্রজে আবির্ভূত হইয়া যশোদার ঘরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে। মা, তুমি ত সেই কৃষ্ণের অনুজা—মদন ত প্রদ্যুম্নরূপে তাঁহারই সন্তান—তবে শ্রীকৃষ্ণের মিলনে কাম থাকিবে কিরূপে?

এই লীলা অতি সংগোপনে সংসাধিত হইল। কুরুক্ষেত্রে দ্বারকায় মথুরায় কেহ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিল না—গোপেরাও—

মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকশঃ।

এই গুপ্তমিলন জানিলেন নারদাদি ঋষিগণ, তাঁহারাই এই চরমধর্ম্মশাস্ত্ররূপে প্রচার করিলেন—সে প্রচারেও এ চরমধর্ম্ম জীবের হৃদ্গত হয় নাই—সে বর্ণনা সৌন্দর্য্যের বর্ণনা, কবিকল্পনা বলিয়াই লোকের মনে হইত—মহাপ্রভু আসিয়া এই প্রকট বৃন্দাবনের লীলার ভিতর দিয়া নিত্যবৃন্দাবনের আভাস দিলেন—তাই বাসুঘোষ গাহিলেন—তিনি অবতীর্ণ না হইলে—

রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি জানাতে শকতি কার।

এই অপ্রকট লীলাই বৈষ্ণবের লক্ষ্য—ব্রজবধূদিগের ত্যাগই এই উপাসনার আদর্শ। বাহিরের ভাষায় ত্যাগ কিন্তু ভিতরে অনুস্মরণ। এই অনুস্মরণই এই উপাসনার প্রাণ। অপ্রকটলীলায় যাইবার সোপানই অনুস্মরণ—মহাপ্রভু ইহাই উপদেশ করিলেন—"ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।' রাসলীলায় মিলন; নিত্য মিলনের আভাস, তাহাদিগকেও অনুস্মরণের দ্বারাই নিত্যলীলায় যাইতে হইয়াছিল। যাঁহারা পতিপুত্রভ্রাতাকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া প্রকটলীলায় যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কৃষ্ণভাবনাযুক্ত হইয়া নিমীলিতলোচনে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাদের শুভাশুভ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল। প্রারব্ধ কর্ম্ম তাঁহাদিগের কৃষ্ণসঙ্গমে বঞ্চিত করিতে পারিল না। গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্য দেহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সঙ্গত হইলেন।

জহু গুর্ণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।

সুতরাং অলব্ধরাসা গোপীকাগণ এই রূপ দেহত্যাগের পর অপ্রকট লীলায় মিলিত হইলেন। যাঁহারা রাসে মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল কিনা, ইহাও ভাবিবার বিষয়। এ লীলা যখন মনুষ্য-লীলায়

অনুকরণে তখন দেহত্যাগ হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এ কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় দন্তবক্রবধের পর প্রত্যাগমনবৃত্তান্ত ভাগবতে স্পষ্ট বর্ণিত না থাকিলেও, সেই সত্যসংকল্প শ্রীভগবান্ যখন "আসিব" বলিয়াছিলেন তখন স্পষ্ট বর্ণিত না থাকিলেও স্বীকার করা যাইতে পারে যে তিনি ব্রজে কিছুদিনের জন্য প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এ প্রত্যাগমনে "আসিব" এই বাক্যটী রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু উদ্ধবের দ্বারা ব্রজগোপীগণের নিকট তিনি যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন সে ত নিত্যলীলারই কথা।

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যং অচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ ১০।৪৭।৩৬

অশেষবৃত্তি হইতে বিমুক্ত মন অর্থাৎ যখন মনের শেষ হয় তখন সম্যক্‌ভাবে শ্রীভগবানে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি অচিরাৎ উপস্থিত হন। এইখানেই অলব্ধরাসা গোপীগণের কথা বলিলেন। তাহা হইলেই সেই গোপীগণ যেমন গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া অপ্রকটলীলায় গমন করিলেন, ইঁহারাও অপ্রকট লীলায় যাইবার জন্য দেহত্যাগরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, ইহাই বলিতে হয়। আমরা ত বিশেষে আবদ্ধ, আমাদের সে অনুস্মরণ অসম্ভব। শ্রীভগবানের যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম সামান্য স্মরণ। মন তখন বহির্ম্মুখী কিন্তু অন্তর্ম্মুখীপ্রবণতা জাগিয়াছে। মন যখন বহু বিষয় হইতে এক বিষয়ে আবদ্ধ থাকে তখনই ধারণা। গীতায় ইহাই 'বৃত্তি' নামে অভিহিত। "শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া" এই ধারণার পর ধ্যান অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলেই ধ্রুবানুস্মৃতি, কেবল ধ্যেয় বস্তুর স্ফুরণের নাম সমাধি।

জীবগোস্বামী স্মরণের এইরূপ বিভেদ করিয়াছেন। ধ্যানপরায়ণ সাধকমাত্রেই অবগত আছেন যে এই স্মরণ কার্য্যটী কিরূপ কঠিন। আমরা যেরূপ চিন্তা করি তাহার স্ফুরণ হইতে গেলে প্রত্যাহার সিদ্ধ হওয়া চাই। প্রত্যাহার সিদ্ধ না হইলে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির খেলায় শ্রীমূর্ত্তির স্থাপন কিছুতেই হইবে না। ধ্যানের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রত্যয়ের একতানতা যতদিন না আসিয়াছে, ততদিন হয় ত বহু প্রয়াসে চরণযুগল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া জঙ্ঘাদেশ দর্শন করিতে না করিতেই চরণযুগল কোথায় লুকাইয়া গেল; আবার 'কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং' চিন্তা করিতে গিয়া হয়ত স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া উপস্থিত! বাহিরের সংস্কারকে ছাড়াইয়া না গেলে ধ্যানের সদৃশ প্রবাহতা আসে না। সেই

স্বয়ং রূপের দর্শন পাইতে গেলে আপনার নাম ভুল হইয়া যাইবে। যখনই দর্শন হইবে—তখনই

আপনার নাম সখি নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে।

সেই স্বয়ং রূপ যাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়াছে, সে কি তাহার পরিমাণ করিতে পারে, না দেখিয়া তাহার তৃপ্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়?

"দুই আঁখি কি করিবে পান"

সে বলিবে—

যে হেরিবে কৃষ্ণানন　　তার করে দ্বিনয়ন
বিধি হয়ে হেন অবিচার।

তিনি যদি অণুরূপে গ্রহণ করিয়া দিব্য চক্ষু প্রদানে, ভাবরূপে স্ফুরিত হন, তবে সেই "কেবল রসনিরমান্" ভাবের সহিত মিলিত হইয়া প্রকট হইয়া সমাধিতে স্ফুরিত হইতে পারে, নহিলে সে কিছুতেই সে রূপের পরিমাণ হয় না—

লাখ লাখ যবতী　　দিবস নীতি থারতি
হেরই নহ পরিমাণ।

যার দর্শন হইয়াছে সে বলিতে পারে—

পহিলহি রাগনয়ন ভঙ্গ ভেল॥
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥

সে বলিতে পারে—

সখি কি কহব অনুভব মোর।
সোহিরূপ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।

তখন সকল বিশেষণগুলি প্রেমময় স্বরূপে নিঃশেষরূপে মিশিয়া মদনমোহনের মহান্ ভাব স্ফুরিত করে। কেবল তখনি—

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যাং
বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশং॥ *

রূপ ফুটিয়া উঠে, তখন সেই রূপেই সে ডুবিয়া যায়। গিয়া বলে—

তোমার গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটী চরণ সদা লৈয়া রাখি বুকে ॥

এইরূপই স্বয়ং রূপ-- ইনিই ব্রজেশতনয়—
তাঁহারই ধাম—শ্রীবৃন্দাবন।
উপাসনা—ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
প্রমাণ—শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

প্রতীক্ষা।

তোমাতে আমাতে প্রাণের পরেতে
কবে হবে পরিচয়?
কবে— মোহের আঁধার ঘুচে যাবে মোব
প্রাণে প্রাণে হবে লয়!
কবে— সংসারবাসনা অসার ভাবনা
পরিহরি তোমা ভজিব!
কবে— আপনা ছাড়িয়া তোমার সন্ধানে
সাধনার পথে ফিরিব!
কবে গো আমার ঘুচে যাবে জ্বালা
চির নির্ব্বাণ লভিব।
কবে— হৃদয় মাঝারে তোমা নিরখিয়া
সুখ-স্রোতে চির ভাসিব।
কবে কত দিনে কত বাকি তার—
সে দিনের কত দেরি?—
সেই আশা নিয়ে তোমা পথ চেয়ে
প্রতীক্ষায় যেন মরি!

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

চিরপরিচিতের আভাস।

বেণুবনের আড়াল দিয়ে
কে যাও তুমি লুকিয়ে ?
হাতে বাঁশী—পায়ে নূপুর
বাজে 'রুণরুণি'য়ে।
কোথাও যেন দেখিনি তোমা,—
তবু তোমা জানি।
কোথায় যেন কোন্ কুসুমে
দেখেছি হাসিখানি।
নীলাম্বরে কতবার বসন তোমার
ছিল আঁকা ;
মুকুটবরণ মেখেছিল
শিখি-পুচ্ছ-পাখা ;
'তরতরা'ন নদীর বুকে
তোমার নূপুর-রব,
কতবার—কতবার
করেছি অনুভব ;
কতবার বিজন রাতে
তোমার বাঁশীর সুর,
বাজায়ে মোর অলস হিয়া
করেছে ভরপূর।
জলে স্থলে প্রাণে মনে
প্রকাশ করে যারে,
কেমনে সে লুকিয়ে রবে
গভীর অন্ধকারে ?

এসো এবার হৃদয়মাঝে
চিরপরিচিত!
জীবনবধূ তোমার সাথে
হবে পরিণীত।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

মা।

সোনার থালে বিশ্ব তুলে বল্ মা কাহার পূজার তরে,
এম্নি করে পাগ্‌লি মেয়ে যাচ্ছ ছুটে দেশান্তরে?
নাহিক শ্রান্তি আপন মনে উন্মাদিনী এলোকেশে,
বিঘ্নবাধা ছিন্ন করি খুঁজছ কোন্ সে নিরুদ্দেশে?
নাহিক ঘৃণা শঙ্কা বাধা নাইক' কোন ভয়ের রেখা,
মরণ টানে যাচ্ছ ছুটে অচিনের কোন্ দেশে একা?
ব্যথা পথের একলা পথিক একলা দেশের আঁধার ভেঙ্গে,
বাহুর দোলে বিশ্বে নিয়ে একলা সারা সৃষ্টি জেগে,
কি যে করুণ মর্ম্মগানে শীর্ণ সারা অর্ঘ্য হাতে,
দৈন্য-ঘেরা পুষ্প পাতায় ব্যথায় ভরা বেদনাতে;
যাচ্ছ নিয়ে নিরুদ্বেগে সকল ব্যথার মলিনিমা,
সর্ব্ব অপমানের দাগা মৃত্যু-ঘেরা মর কালিমা॥
নাহিক তৃপ্তি যাচ্ঞা ক্ষুধা নাইক' তৃষা বক্ষ ভরা,
চলার পথে ব্যথিত বুকে চলাই লক্ষ্য জীবন সেরা॥
জানিনা কোন্ অলখ্ সুখে ভরপুর কোন্ গুঞ্জরণে,
মৌন বধির কোন্ অচেনার নূপুর সিঞ্জিরণে;
জানি না কোন্ তরাস-লাগা নিঝুম শ্যামল আন্দোলনে,
বেদনা-ভরা বিশ্ব-নাড়ীর নিবিড়-করা সঙ্কলনে—
পেয়েছ ঠাই, রিক্তসুখের অলস-করা আরাম নীরে;
নীরব সুখে বয়েছ তাই জমাট করা ব্যথার ভরে॥

রিক্তছেলের দুঃখের বোঝা বয়েই মা তুই হ'লি কালী,
ভিখারীর মা, ভিক্ষু-রাণী ! করিলি সার পূজার থালি ॥
একলা তুমি বিরাজ মা, বিশ্বগলা ঘূর্ণিপাকে,
মৃত্যু পারের কুহক নদীর কল্লোলিত ফেনিল বুকে ॥
কাঁপন-ধরা-ছিন্ন-অণুর বক্ষ জুড়ে জাগিস্ ব্যথা,
বিশ্ব-শিরায় ভক্তি-পূজায় আশীর্ব্বাদে আছিস্ গাথা ॥
বিশ্ব আঁধার ভাঙ্গিস্ ওমা ! ব্যথার-স্বর্গ-আলো-করা।
আঁধার-আলোর ব্যথার স্বরে গোপন পুরে দিস্ মা ধরা ॥
ছিটিয়ে শত প্রহেলিকায় জড়োয়াকরা কান্না হাসি,
অচিন্ পূজায় ধূলার দেশে আপ্নি ধরা দিচ্ছিস্ আসি ॥
হারিয়ে যাওয়া মনটী তোমায় কোথায় কেমন জানি না সে
কোন্ আঁধারের পিছিল পারে কোন্ নীলিমায় রঙ্গিণ শেষে,
কোথায় পড়ে কোন্ অতীতে কোন্ পাথারের ধূলার পরে,
জানি না কোন্ মৌন দেশের ধবল রাজ্যের স্বপন শিরে ;
তাঁরই খোঁজে পাগ্‌লি আমার সকল সংজ্ঞা মুছে ফেলে,
ম রে হাড়ের রুদ্রমালা অসংকোচে তুল্লি গলে ॥
অসংকোচে আপ্নি একা সোনার কাঠির স্পর্শে ছলি,
ধেয়ান-ধরা রুদ্রদেবের জাগ্রত ধ্যান দৃষ্টি দ'লি
খেল্‌লি যে নীল লুকোচুরী অরূপ আঁধার ভেঙ্গে পড়ে,
স্নেহের ভরা বৈষ্ণবী তুই কাট্‌লি শেষে অসুর শিরে ॥
অসংকোচে কার ছলনায় কার শাসিত উন্মাদনায়,
কোন্ সে কঠোর নিয়ন্ত্রিত মুগ্ধ-করা নির্দেশতায় ;
নিরুদ্বেগে রক্তথেকো নিজের ছেলের মাথা ছিঁড়ে,
নিজের বুকের মর্ম্মখানি আপন হস্তে উপাড়িয়ে ;
তপ্ত ঘোরা রক্তধারা নিজেই শেষে কর্লি পান ;
বিরাট প্রলয় অগ্নি মাঝে আপ্নি বেছে নিলি স্থান ॥
মূর্ত্ত রবির দৃপ্ত তেজে আছিস স্বর্গ পাতাল জুড়ে,
মুখে মহান্ রুদ্র আভা অঙ্গ বেয়ে রক্ত ঝরে ॥
বক্ষে মা তোর স্নেহ গলে মাণিক গাথা ঝিলিক তারা,
চক্ষে কঠোর রুক্ষ শাসন উদ্যত খর-খড়্গ পারা ॥

অবাক্ ওমা বিশ্ব সারা অরূপ মরীচিকা হেরে,
চমক্ ভ'য়ে মুষ্ড়ে শুধু বক্ষ ছিঁড়ে মা মা করে॥
তারা শুধু চেনে মা তোর বিগলিত স্নেহের থালি,
জগত জোড়া ধূলার আসন ধন্য করা চরণ ধূলি॥
আমিও মা চেয়ে আছি অই চরণের ধূলার পানে,
জানি না কোন্ শুভক্ষণে পূর্ণ হ'ব অচিন্ গানে॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

তুমি।

তুমি নয়ন-শোভন অঞ্জন আমার
তুমি হৃদয়রঞ্জন কুসুম হার,
তুমি পূর্ণিমা রাতে পাপিয়া রাতে
তুমি শারদ প্রাতে বাঁশীর গান,
তুমি সরস জড়িত নববঁধুর বুকে
আধ মুকুলিত প্রেম-পিপাসা,
তোমার মুখখানি দেখিলে বুঝি মিটিবে আশা।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

নিরাশ-যাত্রী।

(১)

মাঝি ফিরাও তরী বারেক তীরে।
রুদ্ধশ্বাসে আস্‌ছি ছুটে যাব ব'লে পরপারে।
তোমায় তরীর বুকমাঝে আছে গো স্থান আমার তরে,
পায়ে ধরি ওগো পারি বারেক তরী ফিরাও তীরে।

(২)

আমি যে গো বড়ই দীন, নাইক' কিছু দিতে তোমায়।
তাই বলে কি যাবে চলে ভাসিয়ে মোরে নিরাশায় ?
যাবে চলে ?—যাও গো চলে তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে।
(কিন্তু) জেনো দীনের দুঃখ-বাণী বাজবে সদা মরম মাঝে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে।

আমাদের বৎসর।

গত বৎসরে আমাদের, শুধু আমাদের কেন সমগ্র জীবের কর্ম্মফল যোগমায়া যোগাত্মা চৈতন্যময়ীর প্রসাদে ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হউক। শ্রীহরি ওঁ তৎ সৎ॥

সহজ কথায় আমরা তো কর্ম্ম অর্পণ করিতে চাই। সকলেই ভেদ ভাবে অবস্থিত হইয়াও আপনাকে যন্ত্রীর যন্ত্ররূপ কল্পনা করি, কিন্তু তাহাতে কি কর্ম্মের অবসান হয়। ইউরোপীয় মহাসমরে প্রজ্বলিত হুতাশনে পতঙ্গবৎ কোটী কোটী জীবকণের ধ্বংস হইতেছে, অথচ জার্ম্মান সম্রাট্ অকাতরে এ কর্ম্মটি ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া খুসী হইয়া আছেন। আমরাও তদ্রূপ ফলাকাঙ্ক্ষায় ডুবিয়া আছি, অথচ 'ইদং কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' বলিয়া মনে করি কর্ম্মটা ভগবানে পঁহুছিল। মনে হয়, কি কুক্ষণেই ভগবান্ অর্জ্জুনকে নিমিত্ত মাত্র হইতে বলিয়াছিলেন।

সেই জন্যই খট্‌কা লাগিল যে, কি করিয়া ভগবানকে কর্ম্ম অর্পণ করা যায়। একটা কল্পিত আধার মনে করিয়া তাহার উপর কল্পিত কর্ম্মফল রাখিলেই কর্ম্ম অর্পণ করা হয় না ; শরীরের ভিতর অন্ন দিলেই উহা শরীরে অর্পিত হয় না। অর্পিত অন্ন শরীরের সহিত সমরস ও সমপাতি না করিলে শরীরে যায় না। ইহাকেই পচনশক্তি বলে। সমানুপাতি করিতে গেলে অর্পিত বস্তুর বিরুদ্ধ ভাবগুলি মল-মূত্রভাবে বাহিরে পড়িয়া যায়। অনেকে, বিশেষতঃ কলিকাতার বাবুরা এইগুলিকেই ভোজনের ফল বলিয়া মনে করেন ও আহারের পরই বিসর্গের চেষ্টায় থাকেন। সেইরূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যেও যোগিগণের মধ্যেও বিসর্গ লইয়া

এত মারামারি। কার সাধনার ফল কতটা ও কিরূপ বাহ্যশক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে ইহাই আধুনিক সাধনার কষ্টিপাথর। কিন্তু এই যোগশক্তিগুলি যে প্রাণের ভিতর একত্বাভিমুখী শক্তির মলমূত্ররূপী বাহ্য ফল ইহা আমরা একবারও ভাবি না। কিন্তু ইহা ত কর্ম্মার্পণ নহে। ভগবানে কর্ম্ম অর্পিত হইলে বাহ্য ভাবের এরূপ ফল হইতে পারে না। এই বিসর্গগুলিকে উদ্ভব করাই কর্ম্ম ও তাহাতেই কর্ম্মের বন্ধন শক্তি।

এই বিসর্গগুলি কারকবুদ্ধিতে অবস্থিত আছে। কর্ম্ম করিলেই যে অংশগুলি শুদ্ধ ভগবৎ বা আমি স্বরূপে পরিণত না হয় তাহাই বিসর্গ হইয়া বাহিরে আসে। 'অ' বলিলে স্বরটী অন্তর্ম্মুখী হইয়া যায়. 'অঃ' বলিলে সেইগুলি বাহিরে আসিয়া পড়ে। কারকগুলি এইরূপ বিসর্গবুদ্ধি দ্বারা আবৃত। ভক্ত ভক্তির আবেশে কার্য্য করিলেও কোথা হইতে তাহার ভিতর একটা কর্তৃত্বের অভিমান আসিয়া পড়ে। বিশেষ কার্য্য করিলে বিশেষ করণবুদ্ধি আসিয়া পড়ে। এই কারকের কথা বারান্তরে বলা যাইবে। করণবুদ্ধি ছিল বলিয়াই ভগবান্ একেবারে ধ্রুবের হৃদয়ে প্রকাশ হইতে পারেন নাই। নারদ কর্তৃক মন্ত্রদীক্ষা ও সাধনারূপ করণ-জ্ঞানের তৃষ্ণা কতকটা প্রশমিত হইলে, ধ্রুব ভগবান্কে দেখিতে পান। যিনি আমির আমি, যিনি শরীরের ভিতরে বৈশ্বানর ও যিনি আছেন বলিয়াই বাহ্য ও ভিতর সমন্বিত হয় তাঁহার প্রকাশে কোন কারকের আবশ্যকতা নাই। সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে কি দীপের আবশ্যক হয়?

সে যাহা হয় হউক; এই কারকগুলিই আমাদের চৈতন্যের ভিতর অহঙ্কার-গ্রন্থের তন্তুস্বরূপ এবং এই কারকবুদ্ধিই যে ভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহাই দেখাইবার জন্য কারকগুলির পর্য্যায় বা শৃঙ্খলাজ্ঞানের বিপর্য্যয় করিবার জন্য, ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে মায়াবিভূতির বিকাশ করেন। ইহাকেই ইংরাজীতে miracle বলে। কিন্তু আমরা এত ভ্রান্ত যে, কোথায় এই গুলির সাহায্যে কোথায় কারকগুলির উপরে যাইব, তাহা না করিয়া ভগবানের ঘন একত্ব শক্তিকে আপনাপনি ধর্ম্মমতের ভেদাত্মক বিশিষ্টতার পরিপোষণে প্রযুক্ত করি। তৃপ্তি তাহার স্বরূপগত আনন্দময়ত্বের বাহ্যভাব। তাঁহার চৈতন্য অভিব্যক্ত হইলেই জীব তৃপ্ত হয়। 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃপ্তিরূপেণ সংস্থিতা' এইটিই আসল কথা। এই ভাবটিকে বুঝাইবার জন্যই পরাপ্রকৃতি মহামায়া নিত্য খেলিতেছেন। ইহাই বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র এককণা তণ্ডুল লইয়া সশিষ্য দুর্ব্বাষার ও জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি ব্যাপার বিবৃত করেন। ইহাই বুঝাইবার জন্য বাইবেল ৫ খণ্ড

রুটি ও ৫টি মৎস্যের দ্বারা সহস্র সহস্র লোকের তৃপ্তি দেখাইয়াছেন। এই দুই ব্যাপারেই ভগবানের আনন্দময়ত্বের ব্যঞ্জনা করা হইয়াছে। ইহা ত বাইবেল বা মহাভারতের বিশেষত্বের প্রমাণ নহে। সর্ব্বকালে সর্ব্বভাবে ভগবানের মহিমা ব্যঞ্জনা ও জীবকে উদ্ধার করিবার ইঙ্গিত দিবার জন্যই এই খেলার অবতারণা। তৃপ্তিটিকে বাহিরে না দেখিয়া যে তৃপ্তির কারণ ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছে সেই প্রকৃত দর্শী।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি" ইত্যাদি কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম বোধগুলি ভগবানেও নাই এবং জীবের শুদ্ধ প্রকৃতিস্বরূপেতেও নাই। যোগমায়া মহাবিদ্যা ভগবৎ স্বরূপটি লইয়া খেলা করিয়া ভগবান্‌কে অঙ্কিত করিবার জন্য সৃষ্টি স্থিতি ও লয়রূপ নিম্নতর ভাবের সৃজন করেন। সৃষ্টির ভিতর যতই খেলাই হউক না কেন, তাহার প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক ভাবে তাহার সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে একমাত্র ভগবান্‌ই সার পদার্থ ইহা বুঝিতে পারিলে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতেও সাধক মুহ্যমান হন না। এইরূপে সৃষ্টি ও লয়ের ক্ষেত্রেও ভগবান্ একমাত্র সার পদার্থ। মনে হয় যোগমায়ার খেলাটি কতকটা টিকা দিবার মত জীবিত বা মৃত বীজাণুকে মানবশরীরে প্রবেশ করান গেল। ভিতরে যে জীবন্ত ঐশিক সংরক্ষিণী শক্তি আছে সেই শক্তিই শারীরধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া সুপ্তভাব হইতে ব্যক্তভাবে খেলিতে লাগিলেন। বিষের বীজাণুও সংরক্ষিণী শক্তির সংগ্রামে শারীরিক অণুগুলি ঐ বিষাক্ত বীজাণুশক্তির বিরুদ্ধভাবে খেলিতে অভ্যস্ত হইল। ডাক্তারেরা এই পর্য্যন্তই দেখেন। কিন্তু আমরা দেখি যে শরীরের সমস্ত অণুগুলি ও তাহাদের ভিতর অভিব্যক্ত ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবটি মহামায়ার ব্যক্ত খেলায় কতকটা ভাব গ্রহণ করিতে শিখিল ও তদ্ভাবাপূত হইয়া গেল। তাই বুঝি কি ব্যক্তিগতজীবনে কি সমগ্র মানব জাতির জীবনে বাহিরের ধর্ম্মের গ্লানি উৎপন্ন হইলেই ভিতরে বৈষ্ণবী শক্তির উদ্রেক হওয়ায় জীব আশ্চর্য্য কৌশলে দুইটি জিনিষ শিখিয়া ফেলে। বাহির হইতে আগত শত্রুপরাভব জন্য আর নিজে চেষ্টিত হয় না। ব্যক্ত খেলার ভিতর সুপ্তপ্রায় ভগবতী শক্তিকে আবাহন করিয়া তাঁহারই সাহায্যে বাহিরের গ্লানি দূর হয় ইহা বুঝিতে পারে। আমির ভিতরে মহামায়ার অপরাভাবের যে খেলা হয় তাহাতে আমিটিকে ভগবানের অংশ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় ভগবানের সহিত এক হইতে পারা যায়।

এই দুইটি ভাবই অবতারের সময় বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভাব বলিয়া বৈষ্ণব-

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যে সকল জীব বাহিরে ধর্ম্মভাব লইয়াই ব্যাকুল, যাঁহাদের দৃষ্টিতে এখনও বহু আছে ও যাঁহারা সেই বহুর ভিতর ধর্ম্মরূপের একত্বের আভাস মাত্র পাইয়াছেন তাঁহারা দেখেন যে সাধুগণের পরিত্রাণ বিরুদ্ধ শক্তির উপশম ও ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্য মাত্র। তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এই খেলায় মহিষাসুরবিনাশিনী মহামায়াকে দেখিতে পান! আত্মভাবে অবস্থিত বলিয়াই জীবের দুঃখহরণরূপ ভাবটি দেখিয়াই তাহারা তৃপ্ত হইয়া যায়, সর্ব্বসাক্ষী রূপিণী দেবী নারায়ণীকে তো দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহারা কতকটা অধ্যাত্ম-নিত্য বিনিবর্ত্তকাম, যাঁহারা শুদ্ধ আমির ভিতর দিয়া ভগবানকে দেখিতে শিখিয়াছেন তাঁহারা দেখেন যে এই খেলার অপর একটি দ্বিভাব (pole) আছে। যেমন চুম্বকের দুইটি দ্বিভাব আছে, তেমনি ভগবানের প্রকাশেও দুটি দ্বিভাব আছে ;—একটির নাম সর্ব্বের ক্ষেত্র—এই ক্ষেত্রে বর্ণ আশ্রম ও শাস্ত্র আছে, ব্যক্তিত্ব ভাবের অংশ রাখিয়াও এভাবে থাকা যায়। বসুদেব এইভাবের কেন্দ্র হইয়া সর্ব্বগুলিকে ঘন একরূপে যেন ধরিয়া আছেন। ভগবৎ চৈতন্য দেবকী অথবা প্রকাশশীলতারূপে উজ্জিত হইয়া এইভাবে মেলেন। অপরভাবটি বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আনন্দের ক্ষেত্ররূপে আছেন। মধ্যে যমুনার neutral line আনন্দক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা নন্দ বা আনন্দ। এ ক্ষেত্রে ব্যক্ত ভাব আছে কিন্তু তাহা ঘন হইয়া আনন্দের ক্ষেত্রে মিশিয়া থাকে। অঙ্ক কষিতে গেলে প্রত্যেক স্তরে স্তরে যেমন অঙ্কের ফলটি অভিব্যক্ত হইয়া পরিশেষে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধির ক্ষেত্র বৃন্দাবনে ব্যক্ত সমস্ত ভাবগুলি ভগবৎ ভাবে মিশিয়া যায়। ব্রজের গাভী তাঁহার বেণুরব বুঝিতে পারে। সমস্ত প্রকৃতি তাঁহার বংশীধ্বনিতে নাচিতে থাকে। এখানেও দৈত্যশক্তির প্রকাশ আছে বটে কিন্তু তাহার প্রশমন করিবার জন্য গোপদিগের কাহারও মনে ভগবান্ ব্যতীত অন্য উপায় বা অবলম্বন জাগে নাই। প্রত্যেক বিপদই ভগবান্ স্বয়ংই প্রশমন করেন। গোপেরা দেবতাকেও পরিত্যাগ করেন, তাই গোবর্দ্ধনধারণরূপ ব্যাপারে ভগবানের সর্ব্বদেবময়ত্ব অভিব্যক্ত হইল।

যমুনার অপরপারে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে মহাসংগ্রাম হইয়া গেল। সে সংগ্রাম ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবের। সেখানেও ভগবান্ একমাত্র কর্ত্তা সাক্ষী ও প্রভু কিন্তু সেখানে তিনি সারথীরূপে প্রচ্ছন্ন। লোকে দেখিল ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন, ভীম ইঁহারাই যোদ্ধা সেইজন্য অনেকেই আজকাল কুরুক্ষেত্রে ভগবান্‌কে না দেখিয়া ভীষ্মকে দেখিয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভীষ্ম ও দ্রোণ ভিন্ন

কুরুপক্ষে কোন জন ও পাণ্ডবপক্ষের যুধিষ্ঠির ভিন্ন কোন জন বুঝিয়াছিল যে ব্যক্ত-জীবের সারথীরূপে অবস্থিত নিরস্ত্র চতুর্ভুজ ভগবানই এই সময়ে প্রকৃত যোদ্ধা। কয়জনই বা আজকাল Europe এ সংসাধিত কুরুক্ষেত্রে সেই সারথীরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। অর্জ্জুনের মত কেহ বা ভগবানকে বাদ দিয়া জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়াও ব্যূহভেদ হইল না। যখন হতাশ হইয়া অর্জ্জুন নিজ প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন তখনই ভগবানের উপদেশে জয়দ্রথ পাতিত হইলেন। বৈষ্ণবাস্ত্রত্যাগে যখন সকল বীর অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, ভীম অহঙ্কারে অস্ত্র ত্যাগ করিলেন না। সব্বভাবে অবস্থিত হইলেই ব্রহ্মাস্ত্র লাভ হয়—তাই কৌরব পক্ষ হইতে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ হইল। অস্ত্র বেগে ভীমের উপর আসিতেছে—ঐ বুঝি ভীম সেই শক্তিতে ধ্বংস হয়, এমন সময় সেই প্রচ্ছন্নযোদ্ধা ভগবান্ ভীমকে আলিঙ্গন করিলেন। সর্ব্বজনীন একত্র জ্ঞানে বৈজ্ঞানের উৎপত্তি, সুতরাং উহা সর্ব্বস্থানেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক যে শক্তি মানবকে রক্ষা করে তাহাই আবার মানবকে ধ্বংস করিতে পারে, কিন্তু এ ধ্বংস বা সংরক্ষণ ব্যাপারে ভগবান্ এরূপ প্রচ্ছন্ন থাকেন যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কোন পক্ষের লোকই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এ মহাসমরে তাহাই ত হইতেছে। ভীমের আসন্ন মৃত্যু—ঐ দেখ সার্ব্বজনীন ভাবের পরিসমাপ্তি সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বজীবের আধার ভগবান্ যাই ভীমকে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি সেই ব্রহ্মাস্ত্র বৈজয়ন্তি মালারূপে পরিণত হইয়া গেল।

কুরুক্ষেত্রে ভগবানের প্রকাশ সর্ব্বাত্মক ভাবেই হইয়াছিল। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের সার্ব্বজনীন ভাব অসিদ্ধ হইলে যখন Europe সর্ব্বাত্মকরূপে তাঁহাকে দেখিতে শিখিবে, যখন বিজ্ঞানের অভিমান ভুলিয়া মানব-জীবনের ভিতর ভগবানের খেলার সঙ্গও পাইবে, তখনই এই মহাঅভিনয়ের প্রকৃত ফল সিদ্ধ হইবে। সর্ব্বের ভিতর ভগবানের অবতার হয় না, তাঁহার স্বভাবের বিকাশ হয়; কিন্তু তাঁহার স্বরূপের আভাস পাওয়া যায় না। তাই বলি, অবতার অবতার বলিয়া মুগ্ধ হইয়া আমির ভিতর দিয়া বৃন্দাবনের ভগবানকে ভুলিও না। সর্ব্বাত্মক ভাবেই কর্ম্মের অর্পণ হইতে পারে। সমস্ত কারকগুলির ভিতরে ভগবানের অভিব্যক্তি না দেখিলে সর্ব্বাত্মক ভাব জাগে না। স্বভাব বা প্রকৃতি দেবী ভগবানকে সর্ব্বাত্মকভাবে আবৃত করিবার জন্যই খেলেন কিন্তু আমাদের ভিতরের মোহ আছে বলিয়া আমরা কেহ কেহ তাঁহাকে অহংয়ের কর্ত্তাভাব, কেহ বিজ্ঞান প্রভৃতির করণশক্তি, কেহ বা অন্য কোন কারকবুদ্ধিতে সেই

সর্ব্বাত্মক বুদ্ধি হারাইয়া ফেলি। এই সময় ভাল করিয়া মহাভারত পড়িলে বুঝিতে পারিব যে সে সময়ে যেমন সকল ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানই অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুর্দ্দিনে এই পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভগবৎবিমুখ মোহের ধ্বংসকালে যোগমায়া বিদ্যাভাবের আভাস দিবেন। আমরা ধর্ম্মের পক্ষে আছি, কিন্তু ধর্ম্ম যে তাঁহার অবয়বী ভাব ইহা তো সকলে বুঝিতে পারিতেছি না। যোগেশ্বর কৃষ্ণকে তো এই সময়ের ভিতর দেখিতে পাইতেছি না। এমন সুযোগ তো আর ঘটিবে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভগবানকে অস্বীকার করিয়া কেবল ব্যাবহারিক একত্ব বুদ্ধিতে দৃপ্ত হইয়া সূক্ষ্মতর স্বার্থের কুহকে ডুবিয়া যাইতেছিল। জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বিজ্ঞানের অপব্যবহারে আজ তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অপেক্ষা একটা মানবের জীবনের মূল্য অধিক। তাঁহারা বুঝিবেন যে বৈজ্ঞানিক ভাবে মানব প্রকৃত পরমার্থ লাভ করিতে পারে না। ভগবানকে বাদ দিলে সকল বিদ্যাই অবিদ্যার কারণ হইয়া যায়। তাই বলি এস সকলে ব্যক্তভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিতে করিতে একবার এই মহা-অভিনয়ের ভিতরে সেই এক অদ্বিতীয় নটরাজের খেলা বুঝিতে চেষ্টা করি। শুধু ব্রহ্মকে না দেখিয়া, ধর্ম্মের আধারকেও দেখিতে চেষ্টা করি।

আর যাঁহারা যমুনার অপর পারে থাকেন, যাঁহাদের ভিতর সর্ব্বের আকাঙ্ক্ষা কতকটা তৃপ্ত হইয়া গিয়াছে যাঁহারা বাহ্যভাব ত্যাগ করিয়া আত্মতৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বঝিবেন যে এত ঝড় জল এত গোলযোগে ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবের উপায় আছে। সমুদ্ররূপধর্ম্ম কেবল উপর দিকেই তরঙ্গায়িত হয়, অবয়বের ভিতরেই এই তরঙ্গের খেলা. অবয়বীতে সবটাই স্থির শান্ত ও মধুর। তাহার উপর ভাবের আনন্দময় নিষ্ফল ভাব আছে—সেখানে ধর্ম্ম একেবারেই নাই—এইটিই মানবের পরমার্থ। অতএব হে গোপ গোপীগণ! তোমাদের নিকট প্রার্থনা যে শুদ্ধ ভগবানের স্বরূপ ভাবটিকে স্বামিদত্ত বীর্য্যের ন্যায় আপন আপন চিত্তগর্ভে ধারণ কর সংরক্ষণ কর, জগতে পুনরায় ধর্ম্মভাবের সংস্থাপন হইবে। প্রাচ্য জগৎ ভগবানকে প্রকৃত ভর্ত্তা ও কর্ত্তা রূপে চিনিতে শিখিলে, তাহাদের উচ্চাভিলাষিগণকে এই পরম বীজটি দিতে হইবে। সর্ব্ব-ভাবের ভিতর ভগবৎ ভাবের অভিব্যক্তি ও পরিসমাপ্তি বাহিরের খেলার মর্ম্ম। সেই পরিসমাপ্তির ভিতর যিনি সোহংরূপী অদ্বিতীয় ভগবানকে দেখিতে পান, তিনিই দেখেন সর্ব্ব ভাবটি যোনি বা ক্ষেত্র। উহার ভিতর

সর্ব্বাত্মিকা ভাবের আধারকণা (ovum) ফুটিতেছে, আর তোমাদিগের ভিতর অভিব্যক্ত সেই পর অতিগ ভাবটি বীর্য্য। তোমরা এসময়ে বীর্য্যটি সংরক্ষণ না করিলে কি করিয়া ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যারূপ ভাবের বীজ পড়িতে পারে। অতএব হে আত্মতৃপ্ত ভগবৎকিঙ্করগণ তোমরা বাহবে খেলার মোহে ডুবিও না। যদি বাহিরে খেলার দিকে দৃষ্টি পাড় তখন কায়মনোবাক্যে স্মরণ করিও— "যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণঃ যত্র" ইত্যাদি

কোথা তুমি।

১

আছিনু যখন জননী-জঠরে,—
ছিলে যে গো তুমি মোরে কোলে করে!
না ছিল ক্রন্দন, ছিল না ত গোল,
না পশিত কাণে সংসারের রোল ;—
তব মুখ হেরি—আপনা পসারি
　　আছিনু বিভোল আমি ;
সহসা আমারে রাখি কোন্ পুরে,
চলে গেলে তুমি কোথা কত দূরে
কত না কাঁদিয়ে ডাকিনু তোমারে
　　ওহে প্রিয়সখা স্বামি!

২

দিলে কত জনে খেলা কত মত
করিল আদর কত জনে কত ;—
কত না সোহাগ কত না যতন
কত হাসি খুসী কত প্রলোভন ;—
কত বেশ ধরে, কত ছল করে
　　আসিল ভুলাতে মন!

কত না হাসিনু হেরে সে সবায়,
কত না কাঁদিনু না হেরে তোমায়!
আর কত সব ?—কত সহা যায়
কোথা গো জীবনধন ?

৩

যেখানে যা কিছু সুন্দর শোভন
পূর্ণিমার শশী উষার তপন
মলয় অনিল পিক-কুহুরব
প্রমদার প্রেম কুসুম-সৌরভ
নীলাকাশ পটে, নির্ঝরিণী তটে
বিশাল বারিধি নীরে ;—
সুন্দরী বসুধা মধুরতা মাখা—
তোমারি লাগিয়ে ওগো প্রাণসখা
কতনা খুঁজেছি মিলিল না দেখা ;
দিন গেল ফিরে ফিরে!

৪

আর কোথা যাব, কোথা দেখা পাব ?
কেমনে বলগো এ জ্বালা জুড়াব ?
হতাশার ভারে ভেঙ্গে গেল হিয়া,
অন্ধ হল আঁখি চাহিয়া চাহিয়া,
জীবনের ভার, কর অবসর
আর ত পারি না আমি!
এই বেলা মোরে দেখাও সরণি
এই বেলা ঘাটে আনো গো তরণী
এই বেলা ওগো নয়নের মণি
বল বল কোথা তুমি ?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ,

আর্য্যললনা—শশিকলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। হিরণ্ময় হরিদ্রাঞ্চলা প্রকৃতি দেবী কাকলিমুখরিত কনককিরীটী বনস্পতিগণ সহ প্রদোষপ্রাসাদাবলম্বী মরীচিমালীর সায়াহ্নিক বন্দনায় নিরতা। মুনিবালকগণ হোমধেনুকুল সহ গৃহপ্রত্যাগমনের উপক্রম করিতেছে; অঙ্কাগত নৃত্যকৌতুকী বৎসগণসহ গাভীগণ মুনিবালকগণের গৃহগমনের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। দূরে মৃন্ময়কুম্ভপূর্ণ সলিলে তাপসকুমারীগণ আলবালে জল সেচন করিতে করিতে মৃদুল রবে বিভুবন্দনা গান করিতেছে। আশ্রমবাসিগণের ধূপধূনা ও আজ্যগন্ধসমাকুল সমীরণ সামসঙ্গীতের উদাত্ত ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া দূর দূরান্তরে প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময়ে ভরদ্বাজাশ্রমের উদ্যানোপকণ্ঠস্থ শিলাদলে বসিয়া দুইটি তাপসকুমার কি জানি-কি আলাপ করিতেছিল। তখন সেইস্থানে অযোধ্যারাজতনয় সুদর্শন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গম্ভীর অথচ আনন্দপূর্ণ সস্মিত বদন মণ্ডলে কি অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকটিত হইতেছিল। তিনি ঐ কিশোরদ্বয়ের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই, তোমরা কি রাজকুমারীকে এখানে দেখিয়াছ ?"

তাহাদের একজন উত্তর করিল "কোন্ রাজকুমারী দাদা ? আজ কোনও রাজপরিবারের কেহই ত আশ্রমে আসেন নাই।"

কথা শুনিয়া সুদর্শন একটু চিন্তান্বিত হইলেন। তখন অপর তাপসনন্দন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, তোমার কথা শুনে তোমায় স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বোধ হচ্ছে, তুমি রাজকুমারীর কথা কি বলছিলে ?"

সুদর্শন। ভাই আজ আমি যখন দেবীমন্দিরে ব'সে মায়ের উপাসনা করিতেছিলাম তখন সহসা একটী রাজকুমারীকে আমার পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়াই যাই একটু সরিয়া যাইব মনে করিতেছি তখন দেখিলাম দেবীমূর্ত্তি করপ্রসারণপূর্ব্বক আমার পথ রোধ করিয়া কহিলেন "বৎস, তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর" এই বলিয়া জগজ্জননী উভয়ের করদ্বয় সম্মিলিত করিয়া দিলেন; রাজকুমারী ও আমার পরস্পরে মাল্যবিনিময়

হইল। আমি ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া যেমন পূজা করিতেছিলাম তেমনি দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলাম। পূজান্তে আশ্রমকুটীরে আগমন করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন অভিপ্রায়ে যাই কণ্ঠবিলম্বিত রুদ্রাক্ষমালা উত্তোলন করিতেছি তখন দেখিতে পাইলাম তাহার সহিত একগাছি উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ বন্ধুজীবকুসুমমাল্য রহিয়াছে; তাহা দেখিতে পাইয়া আমার সেই রাজনন্দিনীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। আহার ও বিশ্রামান্তে তাহার অন্বেষণার্থে আশ্রমের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি কিন্তু কাহারও নিকট কোনও রাজপরিবারের আগমন-সংবাদ শুনিতে পাইলাম না।

তাপসকুমার। এত বড় আশ্চর্য্য কথা দাদা! সেই মালাত এখনও তোমার গলায় আছে দেখ্‌ছি; কোনও রাজকুমারী এল না, অথচ তার দেওয়া মালা তোমার গলায় এল কি করে? তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখেছিলে।

সুদর্শন। ভাই, স্বপ্নের দেশত অনেকদূরে ছেড়ে এসেছি। স্বপ্ন দেখলেও স্বপ্নের মালা কি কখনও জাগ্রতে সত্য থাকে? ভাই, আসলে রাজকুমারীও মিথ্যা, মালাও মিথ্যা, পরিণয়ও মিথ্যা! সকলই মহামায়ার মায়া, নাটকের নাট্যাভিনয় মাত্র! সকলই জগদম্বার সংসারখেলায় এক একটী তরঙ্গবিলাস মাত্র! যেখানে আমি নাই, তুমি নাই, বিশ্ব নাই, সর্ব্ব নাই, আছেন একমাত্র পুরুষোত্তম, সেখানে অপর যাহা কিছু সকলই মিছা! আর যেখানে সেই পরম পুরুষকে আচ্ছন্নের মতন করে অপর যাকিছু সত্যবলে প্রতীয়মান হয় সে ক্ষেত্রে সেই খেলার ঘরে, সবই সত্য। সেই খেলার কথায় বলছি আমার বিবাহ হবে। কাশীরাজকুমারী শশিকলা হবেন আমার সহধর্ম্মিণী! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব হবে। আমার এই তাপসজীবনের অভিনয় শেষ হল; এখন কিছু দিন রাজ্য ঐশ্বর্য্যের খেলা খেলতে হবে।

তাপসকুমার। এঁ্যা দাদা; এখন যেয়ে আবার রাজ্য শাসন করবে? তবেত তোমায় আবার সংসারের পাপে তাপে ডুবতে হবে? অর্থ ঐশ্বর্য্যের দাস হয়ে পড়তে হবে? সেত বড় কষ্ট! তাতে আবার রমণীসঙ্গ!!

সুদর্শন। ভাই, গুরুদেব ত তোমাদের এরূপ শিক্ষা দেন নাই বোধ হয়! তোমরা এ শিক্ষা কোথায় পেলে?

তাপসকুমার। গুরুদেব সংসারাশ্রম ও তাপসাশ্রমের ভেদাভেদের কথা তেমন কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু সকলেই বলে সংসারে বড় দুঃখ, বড় প্রলোভন, এই শুনেই বলছি।

সুদর্শন। যে জগন্মাতার প্রসাদে সর্ব্বতাপ বিনষ্ট হয়, যে পরাবিদ্যারূপিণী মহা-যোগিনীর প্রসন্নতাবশতঃ বিচ্ছিন্ন জীব স্বক্ষেত্রে পরমপুরুষের পদচিহ্ন দর্শন করে কৃতার্থ হয়,—ভাই সেই মায়েরই ত এই সংসার! আমরা সকলেই ত তাঁর জঠরে শুয়ে আছি। তপস্যাই বা কি অতপস্যাই কি? যোগই বা কিসের? অযোগই বা কিসের? চরচর ব্রহ্মাণ্ডই ত সেই কলাবতী কাত্যায়নীর লীলা-বিকাশ!! এখানে থেকে কে কার উপাসনা করে? কে কার কাছে কি প্রার্থনা করে? সেই চৈতন্যময়ী জননীই যখন সব, তবে 'তোমার' 'আমার' আর কোথায়? ক্রিয়া কর্ম্মই বা কোথায়? তোমার আমার এমন কি থাকতে পারে যাতে তাঁকে প্রসন্ন করবে? ভাই আমি বুঝি ইচ্ছাময়ী জননী আমায় যখন যেখানে রাখেন তাই বেশ! এটা ভাল ওটা মন্দ; এতে সুখ ওতে দুঃখ বলে চীৎকার করা সব মিছা কথা! এ সব খেলার পুতুলের হাসি কান্না। যিনি সূতা ধরে পুতুল নাচান, তিনিই বাণী বাজায়ে পুতুলের মুখে কথা ফোটান; পুতুলটার তাতে কোনও কৃতিত্ব নাই। সে, যে অচেতন জড়, সেহ জড়ই। আমার বলতে আমাদের যা কিছু সকলইত তাঁর হাতের ক্রীড়াকন্দুক। আমাদের এই 'আমি' 'আমি' শব্দও যে তারই বাণী! তাঁর সংসারে তিনিই খেলছেন, তার খেলাঘরে থেকে একটুকু হাসিকান্নার অভিনয় করা তাতে আবার 'আমি' কোথাকার কে ভাই?

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিলেন।

উৎসবময়ী কাশিরাজ-নগরী আজ স্বয়ম্বর সমারোহে উৎফুল্লা। ক্রোশান্তর ব্যাপী সমতল ভূমিখণ্ডে স্বয়ম্বর সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে ন্যূনাধিক লক্ষবর্গ ধনুক পরিমিত ভূমিখণ্ডে বিবলম্বন সোপানাবলি গ্রথিত অনুচ্চ চবুতরাবক্ষে সুবৃহৎ স্ফটিকস্তম্ভোপরে সুনীল চন্দ্রাতপমণ্ডিত সুবৃহৎসভামণ্ডপ বিরাজিত। তাহার মধ্যবর্ত্তী অত্যুচ্চ গম্বুজশিরে কাশীরাজকুলের চিরপ্রসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠার মহিমামণ্ডিত শুভ্রপতাকার প্রসারিত বক্ষে "সত্যান্নাস্তি পরোধর্ম্ম" এই মহাবাক্য দূরাগত জনগণ-হৃদয়ে সত্যের মহিমা ঘোষণা করিবার নিমিত্তই যেন প্রতিকূল পবন-হিল্লোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। সেই চন্দ্রাতপতলে নানাদিগ্দেশাগত নৃপতিবৃন্দের বিবিধ বর্ণ-সমুজ্জ্বল বিশিষ্ট চিহ্নাঙ্কিত কেতনরাজি সম্বলিত উৎকৃষ্ট রাঙ্কবপটবিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপতলে মহার্ঘ্য রত্নবোদকানিচয় সুরঞ্জিত পারসিক গালিচাস্তরণে স্ব স্ব মর্ম্মরবক্ষাবরণপূর্ব্বক মণিকাঞ্চন-কারুকার্য্যখচিত দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত সিংহাসনসমূহ ধারণ করত অপূর্ব্ব শোভায় বিভূষিত হইয়াছে। সেই

সিংহাসনশিরে সুরুচিগ্রথিত প্রবালমরক্তকাঙ্ক্ষিত পদ্মরাগ মণিময় ঝালর শোভিত শ্বেত-নীললোহিতপাটলাদি বর্ণের ছত্ররাজি মণিময় দণ্ডসমূহের শোভায় সভামণ্ডপ আলোকিত করিয়া কাশীনাথের অতুল সমৃদ্ধি মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

রজনী প্রভাতের পূর্ব্ব হইতেই অদম্য কৌতূহল পরবশ দর্শকবৃন্দ সেই সভামণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করত নানাবর্ণ বিচিত্রত এক অভিনব জীবন্ত প্রাচীরের সভামণ্ডপের পরিণয় পদ্ধতি সামাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই জনসঙ্ঘের সমবেত দৃষ্টি একমাত্র সভামণ্ডপে নিবদ্ধ। জীবদেহের সমস্ত অণু পরমাণু যেমন একমাত্র আত্মভূত পুরুষের অনুরক্ত হইয়া দেহকোষে নিবদ্ধ থাকে, তাহারাও যেন সেই প্রকার এই জীবদেহান্তবর্ত্তী হৃদয়রূপ সভামণ্ডপের সিংনিরুদ্ধচিত্ত হইয়া কি এক অভিনব মনোহর মিলন দর্শনের জন্য লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের সর্ব্ব-প্রকার আগত আলাপ আলোচনা ভাব বিনিময়াদি সকলই সেই এক সয়ম্বর লক্ষ্যে প্রবাহিত। অনতপূর্ব্বে সাধারণ দর্শকদিগের নিমিত্ত তাহাদিগের মর্য্যাদা ও বর্ণাশ্রমবিভাগানুমোদিত আসনমঞ্চসমূহে তৎতৎ শ্রেণীর জনগণ বিরাজিত রহিয়াছে। সভামণ্ডলের একদেশে পণ্যজীবিগণের নানাবিধ পণ্যবিথীকা-নিচয় সমাগত বাজন্য ও ধনাধীশ্বরগণের সুভাগমন প্রত্যাশায় স্বীয় সম্পদ সম্ভারের অপূর্ব্বচ্ছটায় রূপের হাট মিলাইয়া বসিয়া আছে।

সহসা রাজদ্বারে দুন্দুভি ধ্বনিত হইল। প্রথমতঃ বনবাসী তাপসগণ পুরঃসর ব্রাহ্মণগণ সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক যথানিয়োজিত মঞ্চাসনে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিলেন। তৎপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজগণ ও সামাজিক ও ব্যাবহারিক রীতি অনুসারে স্ব স্ব স্থানে সমাসীন হইলে অমাত্য পারিষদ ও অনুচরবৃন্দ পরিবৃত কুশহস্ত পুরোহিতপুরস্কৃত কাঞ্চুকী পরিচালিত রাজন্যবৃন্দ যথাযোগ্য যান বাহনাদি আরোহণে সভামণ্ডপের দ্বার পর্য্যন্ত আগমন করিলে সুকণ্ঠ চারণগণ তাহাদিগের কুলকীর্ত্তির সহিত স্বোপার্জ্জিত সৌর্য্য বীর্য্যাদির পরিচয় কীর্ত্তন করতঃ একে একে যথানির্দ্দিষ্ট আসনসমীপে উপনীত করিতে লাগিল। এক এক জন নরপতি সিংহাসনসমীপবর্ত্তী হইলে ও তদীয় পুরোহিত ও পার্শ্বচরগণ তাহাদিগের যথাস্থান অধিকার করিলে কঞ্চুকীর ইঙ্গিতানুসারে সকলে আসনোপরি সুখোপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে আনুষঙ্গি সৈন্য ও অনুচরগণ জলদগম্ভীরমন্দ্রে নরেন্দ্রের জয়ধ্বনি করত যথানিয়োজিত স্থানে

দণ্ডায়মান থাকিয়া নায়কের আদেশ বাণীর অপেক্ষায় পাষাণপ্রতিমার ন্যায় অবস্থিত হইল। নানাবিধভূষণ পরিচ্ছদের অতুলচ্ছটা ও সভাসদ্গণের স্থির গাম্ভীর্য্য সম্মিলিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ততার স্নিগ্ধ স্বরূপ প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

এদিকে আমন্ত্রিত জনগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে ঋষি ও ব্রাহ্মণপত্নীগণানুগামিনী পুরললনাগণ সহচরী ও সেবিকাগণ পরিবৃতা হইয়া যথাযোগ্য যানারোহণে কঞ্চুকীপ্রদর্শিত পথে সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক মহিলাগণের উপবেশনযোগ্য সূক্ষ্ম চীনাংশুকবিনির্ম্মিত যবনিকান্তরালে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা যথাস্থানে উপবিষ্টা হইলে সূত ও মাগধগণ মুরজ মৃদঙ্গ বীণাদি বাদিত্র সহযোগে দেশকালোচিত সুমধুর স্বরতানলয়সমন্বিত বিভু-বন্দনায় অভ্যর্থনাসঙ্গীত গাইতে লাগিল।

গায়কগণের সঙ্গীত ধ্বনি আকাশে বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অমাত্যগণ-পরিবৃত কাশীনরপতি সুবাহু অভ্যর্থনাবেশে সুসজ্জিত হইয়া কুলপুরোহিত-পুরঃসর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং সর্ব্বত্র সমবস্থিত ব্রাহ্মণসজ্জনদিগকে যথাবিহিতরূপে অভিবাদন করত যুক্তকরে কহিলেন—"সভাসদ্গণ ও রাজন্যবৃন্দ! আপনারা অবগত আছেন যে সত্যই এই কাশীরাজবংশের সুদৃঢ় অবলম্বন। সে সত্যরক্ষার নিমিত্ত এই স্বয়ম্বরের প্রস্তাবনা ও সভার অনুষ্ঠান, সেই সত্যরক্ষার নিমিত্তই গললগ্নীকৃতবাসে আপনাদিগের নিকট আমার একটী অভিনব প্রার্থনা বিদিত করিতে সাহসী হইয়াছি। আপনারা সকলেই সত্যসন্ধ ও সুবিবেচক এক্ষণে অবহিত চিত্তে আমার বক্তব্য শ্রবণপূর্ব্বক আমাকে সদুত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করুন ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান সময়ের এক বৎসর পূর্ব্বেই আমার সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা একমাত্র তনয়ার স্বয়ম্বরবার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছি প্রায় মাসাধিক কাল গত হইল আমার সেই কন্যা, বিধিবশে স্বপ্নস্বয়ম্বরা হইয়াছেন। মা আমার স্বপ্নযোগে গিরিরাজনন্দিনী মহামায়ার আদেশক্রমে অযোধ্যাধিপতি ধ্রুবসন্ধিনন্দন সুদর্শনকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। আর্য্যরমণীর সতীত্বই একমাত্র অবলম্বন। সতীত্ব বিরহিত রমণীর জীবনধারণ বৃথা। রমণীর সতীত্ব মর্য্যাদা রক্ষাই আর্য্যজাতির প্রধান ধর্ম্ম। জাগ্রত, স্বপ্ন বা যে অবস্থায়ই হউক না কেন যে রমণী একমাত্র পতি ব্যতিরেকে পুরুষান্তরে পতিবুদ্ধি নিয়োগ করে সে কুলটা ও দ্বিচারিণী বলিয়া পরিগণিতা হয়। বিশেষতঃ সতীত্ব আত্মার ধর্ম্ম, উহা

কেবল দেহ, মন বা বুদ্ধির ধর্ম্ম নহে ; অপিচ মানবের আত্মা বা জীবসংজ্ঞাবাচ্য আত্মজ্ঞান পরমপুরুষ ভগবানের অংশস্বরূপে তাঁহাতে নিবিষ্ট। আমাদিগের ব্যাবহারিক বিধি নিষেধাদি সেই একমাত্র মহান্ সত্যের ব্যাবহারিক বিকাশ বলিয়াই সত্য। সেই অতন্দ্রিত আত্মা কখনও সুপ্ত বা মোহগ্রস্ত হন না। নিদ্রা বা স্বপ্নাদি তারই প্রাকৃতিক বিলাসমাত্র। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় পরিণয় ও জাগ্রতাবস্থায় পরিণয় উভয়ই তুল্য জ্ঞানে মদীয়া কন্যা শশিকলাকে অযোধ্যারাজনন্দন সুদর্শনের হস্তে সম্প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমার কন্যারও তাহাই সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পের বশানুগা হইয়া স্বয়ম্বরসভাতে আগমন করিতে অভিলাষিণী নহে। অপিচ আপনাদিগের নিকট প্রকাশ না করিয়া স্বয়ম্বরব্রতের উপলক্ষের অন্তরালে সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক সুদর্শনকে বরমাল্য প্রদান করিলে আমার কন্যা বা আমার প্রতি আপনাদিগের দ্বেষবুদ্ধি উদ্রিক্ত হইবার কোনও কারণ থাকিত না। কিন্তু ইহা ছলনা। আমি কোনও কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাদৃশ কার্য্যে উপদিষ্ট হইলেও সেই ছলনাবৃত্তির অনুসরণে উৎসুক নহি। বহু ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নৃপসত্তমগণ, আপনারা আমাকে এক্ষণে ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমার বংশানুমোদিত সত্যব্রত, ধর্ম্ম ও রমণীর সতীত্ব মর্য্যাদা রক্ষিত হয়।” এই বলিয়া নরপতি তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলেন।

সভাস্থ সকলেই তাঁহার ভূয়সী সাধুবাদ করিতে লাগিল। অপিচ যুধাজিত প্রমুখ কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত নরপতি তাহার প্রতিবাদপূর্ব্বক কহিলেন ; “মহারাজ আপনার উক্তি যথার্থ হইলেও আপনার সমর্থন করিতে পারিতেছি না। যেহেতু আপনি আমাদিগকে স্বয়ম্বরে আহ্বান করিয়াছেন ; আমরা আপনার কন্যার বিবাহে আমন্ত্রিত হইয়া কুটুম্ব ভাবে আগমন করি নাই। পক্ষান্তরে আপনি আমাদিগের আগমনের পূর্ব্বেই আমাদিগকে নিষেধ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে পারিতেন, তাহাতে ঔদাস্য প্রকাশ করাতে আমাদিগের প্রতি আপনার তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং আপনার কৃত অপমান আমরা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমরা এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত আছি।”

সভাস্থ নৃপতিগণের মধ্যে এবম্বিধ নানাপ্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ নরপতি অবন্তী-রাজ সুবাহুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “রাজন্, এই বিবাহে আপনার পণনির্দ্ধারণ নীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ

ক্ষাত্রিয়রমণীগণ বীর্য্যশুল্কা হওয়াই অতিশ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া থাকেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য আপনার অভিপ্রায় কি? আপনি কাহাকে কন্যাদান করিতে অভিলাষ করিতেছেন? আপনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা ব্যক্ত করুন।'

সুবাহু কহিলেন "আমার কন্যা সুদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছে সুতরাং তাহাকে অপর পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা আমি গহিত বিবেচনা করি। কারণ যে 'মন' মানবগণের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, সেই 'মন' একজনে সমর্পিত হইলে তাহার দেহ অন্যে সমর্পিত হইতে পারে না। তাদৃশ আচরণে ধর্ম্মের গ্লানি আনয়ন করা হয় এবং লোকসকল তাহাতে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সুদর্শনকে যথাবিধি প্রাজাপত্য বিধানে কন্যা সম্প্রদান করাই আমার অভিপ্রেত।

সুবাহুর বক্তব্য শেষ হইলে অবন্তীপতি সুদর্শনকে কহিলেন; হে মহাভাগ রাজনন্দন, এই সভাক্ষেত্রে সকল নৃপতিই স্ব স্ব সৈন্যসামন্তাদিসহ উপস্থিত হইয়াছেন; সকলেই রাজনন্দিনীর নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। তোমার কোনও সেনাবল সহায় নাই, অতএব এস্থলে তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর? তোমার ভ্রাতা শত্রুজিতও রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ লালসায় যুধাজিৎসহ এস্থলে উপস্থিত আছেন, তাঁহার বল অপরিমেয়, বিশেষতঃ তোমার প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ববৈরতাও রহিয়াছে। তোমার সৈন্যাদি নাই বলিয়া প্রকৃত ঘটনা তোমাকে জানাইলাম, এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই কর।"

সুদর্শন কহিলেন "হে নৃপসত্তম! আমার কোষ, দুর্গ, মিত্র, সৈন্যসহায় বা রক্ষক কেহই নাই, এস্থানে স্বয়ম্বর হইবে শুনিয়াই আমি দেবী ভগবতীর আদেশ-ক্রমে এস্থলে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমার কোনও কর্ত্তব্য নাই। হে পার্থিবসত্তমগণ, যুদ্ধে বা জয় পরাজয়ে আমার লজ্জা, ভয়, জিগীষা বা অপমান নাই। যাহা ভবিতব্য তাহাই হইবে; তবে সতী যাহাকে আশ্রয় করেন তাহার পরাজয় হইতে পারে না।"

অবন্তীরাজ কহিলেন, বৎস তোমার বয়ঃস্বল্পতা নিবন্ধন ও তুমি ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া তোমার প্রতি স্বাভাবিক স্নেহের সঞ্চার হইতেছে; এদিকে উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ তোমাকে সংহার করিবার বাসনা করিয়াছেন, তোমার হিতার্থেই এই সকল কথা বলিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় তাহাই কর।"

সুদর্শন কহিলেন "হে মাননীয় নৃপসত্তমগণ, আপনারা সুহৃদ্ভাবে কৃপা করিয়া অতি সদুপদেশই দিয়াছেন। পরন্তু এই স্থাবরজঙ্গমময় অখিল জগৎ দৈবের অধীন; কোন প্রাণীই আত্মবশ নহে; সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের বশতাপন্ন।

সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম, কাল ও স্বভাব দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। সময় উপস্থিত না হইলে কেহই কাহাকেও বিনষ্ট করিতে পারে না। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অতি সামান্য কারণেও জীবের পঞ্চত্ব লাভ ঘটিয়া থাকে; অকালে মহা বিপদেও তাহার কিছুই হয় না। সুতরাং তথাকথিত উপলক্ষীভূত কোন জীব বা কিছু হইতেই আমি ভীত নহি, সকলের নিয়ন্ত্রী বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতির লীলাবশেই সকল সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। আমার এই ব্যক্তিজীবনের সুখ দুঃখাদি সকলই আমার কর্ম্মজনিত সেই স্বকর্ম্ম বহু ভোগেই বা আমার দুঃখ কি? বিশাল বিশ্বের কিছুই যখন বিশ্বেশ্বর ছাড়া নহে; সেস্থলে কে কাহার অনিষ্ট বা ইষ্ট করিতে পারে? নিয়ন্তার ইচ্ছারূপিণী মহাদেবী যাহা করিবেন তাহাই হইবে।” এবম্বিধ কথোপকথনের পর সেই দিনের সভাভঙ্গ হইল।

ভগবান্ মরীচিমালী যখন সন্ধ্যা সহচরীর কর গ্রহণপূর্ব্বক যামিনীর মন্দিরদ্বারে পদার্পণ করিতেছিলেন, যখন পৃথিবীর যাবতীয় জীবকুলের নানা গ্রামে তাঁহার এই নবসম্মিলনের অভিনন্দনগীতি ধ্বনিত হইতেছিল সেই পুণ্যময়ী প্রদোষলগ্নে কাশীরাজপুরে সুতহিবুক যোগে উচ্চ নহবৎশিরে নানাবিধ বাদিত্র সংযোগে সাহানা রাগিণী বাজিয়া উঠিল। সেই ধ্বনির সহিত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের আরাত্রিক শব্দ ও বৈদিকগণের সামরবের যুগপৎ সম্মিলনে এক অভিনব আনন্দস্রোত বিশ্বের চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ বিশ্বের পদতল স্পর্শ করিয়াও বিশ্বেশ্বরের আনন্দধারা বিশ্বক্ষেত্রে বিকিরিত হইয়া বিশ্বে ও বিশ্বেশ্বরে, জীবে ও ব্রহ্মে, প্রকৃতি ও পুরুষে এক মহামিলনের ঘন আনন্দময় উচ্ছ্বাস সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দময় প্রবাহে নিপতিত কাশীরাজভবনে আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ কিয়ৎকালের জন্য দ্বেষ ও বিজিগীষাদি ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিনিচয়ের কবল হইতে বিমুক্ত হইয়া সুবাহুনন্দিনীর বিবাহসভায় সম্মিলিত হইলেন ও সকলেই নবদম্পতিকে যথোপযুক্ত আশীর্ব্বাদ ও যৌতুকাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলেন। কাশীপতিও তাঁহাদের প্রত্যেককে ধন, বস্ত্র ও ভোগ্যাদি দ্বারা যথোপচারে অর্চ্চিত করিয়া বিদায় করিলেন। নৃপতিবৃন্দ স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া সুখে রাত্রি যাপন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

পর্য্যায়, ৬ষ্ঠ ভাগ] আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩২৪। [২১ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধীয়

মাসিকপত্র

পন্থার পরঃ কিমন্তৎ

পন্থা

সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ

মহাজনো যেন গতঃ স

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্,
পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ
সহকারি-সম্পাদক।

IMPERIAL LIBRARY CALCUTTA

সূচী।

ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ১... টাকা। [প্রতি সংখ্যা ... আনা।

নিবেদন।

পন্থার সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন পন্থা বাহির হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইল। গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন বর্ত্তমান সময়ে কাগজের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে ও গ্রাহক সংখ্যা কম থাকাতে, পন্থা দুই মাস করিয়া একত্রে বাহির হইবে। আর একটি বিশেষ নিবেদন এই—আপনাদের অনেকের নিকট গত বৎসরের চাঁদা পাওনা আছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিবেন এবং ১৩২৪ সালে অগ্রিম মূল্যের জন্য পরবর্ত্তী মাসে ভি পি করিব। বোধ হয় আপনারা তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

ইতি—

ম্যানেজার।

পন্থার নিয়মাবলী।

১। "পন্থার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সমেত ২্ দুই টাকায়, ভি পিঃতে ২/০ দুই টাকা এক আনা। শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ মূল্যে দেওয়া হয়। এক সংখ্যা নমুনার জন্য ।০ চারি আনা দিতে হইবে।

২। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর সংখ্যা পাইবামাত্র না জানাইলে, আমরা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী নহি।

৩। গ্রাহকগণ পত্রে এবং টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্টরূপে লিখিবেন। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবার জন্য টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা কুপনে "নূতন" এই কথাটি যেন লিখিয়া দেন। গ্রাহকগণ কোন বিষয়ের উত্তরের প্রত্যাশা করিলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৪। "পন্থা"র বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য মলাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেজ মাসিক ৪্ চারি টাকা হিঃ, চতুর্থ পেজ ৫্ পাঁচ টাকা হিঃ এবং অন্যত্র ২৷০ আড়াই টাকা হিসাবে লওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে পত্রিকা প্রচারের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইবে।

৫। "পন্থা"র ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বা দ্বেষভাবাপন্ন প্রবন্ধ গৃহীত হয় না। প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী হইবেন।

৬। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট না পাঠাইলে, তাহা ফেরত দেওয়া হয় না।

৭। "পন্থা" সম্বন্ধীয় টাকা, পত্রাদি, প্রবন্ধ এবং বিনিময়ার্থ পত্রিকা আমার নামে নি লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

"পন্থা" কার্য্যাধ্যক্ষ,

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৬ষ্ঠ ভাগ।] আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩২৪। [৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।

শিবার্চ্চন।

নমি দেব মহাদেব নমি রাঙা পায়
পোড়া হাড় ভস্ম ছাই ও চরণে পায় ঠাঁই
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায়
ভকতবৎসল হর
ভক্তে দিবেন বর
মরতে শিবত্ব মেলে শিব সাধনায়—
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায় ?
দেখিনি কে সুধা ঢাল কালকূট খায়
দেখিনি কে কৃত্তিবাস
শ্মশানে সুখের আশ
ভূত পিশাচের পালে প্রীতি মমতায় !
কার বুকে এত স্নেহ
প্রণয়িনী শবদেহ
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহা তপস্যায় ?
দেখিনি মড়ার হাড়
কে করে গলার হার
কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায় ?

অমৃতান্ন পরিপূর্ণা
কার ঘরে অন্নপূর্ণা
সতীর গরব ভরে কেবা পড়ে পায় ?
কার প্রেমে হেন সাধা
কে দেয় জায়ারে আধা
অর্দ্ধনারীশ্বর কোথা মিলে দেবতায় ?
কুবের ভাণ্ডারী তবু
সুখ সাধ নাহি কভু
বিশ্বপ্রেমে দিশেহারা পাগল-ধরায়
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায় ?
নমি দেব মহাদেব নমি রিপুনাশী
সদানন্দ ভোলানাথ আমি ভালবাসী
অনাসক্ত অনুরাগী
সংসারী সংসারত্যাগী
শ্মশান সুখের বাস, নিত্য স্বর্গবাসী
জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম ভক্তি
মিশামিশি শিব শক্তি
উন্নতি মঙ্গল তাহে নিত্য পাশাপাশি
অনাথ-অধম-পাতা
রাজরাজেশ্বর—তবু ভিখারী উদাসী
সহস্র প্রণাম পায়
স্মরণে নীচত্ব যায়
মৃত দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি
যদিও জানি না ধর্ম্ম
বুঝি না ভকতি মর্ম্ম
তবুও পূজিব প্রভু সাজিয়া সন্ন্যাসী
প্রেমময় মৃত্যুঞ্জ আমি ভালবাসি ॥

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভাগবতের উপদেশ।

—০ঃ০ঃ০—

(মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যার পরে)

গতবৎসরের প্রবন্ধে আমরা পরাবিদ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যার পার্থক্য আছে। বাহ্য ও সর্ব্বভাবের ভিতর একত্ব দর্শনই অপরাবিদ্যার লক্ষণ। তাহাতে একত্ব বুদ্ধির স্ফুরণ হয় বটে; ভেদের কথঞ্চিৎ প্রসমন হয় বটে; কিন্তু তাহাতে ত 'আমির' শান্তি হয় না! মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিজ্ঞান হইলেই'ত দুঃখ শান্তি হয় না! শারীরবিজ্ঞান-সাহায্যে রোগের গতি নির্ণীত ও পরিজ্ঞাত হইলেও ত মৃত্যু অনিবার্য্য! ঐ বিজ্ঞানে'ত 'আমির' স্থান নাই, 'আমির' তৃপ্তি নাই!! অপরাবিদ্যার একত্বের পরিজ্ঞানে চিত্তশুদ্ধি হয় বটে; কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎভাবে আত্মা বা ভগবানের প্রসঙ্গ নাই।

তাহার পরের স্তরে বিদ্যার আবির্ভাবে আত্মা বা ভগবানের প্রতি আকর্ষণ সঞ্জাত হয়। বিদ্যা সর্ব্বাত্মিকা। সর্ব্বের ভিতর 'আত্মভাবের' প্রকাশের নামই বিদ্যা। সাংখ্যমতে প্রকৃতির খেলা যে পুরুষের জন্য এই তত্ত্বটি বিদ্যার পথম স্তর। খেলাও আছে, পুরুষও আছেন। খেলার গতি একরূপ, পুরুষের গতি অন্যরূপ। তবে প্রাকৃতিক খেলা হইতে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সিদ্ধ হয়; ইহাই সাংখ্যের মত। ইহাতে সর্ব্বের ভিতর আত্মভাবের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তা'র পর ভগবান্‌কে ঈশ্বররূপে জানা যায়। প্রাকৃতিক খেলা সমুদয় যে স্বতন্ত্র নহে ও তাহার ভিতর যে একজন ঈশিতা আছেন ইহাই ঐশ্বর্য্য ভাবের মূল তথ্য। সেই ভগবান্ আবার আমার ধ্যেয়, তাঁহার ধ্যান করিলেই তিনি প্রকৃতির ঈশ্বররূপে আমার দুঃখাদি দূর করিবেন; তিনি ঈশ্বর না হইলে'ত দুঃখ দূর হয় না! আর্ত্ত ও অর্থার্থী ভক্তগণ এইরূপে ভগবানের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া ভজনা করেন। আজকাল রাগানুগা ভক্তির যেরূপ চলন—অন্ততঃ কাগজ কলমে, তাহাতে ভগবানের ঈশ্বরত্ব ভাবটি একরকম পরিত্যজ্য হইয়া উঠিয়াছে। আবশ্যক হইলে অন্য লোকের নিকট প্রার্থী হইব, ইষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক উপায়গুলি অবলম্বনে কুণ্ঠিত হইব না; তবু ভগবানের ঈশ্বরত্বের অনুসরণ করিতে পারি না। ভক্তগণ ভুলিয়া যান যে যতক্ষণ

আর্ত্ত ও অর্থার্থী ভাব আছে, যতক্ষণ সুখ দুঃখের প্রপীড়নে চিত্ত আহত হয়, ততক্ষণ রাগানুগা ভক্তি কেবল কথার কথা! কেবল সাম্প্রদায়িক বুকনি মাত্র!

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ গীতা।২।১

হে ভক্ত্যাভিমানি ভক্ত তুমি যে রাগানুগামার্গের সাধনার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ, তুমি কি প্রাকৃতিক খেলায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি বর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছ? প্রকৃতি বা বাহ্য হইতে এখনও কি শিক্ষা করিবার কিছুই নাই? প্রাকৃতিক বিধির বাধন অতিক্রম না করিলে'ত বৈধি ভক্তি ত্যাগ করা যায় না। বিশিষ্ট আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে, অবয়বী ভাব বিসর্জ্জন না করিলে'ত কাম যায় না। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির নামই'ত কাম।

কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত না হইলে'ত রাগানুগামার্গে যাওয়া যায় না! কেহ হয়ত ব্রজগোপীগণের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। ব্রজগোপিকারা জীবন্মুক্ত ছিলেন কিনা? এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু এ কথাটা ঠিক যে তাঁহাদের ভিতর ব্যক্তিগত কোনও কাম ছিল না। তাঁহাদের সমারম্ভ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত। ফলাফলের কথা, জাতিকুলের কথা তাঁহাদের মনে উদয়ই হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের মনে বিচারও ছিল না। তাই ব্রজগোপীর ন্যায় সাধনা করিতে গেলে মন বুদ্ধি পরিত্যাগ করা চাই। এ স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে গোপীগণের চিত্ত ভগবানে আকৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাসলীলার প্রারম্ভে কেহ কেহ'ত ভগবানের অঙ্গসঙ্গ কামনা করিয়াছিলেন! তাঁহারা'ত স্ত্রীসুলভ ভাব একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই! আমাদের বিশ্বাস এই যে রাসলীলা গোপীগণের ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য অভিনীত হয় নাই, উহা কেবল মাত্র ভগবানের মহিমা দেখাইতেই অভিনীত। কুচযুগলে পদস্পর্শের প্রার্থনাভিলাষিণী গোপীগণের যাই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ পস্পর্শ লাভ ঘটিল অমনি তাঁহাদের সমস্ত কাম বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। খেলাটা ভগবানের দিক্ হইতে দেখিতে হইবে। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই চিন্তামণির স্পর্শে গোপীগণ ভগবৎপ্রতিবিম্বত্ব প্রাপ্ত হইল। অহং এ অহং সোঽহং হইল। জীব আপনাকে বিশ্বচৈতন্য বলিয়া জানিল। তাই বুঝি ভাগবত বলিলেন "বালক যেরূপ সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া নিজ প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, ভগবান্ সেই প্রকার রাসলীলা করিলেন।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে তাঁহার নিজ জনকে গোপীভাবের সাধনার কথা বলিয়া-

ছিলেন তাহা'ত মনে মনে আপনাকে শ্রীরূপে কল্পিত করিয়া ভগবানের অঙ্গসঙ্গ লাভের বাসনা নহে। তাঁহার কথার মূল উদ্দেশ্য—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে কহি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

বাঞ্ছা বা ইচ্ছা আছে; ইচ্ছাময়ী যোগমায়ার ক্ষেত্রেই ত রাসলীলা! ইন্দ্রিয়ও আছে, শুধু তাহাই নয় আপন আপন ইন্দ্রিয়প্রীতি কিরূপে হয়, তাহার বোধও আছে; কোথায় ইন্দ্রিয়ের বোধ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের অবসান তাহা না করিয়া ইন্দ্রিয়বুদ্ধি লইয়া সাধনা? আচ্ছা; ইন্দ্রিয়-প্রীতি বোধটী যদি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিতে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে উহার রূপটী কিরূপ হয় বলিতে পার? ঐ বোধটী বাহিরে পরি সমাপ্ত না হইয়া, আমিতে পরিসমাপ্ত হওয়া কোন্ তত্ত্বের খেলা বুঝিতে পার? আমরা বোধমাত্রেই তৃপ্ত হই না। কারণ উহাতে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা নাই। ইন্দ্রিয়রূপিণী নর্ত্তকীগণের সেই রুণুরুণু ঝুনুঝুনু মঞ্জিরা আকুল পিপাসা ত বোধে নাই, তাই ত বোধ লাভ করিয়াও ধ্যানভঙ্গের পর পুনরায় ইন্দ্রিয়গ্রামে আসিতে হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ-স্বরূপ-পুরুষের উপলব্ধি না হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাম রাখিয়া ভগবানের রাসলীলায় যোগ দেওয়া যায় না। কিন্তু ভগবত্তত্ত্বের এমনই মহিমা যে তাঁহার অঙ্গস্পর্শে রমণীসুলভ কাম ও ইন্দ্রিয়গ্রামের ক্রীড়াসমূহ ঐ দেখ কিরূপে তাহাতেই পরিসমাপ্ত হইতেছে! মানুষশরীর ধারণ—যে মানুষশরীর ধারণ করিয়া যোগিগণেরও কখন কখনও মোহপ্রাপ্তি হয়, সেই মানুষশরীর ধারণ করিয়া ভগবান্ লীলা করিলেন; সুললিত মন্মথমোহন শ্রীঅঙ্গের মাধুরী লইয়া আকৃষ্টচিত্ত গোপাঙ্গনাগণ দেখ: শ্রীঅঙ্গ স্পর্শলাভ করিয়াই ধন্যা হইলেন। যতক্ষণ ছোট আমি, যতক্ষণ ছোট আমির অবয়বী ভাব, ততক্ষণ কাম। পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে ত কাম নাই!! আপূর্য্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে ইন্দ্রিয়রূপ সরিৎকুল নিপাতিত হইয়াই সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মন, বুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির উপায় ও সাধনা কর বা না কর, যদি কোনও প্রকারে সেই পরিপূর্ণ পরপুরুষে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গুলিকে নিপাতিত করিতে পার তখনই দেখিবে তাহারাও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কামনার জয় ও সংযম লইয়া মারামারির এত আবশ্যকতা কি? কামকে ছলে, বলে, কৌশলে তাঁহাতে ফেলিয়া দেও, দেখিবে কাম পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে; পরিপূর্ণ পুরুষকে লাভ করিয়া পূর্ণ হইয়াছে। ইহাই ত শ্রীধর স্বামীর উদ্দেশ্য। তিনি যে বলিয়াছেন 'রাস পঞ্চাধ্যায় অনস্মরণ হইয়া

শ্রবণ মনন করিলে কামরূপ হৃদ্রোগ নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া যায়।' তাহাতে কি যমুনার জল, আকাশের চাঁদ, কি ব্রজগোপীদের মহিমা সূচিত হইল? না ইহাই ইঙ্গিত করা হইল যে, ভগবান্ সর্ব্বাত্মক? যাহা কিছু দেখিতেছ, ইন্দ্রিয় কাম প্রভৃতি যতগুলি প্রাকৃতিক ভাব আছে, তাহার সবটাইত ভগবান্। প্রকৃতির আঁটিও নাই, খোষাও নাই; সবটাই সেই ঘন, একরস, পর-পুরুষ!' মহাপ্রভু যে গোপিকাভাবে সাধনার কথা বলিয়াছেন ইহাই তাহার মর্ম্মার্থ। গোপীগণ ভগবান্‌কে ভগবদ্ভাবে (ঐশ্বর্য্য ভাবে) দেখিতেন না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাঁহাদের ভিতর সেই পরপুরুষাভিমুখী এক প্রবৃত্তি ছিল। তাঁহাদের সকল বৃত্তিই, সকল ভাবই সেই ভগবানের দিকে নিরন্তর প্রধাবিত থাকিত। ভগবান্‌ই স্বেচ্ছায় আপনাকে তাঁহাদের বৃত্তিনিচয়ের বিষয় করিয়াছিলেন। গোপিকারা সাধনাদ্বারা ভগবান্‌কে বিষয় করিতে যান নাই। ভগবান্, নাপিতানী, পসারি, দেয়াশিনী, বণিকিনী ও বেদিয়ার বেশ ধরিয়া কিরূপে শ্রীরাধার অন্তঃপুরে তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, চণ্ডীদাস পদাবলীতে তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

এই ভগবানের দুই মূর্ত্তি।—একটী আমিকে লইয়া, আর একটী সর্ব্বকে লইয়া। সর্ব্বের ভিতর তাঁহার প্রকাশ অথবা তাহাতে সর্ব্ব ভাবের আরোপ তাঁহার মায়া শক্তির খেলা এই কিছুই নাই এই যেন সৃষ্টি হইল। যুগের পর যুগ পরিবর্ত্তিত হইল ও অবশেষে এই সমস্ত খেলা লীন হইয়া গেল। এই সমস্ত ব্যাপারটী, মায়াশক্তি বা প্রকৃতির বিলাস। সর্ব্বভাবটী সংরক্ষণ করিয়া কেহ মায়া অতিক্রম করিতে পারেন না। সেই জন্য সমাধিতে এই সর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিতে হয়। "সর্ব্বভাবপরিত্যাগো সমাধিরিতি উচ্যতে।' (পাতঞ্জলদর্শন) সর্ব্বভাবেই আমাদের জীবন। আমরা কয়জন শুধু আমিকে লইয়া থাকিতে পারি। সেই জন্য এই সর্ব্বভাবকে লইয়াই মানবের উন্নতি ও অবনতি। বাহ্য সর্ব্বসমূহে চিত্ত আকৃষ্ট থাকিলে সেই অবস্থা ক্ষিপ্ত ও মূঢ় নামে অভিহিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র এই সর্ব্বভাবগুলিকে একত্বে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। তবে সেই একত্ব ভাবটী শক্তি লইয়া। এক এক জাতীয় শক্তি কতকগুলি বাহ্য সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া প্রকটিত হয়। বিজ্ঞান সর্ব্বোচ্চ স্তরে বস্তু বুঝিতে শক্তিই বুঝে। তাহার নিম্নস্তরে বিন্দু বা কেন্দ্রশক্তির জ্ঞান লইয়াই বিজ্ঞান সন্তুষ্ট। পূর্ব্বে রোগ বলিতে আমরা কতকগুলি শারীরিক পরিণতি ও বিপ্লবের ভাব বুঝিতাম, এখন বিজ্ঞান দেখাইতেছেন

যে রোগের মূলে একটা বিশিষ্ট বীজাণুর খেলা আছে, রোগের অবস্থা বিবর্ত্তনাদি শরীরের অভ্যন্তরে এই বীজাণুর ক্রম অভিব্যক্তি মাত্র। গত শতাব্দীর বিজ্ঞান কেবল দ্রষ্টব্য বিষয়ের বিভিন্ন ভাবসকল লক্ষ্য করত তাহার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞান আর সে ভাবে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যেক অভিব্যক্তির মূলেই বিশেষ ও কেন্দ্ররূপী সত্তার স্থাপনা করেন। কোন্ কোন্ পদার্থে শর্করা মিশ্রিত আছে বিজ্ঞান পূর্ব্বে তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিত ও তাহা দেখিয়াই তৃপ্ত থাকিত; এক্ষণে শর্করাস্বরূপ বিশেষ অণুটিকে জানিতে পারিয়া কয়লা প্রভৃতির ভিতর হইতেও শর্করা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে। জর্ম্মণদেশে এই আধুনিক বিজ্ঞানের সবিশেষ চর্চ্চা ছিল বলিয়াই এই মহাসমরের সময়েও অদ্ভুত উপায়ে প্রয়োজনীয় বস্তু-নিচয় প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতেছেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানে আমাদের আমির কোনও সংস্রব নাই। আর্য্য-বিজ্ঞানের গতি অন্য প্রকার। পাশ্চাত্য জগতে আমিকে বাদ দিয়া গ্রহনিচয়ের গতি প্রভৃতির পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) শাস্ত্রের প্রচলন হইয়াছে, অপিচ আর্য্যগণ আমি-টিকে অবলম্বন করিয়া আছেন বলিয়াই তাহাদের জ্যোতিষ্কমণ্ডল কেবল বাহিরের বস্তু নহে,—তাহারা গ্রহ বা আমিরই বিকাশের ভাবস্বরূপ। এই রূপে আর্য্যমতে বাহ্যবস্তু ও শক্তিমাত্রই 'আমির' বিকাশ ও চৈতন্যময় পদার্থ। এক সময়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহকে বালসুলভ জল্পনা বলিয়া মনে করিতেন। বালক যেমন সর্ব্বত্রই চৈতন্যের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করে, সেই প্রকার শিশু মানবও সর্ব্বত্র চৈতন্যের অভিব্যক্তি দেখিতে পায়। যোগশাস্ত্র এই আর্য্যশাস্ত্রের চৈতন্যের সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণিত করে। যোগী আমিকে লইয়া অন্ত-র্মুখীন হইয়া থাকে। অথচ আমির ভিতরে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সাহায্যে কি উপায়ে বাহ্য ফলসকল আনয়ন করেন শিক্ষিত মহোদয় কি তাহা বুঝিবেন! চৈতন্যের ভাবগুলি কিরূপে বাহ্যজগতে আসিয়া শক্তিমান্ হয় তাহা কি কেহ বুঝিয়াছেন! আজ ইংলণ্ডে কি হইতেছে জানিতে, যোগী আমির ভিতর দিয়া অনুসন্ধান করেন ও চিত্ত স্থির হইলে সমস্ত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পারেন।

অতএব বুঝা গেল যে বুধগণ আবার বিদ্যার ক্ষেত্রেও, সর্ব্বের ক্ষেত্রেও, কেবল বাহ্যভাবে বস্তুশক্তি লইতে চাহেন না। তাঁহারা আমির সহিত

সংশ্লিষ্ট করিয়া বাহিরের সর্ব্বকে চিনিতে ও বুঝিতে পারেন। তাঁহারা বস্তুর বিশেষ অণু না দেখিয়া বস্তুগুলিকে মনস্তত্ত্বের অংশভূত দেখেন। সত্ত্বগুণে যাহা মানসিক ভাব বিশেষ, রজোগুণে তাহাই বিশেষ ইন্দ্রিয় ও শক্তিরূপে ক্রিয়াস্বরূপ। এবং তমোগুণে তাহাই আবার বস্তুরূপে বাহ্য ভাব ধরিয়া প্রকটিত হয়। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোময় ভাব রূপে বাহিরের সর্ব্ব আমির সহিত সংযুক্ত আছে। এই মনোময় ভাবটীকে যখন সর্ব্বাত্মভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তখন উহা দেবতারূপে প্রকাশিত হয়। বসন্ত রোগের মূল কারণ এই রূপেই শীতলাদেবীর অভিব্যক্তি বলিয়া আর্য্যগণ জানিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

"লুকোচুরি।"

(১)

"লুকোচুরি" খেল তুমি,
কাহারে না দেখা দাও,
বারেক তরে "টু" দি'য়ে
কোথা তুমি সরে যাও?

(২)

তোর ছেলে কানা হ'য়ে
"লুকোচুরি" খেলা করে,
বিফল প্রয়াস মোর
তোমারে ধরিতে নারে।

(৩)

চপলার মত তুমি
কর চিদাকাশে খেলা,
ক্ষণেকে আবৃত কর
আঁধারে আলোক মেলা।

(৪)

কভু হৃদি বৃন্দাবনে
বংশী করে গীত গাও,

জীব-আত্মা গোপিকার
　　পরাণ কাড়িয়া লও ।

(৫)

কখন প্রকাশে তব
　　শুভ্র জ্যোতি মনোহর,
কভু দুঃখ শোকরূপে
　　মহামৃত্যু ভয়ঙ্কর ।

(৬)

প্রকাশ ও অপ্রকাশ
　　সকলই তোমারি রূপ,
তুমিত জগত মাঝে
　　অনন্ত অব্যয় ভূপ ।

(৭)

যদি তুমি দূরে থাক
　　কেমনে নিকটে যাব,
কি ক'রে তোমার কাছে
　　প্রাণ খুলে কথা ক'ব ?

(৮)

আর কে শুনিবে কথা
　　সরম মরম গান,
আছো দূরে শুনে মন
　　নিরাশে ডুবি'ছে প্রাণ ।

(৯)

কে বুঝিবে মনোব্যথা
　　কে দিবে সান্ত্বনা বুকে,
পরাণের দুঃখ গীতি
　　কে আছে শুনাবে তাকে ?

(১০)

দয়ার্দ্র থাকিলে কেহ
　　সাথী মোর ধরা মাঝে,

দেখিয়ে যাতনা মোর
এসে ধরা দেয় নিজে।

(১১)

তবে কি এ বনে তব
পশে না করুণ গীতি,
তবে কি আমার হৃদে
ফোটে না তোমার জ্যোতিঃ ?

(১২)

তবে কি দূরেই আছো
আমার নিকটে নাই,
কেমনে তবে গো সখা
কেমনে নাগাল পাই ?

(১৩)

না, না, তুমি আছো কাছে
কে ব'লে দূরেতে থাকো,
ঐ যে মধুর স্বরে—
জগৎ কাঁপায়ে ডাকো।

(১৪)

তুমি আছো দূরে তবে
কেমনে বিশ্বাস হয়,
ঐ যে গাহিছো গান
হৃদয় শুনিতে পায়।

(১৫)

ঐ যে মোর হৃদি মাঝে
বসিয়া বাজাও বাঁশী,
হাসিভরা চাঁদ মুখে
ডাকছ আমারে হাসি।

(১৬)

তোমার মহিমা গায়
অনন্ত জগৎ জুড়ে,

শুধু কি ধরার মাঝে
　　আমিই বেড়াব ঘুরে ?
　　　(১৭)
অখিল জুড়ে সকলে
　　করিছে তোমারি গান,
খালি কি আমার হৃদে
　　বাজিবে বেসুরো তান ?
　　　(১৮)
হে সখা—
জীবনের এই অকিঞ্চন
　　ফলিবে কি কভু মোর,
গাহিতে তোমার নাম
　　হ'বে কি এ প্রাণ ভোর ?
　　　(১৯)
তুমি যে দীনের বন্ধু
　　কৃপাসিন্ধু দয়াময়,
এইবার এসো নাথ
　　এখনো কি অসময় ?
　　　(২০)
মনসাধ মিটে যাক
　　করি পদে প্রণিপাত,
ক্ষণেকের তরে শুধু
　　পশিও হৃদয়ে নাথ!
　　　(২১)
এস নাথ, এস বন্ধু,
　　সময় হয়েছে তার,
ইচ্ছা হলে চ'লে যেও
　　"থাকো" বলিব না আর।
　　　(২২)
বারেক পূজিব পদ
　　ভকতি-কুসুমদামে,

বারেক দাঁড়াও এসে
মোহন মধুর ঠামে।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আত্মানুভূতি।

কত জনমের ব্যর্থতার পরে
খুঁজিয়া পেয়েছি তারে,
আঁধারে আলোকে দ্যুলোকে ভূলোকে
রেখেছিল ঢেকে যারে!
মনে হ'ত যেন কত দূরে সে গো
কি ঘোর আঁধার মাঝে,
রহিয়াছে তার নিজরূপ ঢাকা
কি বিপুল বিশ্বের সাজে।
দূরে সে ত নয় অতি কাছে মোর
চির স্বপ্রকাশ রূপে;
চিনিয়া চিনিনি ফিরিয়া দেখিনি
'সোঽহং' সে বিশ্বভূপে।

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

আকাঙ্ক্ষা।

(১)

কতবার আমি কাঁদিয়াছি ওগো
তোমারে পাবার আশে,
তুমি কই নাথ দেখা ত দাও না
নাও না তোমার পাশে,
এসেছি তোমার দ্বারে কত বার
নিরাশায় বুক ভেঙ্গেছে আমার
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরেছি আবার
বুকভরা দুঃখ-শ্বাসে।

(২)

কতবার আমি ভাবিয়া তোমায়
　　হেরেছি অসীম আকাশে,
ভেবেছি বুঝিবা আছ তুমি নাথ
　　লুকায়ে মেঘেরি পাশে ;
শীতে বসন্তে কত বরষায়
শস্যশ্যামলা বিপুলা ধরায়
আপনা হারায়ে সারাটি বেলায়
　　ফিরিয়াছি দেশে দেশে।

(৩)

কতবার আমি তটিনীর কূলে
　　বসিয়া অলস আবেশে,
ভেবেছি কেন বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
　　চলিয়াছে নদী ভেসে ;
কতশতবার পুলকিত মনে
আছিনু চাহিয়া শ্রান্ত নদী পানে,
ভেবেছিনু তব মুরতি সেখানে
　　নীলে নদী যেথা মেশে।

(৪)

কতশতবার বিজন কাননে
　　উদাস পরাণে বসে,
অদূরে মায়ার মুরতি হেরিয়া
　　উঠেছি কাঁপিয়া তরাসে,
বিজনে মধুর কুহু কুহু স্বর
বাজেনি আমার হৃদয়ের পর
কেবল হৃদয় তোমাতে নির্ভর
　　ছুটেছে অধীর পিয়াসে।

শ্রীসুবিমলচন্দ্র ঘোষ।

উপনিষৎ-চর্চ্চা।

অবতরণিকা।

সত্য সুদীপ্ত জ্ঞানরত্ননিচয়ের অক্ষয় ভাণ্ডার—উপনিষদ্। উপনিষদ্ অপৌরুষেয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ কর্তৃক শিষ্যপরম্পরায় উপদিষ্ট। এই অক্ষয়

গ্রন্থস্বরূপ। ভাণ্ডারস্থিত রত্নের একটী কিরণরেখাই সুদূর প্রসৃত হইয়া, সংহিতা স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি আধারে, বর্ণবৈচিত্র্যে মুগ্ধ করিয়া, সার্ব্বজনীন বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিকে সেই এক সনাতন ভাণ্ডারের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। উপনিষদ্ বহু। তন্মধ্যে দার্শনিক আচার্য্যগণ যে সকল উপনিষৎকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশোপনিষৎ তাহার অন্যতম। ইহাতে মাত্র আঠারটী মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য, উবটার্য্য, শঙ্করানন্দ, আনন্দভট্ট, অনন্তাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহার বিভিন্ন ভাষ্য রহস্য বিবৃতি টীকাদি প্রণয়ন করিয়া অতুলনীয় লোকহিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য উপনিষৎ অপেক্ষা এই ক্ষুদ্রাবয়ব উপনিষদ্‌খানার একটু বিশেষত্ব আছে—ভাব ও ভাষার প্রাঞ্জলতানিবন্ধন অপরাপর উপনিষৎ পাঠে যত সহজে ব্রহ্মোপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভ হয়, ইহার ভাব তদপেক্ষা গহন। অতি অল্পসংখ্যক শব্দ দ্বারা বহুভাব প্রকটিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনাত্মক অবস্থাটীও ইহাতে পরিব্যক্ত। বোধ হয় এই জন্যই পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রায় সকলেই ইহার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে সমধিক যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

এতগুলি ভাষ্য টীকাদির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও আবার নূতন ভাষ্যাদি অবতরণের কি প্রয়োজন? পাঠকবর্গের এই অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে;—

নূতন ভাষ্য কেন? পূজনীয় উপাধ্যায় মহাশয়গণের নিকট অধ্যয়নে, পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যাদির সাহায্যে এবং স্বয়ং যথাশক্তি অনুশীলনেও যখন প্রাণের পিপাসা সম্যক্ নিবৃত্ত হইল না, যখন মনে করিয়াছিলাম—এ দারুণ অসম্ভব তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একবিন্দু স্নিগ্ধবারিও বুঝি এ ধরা মরুতে দুর্ল্লভ, যখন হতাশের উষ্ণ দীর্ঘ-

শ্বাসের সহিত একবিন্দু—বেশী নয় একবিন্দু অশ্রু নয়ন-কোণে আসিয়াছিল, তখন—সেই শুভ মুহূর্ত্তেই, সেই অহৈতুক করুণাসিন্ধু, যিনি উপনিষৎ পাঠ না করিয়া, উপনিষদ্-রহস্য প্রণয়নপূর্ব্বক সন্তপ্ত তৃষিত মরুভূমিসদৃশ প্রাণগুলিকে সত্যের বিমল আলোকে শান্ত স্নিগ্ধ ও সরস করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহার সেই দূরাগত সুমোহন আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করিল। অথবা কবির ভাষায় বলিতে হয়—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"। তারপর—তারপর তাঁহারই অহৈতুক কৃপায়—কৃপায় নহে, অতুলনীয় স্নেহে, জন্ম ও জীবনের সম্পূর্ণ সফলতাসম্পাদক তদীয় শ্রীচরণের ধূলিকণা স্পর্শে ধন্য হইয়া মানবদেহধারী সাক্ষাৎ মহেশ্বরের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত এই উপনিষদ্‌খানির অপূর্ব্ব অথচ সরল ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রাণ যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছে। যে নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ বারিপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যাহার স্পর্শে চিরদিনের সঞ্চিত পিপাসার সম্পূর্ণ উপশম হইয়াছে, সেই আনন্দের—সেই ভূমাসুখের আস্বাদন মাত্র একা করিয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না বলিয়াই—সহৃদয় পিপাসিত পাঠকবর্গের সহিত সমবেত হইয়া, নিস্তরঙ্গ আনন্দের জগৎপ্লাবী সনাতন উচ্ছ্বাস সম্ভোগের জন্যই এই উদ্যম। ইহা পিষ্টপেষণ অথবা আধুনিক আবিষ্কার নহে, দুর্ল্লঙ্ঘ্য বেষ্টনীর মধ্যস্থিত অতি পুরাতন সমুজ্জ্বল রত্নের বহিরানয়ন মাত্র।

উপনিষৎ পাঠে অধিকারী।

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায়—পূর্ব্বাচার্য্যগণ উপনিষৎ পাঠের অধিকারি-নিরূপণপ্রসঙ্গে যে সকল গুণের (১) উল্লেখ করিয়াছেন; তাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন অধিকারী জীবনসঙ্কট কালে দুর্ল্লভ। ফলতঃ আমরা তাদৃশ অধিকারী না হইয়াই উপনিষদ্ অধ্যয়ন করি বলিয়া, ইহার সরল সত্যবাণীসমূহ আমাদের নিকট অরণ্যরোদনবৎ নিষ্ফল হয়। মাত্র বাচনিক জ্ঞানের জন্য উপনিষৎ নহে। ইহার এক একটী বাক্য সত্য সত্যই ব্রহ্মসান্নিধ্য বা ব্রহ্মনিবেশ স্বরূপ। ইহার এক একটী মন্ত্র পাঠমাত্রেই যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণ এক ধ্রুবজ্যোতির সন্ধান পাইয়া আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্তু অনধিকারীর পক্ষে সে আনন্দের আশা কোথায়? তবে কি আমরা উপনিষৎ পাঠ হইতে বিরত থাকিব, এইরূপ সংশয়াপন্ন অবস্থায় দয়া-

(১) গর্ভাধানাদিদশবিধসংস্কারপূত, অধীতবেদ উৎপাদিত পুত্র, যথাশক্ত্যনুষ্ঠিত যজ্ঞ, নিষ্পাপ, নিস্পৃহ, যমনিয়মবান্, অতিথিপূজক, এবং মুমুক্ষু এরূপ ব্যক্তিই উপনিষদ্ পাঠে অধিকারী।

নিধি গুরুদেব অভয় প্রদানচ্ছলে বলিয়াছেন—বর্ত্তমান কালস্রোত যেরূপ খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে ওরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হওয়ার আশা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে। তবে 'স্বল্পাশ্চ কালা বহবশ্চ বিঘ্না যৎ সারভূতম্ তদুপাসিতব্যম।' এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে দেশকালোচিত যতটুকু মাত্র সম্ভব ততটা শুদ্ধপূত হইয়া, "আত্মজ্ঞানই জীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য" এই ধ্রুবলক্ষ্যে চিত্ত স্থির করিয়া যতটা সম্ভব ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলেই বর্ত্তমান কালযোগ্য অধিকারিতা লাভ করা যায়। লক্ষ্য স্থির ও যথাসম্ভব শরণাগত ভাব থাকিলেই উপনিষৎ পাঠের প্রথম অধিকারী হওয়া যায়। অপরাপর গুণগুলি পুনঃপুনঃ ঔপনিষদিক জ্ঞানের অনুশীলনে স্বতঃই লব্ধ হইয়া থাকে। তখনই ইহার প্রত্যেক মন্ত্র, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে যেন কি এক সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয় বলিয়া প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। তখনই উপনিষৎ মাতার ন্যায় পাঠককে স্নেহচুম্বনে কৃতার্থ করিয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে শ্রুতিকে জননীতুল্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বাচনিক জ্ঞানের জন্য অথবা পাণ্ডিত্যাভিমান বৃদ্ধির জন্য উপনিষৎ পাঠ প্রকৃত ফলদায়ক হয় না।

দ্বিতীয়তঃ মানবজীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন বর্ত্তমানকালীয় অভিমত বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান ধর্ম্ম সমস্যা।

অধিকাংশ লোকেই দুর্ধিগম্য বোধে আত্মজ্ঞান লাভের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কারণ আমরা জানি আত্মজ্ঞান লাভ সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক যথারীতি যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন প্রকারে সম্ভবপর নহে। ইদানীং প্রায় সকলেই দুর্ব্বল, অত্যধিক সংসারাসক্ত ও অল্পায়ু, তদুপরি জীবিকা নির্ব্বাহ ও তদুপরি পরিজন ভরণপোষণের চিন্তাতেই সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন, সুতরাং এ কালে এ অবস্থায় আত্মজ্ঞানের অনুশীলন সুদূরপরাহত। এ জগৎ তো স্বপ্নবৎ অলীক মাত্র যতদিন না এই মায়ার ইন্দ্রজাল হইতে মুক্ত হইতে পারিব, যতদিন আমাদের এই বিষয়বাসনা থাকিবে, যতদিন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইব, যতদিন স্ত্রীপুত্রপরিজনের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিতে না পারিব, যতদিন ভোগের আশায় পতঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইব, ততদিন আমাদের পক্ষে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান্ হওয়া অসম্ভব। ও সকল অতি দূরের কথা, অতিশয় উচ্চস্তরীয় সাধনলভ্য, সুতরাং ও সকল আমাদের

জন্য নহে, আমরা বরং তদপেক্ষা জগতে সদ্‌ভাবে বিচরণ করিতে, সত্য কথা বলিতে, যথাসম্ভব দানাদি দ্বারা পরোপকার করিতে, কিংবা কোন লোকহিতকর কার্য্য দ্বারা জগতে যশস্বী হইতে চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, বড় নীরস জ্ঞান, ও সকল আমাদিগের জন্য নহে। কিন্তু এরূপ বলিয়া কি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি। প্রাণের গভীরতম তলদেশ হইতে যে আত্ম-তৃপ্তির ব্রহ্মলিপ্সার মৃদু মৃদু আকর্ষণ অনুভব করি সেই আকর্ষণ যখন অপেক্ষাকৃত একটু প্রবল বেগে আসিতে থাকে তখন স্ব স্ব প্রবৃত্তি-অনুযায়ী কোন না কোন ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া সেই লিপ্সার চরিতার্থ সম্পাদনে যত্নবান্ হই। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে একই বৃক্ষের মূলের দিকে লক্ষ্যশূন্য হইয়া বিভিন্ন শাখাগত পত্রগত পুষ্পগত কিম্বা ফলগত বিভিন্নতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি, মূল হইতে বহুদূরে শাখায় শাখায় বা পত্রে পত্রে বিচরণ করি। কখনও বা স্বকীয় মতের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনোদ্দেশে পার্শ্ববর্ত্তী শাখার প্রতি হিংসাপরায়ণ হইতেও বিমুখ হই না। তাই ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর দ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। কাহাকে পাইবার জন্য, কি লাভ করিবার জন্য উপাসনা করিতেছি, তাহার তত্ত্ব জানা নাই, অথবা জানিবার জন্য প্রয়াসও নাই,— দুর্গাপূজা কি বিষ্ণুপূজা কি শিবপূজা, করিতে হয় তাই করি। দুর্গা কে? শিব কে? বিষ্ণু কে? তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহাকে পূজা করিলে আমি কি ফল প্রাপ্ত হইব? ইত্যাদি তত্ত্ব পরিজ্ঞান নাই, তবে দশ জনে করে আমও করি এইভাবেই বহু লোকের গতি; শাস্ত্রে আছে—"দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ। তাবৎ পূজাং ন মনুতে যাবৎ পরিচয়ো নহি।" অর্থাৎ যাবৎ পর্য্যন্ত দেবতার সহিত পরিচয় না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত পূজাই হয় না। সুতরাং যে পূজা একবার করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয়, আমরা সেই পূজা চিরজীবন একই ভাবে করিয়াও কোনও বিশেষ ফলের অনুভব করিতে পারি না। অবশ্য কর্ম্মমাত্রই ফলের জনক, পূজাদি যে ভাবেই করা হোক তাহাতে যে কিছুই ফল হয় না তাহা নহে। তবে যেরূপ ফল পাওয়া উচিত, তদনুপাতে উহা অতি ন্যূন। এই সকল অনর্থের একমাত্র কারণ মূলের দিকে লক্ষ্যহীনতা। এই লক্ষ্যহীনতা হেতুই আমরা যাহা কিছু বৈধকর্ম্ম—জপপূজাদির অনুষ্ঠান করি, সকলই মরুভূমিতে জল নিক্ষেপের ন্যায় উপযুক্ত ফলপ্রদানে অক্ষম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি একমাত্র আত্ম-জ্ঞানই জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য হইতে চ্যুত হইয়াই আমরা বহুদূরে পড়িয়া আছি বলিয়া পরস্পর স্ব স্ব ধর্ম্ম-

সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা দর্শনে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া থাকি। তাই বলিয়াছিলাম মূল এক, যতই শাখাপ্রশাখা ছাড়িয়া মূলের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, অথবা শাখাপ্রশাখায় উপবিষ্ট হইয়াই মূলের দিকে লক্ষ্য স্থির করা যায়, ততই (সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ) শাখাগত বিভিন্নতা দূরীভূত হয়। কেন আমরা এই মূলের দিক্ হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইলাম? তাহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—সন্ন্যাস অর্থাৎ সংসারবিরক্তি না আসিলে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন অসম্ভব এই জ্ঞান। যতদিন না মিথ্যা সংসারের মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ততদিন আত্মজ্ঞান দুর্ল্লভ। সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন একান্ত অসম্ভব। এই বিরুদ্ধ ধারণাবশতঃই আমরা লক্ষ্যশূন্য।

যে ভারতীয় ঋষিগণ পুত্র পশ্বাদি রক্ষার জন্য, প্রচুর অন্নসম্ভার নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিবার জন্য, যথা সময় পর্জ্জন্য বর্ষণের জন্য, নির্ম্মল পানীয়জলের জন্য, বাত্যাবিদ্যুতাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য, শত্রু বিনাশের জন্য, নিয়ত বৈদিক মন্ত্রদ্বারা ঈশ্বরারাধনা করিতেন। যাঁহারা ফলে ফুলে বৃক্ষে লতায় স্ত্রী-পুত্রে চন্দ্রে সূর্য্যে স্থাবর জঙ্গমে সর্ব্বত্র একই ব্রহ্মসত্তার অদ্ভুত বিকাশ দর্শনে, ভক্তিপ্রণতচিত্তে, বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রাণে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, বাষ্পগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে, মধুর নামধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেন, পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মচর্য্যাই যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের বাহ্যিক অনুষ্ঠান। সন্ন্যাস বা বিষয়বিরতি যেদেশে কদাচিৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর পুত্রাদির প্রতি আশ্রমধর্ম্মরক্ষার ভার অর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইত, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিজন কর্ত্তৃক অধ্যুষিত এই পুণ্যভূমিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে এরূপ উৎকট সংস্কার কোথা হইতে আসিল। কে বলিল—সংসার বন্ধনাগার, কে বলিল—স্ত্রী-পুত্র পরিজন বিষয়বাসনা বন্ধনের শৃঙ্খল মাত্র, কে বলিল—আনন্দ সংসার ত্যাগে, কে বলিল—ঈশ্বরলাভ সন্ন্যাসে, কে বলিল—আত্মজ্ঞান বিষয়নিস্পৃহতায়। এই অমৃতের রাজ্যে এই হলাহলের প্রসার কে করিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, একমাত্র মিথ্যাজ্ঞানই ইহার হেতু। যেদিন হইতে আমরা শিখিলাম, বুঝিলাম না—শুধু মুখে বলিতে শিখিলাম—"জগৎ মিথ্যা", সেই দিন হইতেই এই বিষম বিষতরুর সৃষ্টি; এখন যতই সেই জ্ঞান অস্থিমজ্জাগত হইতেছে ততই এই তরু ফলে ফুলে সুসমৃদ্ধ হইয়া তীব্র বিষজ্বালা বিস্তারে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিকে ত্রিতাপদগ্ধ করিতেছে। আমরাই অমৃতকে গরলে পরিণত করিয়াছি। অথচ সে গরলের হাত হইতে

বৈদিক যুগের অবস্থা।

পরিত্রাণের কোন উপায় রাখি নাই। আমরা জানি স্ত্রীপুত্র সংসার বিষয়-বাসনা ইহাই আমাদের বন্ধন ও বিষবৎ যন্ত্রণাপ্রদ ; কিন্তু উহা মুহূর্ত্তের তরেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদিও দেখা যায় ক্বচিৎ কোন তেজস্বী ভাগ্যবান্ বিষয় পরিহারপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিতেছেন, কিন্তু উহা কদাচিৎ মাত্র, সার্ব্বজনীন সর্ব্বকালিক নহে। আমরা যদি বিষয়কে অমৃত বলিয়া ভোগ করিতে পারিতাম, তবে বাস্তবিকই এই বিষয়,—এই ক্ষুদ্র বিষয়ই আমাদিগকে মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত চিরামৃত ভোগের অধিকার প্রদান করিত। কিন্তু হায়! আমরা যে তাহা করি না, আমরা প্রতিনিয়ত বিষয় ভোগ করি অথচ মুখে বলি ইহা বিষ, মনেও বুঝি ইহা বিষ। সুতরাং অমৃতই বিষরূপে আমাদেরই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। বিষয় যে কল্পতরু! আমরা যাহা বলিব তাহাই পাইব। এই সকল তত্ত্ব উপনিষদে বিশেষতঃ এই ঈশোপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাই লোকলোচনের সন্নিধানে উপস্থিতির জন্য এই প্রয়াস।

বিলুপ্তপ্রায় বর্ণাশ্রমের পুনরুদ্ধারকর্ত্তা, হৃতগৌরব ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞানের অদ্বিতীয় অবতার, অদ্বিতীয় আত্মদর্শী, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য দেবের অমৃতময় অদ্বৈতবাদ হইতে যে এরূপ বিরুদ্ধজ্ঞান সমাজশরীরকে বিক্ষত করিবে ইহা স্বপ্নের অগোচর, ধারণারও অতীত। সেই ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এবং যেরূপ উন্নতস্তরীয় জ্ঞানের পক্ষে জগৎ "মিথ্যা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার রহস্য আমরা জানিলাম না অথবা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না, অথবা তিনি যে অদ্বয়-তত্ত্বে উপনীত হইয়া জগতের পৃথক্ সত্তা দেখিতে পান নাই আমরা সেখানে পৌঁছিলাম না, অথচ জগৎ মিথ্যা জ্ঞানটী মজ্জাগত করিয়া লইলাম। সুতরাং ইহার যে বিষময় পরিণাম তাহাই আমাদের ভোগ্য হইল। অমৃতময় অদ্বৈত জ্ঞান হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া রহিলাম।

অমৃতে বিষ।

এইবার দেখা যাউক, উপনিষদ্ এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন :—

"বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ সত্যং চানৃতঞ্চ, সত্যমভবৎ যদিদং কিঞ্চতৎ সত্যমিতি আচক্ষতে" অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য এবং অনৃত হইলেন, আবার সত্যরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিলেন, সুতরাং যাহা কিছু এই পরিদৃশ্যমান তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া আখ্যাত হয়। এইস্থানে ঐ একটী অনৃতশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অনৃত কিন্তু ঠিক মিথ্যা নহে—ঋতের স্বল্প বিকাশমাত্র অর্থাৎ এক ও মহান্ ঋত,যেখানে

মিথ্যাবাদ নিরাস।

ঈষদ্‌ভাবাপন্ন অর্থাৎ ক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত হইতেছেন তাহাই অনৃত। তবে সাধারণতঃ অনৃত শব্দ মিথ্যা অর্থেই ব্যবহার হয় বটে, তাহা হইলেও ঋষি অনৃতের সঙ্গেই দ্বিতীয় সত্য শব্দের উল্লেখ করিয়া উহাকেই সত্যরূপে ধারণা করিবার ইঙ্গিত করিলেন। পাছে বিন্দুমাত্র মিথ্যাত্বের সংশয় থাকে এই আশঙ্কায় আবার বলিলেনঃ—যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যমিতি আচক্ষতে। শ্রুতি কোথায়ও জগৎকে মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলেন নাই, বরং ইহা সমস্তই ব্রহ্ম এইরূপ বাক্য ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে গিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মশক্তি মায়াকে মিথ্যা বলিয়া পরমাত্মার জাগরণময়ী অবস্থাটীকে পরিহার পূর্ব্বক, কেবলমাত্র নির্গুণ ও নিষ্কল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অবস্থায় জগতের অস্তিত্ব অনুপলব্ধিবশতঃ "জগৎ মিথ্যা" এই জ্ঞানের প্রচার করিয়াছেন। ফলতঃ জগদংশ বাদ দিয়া শুধু নির্গুণাংশ দর্শনহেতু ইহা প্রকৃত অদ্বৈতদর্শন হইল না! পরমাত্মার লীলাবিলাসময় কল্পিত এক চতুর্থাংশ বাদ পড়িয়া গেল। এবং এইরূপ দর্শনই সত্য এবং শেষ দর্শন মনে করিয়া অন্যান্য দর্শনগুলির মত নিরস্ত করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়া, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতে হইয়াছে। এবং এই জগৎও ব্রহ্ম এইরূপ অর্থবোধক শ্রুতিগুলিকে অযথা সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া যাউক "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহার সরলার্থঃ—এই সকল অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নাম-রূপাত্মক জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু ঐরূপ অর্থ করিতে গেলে স্বমত রক্ষিত হয় না বলিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কারণরূপে সত্য, কার্য্যরূপে সত্য নহে। এইরূপ অন্যান্য বহু শ্রুতিবাক্যে কূটার্থ করিতে হয়। কেন তাঁহারা এরূপ কূটার্থ করেন তাহার হেতুস্বরূপ বলিয়া থাকেনঃ—জগৎকে ব্রহ্ম বলিলে অসামঞ্জস্য হয়। ব্রহ্ম অনন্ত, জগৎ সান্ত। ব্রহ্ম চৈতন্য, জগৎ জড়, ব্রহ্ম নির্গুণ জগৎ সগুণ ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় হয় না বলিয়াই ঐরূপ লাক্ষণিক অর্থ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের এযুক্তি অকিঞ্চিৎকর—যিনি ইচ্ছাময়, নিত্য ইচ্ছাস্বরূপ, যিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি বহু হইবার ইচ্ছায় ক্ষুদ্রত্বের সঙ্কল্পে আবদ্ধ হইলে, কেন তিনি ক্ষুদ্র সসীম সগুণ বা জড় হইতে পারিবেন না? এই ক্ষুদ্রত্ব ব্রহ্মে স্বীকার না করিলে তাঁহার পূর্ণত্বে ব্যাঘাত হয়। ব্রহ্মে অভাব কল্পিত হইয়া পড়ে। শ্রুতি বলেন—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং, পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

এস্থলে হয় ত, অদ্বৈতবাদিগণ বলিবেন যে ব্রহ্মের ইচ্ছাময়ত্বই মিথ্যা, কারণ নির্গুণের ইচ্ছা সম্ভবে না, তবে এ জগৎ কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন উহা ব্রহ্মে মিথ্যাভূতা মায়ার অধ্যাস মাত্র। যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় কোন মনুষ্য বাজা হয় ও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু নিদ্রাবসানে তাহার কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না; তদ্রূপ এই জগৎ বস্তুতঃ সত্য নহে, স্বপ্নবৎ তাৎকালিক ব্যবহার মাত্র। তবে এই ব্যবহারটী অনাদি অনির্ব্বচনীয় এবং প্রবাহরূপে নিত্য, কিন্তু পরমার্থতঃ মিথ্যা। কারণ এই বিকার ব্রহ্মে একেবারে অসম্ভব। ব্রহ্ম নির্বিকার, জগৎরূপ বিকার তাহাতে আরোপমাত্র।

এই সকল যুক্তির মূলে শ্রুতিপ্রমাণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদক ত্রিবিধ শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) প্রথম—নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক অর্থাৎ কতকগুলি ব্রহ্মের অবাঙমনোগোচরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। দ্বিতীয়—ব্রহ্মের ইচ্ছাময়ত্ব, জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, অনন্তত্ব, আনন্দময়ত্ব ইত্যাদির বোধক। তৃতীয়—ব্রহ্মের সর্ব্বত্ব অর্থাৎ অসদ্ভাবত্ব, ক্ষুদ্রত্ব ও পরিণামিত্বাদির প্রতিপাদক। এই ত্রিবিধ স্বরূপ দ্বারা ব্রহ্মের তিনটী স্বরূপ পাওয়া যায়,—একটী নির্গুণ, একটী বিরাট সগুণ এবং অপরটী ক্ষুদ্র সগুণ। শ্রীভগবদ্গীতাতেও এই তিনটী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই পুরুষোত্তম অক্ষর এবং ক্ষর নামে অভিহিত হইয়াছেন। একটী জীবস্বরূপ, একটী ব্রহ্মস্বরূপ এবং অপরটী ভাবাতীতস্বরূপ। এই তিনই যখন শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রতিপাদ্য, তখন একটীকে সত্য অপরগুলি মিথ্যা বলা শ্রুতি ও যুক্তির প্রতিকূল। কিন্তু বর্ত্তমান অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের নির্গুণ ও নিষ্কল স্বরূপই একমাত্র সত্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া, অপর শ্রুতিগুলি অর্থাৎ ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ববোধক শ্রুতিগুলির অর্থ সঙ্কোচ করিয়া থাকেন। শ্রুতিনিরপেক্ষর বা এক শ্রুতির দ্বারা অপর শ্রুতির সঙ্কোচ ন্যায়বিরুদ্ধ। পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলি পর্য্যন্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই শ্রুতির বিশেষত্ব এবং ইহাই শ্রুতির গৌরব। কারণ শ্রুতি অপৌরুষেয়। এক স্থলে অতিরাত্র নামক যাগে ষোড়শী নামক পাত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অন্যত্র ঐ যাগে উক্ত ষোড়শী পাত্র গ্রহণের নিষেধ আছে। এরূপ পরস্পর

স্বরূপত্রয়।

---

(১) শ্রুতিবাক্যসমূহ সংস্কৃত ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণবিরুদ্ধ শ্রুতিদ্বয়ের? স্বার্থকতার জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ ষোড়শী পাত্র গ্রহণের বিকল্প বিধান করিয়াছেন। শ্রুতিবাক্যসমূহের এইরূপ অখণ্ড প্রভাববশতঃই একশ্রুতির অনুরোধে অন্যশ্রুতি সঙ্কোচ করা যায় না। ফলতঃ কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে শ্রুতিগুলি পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকও নহে। এই উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যেরই অবিরোধে সামঞ্জস্য হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি জ্ঞানের অল্পতা নিবন্ধন সর্ব্বত্র সকল শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করিতে নাও পারা যায়, তথাপি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ শুধু শ্রুতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত তিনটীই যে ব্রহ্মের স্বরূপ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা আপনাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া জগতে পরিচয় দিতে চাহেন, তাঁহারা নিত্যপ্রত্যক্ষ জীবভাবকে ত মিথ্যা বলেনই, অধিকন্তু স্বাভিমতযুক্তি রক্ষার জন্য ব্রহ্মভাবটী পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিতে বাধ্য হন; অথচ তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈত-দর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন; যদি এক অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরাংশমাত্র দর্শনেও অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থির থাকে তবে সাংখ্যকে দ্বৈতবাদী বলিয়া উপহাস করা কি যুক্তিসঙ্গত! সাংখ্য প্রকৃতি বা জড় অংশ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যাংশকেই ব্রহ্ম বলিলেন, আর অদ্বৈতবাদিগণ জড়ের পরমার্থতঃ সত্বাই স্বীকার করিলেন না। তবে জড় বলিয়া যাহা পরিদৃশ্যমান হয় উহা মায়া, মিথ্যা, ভ্রম; সুতরাং দর্শনের যোগ্য নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ উভয়েই জড় অংশ পরিত্যাগনিবন্ধন দ্বৈতদর্শী হইলেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

যাহা হউক, ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত তিনটী স্বরূপই শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং তাহাতে কোন সংশয় না থাকিলেও যুক্তিদ্বারা সত্যরূপে ধারণা করা যায় কি না, তাহা এইবার আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এস্থলে আমরা একটু ধীরভাবে বিচারমার্গে অগ্রসর হইব। কারণ বিষয় বড় জটিল, কেবল শাব্দজ্ঞানের দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ ধারণাযোগ্য হয় না; সাধক সম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তিই ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। বাক্য এবং মনের অতীত বিষয়কে আমাদের এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির মাপকাটী দিয়া পরিমাণ করিতে গেলে যে, তাহার সম্যক্ জ্ঞান হইবে না ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন তথাপি যতদূর সম্ভব আমরা যুক্তি-দ্বারা এই বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহার সম্যক্ জ্ঞান একমাত্র তিনিই গুরুরূপে আবির্ভূত হইলে এবং জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানান্ধ চক্ষুকে উন্মীলিত করিলেই সম্ভব হইতে পারে, নতুবা নহে।

জগৎস্বরূপ নির্ণয়।

জীব বা জগৎ কি? নাম, রূপ ও ব্যবহার। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নাম, তত্তদ্‌গত বিভিন্নরূপ বা আকার এবং জন্ম, সত্তা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপচয় ও নাশ এই ষড়্‌বিধ বিকার অর্থাৎ ব্যবহার। এই তিন অংশ সমষ্টিভূত হইয়া জীব বা জগৎ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। অতএব যে স্থলে জীব বা জগৎ শব্দ দৃষ্ট হইবে সেই স্থলে মাত্র ঐ তিন অংশের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। চৈতন্যাংশ সম্বন্ধে কোন সংশয় বা কোন দর্শনের সহিত বিপ্রতিপত্তি নাই; যাহা কিছু গোলযোগ, যাহা কিছু সংশয় ঐ জীব বা জড় অংশটুকু লইয়া। এই জীবের উপাদান ও নিমিত্তকারণ সত্য, ইহা অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। কারণ সত্য হইলে, কার্য্য কিরূপে মিথ্যা হয়। বীজ সত্য অথচ বৃক্ষ মিথ্যা এরূপ হয় না। উঁহারা বলেন বাস্তবিক ত কার্য্য কিছুই নাই, সবই কারণরূপে অবস্থিত। তবে কার্য্য বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, উহা অধ্যাস, ভ্রান্তি বা স্বপ্নমাত্র। ভাল কথা—ঐ স্বপ্নবৎ ভ্রান্তি কাহার? ভ্রান্তি ত জ্ঞানবিশেষ, জ্ঞান যখন চৈতন্যের ধর্ম্ম এবং চৈতন্যই যখন ব্রহ্ম, তখন এই ভ্রান্তি ব্রহ্মেরই বলিতে হইবে। কারণ নাম, রূপ ও ব্যবহার রূপ জড়জীবের কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না। তাহা হইলে বলিতে হইল চিন্ময় ব্রহ্ম ভ্রান্ত; ইহা অশ্রদ্ধেয়। তাহার পর ইহাকে মিথ্যাভূতা মায়ার অধ্যাসও বলা যায় না। কারণ মায়া কি? ব্রহ্মের যে বহু হইবার জন্য অনাদি ইচ্ছা, তাহাই মায়া। মায়া ব্রহ্মেরই ইচ্ছা শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতা-নিবন্ধন ব্রহ্ম ও মায়া অভিন্ন। প্রকাশশক্তিবিহীন সূর্য্য এবং দাহিকাশক্তিবিহীন অগ্নির অস্তিত্বই অসম্ভব। সেইরূপ মায়াশক্তিবিহীন ব্রহ্ম থাকিতে পারেন না। এই মায়াকে উপনিষদ্ মিথ্যাভূতা বলেন নাই। বরং ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।* মায়াকে মিথ্যাভূতা বিশেষণে অন্বিত করা অদ্বৈতবাদিগণের স্বকপোলকল্পিত। পক্ষান্তরে তর্কস্থলে মিথ্যা স্বীকার করিলেও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম মায়ার আবরণে আবৃত ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা।

মায়া সত্য ও তাহার দৃষ্টান্ত।

একখণ্ড কাষ্ঠশলাকার অগ্রভাগ অগ্নিসংযুক্ত করিয়া দ্রুতবেগে সঞ্চালিত করিলে একটী বহ্নিরেখা প্রতীত হয়। ঐ বহ্নিরেখাটী বস্তুতঃ রেখা না হইলেও যেমন তৎকালে রেখাবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়া উহাকে মিথ্যা বলা যায় না। ঐ একবিন্দু বহ্নি সুদীর্ঘ রেখারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের এই জীবভাব

* শ্রুতিপ্রমাণ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

নির্গুণস্বরূপ না হইলেও মিথ্যা নহে। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্ম আপনাকে ঐরূপই দর্শন করেন, তাই ক্ষুদ্র, তাই পরিণামী। বহ্নির দৃষ্টান্তে আমরা তিনটী অবস্থা দেখিতে পাই--বহ্নিবিন্দু, দ্রুত সঞ্চালনরূপ ক্রিয়াশক্তি ও রেখা ইহার কোনটীই যেরূপ মিথ্যা নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম তাঁহার শক্তি বা মায়া অথবা ঈশ্বর এবং জীব এই তিনের কোনটীই মিথ্যা নহে। বহ্নিবিন্দু যেরূপ সকল অবস্থাতেই অব্যাহত, ব্রহ্মের নির্গুণ অংশও সেইরূপ সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় অব্যাহত।

জগৎ বাস্তবিক একটী দর্শন মাত্র। শ্রুতি বলেন "স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ তিনি বহুভাব দর্শন করিলেন। এই বহুভাব তাঁহাতেই অব্যক্ত ছিল, আবার লীলাকৈবল্যবশতঃ নিশ্বসিতবৎ স্বতঃ ব্যক্ত হইল। তিনি দৃশ্য এবং দ্রষ্টা হইলেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভিন্নতা নিবন্ধন দ্রষ্টা সত্য অথচ দৃশ্য ভ্রান্তি, ইহা বলা যায় না।

তাহার পর স্বপ্নের দৃষ্টান্তদ্বারা জগতের অলীকত্ব প্রমাণের চেষ্টাও অকিঞ্চিৎকর। স্বপ্নাবস্থায় আমাদের চতুর্দ্দশ করণ মধ্যে মাত্র চারিটী করণ (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার) জাগ্রত থাকে। অপরগুলি সুপ্ত। সেই অবস্থাতেই সেই করণ চতুষ্টয়ের পক্ষে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, জাগ্রদবস্থায় অর্থাৎ সমগ্র চতুর্দ্দশ করণের ক্রিয়াশীল অবস্থায় তাহা অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে। তাহাতে দোষ কি? স্বপ্নাবস্থায় যে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বলিয়া উহা মিথ্যা নহে। স্বপ্নকালীন উহা সত্য ছিল, স্বপ্ন চিরদিনই সত্য। জাগরণ অবস্থায় মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। বস্তুতঃ উহা মিথ্যা নহে।

জগৎ স্বপ্ন নিরাশ।

যাহা কোন না কোন অবস্থায় প্রতীত হয়, তাহাই সত্য। তাহাই ব্রহ্ম। এবং ইহাই পূর্ণ বা সত্য অদ্বৈততত্ত্ব। মিথ্যাই বলিয়াই হউক, ভ্রান্তি বলিয়াই হউক, অথবা জড় বলিয়াই হউক এই পরিদৃশ্যমান্ পরিণামী অংশ বাদ দিলে অদ্বৈতত্ত্ব থাকে না। নির্গুণ অবস্থায় অনন্তত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব প্রতীয়মান হয় না বলিয়া, অনন্ত বা ক্ষুদ্র মিথ্যা নহে। অনুপলব্ধিনিবন্ধন যদি মিথ্যা বলা যায়, তবে অনন্ত বা ক্ষুদ্রাবস্থায় নির্গুণের উপলব্ধি হয় না বলিয়া তাহাকেও মিথ্যা বলিতে হয়। ইহা শুধু দর্শনের তারতম্য মাত্র। যখন ব্রহ্ম আপনাকে বিরাট রূপে দর্শন বা কল্পনা করেন তখন তিনি বিরাট, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, অক্ষর প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যখন ক্ষুদ্ররূপে বা বদ্ধরূপে আপনাকে কল্পনা

বা দর্শন করেন, তখন তিনিই ক্ষুদ্র, জীব, ক্ষর প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। আবার যখন মহত্ত্ব, ক্ষুদ্রত্ব কিছুই দর্শনের অভিলাষী নহেন, তখন তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিকার। যেমন কোন আপ্তকাম মহাপুরুষ স্বীয় একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুগপৎ বহুমূর্ত্তি ধারণ করিতে সমর্থ হন, ইহাও তদ্রূপ।

এইরূপে ব্রহ্মের সকল অবস্থাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, অন্যথা শ্রুতির গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। তবে যে সকল শ্রুতিতে অসৎ, অনৃত এবং অবিদ্যা শব্দের প্রয়োগ আছে সেই সকল স্থলে বুঝিতে হইবে ঈষৎ অর্থে নঞ্‌টী প্রযুক্ত হইয়াছে। (ন+সৎ= অসৎ) যেখানে ঈষৎ রূপে বা ক্ষুদ্ররূপে অবভাষিত তাহাই অসৎ। এইরূপে ঋতের স্বল্প বিকাশই অনৃত এবং বিদ্যা যেখানে স্বল্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অবিদ্যা। এইরূপই শ্রুতির অভিপ্রায়। এ স্থলে নৈয়ায়িকগণ আপত্তি করিতে পারেন, নঞ্‌ এর অভাবার্থেই শক্তি, অন্যত্র লক্ষণা; বাস্তবিক উহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। নঞ এর তৎসাদৃশ্যাদি ছয়টী অর্থই শক্যার্থরূপে পরিগৃহীত। পক্ষান্তরে যদিই বা লক্ষ্যার্থ হয় তবে একটী শব্দের একদেশমাত্র লক্ষণা স্বীকার করিয়া যদি অসংখ্য শ্রুতির সঙ্কোচ বা লক্ষণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তবে উহাতে যথেষ্ট লাঘব আছে। উপনিষদের মন্ত্রসমূহ একটু ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রুতিতে যে সকল স্থলে অসৎ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে উহা মিথ্যা অথবা ভ্রান্তির বোধক নহে। সৎএর ক্ষুদ্র ভাবটী প্রতিপন্ন করাইবার জন্যই অসৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে

অসৎ শব্দের অর্থ।

আর একটী আপত্তি হইতে পারে যে, জীবভাবটীও যদি ব্রহ্মের অন্যতম স্বরূপ হয়; তবে সে স্থলে তাঁহার পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি নাই কেন? স্বরূপ বলিলে সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে অবস্থানটীকেই বুঝা যায়। জীবভাবে ত ব্রহ্মভাব পরিদৃষ্ট হয় না। তবে উহাকে কিরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায়। ইহার উত্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, জীবভাবেও তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হয় নাই, তিনি তখন তাদৃশ ক্ষুদ্র ও পরিণামী রূপেই আপনাকে দর্শন করিতেছেন। তিনি অপরিণামী হইয়াও পরিণামিবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীব বা জগৎ এই যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ এই সকল কিছুই অভিনব সৃষ্টি নহে। একটী দর্শন মাত্র। একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্রত্ব, তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত লীলাবিশেষ। যদি জীবভাবেও তিনি স্বকীয় মহৎ স্বরূপ দর্শন করেন,

জীব কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ।

তাহা হইলে জীবভাবটী কল্পিত হইতেই পারে না। তাঁহার মহৎ স্বরূপটী মনে থাকিলে, এই ক্ষুদ্রত্বের লীলার আনন্দবিলাস সংঘটিত হয় না। তাই তিনি ইচ্ছা করিয়া মহান্ ও চিন্ময় হইয়া, ক্ষুদ্র ও অজ্ঞানের লীলা করিতেছেন। ইহাই তাঁহার আনন্দময় স্বরূপের আনন্দপ্রবাহ। পূর্ণ ও অনন্তের ক্ষুদ্র হইয়া যে কি সুখ, কি আনন্দ, তাহা একমাত্র তিনি অনুভব করিতে পারেন। স্বয়ং রসস্বরূপ অখণ্ডৈকরস হইয়াও বহু রসের আস্বাদনে বিভোর হইবার জন্য এই বহু হইবার ইচ্ছা।

জগৎ আনন্দময়।

এ জগতে কোথাও আনন্দের অভাব নাই, কোথাও আনন্দ আচ্ছাদিত নহে, সর্ব্বত্র এক অসীম আনন্দপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া ক্ষুদ্রাকারে পরিদৃষ্ট হইতেছে মাত্র। কে বলিল—জগৎ দুঃখময়, কে বলিল—জীবত্ব বন্ধনমাত্র। মুগ্ধ জীব। একবার নয়ন উন্মীলিত কর, ঐ দেখ, আনন্দের জ্যোতিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত। হয় ত তুমি বলিবে,—কেন, ঐ যে পুত্রহারা জননী বক্ষে করাঘাত করিয়া শোকসাগরে ভাসিতেছে, ঐ যে পতিহীনা রমণী জগৎ শ্মশান দেখিতেছে, ঐ যে ক্ষুধার্ত্ত জঠরজ্বালায় আত্ম-হত্যা করিতে উদ্যত, এগুলি কি দুঃখের চিত্র নহে! ইহার কোথাও তো আনন্দের কণা মাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? সত্য বটে, এখন তুমি দেখিতেছ উহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু একদিন দেখিবে, উহাই আনন্দময়ের আনন্দোচ্ছ্বাস, ঐ মর্ম্মভেদী হাহাকারই অনন্ত আনন্দের উদ্বেলন মাত্র। একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। রামবনবাস, সীতাহরণ, সতীর বনবাস প্রভৃতি করুণরসোদ্দীপক অভিনয় দর্শনে সহৃদয় দর্শকগণ আকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। সেই রোদনের মধ্যে যদি আনন্দের অনুভূতি না থাকিত তবে ইচ্ছা করিয়া কেন পুনঃপুনঃ ঐরূপ অভিনয় দেখিবার জন্য লালায়িত হয়। অন্যথা তাদৃশ অভিনয়স্থলে না গেলেই ত হয়? কিন্তু তাহা পারা যায় না। ঐ যে কাঁদিয়া, ঐ যে হাহাকার করিয়া শোকের ভাবে, যন্ত্রণার ভাবে আনন্দের অনুভব তাহা ত হয় না। তাই পূর্ণের এই ক্ষুদ্র লীলা। পূর্ণের পূর্ণানন্দ নিত্য, তাহাতে কি আর বিশেষ তৃপ্তি আছে? তাই তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যেন আপনার পূর্ণত্ব বিস্মৃত হইয়া অভাব কল্পনা করিয়া স্বয়ং অভাবগ্রস্ত সাজিয়া অভাব পূরণের অভিনয় করিয়া সেই পূর্ণানন্দেরই প্রবাহ ভোগ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হয়েন, ইহাই তাঁহার জীবভাব। এমন আনন্দের লীলা-বিলাসকে দুঃখের আগার বলিয়া, অমৃতকে বিষ বলিয়া আত্মবঞ্চক হইও না।

যাহা হউক, আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এই জীবভাবই আবার যখন ইচ্ছা করিবে—আমি আর ক্ষুদ্রস্বরূপ দেখিব না, ক্ষুদ্রত্বে মুগ্ধ হইব না, ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় করিব না; আমি আমার মহান্‌স্বরূপে ভূমানন্দে অবস্থান করিব। তখন তিনিই আবার সেই অক্ষর ঈশ্বর, হিরণ্য-গর্ভস্বরূপে অবস্থান করিবেন। তারপর তারপর আবার যখন ইচ্ছা করিবেন আমি আর এ মহান্‌স্বরূপেও অবস্থান করিব না, এ ভাবরঞ্জনাময় অবস্থা আর দর্শন করিব না, তখন তিনি নিরঞ্জন, নির্ব্বিকল্প, অবাঙ্‌-মনোগোচরীভাব প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই তাঁহার পুরুষোত্তমস্বরূপ। আবার এই নির্গুণস্বরূপ হইতে নিঃশ্বসিতবৎ স্বতঃই তাঁহার বিরাটরূপ দর্শনেচ্ছা সঞ্জাত হয়। পুনরায় তাহা হইতে, বহুভাব বা জীবভাব দর্শনের অভিলাষ হইতে পারে। সুতরাং জীব ও জগৎ নিত্য, সত্য ও অনাদি। নির্গুণ যেরূপ নিত্য, সত্য এবং অনাদি, ঈশ্বরত্ব সেইরূপই নিত্য, সত্য ও অনাদি, এবং জীবও নিত্য, সত্য ও অনাদি, ইহার কিছুই মিথ্যা নহে, কোনটীই ভ্রান্তি নহে, শুধু দর্শনের তারতম্য। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত বলিয়া কোন অংশ সত্য, কোন অংশ মিথ্যারূপে প্রতীতি হয় মাত্র।

স্বরূপ ত্রয়ের সামঞ্জস্য।

এই তিনটী অবস্থাই একটী অনির্ব্বচনীয়, মঙ্গলময়ী, মহাশক্তির বিকাশ। আমরা একটী দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টী আরও স্বপ্নরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব—একখানি বস্ত্র, প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলাম, দীর্ঘ, প্রস্থ আকৃতিবিশিষ্ট একটা জিনিস; ইহার নাম বস্ত্র। কিছুদিন বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তারপর মনে হইল দেখি বস্ত্রখানা বাস্তবিক কি জিনিস? দেখিলাম কতগুলি সূক্ষ্ম সূত্র দীর্ঘপ্রস্থে বয়ন করা হইয়াছে মাত্র; এইরূপ সূত্রের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া দেখি বস্ত্র বলিয়া ত কিছু নাই। সূত্রে বা কারণে দৃষ্টি নিপতিত হইলেই বস্ত্র বা কার্য্য আমার জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। বাস্তবিক তখন বস্ত্রত্ব লোপ পায় নাই, বস্ত্র সত্যই রহিয়াছে। কিন্তু আমি আর বস্ত্র বলিয়া দেখিতেছি না। আমি দেখিতেছি না বলিয়া বস্ত্র মিথ্যা নহে। এক অবস্থায় যাহা সত্য, অবস্থান্তরে তাহার সত্তা উপলব্ধি না হইলেও উহা মিথ্যা নহে। এই অবস্থাগুলি জীবকল্পিত নহে, চৈতন্যেরই বা ব্রহ্মেরই কল্পনা। তিনি সত্যসঙ্কল্প, সুতরাং যে অবস্থায় যাহা প্রত্যক্ষ হয় সে অবস্থায় তাহাই সত্য। আমি জীব, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি অথচ আমিই বলিব ইহা মিথ্যা। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে মিথ্যা বলা চলে না। মিথ্যা-জ্ঞান থাকিলে স্বপ্ন হয় না। সুতরাং কোন না

বস্ত্রের দৃষ্টান্ত।

কোন অবস্থায় যাহা সত্যরূপে প্রতীত হয়, তাহা সর্ব্বদাই সত্য। অন্যাবস্থায় উহা অপ্রকটভাবে থাকে। আমি যখন সূত্রাংশ দর্শন করিতেছি, তখন কি বস্ত্রত্ব লোপ পাইয়াছে? তাহা নহে। তখন আমি ঐ অংশ হইতে দর্শনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সূত্রাংশে বিন্যস্ত করিয়াছি মাত্র। তারপর, আর একটু অগ্রসর হইয়া সূত্রগুলির কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিতে পাই—কতগুলি তুলা ঐ সূত্রাকারে পরিণত হইয়াছে। এই তুলাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে তখন সূত্রাংশ পর্য্যন্ত আমার প্রতীতির বহির্ভূত হয়। বস্তুতঃ সূত্রাংশ নিত্যই সূত্ররূপে বিদ্যমান। আমার দৃষ্টির তারতম্যদ্বারা উহার এই তুলা, সূত্র ও বস্ত্ররূপ অবস্থা ত্রয়ের কোনই ব্যাঘাত হয় না। আবার দেখিতে পাই ঐ তিনটী অবস্থা প্রত্যেক অবস্থার ভিতর দিয়া তুলা অংশটী ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত। একমাত্র তুলা ব্যতীত কোথাও কিছু নাই। তুলাই সূত্র, তুলাই বস্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে। তুলার ব্যাঘাত কোথাও হয় নাই। তারপর, শ্রেণীবদ্ধ সজ্জিত তাবটীকে এবং সূত্রগুলিকে খুলিয়া ফেলিলে আর বস্ত্র অথবা সূত্র কিছুই থাকে না, একমাত্র তুলারূপে অবস্থান করে। ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প স্বরূপের উদাহরণ। মাত্র তুলারূপে পরিণত অবস্থায়, আর যে তাহার সূত্র অথবা বস্ত্রভাব পরিগ্রহের যোগ্যতা নাই, ইহা যেমন বলা যায় না, সেইরূপ নির্গুণ, নিরূপাধি ব্রহ্মের যে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্বরূপ উপাধি অসম্ভব, তাহা বলা যায় না।

তাই, এখন দেখিতে পাই, এবং পরমারাধ্য মহেশ্বরের অতুলনীয় করুণায় বুঝিতে পারি, ন্যায় অবধি বেদান্ত পর্য্যন্ত ছয়টী দর্শনের জগৎ এবং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, কোথাও মতের অনৈক্য নাই। কাহারও সত্যদর্শনে ব্যাঘাত হয় নাই। তবে এ বিভিন্ন প্রকার উক্তির একমাত্র কারণ দর্শনের তারতম্য।

ষড়্ দর্শনের সত্য উক্তি।

ব্রহ্মের যে অংশ যে সময়ে জগতে দর্শন করাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সময় তিনি, সেই ব্রহ্ম, সেই জগদ্‌গুরু, সেই সেই দর্শনপ্রণেতা ঋষির হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সেই অংশটুকুমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শন জগতের কর্ত্তারূপে, বৈশেষিক পরমাণুরূপে, সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষরূপে, বেদান্ত সত্য ও মিথ্যারূপে দর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ ইহার প্রত্যেক অবস্থাই সত্য। ন্যায়দর্শনকার সত্যের যে স্তরে থাকিয়া যে অংশ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য দর্শকগণ অন্যস্তর হইতে ব্রহ্মের অপরাপর অংশ দর্শন করিয়াছেন। কেহ বস্ত্র, কেহ সূত্র, কেহ তুলা। কাহারও দর্শন ভ্রমাত্মক নহে।

যদিও দেখা যায় পরবর্ত্তী দর্শনকারগণ পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনের মতসমূহ খণ্ডন করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়াছেন, তথাপি, অদ্যাবধি ছয়টী দর্শনই স্ব স্ব অস্তিত্ব স্থির রাখিতে পারিয়াছে। ইহাও উহাদের প্রত্যেকের সত্যত্বের প্রমাণ। কাল-স্রোত যত খরবেগে প্রবাহিত হয়, সত্য, ধর্ম্ম, যে পরিমাণে গ্লানিযুক্ত হয়, মিথ্যার, অজ্ঞানের করাল-তিমির যে পরিমাণে সত্যের ধ্রুব-জ্যোতিকে পরিম্লান করিতে থাকে, সেই সত্য, সেই ব্রহ্ম, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় মাতৃহারা সন্তানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া আপনার পূর্ণ স্বরূপটী ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে প্রকটিত করিয়া দেন। তাই ধর্ম্মজগতে দেখিতে পাই, যখন যে অংশ গ্লানিযুক্ত হয়, তখন সেই অংশকে সম্যক্ সংশোধিত করিবার জন্য যিনি স্বয়ং জগদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মস্বরূপ সেইরূপ ভাবে প্রকটিত করেন। বর্ত্তমানকালে জগৎ মিথ্যাজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, ধর্ম্ম পূর্ণ-গ্লানিযুক্ত, তাই, সত্যযুগেও বৈদিক, উজ্জ্বল সত্যদর্শনের আলোকে আলোকিত করিবার জন্য তাঁহার এই সত্যলীলা আরম্ভ হইয়াছে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং॥ ১।

প্রভবপ্রলয়ৌ যস্য সত্যং শুদ্ধং সনাতনং।
নমস্তদ্ব্যবহারায় গুরবে জগদাত্মনে॥

সত্য, শুদ্ধ এবং সনাতনই যাহার কারণ, নামরূপব্যবহারাত্মক জগৎ-স্বরূপ সেই পরব্রহ্ম শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

ঈশাবাস্য ইত্যাদি অষ্টাদশ মন্ত্রের মধ্যে প্রথম চতুর্দ্দশ মন্ত্রে, পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধির হেতুভূত ব্যবহারাত্মক জগৎস্বরূপ প্রতিপাদন দ্বারা মুক্তির উপায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট মন্ত্রচতুষ্টয় উদাহরণস্বরূপ সূর্য্যাদির উপাসনা-প্রণালী নির্দ্দেশ দ্বারা মুমুক্ষুব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানরীতি উক্ত হইয়াছে। মুমুক্ষু মাত্রই এই শাস্ত্রে অধিকারী এবং মুক্তিই ইহার ফল।

সরলার্থ---এই পরিদৃশ্যমান জগতে বা ব্রহ্মাণ্ডে জগৎ বলিয়া যাহা কিছু আছে, বা প্রতীত হয়, তাহা সমস্তই ঈশ অর্থাৎ নিয়ন্তা বা পরমেশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয়। সুতরাং বিষয়সমূহ পরমেশ্বরের স্বরূপবিশেষরূপে দর্শন বা জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। এই-রূপে জগতের জগৎ অংশ মাত্রের দর্শন পরিত্যাগ করিয়া তবে জগৎ ভোগ করিবে। কোনও বিষয়েরই তদ্গত ক্ষুদ্রত্ব পরিণামিত্ব কিংবা বিষয়মাত্রের রূপ রসাদিরূপ ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করিও না অর্থাৎ বিষয়ের বিষয়ত্বে মুগ্ধ হইও না।

ব্যাখ্যা—ইহাই মুক্তিমন্দিরের প্রথম সোপান। যাহার প্রাণ মোক্ষ লাভের জন্য লালায়িত হইয়াছে, যাহার প্রাণ কাল্পিত ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া, তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় ব্যাকুল ভাবে সত্যপথের অন্বেষণে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে, যাহার প্রাণ বিষয়কে বিষবোধে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে জগৎ যাহার নিকট ছায়াবাজীর ন্যায় মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে, যাহার প্রাণ জগৎ ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও ধ্রুব সত্যের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে—ঐ শুন তাহার জন্য--কেবল তাহারই জন্য, সেই ধ্রুব সত্য—সেই পরব্রহ্ম ঋষিরূপে গুরুরূপে কি মোহন ঝঙ্কারে বলিতেছেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।" বৎস। কেন ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? এই জগৎ, এই বিষয়, এই নাম ও রূপ, এই ব্যবহার, যাহা কিছু তোমার উপলব্ধি হইতেছে, এ সকলই একমাত্র ঈশিতা নিয়ন্তা পরমাত্মা কর্তৃক পরিব্যাপ্ত, ওতপ্রোত ভাবে একমাত্র তিনিই ইহার অন্তরে ও বাহিরে নিত্য বিদ্যমান। অথবা তিনিই ঐরূপ ক্ষুদ্র হইয়া, ঐ নাম গ্রহণ করিয়া ঐরূপ পরিণামী হইয়া, আজ তোমার চক্ষে মিথ্যা বা ভ্রান্তিরূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন।

কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা, ভ্রান্তি বলিয়া ধারণা করিও না, ইহা যতই ক্ষুদ্র হউক, যতই পরিণামী হউক, ইহা সত্য হইতে উৎপন্ন, সত্যে স্থিত এবং সত্যেই ইহার লয়। শ্রুতি বলেন—"নাসদুৎপদ্যতে" অর্থাৎ অসৎ কখন জন্মে না। এই যে জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জগতের পরিণাম দেখিয়া তুমি ইহা বিষবোধে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, বাস্তবিক উহা বিষ নহে, উহা অমৃত। যাহা তোমার নয়নদ্বয়ের সম্মুখে পতিত হয়, কর্ণদ্বয় যাহা তোমার নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে, নাসিকা যাহা বহন করে, রসনা যাহা আস্বাদন করে, ত্বক্ যাহা অনুভব করে, তাহা সকলই সত্য বলিয়া ধারণা কর। তুমি প্রতিনিয়ত যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের সাহায্যে আত্মসত্তা অনুভব করিতেছ, যতদিন না আত্মায় মহান্ সত্তার উপস্থিত হইতে পার, ততদিন ঐ গুলিকেই পরমেশ্বর বলিয়া ধারণা কর, উহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া পরিগ্রহণ করিতে অভ্যাস কর; বিষয়গুলিকে বিষয়মাত্র না দেখিয়া স্নেহময়ী জননীর স্তন্য বলিয়া উপলব্ধি কর; দেখিবে, এই ক্ষুদ্র, এই পরিণামী বিষয়সমূহ একদিন তোমার সম্মুখে অনন্ত ও নিত্য বিকাশময় রূপে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার ভ্রমস্ত পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিবে। তাই উপনিষদের ঋষি মধুরস্বরে স্নেহময়কণ্ঠে বলিতেছেন, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।" তবে বেদান্তের ভাষ্যে যে জগৎকে মিথ্যা

বা ভ্রান্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তাহা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য নহে। (এ বিষয়ের বিচার অবতরণিকায় সবিশেষ দ্রষ্টব্য) উপনিষদ্ অনেক স্থলে এই পরিণামী জগৎকে অসৎ বলিয়াছেন, তোমরা অসৎ শব্দ কখন মিথ্যা বুঝিও না; তোমরা বুঝিবে, সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম যেখানে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হন তাহাই অসৎ। ব্রহ্ম সৎ, নিত্য অখণ্ড, কিন্তু তিনি যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লীলাবশতঃ বহু ভাব ধারণ করেন অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও পরিণামী রূপে আপনাকে দর্শন করেন তখনই তিনি অসৎপদবাচ্য হইয়া থাকেন। নঞ্‌টী এখানে ঈষদর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অসৎ মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ :—"যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" অর্থাৎ এই জগতে যতটুকুকে তোমরা জগৎ বলিয়া বুঝ। এ স্থলে দুইটী জগৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। একটী অধিকরণবোধক এবং একটী আধেয়বোধক। অধিকরণাত্মক জগৎ আধেয় জগতের কারণস্বরূপ বলিয়া অধিকাংশ দার্শনিকই সৎ বলিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শনকার জগতের কারণকেও জড় বলিয়াছেন বটে। যাহাই হউক, জগতের কারণ সৎই হউক বা অসৎই হউক, তাহাতে যে কার্য্যাত্মক জগৎ উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তই দ্বিতীয় জগৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যঙন্ত গম্ ধাতু হইতে জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন। যাহা পুনঃ পুনঃ বা অতিশয় গমন করে অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল তাহাই জগৎ। সুতরাং কারণাত্মক ও কার্য্যাত্মক এই উভয়বিধ জগৎকে পরমাত্মরূপে দর্শন করিতে হইবে। নাম, রূপ ও ব্যবহার ইহাই কার্য্যাত্মক জগৎ। (এ সকল কথা অবতরণিকায় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।) উক্তরূপ অর্থ না করিলে প্রথম জগৎ শব্দটী প্রায় অনর্থক হইয়া পড়ে। ঐ নাম, রূপ ও ব্যবহার যে, পরমেশ্বরের স্বরূপাবশেষ, এইরূপ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ঋষি জগৎকে জগৎ বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, ত্যাগ করিতে বলেন নাই। যে সকল ভাষ্যকার মিথ্যাত্বনিবন্ধন জগৎ পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা এই মন্ত্রের সরলার্থ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঋষির অভিপ্রায় জগৎ পরিত্যাগ নহে; বরং ভোগ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। সেই জন্যই তৃতীয় প্রতীকে উক্ত হইয়াছে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" অর্থাৎ জগতের জগৎ অংশ বা বিষয়মাত্র জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক জগৎকে ভোগ করিবে। "তেন ত্যক্তেন" ইহার তাৎপর্য্য, এইরূপ ত্যাগ করিয়া। আধুনিক সন্ন্যাসবাদিগণ কিন্তু ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—তেন ত্যক্তেন—জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া। ভুঞ্জীথাঃ—এই স্থলে

পরমাত্মা পদটী অধ্যাহারপূর্ব্বক অর্থ করেন—পরমাত্মাকে পালন করিবে। এইরূপ অর্থে সন্নিহিত জগৎ শব্দ পরিত্যক্ত ও পরমাত্ম শব্দটীর অধ্যাহার করিতে হয় এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহের সরলার্থের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না বলিয়া অনেক স্থলে কূটার্থ করিতে হয়। উপনিষদের ঋষিগণ যে সকল মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন তাহা অতি সরল, শৈশবীয় সত্য জ্ঞানের প্রকাশক। উহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কুটিল পন্থা অবলম্বন করিলে উপনিষদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। একটু প্রণিধান সহকারে পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহের সরলার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই উপনিষদে কর্ম্মত্যাগ অথবা সন্ন্যাস অবলম্বনের আভাসমাত্রও উক্ত হয় নাই। যখন ভারতে শাস্ত্রবহির্ম্মুখ বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্রতকে বৈদিক সন্ন্যাসে পরিণত করা প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন বাধ্য হইয়া ঐরূপ অর্থ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য জ্ঞান, অধ্যয়নজ জ্ঞান নহে। উহা প্রত্যক্ষ্যানুভূত সরল ও সত্যজ্ঞান; সুতরাং যতদূর সম্ভব উহার সরলার্থ গ্রহণ করিতে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

জগৎ যদি পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের স্বরূপই দর্শন হয়, তবে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? পরিত্যাগ করিতে হইলেই বুঝিতে হইবে, সে স্থলে "ঈশাবাস্যং" জ্ঞানের সাধনা হয় নাই, তখনও জগৎকে জগদ্রূপেই দর্শন হইতেছে আর যিনি বিষয়মাত্রকেই আত্মস্বরূপ দর্শনে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনি যাহা দেখিবেন, তাহাতেই তাঁহার আত্মার মহান্ স্বরূপটীই ফুটিয়া উঠিবে। যেরূপ ক্ষুদ্রায়তন প্রতিচিত্র (ফটোগ্রাফ) দর্শনে তৎলক্ষিত পুরুষের দেহাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সংস্থানগুলি মনে পড়িয়া যায়, কিংবা ক্ষুদ্র জলাশয়ে তীরস্থিত মহা মহীরুহের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব দর্শনে সেই বিশালকায় বৃক্ষস্বরূপটীই মনে জাগে. সেইরূপ বিষয় যতই কেন ক্ষুদ্র হউক, যতই কেন পরিণামী হউক, তাঁহার নিকট যিনি "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই জ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন তাঁহার নিকট ঐ ক্ষুদ্র—ঐ পরিণামী বিষয়টিই, এক মহান্ ধ্রুব সত্তার বিকাশ করে; আর তিনি বিষয় বলিয়া কিছু দেখিতে পান না। সর্ব্বত্রই অখণ্ড চিন্ময় সত্তার বিকাশ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। অথবা বিষয়সমূহকেই সেই চিন্ময়ের লীলা বিলাসরূপে দর্শন করিতে করিতে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করিয়া আনন্দঘনের আনন্দপ্রবাহই উপভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, বিষয় ভোগ করেন; বিষয়ের বিষ অংশটুকু মাত্র পরিত্যাগ করিবার জন্যই "তেন ত্যক্তেন" কথাটি বলা হইয়াছে

এবং অমৃতাংশ ভোগ করিবার জন্যই "ভুঞ্জীথাঃ" পদটী প্রয়োগ করিয়া, বিষয় ভোগের বিধান করিয়াছেন। বৈদিক ভাষায় লিঙ্, তব্যাদির প্রয়োগগুলি কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া দেয়। যেরূপ 'সন্ধ্যাং উপাসীত" স্থলে, সন্ধ্যার অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও অকরণে বিধিলঙ্ঘনজন্য প্রত্যবায় প্রতিপন্ন হয়, 'ভুঞ্জীথাঃ' পদটী সেই বিষয় ভোগের অবশ্য কর্ত্তব্যতা ও অকরণে বিধিলঙ্ঘন জন্য প্রত্যবায়ভাগিত্বের সূচনা করিতেছে। হায় মুগ্ধ জীব! কেন বঞ্চিত হইতেছ, একবার চক্ষু উন্মীলন কর! একবার সরল প্রাণে সত্যজ্ঞানে আর্ষ-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পরমাত্মার স্বেচ্ছাকৃত আনন্দময় লীলাবিলাসের ফল অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, সর্ব্বত্র একই আনন্দঘন মূর্ত্তি, বহু ভাবে বহুরূপে বহুদেশে বহুকালে নিত্য বিরাজিত। কোথাও তাঁহার স্বরূপের ব্যাঘাত হয় নাই।

যতদিন না তুমি এরূপ সত্যে এরূপ আর্ষজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগৎ ভোগ করিতে পারিবে, ততদিন তুমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির এবং রসনা থাকিতেও মূক। এরূপ জ্ঞানের অনুশীলন করিতে, কোন কল-কৌশলের প্রয়োজন হয় না, কোনও যৌগিক ক্রিয়া—যম নিয়মাদির আবশ্যক হয় না। শুধু সরলভাবে গুরুবাক্যে ঋষিবাক্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখিয়া জগতের সর্ব্বত্র একই ধ্রুব সত্যদর্শনে অভ্যস্ত হইতে হয়। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম এই জ্ঞানই মুক্তিমন্দিরের প্রথম সোপান। সর্ব্বত্র এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই, বিষয়কে বিষয়মাত্র বলিয়া না বুঝিয়া, উহাকেই পরমাত্মস্বরূপ দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেই ক্রমে মহান্ স্বরূপে উপস্থিত হওয়া যায়, জন্মজন্মান্তরের বন্ধন ঘুচিয়া যায় পূর্ণতার বিমল জ্যোতিতে প্রাণ উদ্ভাসিত হয়। চিরদিনের জন্য সঙ্কোচ বা ধাঁধা কাটিয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রের যেরূপ অর্থ বুঝিতে পারা গেল, চতুর্থ পতীকে, উহারই একটু বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া, ঋষি বলিতেছেন—"মা গৃধঃ কস্য স্বিৎ ধনম্" কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না। এই স্থানের অর্থ একটু রহস্যপূর্ণ। পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রায় সকলেই উহার ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন, কেহ বা 'মা গৃধঃ" শব্দের, "কিছু আকাঙ্ক্ষা করিও না" এইরূপ অর্থ করিয়া শেষাংশের অর্থে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যখন "পরমাত্মা ব্যতীত আর কোন বস্তু নাই, তখন ধন আবার কাহার?" আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে ইহার অর্থ অন্য প্রকার, তাঁহারা বলেন—তিনি (বিষ্ণু) যাহা দেন নাই তাহা

ভোগ করিতে অভিলাষ করিও না ইত্যাদি। যাহা হউক, এই সকলপ্রকার ব্যাখ্যায়ই "কস্য" শব্দের অর্থ "জনস্য" অর্থাৎ কোনও লোকের। জন শব্দটী পূর্ব্বে উক্ত নাই। সর্ব্বনাম শব্দগুলি সর্ব্বদাই পূর্ব্বোল্লিখিত কোন বিশেষ্য পদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। "কস্য" শব্দের অর্থ "জনস্য" করিলে, বিশেষ্যটীর অধ্যাহার করিতে হয়। যে সকল ভাষ্যকার "কস্য" শব্দের অর্থ "নিজের অথবা পরের" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতেও উক্ত দোষ অপরিহার্য্য। দ্বিতীয়তঃ ধন শব্দের এস্থলে টাকা কড়ি রূপ অর্থ করিলে, বালকোচিত অর্থ করা হয়। কারণ এই উপনিষদ্‌প্রতিপাদ্য জ্ঞানের, এক কথায় এই উপনিষদ্ পাঠের অধিকারী নির্ণয়প্রসঙ্গে ভাষ্যকারগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন— যাঁহার দেহ গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার দ্বারা পূত হইয়াছে, যিনি সমগ্র বেদের কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়াছেন, যি'ন পুত্রবান্, যিনি যথাশক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি নিষ্পাপ, যিনি স্পৃহাশূন্য, যিনি যথারীতি যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন, অতিথি পূজাদি দ্বারা যাঁহার পঞ্চসূনাজনিত প্রত্যবায় দূর হইয়াছে, এইরূপ মুমুক্ষু ও বিনীত ব্যক্তিই এই উপনিষদ্‌প্রতিপাদ্য জ্ঞানের অধিকারী। ভাল কথা—এইরূপ ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। এই উপদেশ কি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয় না? যিনি নিস্পৃহ তাঁহাকে ধনাকাঙ্ক্ষা নিবারণ করা কি পিষ্টপেষণ নহে? যে ব্যক্তি উপনিষদ্ পাঠের অধিকারী তাঁহার পক্ষে ধনাকাঙ্ক্ষা নিষেধের উপদেশে কি সার্থকতা আছে? ওরূপ অর্থ করিতে গেলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যেরও অভাব হয়। কিম্‌শব্দ পূর্ব্বোল্লিখিত জগৎ শব্দটীরই অনুকর্ষণ করিয়াছে, সুতরাং উহার অর্থ এইরূপ করিলেই সর্ব্বথা সঙ্গত হয়।

কোন বিষয়েরই ধন ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ তত্তৎ বিষয়মাত্রগত যে ক্ষুদ্রত্ব পরিণামিত্বাদি ব্যবহার কিংবা বিষয়মাত্রের রূপ-রসাদিরূপ ঐশ্বর্য্য তাহা গ্রহণ করিবে না। এই অংশ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "তেন ত্যক্তেন" কথাটীর অর্থই সম্যক্‌ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বিষয়গত ঐশ্ব্য অর্থাৎ বিষয়ত্ব আকাঙ্ক্ষা না করিলেই জগৎ অংশ পরিত্যক্ত হইল। তবে প্রতিনিয়ত পরিশূন্যমান এই বিষয়সমূহকে কিরূপে ভোগ করিবে? পরমাত্মস্বরূপবিশেষ মনে করিয়াই জগৎ ভোগ করিতে হইবে। বিষয়কে সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করিতে গেলে, ত্যাগ ত হয়ই না, বরং সঙ্গই করা হয়। কারণ ত্যাগও আসক্তির ন্যায় সঙ্গবিশেষ, উভয়ই মুক্তির পরিপন্থি। ওরূপ অর্থ করিলে পরবর্ত্তী মন্ত্রে কথিত "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" কথাটীর সহিত সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য হয়।

এইবার এই মন্ত্রপ্রতিপাদ্য সাধনাত্মক অবস্থার পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। একটী কথায় বা সাধনার ভাষায় এই মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়টীকে সত্য প্রতিষ্ঠা বলা হয়। উহার বিশেষ প্রণালী গুরুবক্ত্রগম্য। তবে যতদূর প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহা এস্থলে উল্লেখ করা হইতেছে। যখনই ভগবদ্বিষয়ক ভাব মনে উদিত হইবে, তখন সম্মুখে যে পদার্থই থাকুক না কেন উহাকেই সত্য বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। বৃক্ষ হউক, প্রস্তর হউক, জল হউক, ফুল হউক, ফল হউক যাহাই সম্মুখে পাইবে তাহাকেই সত্য বলিতে হইবে। এবং উহাকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া জগতের কেন্দ্ররূপে ধারণা করিতে হইবে। দিক্‌সমূহ উহা হইতেই প্রসূত, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড উহা হইতেই উৎপন্ন, অনন্ত জ্যোতি ঐ কেন্দ্র হইতেই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, উহাই চৈতন্যস্বরূপ, আমি এই কেন্দ্রে উপস্থিত, অনন্তকোটী জীবন যাঁহার জন্য লালায়িত হইয়াছি, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আজ আমার সম্মুখে এই ক্ষুদ্র বৃক্ষটীরূপে জড়াকারে দণ্ডায়মান ;—এইরূপ ধারণা করিতে করিতে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইতে অভ্যাস করিতে হইবে। এবং উহারই চরণে দীনভাবে শরণাপন্ন হইয়া মহৎস্বরূপ বিকাশের জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতে হইবে। জন্ম ও জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদনের এই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, এইরূপ জ্ঞানে তোমার বলিয়া যাহা আছে, তাহা এই ধ্রুব সত্যের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলে তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তোমার সম্মুখে সুনির্ম্মল, স্নিগ্ধ, আকাশ বিকসিত হইয়াছে, তখন প্রাণের সকল জ্বালা দূর হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি অনুভব করিবে, তোমার সর্ব্ববিধ সন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে। এ সকল তত্ত্ব উপনিষদ্‌রহস্যে বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। কিছুদিন এইরূপ সাধনার অভ্যাস করিলে আর এই জগৎকে জড় বলিয়া অনুভূত হইবে না, ইহাকে মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলিতে পারিবে না।

এইবার আর একটু খুলিয়া বলি। মনই জগৎ। এই বাহিরে যে জগৎ দেখিতেছ বাস্তবিক উহা বাহিরে নহে। বহির্জগৎ হইতে আগত পরমপদের স্পন্দনসমূহ তোমার ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক মনোময় ক্ষেত্রে সঞ্চিত সংস্কারসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। তাহাই তুমি দেখিতেছ; তোমারই মনোময় জগতের ছবি তুমি দেখিতেছ। ঐ সুদূরাবস্থিত সূর্য্য, ঐ দূরত্ব, ঐ ব্যাপ্তি সকলই তোমার মন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বন্দনা।

বন্দি তব চরণ-অঙ্ঘ্রি, দেবদেব হে!

নীরদ নবীন পীত বসন
অধরে মুরলী হে,
মধুর মুরলী হৃদয় আকুলি
বাজিয়া উঠিল হে,
তোমার চরণ হেরিব বলিয়া
এসেছি এখানে হে ॥

কোথায় অন্ত হে অনন্ত
ভুবনজন গায়
চকিত শ্রুতি বিনত অতি
সম্ভ্রমে নমি পায় ॥

কোথায় সেরূপ মনোমোহ রূপ
অতি অপরূপ ভাস বিশ্বে,
ভানুকোটী চন্দ্র দীপকে
তোমার মধুর হাস্যে ॥

নিবিড় নীল নলিন নয়ন
চমকে জ্যোৎস্না গগনে
ঋষি যোগীন্দ্র অমরবৃন্দ
লুণ্ঠিত ওই চরণে ॥

কত না ছন্দে বন্দে নিয়ত
শ্রুতি অনুরাগে,
কত সুপ্ত রাগ লুপ্ত বাক্
প্রেম-পিয়াসে জাগে ॥

সুপ্তির মোহ সন্দেহ তমঃ
নিমেষে যায় মুছি,
অনাদি এক রাজরাজ
জড়িত মহিমারাজি।

ভকত ভ্রমর যাচিছে তোমার
চরণ-নলিন-সঙ্গ,
দেহি চরণ দীনশরণ
বৃন্দারকবন্দ্য ॥

হৃদয়রাজ।

জগৎ ভাল থাকে যদি
আমার ভালোয় পড়ুক বাজ,
তুমি আমার আছ যদি
অন্য ভালোয় নাহি কাজ।
হৃদয়সখা তুমি আমার
তোমায় যদি নাহি ভুলি,
কিসের কষ্ট কিসের ব্যথা
শোকে রোগে জলাঞ্জলি।
হৃদয়সখা তুমি আমার
তোমায় যদি বাসি ভাল,
নাই বা ভালবাসুক কেহ
তা'তে মোর কি এলো গেল !
তোমায় ভালবাসুক সবে
আমায় নাই বা বাসুক কেহ,
আমি তো গো পাচ্ছি সদা
তোমার প্রীতি তোমার স্নেহ।
দুঃখ আসুক মৃত্যু আসুক
যা হবার তা হ'ক না সবই,
তুমি আমার প্রাণের আরাম
প্রাণের মাঝে জেগে আছই।
দুঃখ যাহা পেতে হবে
তা'তে আমি ডরাই নাকো,

দীনের সখা দীনকে যদি
একটু তোমার মনে রাখ।
কত দিনে কত জ্বালা
এই রূপেতে জুড়িয়ে যাব,
তোমার প্রাণে প্রাণটি রেখে
প্রাণের ভাবনা মিটে যাবে।
এ সংসারে পাগল যারা
পাগল আমায় বলে বলুক,
তাদের মুখে দেশ বিদেশে
যতই আমার কুনাম রটুক ;
তুমি আমায় বাস ভাল
ইতেই চিত্ত মেতে আছে,
আর আমি তো ডরাই নাকো
অখ্যাতি তো হয়েই গ্যাছে।
জগৎ জুড়ে কুনাম রটুক
তাতে আমার নাইকো লাজ,
তুমি যে মোর প্রাণের বঁধু
হৃদয়রাজ্যের মহারাজ॥

আর্য্যললনা—অনসূয়া।

পতিসঙ্গিনী—সাধনতৎপরা।

(১)

শতবর্ষব্যাপী দারুণ অনাবৃষ্টি প্রভাবে কামদ কানন প্রায় উৎসন্ন হইয়াছে। গগনমণ্ডল জলকণাবিহীন, অতি শুষ্ক বায়ু কেবল অনল বর্ষণ করিতেছে, নিম্নে ধরণীবক্ষে কূপতরাগাদি খাতের অতি নিম্ন পর্যান্ত ধরণীর মর্ম্মস্থল কঠিন, উষর, শুষ্ক। তৃণলতাগুল্মাদিবিহীন দগ্ধপ্রায় বসুন্ধরাবক্ষে শুষ্কত্বক, শীর্ণ-পত্র, ছায়া-বিরহিত, কঙ্কালসার বনস্পতিকুল দণ্ডায়মান রহিয়া অতীত সুখের দুঃখময় কাহিনী

কীর্ত্তন করিতেছে। গতাসু ও পলায়িতাবশেষ পশুকুল, শুষ্ক পাংশুময় ধরণীপৃষ্ঠে বক্ষ ও বদন ঘর্ষণ করিতে করিতে পিপাসায় দীর্ণ বক্ষে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করত জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। পক্ষিগণ প্রায় গতাসু হইয়াছে, কদাচিৎ কোথাও দুই একটী পাখীর মরণনিনাদ উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডল কম্পিত করিয়া ছিন্নতন্ত্রী বীণার ক্ষীণ ঝঙ্কারের মত কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। রাশি রাশি প্রাণী ও মানবের শুষ্ক শবস্তূপে শিশিরসম্পাতহীনা নৈশ ধরণীর উত্তপ্ত হৃদয়ে হতাশের নীরব মর্ম্মন্তুদ হাহাকার বিরাজ করিতেছে। সমাধিপরায়ণ ঋষিকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন ;—অকালে মহাপ্রলয়ের সূচনা দর্শন করিয়া সকলেই শঙ্কিত।

পদ্মযোনির মানসপুত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি স্বীয় পত্নী সাধ্বী তপশ্চারিণী দয়াবতী অনসূয়ার সহিত এই কাননে তপস্যানিরত ছিলেন। প্রাণিগণের ঈদৃশ নিদারুণ ক্লেশ দর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তাঁহার সাধ্বী পত্নী অনসূয়া পতির পদপ্রান্তে উপবেশনপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন—'প্রভো স্বামিন্, আমি শুনিয়াছি মহাত্মাগণের তপঃপ্রভাবে জীবের সর্ব্ববিধ ক্লেশ দূরীভূত হইতে পারে। অধুনা এই শতবার্ষিকী দারুণ অনাবৃষ্টি প্রভাবে এই দাক্ষিণাত্য প্রদেশ অতিশয় ক্লিষ্ট ; বিশেষতঃ এই সর্ব্বশস্যসম্পদ্‌শালিনী কামদ বনভূমি একেবারে উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে ; জীবকুলের দুঃখদর্শনে প্রাণ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। নাথ! ইহার কি কোন প্রতীকার হইবে না?" মহাত্মা অত্রি সতীর মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "দেবি, যিনি বিশ্বের প্রলয়কারিণী সেই ইচ্ছাময়ী জগদম্বার ইচ্ছাবশেই এই বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে ; তাঁহার বিশ্বে তিনিই সকল সুখ-দুঃখাদি বিধান করিতেছেন। সতি, জগতের যাবতীয় স্ত্রী যাঁহার মূর্ত্তি সেই সতী জননীর হৃদয়স্পন্দন তোমার মর্ম্মস্পর্শ করিয়া যে আকুলতা উদ্বেলিত করিয়াছে—মহামায়ার মায়ানাটকের ঈদৃশ অভিনয় ব্যাপারে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার মত কত ক্ষুদ্র জীবকণা কৃতার্থ হইয়া যায়। দেবী জগদম্বার যাহা ইচ্ছা অবশ্যই তাহা সাধিত হইবে।" এই বলিয়া ঋষি বারত্রয় প্রাণায়াম প্রভাবে স্বীয় আত্মভূত চৈতন্যকে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণাতীত শুদ্ধমতে বিলীন করত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সমাসীন হইলেন। প্রাণিগণের দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে যে ব্যথার উদ্ভব হইয়াছিল উহা পরিশ্রুত হইয়া কাতর প্রার্থনা বা আশিস্‌রূপে বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বরের আত্মবোধে সমাবিষ্ট হইল। যেই বিশ্বাত্মা ভগবানে উৎসৃষ্ট হইয়া সামান্য পিপীলিকারও অপর্য্যাপ্ত শর্করাকণা সহস্র সহস্র মানবের নিদারুণ ক্ষুধা বিনাশের সামর্থ্য লাভ করে, যাঁহার কণ্ঠসংযোগে অরাতিনিক্ষিপ্ত বিশ্বধ্বংসি

ব্রহ্মাস্ত্রে বৈজয়ন্তির শোভা ধারণ করে, হলাহল যাঁহার কণ্ঠাবলম্বনে অমৃতে পর্য্যবসিত হয়—তাঁহার নিকট ভক্তের কাতর প্রার্থনার যে কি অচিন্ত্য মধুময় পরিণতি তাহা কে বলিতে পারে?

মহর্ষি অত্রি সমাধিস্থ হইলে তদীয় বহির্মুখ শিষ্যগণ তাঁহার সাহচর্য্য পরিত্যাগ করত অন্নাভাবে কাতরতা নিবন্ধন স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। পতি-পরায়ণা সাধ্বী অনসূয়া তখন একাকিনী আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে পতির সেবা করিতে লাগিলেন। সতী অনসূয়া পতির পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহে বিশ্বেশ্বরের স্থূল রূপ কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্ববিধ বাহ্য ও মানসোপচারে তাঁহারই অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার পতিদেহেই ভগবান্ পঞ্চানন অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব দিকে সদ্যোজাত মুখ, পশ্চিমে বামদেব, উত্তরে অঘোর, দক্ষিণে তৎপুরুষ, ও উর্দ্ধে ঈশান বিদ্যমান রহিয়াছেন। প্রণয়পুলক গদ্‌গদহৃদয়া অনসূয়া সদ্যোজাত বদনে "নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে সর্ব্বোপচার নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, নৈবেদ্যাদি স্বামীর পরিতুষ্টির নিমিত্ত আবশ্যকীয় উপচাররাশি শিবে সমর্পণ-পূর্ব্বক পতি দেবতার তৃপ্তি বিধান করিলেন। তাঁহার পতিদেবতা সমাধিতে অক্ষুণ্ণভাবে নিরুদ্ধ থাকিয়াও তদ্দত্ত উপচাররাশি দ্বারা তৃপ্ত হইতেছেন দেখিয়া তিনিও পরিতৃপ্ত হইলেন। পতিদেবতার তৃপ্তিনিবন্ধন তাঁহার ক্ষুৎপিপাসাদি বাহ্য বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে এক প্রশান্ত তৃপ্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহার বাহির ও অন্তর ক্রমশঃ একতানবদ্ধ হইয়া ভাসিতে লাগিল। তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার বাহিরে যাহা সর্ব্ব রূপে বিতম্বত রহিয়াছে তাহা তাঁহারই পতিদেবতা, তাহাই শিবের সর্ব্বরূপ! শিবরূপে পতিকে হৃদয়ে ও সর্ব্বরূপে শিবকে বাহিরে দেখিতে পাইয়া আনন্দগদ্‌গদকণ্ঠে অনসূয়া পতিপদে প্রণাম করিলেন ও "সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া নিজের স্থূল দেহভাবকে গন্ধপুষ্পরূপে পতিদেবতারূপী সর্ব্বেশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিলেন; ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বভাব চ্যুত হইয়া গেল,—তাঁহার আমি আর স্থূলদেহে অঙ্গীকৃত রহিল না, তিনি স্থূল দেহ বিস্মৃত হইলেন।

অনন্তর ভূতপতি ভবেশের ঈশান ভাবে দৃষ্টি পতিত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন—জীবে যাহা রস—নিজে যাহা বাসনা—বিশ্বে যাহা জল বা অপ্‌তত্ত্বরূপে বিতম্বত তাহা তাঁহারই পতিদেবতা তাহাই শিবের "ভবরূপ"। নিজের বাসনা কামনাদির একমাত্র পরম সাধন পতিদেবতাকে ভবরূপে জল মূর্ত্তিতে নিরীক্ষণ

করত তাহাতে "ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন ও নিজের বাসনা কামনাদির অতীত ও পতির রসময় মূর্ত্তিতে সঙ্কলিত হইয়া বাসনারূপ চন্দনচর্চ্চিত প্রীতিকুসুমকলিকা "ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া পতিপদে সমর্পণ করিলেন।

সতী অনসূয়া এই প্রকারে বাসনার অতীত হইলে, তিনি পরাভিমুখিনী হইয়া পরমপাবন বিশ্বপতির বৈশ্বানর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পাইলেন ও দেখিলেন যে পতিদেবতা তাঁহার স্বাধিষ্ঠানে সর্ব্ববিধ সুখদাতা অগ্নিরূপে (জঠরাগ্নিরূপেও) বিশ্বেষাং নরাণাং সুখাদেয়ানয়নকর্ত্তা বা নিয়ন্তৃরূপে উত্তরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। দেহ ও বাসনাতীত উত্তরভাগেই বিশ্বনাথের বৈশ্বানররূপে তন্ময়ত্ব লাভ করত দেবী অনসূয়া নিজের সুখাদির নিয়ন্তা পতি-দেবতার পদে "রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহার প্রীতিপ্রবাহে আত্মসমর্পণ করিয়া দেখিতে পাইলেন—তিনি কি এক অভিনব প্রবাহে কোথায় কোন্ ঊর্দ্ধে নীত হইতেছেন। তখন তিনি এই উৎগ্রাহিনী প্রবাহকে পরম গুরু পতিদেবতা রূপে চিনিতে পারিয়া "উগ্রায় বায়ু-মূর্ত্তয়ে নমঃ" মন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের, পতির সহিত শিবের ও বিশ্বের সহিত নিজের অভিন্নতানুভব করত অপরা প্রকৃতির লীলাভূমি বিশ্বক্ষেত্রে পরা বিদ্যার অপরা লীলানিচয়ের মহিমময় বিলাস দর্শন করিতে করিতে পতিদেবতাকে পরদেবতা বোধে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন—তিনিই ভূমা, তিনি সকলের অবকাশ, অবশেষমূত আকাশরূপে বিশ্বে, আত্মা রূপে প্রতিহৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার আমিটী আর কেহই নহে, উহা পতি দেবতারই ছায়া মাত্র! গুরুরূপী দয়ার আধার পতি-দেবতা 'আমি'কেই বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত কাল-কালিন্দীর কূলে পশুপালন-ব্যপদেশে নিবিড় কাননে প্রবেশ করত মোহন বাঁশরী রবে 'আমি'কে আহ্বান করিতেছেন। সেই মোহন বংশীধ্বনি যাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়াছে সে আর কি করিয়া গৃহে থাকিবে। বালির আলি বাঁধিয়া,—কুল, শীল, লাজ, মানের বন্ধনে কি সে আর গৃহে বসিয়া থাকিতে পারে? অনুসূয়াও "পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া তাঁহার অভিসারিণী হইলেন, তাঁহার আর দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাই! জ্ঞানহীনা, পরপদাকৃষ্টচিত্তা দেবী তখন পূর্ণ জ্ঞানানন্দময় পতি-দেবতার শরণাগত হইয়া তাঁহাতেই চরম ও পরম শান্তিলাভ করিলেন; তখন তাঁহাকেই একমাত্র আনন্দকন্দ, চিত্তের পরম বিশ্রাম, মৃত্যুর পরপার, ইহ-

পরকালের সর্ব্বস্ব, সারভূত জানিয়া "মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া আত্ম-সমর্পণ করত তাঁহাতে তন্ময় হইলেন। তখন অনসূয়া দেখিতে পাইলেন—তিনি আর তিনি নাই, তিনি এবং পতিদেবতা এক হইয়া গিয়াছেন; তিনি রশ্মিপতি দেবতা সূর্য্য,—তিনি গন্ধপতি দেবতা পদ্ম,—তিনি দেহপতি আত্মা। তখন সূর্য্যস্বরূপ পতিদেবতার অনুরূপতা প্রাপ্ত হইয়া অনসূয়া তাঁহাকেই "রসো বৈ সঃ" রসময়বিগ্রহ বুঝিতে পারিয়া "ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে" বোধে তাঁহাতে মিশিয়া গেলেন; আত্মাতে আত্মা প্রবিষ্ট হইয়া—সমুদ্রে সরিৎ মিলিত হইয়া—সকল বাহ্য বিক্ষোভবিরহিত অনসূয়া আত্মধ্যানে আত্মরূপে নিমগ্ন রহিলেন। বিশ্ব বাহ্য পতি ও নিজে এক হইয়া এক পূর্ণতম, ঘনতম, আনন্দমাত্র বিরাজিত রহিল। যে আনন্দে বাহ্য নাই অভ্যন্তর নাই—যেই আনন্দে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত একতানবদ্ধ, সেই আনন্দস্বরূপে সর্ব্বদেবতা নিমজ্জিত পিতৃগণ অভিস্নাত, ও তর্পিত, দিক্‌সকল পরিপ্লুত।

তখন সেই আনন্দকন্দ জ্ঞানপ্রবাহ বিমলা আদিগঙ্গারূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া আত্মগতা অনসূয়া দেবীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া প্রকাশ্য মানবস্বরে কহিলেন—"দেবি, সাধ্বি, পতির সহিত ব্যক্ত বিশ্বে ফিরিয়া আইস, জীবকুলের তৃষ্ণাকুলকণ্ঠে শান্তিময় সলিল সিঞ্চন কর বল দেবি, আমি তোমার কি আজ্ঞা পালন করিব?" অনসূয়া তখন ধীর মধুর কণ্ঠে কহিলেন—"দেবি, তুমি কে? তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"

গঙ্গা কহিলেন, "দেবি, আমি গঙ্গা; আমি তোমারই হৃদয়ে শুদ্ধ আত্ম বোধরূপে বাস করি, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমার জন্ম; শ্রীশঙ্কর আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। শুচিস্মিতে, আমি তোমাদিগের আশ্চর্য্য তপস্যা দর্শনে অত্যন্ত প্রীতা হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি। বল সতি, তোমার কোন্ অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া আমার আগমনের সাফল্য বিধান করিব।"

অনসূয়া। দেবি, পতির ইচ্ছা ব্যতীত আমার কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। তিনি এক্ষণে সমাধিস্থ। আমার কোনও অভীষ্টসিদ্ধিই যদি আপনার একান্ত অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে তনয়ার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অবস্থান করুন;—আমার পরম দেবতা জাগরিত হইয়া যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন আপনাকে তাহা পালন করিতে হইবে। এই বলিয়া অনসূয়া পুনর্ব্বার পতিসেবায় অভিনিবিষ্টা হইলেন।

দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মবিত্তম ঋষিপ্রধান অত্রি সমাধিভঙ্গে জাগরিত হইয়া অনসূয়ার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। সাধ্বী অনসূয়া কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গঙ্গাদেবী তাঁহার নিকট প্রকটিত হইয়া কহিলেন "দেবি, এক্ষণে তোমার পতি জাগরিত হইয়াছেন, এখন বল তোমার কোন্ অভীষ্ট সাধন করিব?" অনসূয়া কহিলেন "নারায়ণি, আমার স্বামী পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক জল প্রদান করুন।" গঙ্গাদেবী কহিলেন, "তুমি ভূমধ্যে একটী গর্ত্ত খনন কর, আমি জলরূপে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হই।" তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অনসূয়া অতিসত্বর একটী গর্ত্ত খনন করিলে, গঙ্গাদেবী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলময়ী হইলেন। সেই স্বচ্ছ অনাবিল পানীয় দর্শনে অনসূয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দসহকারে কমণ্ডলুপূর্ণ বারি গ্রহণপূর্ব্বক পতি ও সর্ব্বপ্রাণীর সুখের জন্য কহিলেন "দেবি, যদি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন এবং আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে আমার স্বামীর আগমন পর্য্যন্ত এস্থানে অবস্থান করুন।"

গঙ্গাদেবী কহিলেন "সাধ্বি, তুমি আমার স্বরূপ ও স্বভাব অবগত আছ। বিধাতার বিধানানুসারে কোনও প্রকৃষ্ট তপঃফলাবলম্বন ব্যতিরেকে কোথাও অবস্থান আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি যদি তোমার একমাসকাল তপস্যার ফল দান কর তাহা হইলে আমি এ স্থানে অবস্থান করিতে পারি।" অনসূয়া কহিলেন "দেবি, একমাত্র পতিসেবা ব্যতিরেকে অন্য কোনও ব্রত বা তপস্যার বিষয় আমি অবগত নহি, বিশেষতঃ কোনও ফলাভিসন্ধিনী হইয়াও আমি পতিসেবা করি না। পতির সেবাই আমার স্বভাব ও একমাত্র অভিলষিত। তবে যদি ইহাতে আমার কোনও ফলোদয় হইয়া থাকে তবে আপনি তাহা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করুন।"

দেবী সুরেশ্বরী অনসূয়ার ঈদৃশ অকৈতব পাতিব্রত্য দর্শনে সমধিক আনন্দানুভব করত তাঁহার তপঃফলে পরিতুষ্টা হইয়া তথায় অবস্থিতা হইলেন।

দেবী অনসূয়া সকল দেহধারীর দুর্লভ অমৃতস্বরূপ গঙ্গাম্বু আনয়ন করত স্বামীর অগ্রে সমর্পণ করিলেন ও অবনত বদনে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ঋষিপ্রবর যথাবিধি আচমন করিয়া সেই পুণ্যময় সলিলে দেহান্তরবর্ত্তী বৈশ্বানরের তৃপ্তিবিধানার্থ সেই জল পান করত পরমানন্দ লাভ করিলেন। সেই জলপানে অসামান্য সুখলাভপ্রযুক্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, অহো! নিত্য যে জলপান করি এত সে জল নয়! এই জলপানে চিত্তক্ষেত্র ব্রহ্মানন্দ-

প্রবাহে পুলকিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করত বৃক্ষাদি শুষ্কতর, দিক্ সকল রুক্ষতর অবলোকনপূর্ব্বক পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, বর্ষণ তো হয় নাই!" অনসূয়া উত্তর করিলেন, "না নাথ; বর্ষণ হয় নাই।" ঋষি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কোথা হইতে জল আনয়ন করিলে?" অনসূয়া কহিলেন, "প্রভো, আপনি জল আনিতে আদেশ করিলে আমি কমণ্ডলু গ্রহণ করত জল আনিতে বহির্গমন করিলাম; তখন অনাবৃষ্টির কথা আদৌ আমার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। আশ্রমোপকণ্ঠে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন ও অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। ইতিপূর্ব্বে আপনি যখন সমাধিমগ্ন ছিলেন তখন আমার বোধ হয় ইঁহাকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম ও ইনি বরদানেচ্ছা প্রকাশ করিলে আপনার অনুজ্ঞানুসারে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিব বলিয়াছিলাম। অদ্য আমার প্রার্থনানুসারে তিনি আমার খনিত একটী খাতে প্রবেশ করিয়া জলময়ীরূপে অবস্থিত হইয়াছেন আমি সেই জলগ্রহণ করিয়াছি।"

অত্রি কহিলেন, "দেবি, মহাযোগীদের যাহা সাধ্যায়ত্ত নহে, দেবতাদেরও যাহা অসাধ্য, সেই বিশুদ্ধজ্ঞানপ্রবাহিনী শ্রীহরিপদতরঙ্গিণীর সুধাময় জল কি প্রকারে ভূতলে অবস্থিত হইল তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। সতি, তুমি কি আমায় গঙ্গাদেবীকে দর্শন করাইতে পারিবে?"

অনসূয়া কহিলেন, "স্বামিন্, আপনার ইচ্ছা হইলে আমার সহিত আগমন করুন। দেবী অনতিদূরে এই আশ্রমোপকণ্ঠেই অবস্থিতা আছেন।"

অত্রি। কি বলিলে! এই আশ্রমোকণ্ঠেই অবস্থিতা আছেন? এমন কাহার কি পুণ্যফল অবলম্বনে তিনি এ স্থলে অবস্থিতা হইলেন?"

অনসূয়া। নাথ, আমি কোনও ব্রত বা তপস্যা বা তাহার ফলাদির বিষয় অবগত নহি। আমার অনুরোধক্রমে দেবী আমার একমাস কাল তপস্যানুষ্ঠানের ফলাবলম্বনে এখানে থাকিতে পারেন বলিলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার কোন তপস্যা বা ব্রত আচরণের কথা বা তদর্জ্জিত ফলের বিষয় আমি অবগত নহি। পরিণয়-দিবসাবধি আমি যথাজ্ঞানে স্বামীর প্রিয় সাধনে যত্নবতী আছি। স্বামিসেবাই আমার সকল ব্রত, অনুষ্ঠান বা তপস্যা—যাহা বলিতে হয় বলুন—আমি কোনও ফলাভিসন্ধানেও স্বামিসেবা করি না। যদি আমার কোনও তপস্যা বা তপস্যার ফল আপনার বিদিত থাকে তাহা হইলে আপনি তাহা অবলম্বনে এ স্থানে অবস্থিত থাকিতে পারেন। দেখিলাম গঙ্গাদেবী সেই গর্ত্তমধ্যেই অবস্থিত আছেন।

উভয়ে এই প্রকার কথাবার্ত্তায় সেই জলাশয়সমীপে উপনীত হইলেন; এবং খাতপরিপূর্ণ মনোরম জল দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করত বারম্বার নানাবিধ সুললিত স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ও সেই দুর্লভ গাঙ্গাসলিলে স্নান ও মার্জ্জনাদি করিয়া উভয়ে নিত্যকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন। তাঁহাদিগের নিত্যকর্ম্মাদি সমাপ্ত হইলে গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হইয়া কহিলেন "দেবি, এক্ষণে স্বস্থানে গমন করি; আমায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে অনুমতি কর।" মন্দাকিনীর বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া ঋষিদম্পতি তাঁহার বহু স্তুতিবাদপূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিলেন, "হে সরিদ্বরে, আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া আপনি এই তপোবনে অবস্থান করুন।' তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে গঙ্গা কহিলেন, "বৎসে অনসূয়ে, তুমি যে অদ্ভুত বিদ্যাপ্রভাবে স্বামিরূপে শঙ্করের আরাধনা করিয়া ধূর্জ্জটীর কৃপা লাভের অধিকারিণী হইয়াছ তাহা ভূলোকে কাহারো বিদিত না থাকিলেও ভগবান্ শশাঙ্কশেখর, দেবতা ও পিতৃগণ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন আছেন। তোমাদের দম্পতির আত্মা অভিন্ন হইয়া পরমপুরুষ ভগবানে পর্য্যবস্থিত হইয়াছে; অতএব হে শুচিস্মিতে বরাননে, তোমার বৎসরেক শঙ্করারাধনা ও স্বামিসেবার ফল দান করিলে লোকোপকারের নিমিত্ত আমি তপোবনে অবস্থান করিতে পারি। পতিব্রতে, তুমি তোমার নিজ মাহাত্ম্য সুবিদিত নহ। অপিচ তাহা অবিদিত থাকাই আদর্শ পতিব্রতার শোভন ভূষণ। দেবি, আমি তোমার শুভদ দর্শন লাভের নিমিত্ত এই তপোবনবাসের অভিলাষ করি। পতিব্রতা দর্শনে যে অমিত আনন্দ সঞ্চার হয়, ত্রিভুবনে আর কিছুতেই তাহার তুলনা হয় না। যেহেতু সতীর হৃদয়বৃত্তিসমুদয় নিরন্তর বিশ্বনিয়ন্ত্রী জগন্মাতার সহিত অভেদ। তাঁহার মঙ্গলময়ী চিত্তবৃত্তি দ্বারা তিনি নিয়ত জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। সেই তীর্থভূতা শুচি সতীগণের দর্শনে তীর্থগণেরও পবিত্রতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই পুণ্যদর্শনের লালসা ও লোকোপকারজনিত সুখাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া তপোবনসেবায় আগ্রহান্বিত হইতেছি। অপিচ কোনও সুকর্ম্মফলাবলম্বন ব্যতিরেকে কোথাও স্থির হইয়া থাকা বিধিবিহিত নহে বলিয়াই আমি তাহাতে অশক্ত; সুতরাং দেবি তোমার তপঃফলপ্রভাবে আমাকে আশ্রয় দান কর।"

অনসূয়া কহিলেন, "মাতঃ, আমার তাদৃশ তপ বা ব্রতফলের সংবাদ অবগত নহি। যদি আপনার জ্ঞাতসারে আমার কোনও তপস্যা বা ব্রতফল থাকে আপনি তদবলম্বনে লোকোপকারের নিমিত্ত এই তপোবনে অবস্থিত হউন।"

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে সদাশিব শঙ্কর পার্থিব রূপে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "দেবি, আমি তোমার পতিসেবারূপ ব্রতে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। বৎসে, তোমার যাহা অভিরুচি সেই বর প্রার্থনা কর।"

দেবাদিদেবের অচিন্ত্যরূপ দর্শনে পুলকরোমাঞ্চিতা অনসূয়া বারংবার পতির বদন দর্শন করিতে লাগিলেন, পতিদেহের সহিত শিবতনু অভেদানুভব করত বারংবার প্রণতি করিতে লাগিলেন। মহর্ষি অত্রি পতিব্রতা পত্নীর চিত্তভাব বুঝিতে পারিয়া দেবাদিদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভো, সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! আমাদিগের প্রার্থনা আপনার অবিদিত নাই। তথাপি আপনি প্রসন্ন হইয়া যে বরদানে অভিলাষ করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করাও মাদৃশ ব্যক্তিগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। অপিচ আপনাকে স্বরূপে সাক্ষাৎ দর্শন করাই জীবের পরম সাধন, তদতিরিক্ত জীবের আর কিছু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না। আপনি ও গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হইয়া লোকহিতার্থে এই কামদ বনে বাস করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। হে শঙ্কর, সর্ব্ব প্রকার কাম-ভোগের মধ্যে থাকিয়াও জীবগণ যাহাতে আপনার আনন্দময় স্বরূপের অনুভূতি লাভ করিতে পারে, বাসনা বিক্ষুব্ধ জীবকুল আপনার আনন্দময় সঙ্গচ্যুত না হয়, হে দেব, আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আপনি তাহার বিধান করুন।"

ঋষিবাক্য স্বীকার করিয়া দেবাদিদেব সেই বনে জাহ্নবীর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সংসারের কামদ কাননে যিনি অত্রি ভাবে সমাসক্ত হইয়া আনন্দ-কন্দ দেবাদিদেবের দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই সর্ব্ব কামোপভোগের মধ্যেও "অত্রৈব রমতে হরঃ" মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্রীশ্বরের দর্শনে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তিনি যেমন অনসূয়া কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া দক্ষিণাপথের কামদ বনে, তদ্রূপ এই জরামরণাদিসন্ত্রস্ত মৃত্যুময় দক্ষিণাপথে সংসারের কামভোগাসক্তির মধ্যেও প্রতি কামনার অন্তরালেই অবস্থিত আছেন; অসূয়াবিহীন সরলান্তঃকরণে নিজবোধরূপা গঙ্গার কূলেই অত্রীশ্বররূপে 'অত্রৈব রমতে হরঃ' বলিয়া দৃঢ় প্রতীতির সহিত দেখিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই অনসূয়া দেবীর পতিপূজা ও শিবপূজার লক্ষ্য।

---

(২)

সতীসঙ্গিনী—সিদ্ধা।

সুরপুরে আজ দারুণ বিভীষিকা বিরাজ করিতেছে। দ্যুতিমান্ দেবগণ প্রভাবিরহিত ও ম্রিয়মাণ। বাসব বারংবার সিংহাসনচ্যুত হইয়া ভূমে নিপতিত হইতেছেন। মরুৎ প্রায় গতিহীন,—সদাগতি মাতরিশ্বা শ্লথ মন্দান্দোলনে কেবলমাত্র অস্তিত্বের আভাস জ্ঞাপন করিতেছেন। বৈশ্বানর অতি ক্ষীণতনু হইয়াছেন,—বিশ্ব ও নরে সমানুপাতক সুখদান দূরে থাকুক নিজের অস্তিত্ব রক্ষাও যেন কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ানক অসাড়তা সমস্ত দেবকুলে স্বীয় আধিকার বিস্তার করত তাঁহাদিগকে অতিমাত্র কাতর ও স্বাতন্ত্র্য-বিবর্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। পিতৃলোকের অবস্থা আরো শোচনীয়, স্বধাভুক্ পিতৃগণ স্তব্ধ ও স্তম্ভিত, লেপভুজ্ পিতৃগণের অনেকের দেহ শতধা চূর্ণ বিচূর্ণপ্রায় হইয়া আকাশে মিশিয়া যাইবার প্রয়াস পাইতেছে, আকাশ কাহারও অবকাশ স্বরূপে আত্মদেহ বিস্তারণে অক্ষম বলিয়াই যেন তাহার বিচ্যুতি হইতে পারিতেছে না। তথাপি যে মহাবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া, যে কামবন্ধনের প্রোজ্জ্বল মাহাত্ম্যে জীব জীবিত থাকে ও ইন্দ্রিয়নিকরেও প্রীতি লাভ করিয়া থাকে সেই মহৎ অথচ প্রীতিপদ কামবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। বিশ্ব-দেবগণ নিশ্চেষ্ট জড়বৎ অবস্থিত। গণনায়ক বিনায়কের বাহন মূষা নিদ্রাগত, দেব সেনাপতির বাহন শিখী মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থিত। কুমার মোহাচ্ছন্নের ন্যায় আনন্দময় শিব-শিবার মিলন মাধুরী-স্নাত সিংহাসনতলে অবস্থাপিত রহিয়াছেন। ভূমা সদানন্দময় মহাপুরুষ আনন্দময়ী সতীর সম্মিলনে আত্মহারা সতী সদানন্দের অঙ্কে আত্ম-বিস্মৃতা, উচ্ছ্বাস-বিরহিতা।

আদিদেব পরমাত্মার অহংজ্ঞানপ্রবুদ্ধ রুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছেন. তিনি পর-মাত্মার মিলন-মন্দিরে আত্মস্থ হইবার অভিলাষী। তাঁহার বুদ্ধিতত্ত্ব স্বরূপে ব্যক্তে বিতত্ত্বত বৈকুণ্ঠনাথ পরাভিমুখী হইয়া পরব্যোমাতীত পরমাত্মার আনন্দনিকুঞ্জ-দ্বারে সমাসীন। মানসতত্ত্বরূপ পদ্মযোনি দেবগণ সহ স্তম্ভিত। তিনি বুদ্ধি তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীবিদ্যার আকর্ষণ ব্যক্তিরেকে লয়াভিমুখী হইতে পারিতেছেন না। সুতরাং বাহিরে বিশ্ব প্রকটিত থাকা সত্ত্বেও বিশ্বে বৈশ্বানরে,—রূপে কায়নিকে, মনে বুদ্ধিতে যোগচ্যুতিবশতঃ সকল সম্বন্ধচ্যুত, বৈষম্য-প্রাপ্ত ও বিশৃঙ্খলিতের ন্যায় হইয়া পড়িতেছে। বিশ্বপ্রদক্ষিণপরায়ণা ধরিত্রী দেবী

অন্ধকারে, মোহাবিষ্টার ন্যায় কক্ষাবর্ত্তনে রতা। অপিচ প্রতিমুহূর্ত্তে কক্ষ্যচ্যুতির আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছে, বুঝিবা অদৃষ্টপূর্ব্ব কোনও অপরিচিত পর্য্যটকের প্রতিঘাতে কক্ষচ্যুতা হয়। পার্থিব জীবগণ নৈশ অন্ধকারে সমাবৃত, নিদ্রার মোহাবরণের অন্তরালে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে;—শ্রান্তিহরা নিদ্রা জীবদিগকে দারুণ ক্লান্ত ও কাতর করিয়া তুলিয়াছে। অসময়ে বিশ্বের বিপর্য্যয় উপস্থিত। বিশ্বাত্মা ভগবান্ ভাস্কর বিশ্বকেন্দ্রে উপস্থাপিত হইতে পারিতেছেন না, যেহেতু ছন্দোজননী গায়ত্রী দেবীর অঙ্গীভূতা সতীশিরোমণি কৌশিক-পত্নী আদিত্যের উদরে সম্ভাবিত পতিবিরহ ব্যথায় কাতরা হইয়া নিজের আত্মজ্ঞান পতির আত্মজ্ঞানে নির্ম্মজ্জিত করত বিশ্বজননীর সহিত বিশ্বেশ্বরে সর্ব্ব সমর্পণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাই মরীচিমালীর রশ্মিনিচয় গায়ত্রী ছন্দের অনুপাণনাভাবে শক্তিহীনতানিবন্ধন তাহাকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিতে অক্ষম। গায়ত্রীশক্তির প্রেরণা ব্যতিরেকে ত্রিষ্টুপ্ স্বয়ং স্তব্ধ দেবগণ দ্যুতিহীন অগ্নি, মিত্র ও বরুণাদি দেবতা অপ্রকাশ ও তেজোহীন স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের অবলম্বন স্তম্ভস্বরূপ সূর্য্যের স্তম্ভনে জগৎ স্তম্ভিত। সকলই উৎসন্নাভিমুখে প্রধাবিত।

মহর্ষি মাণ্ডব্য-শাপে সতীশিরোমণি পতিব্রতার পতি কৌশিক সূর্য্যোদয়ে দেহত্যাগরূপ নিয়তির বশতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পতিবিয়োগব্যথা-সহনাক্ষমা পতিব্রতা পতিব্রতা ব্রহ্মশাপনিবন্ধন বিচ্ছেদভয়ে ভীতা হইয়া সতী জননী মহাবিদ্যার চরণতলে একান্ত সমাসক্তচিত্তে নিজ পতির সহিত বিশ্বপতির পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মানসবুদ্ধি বিশ্বেশ্বরীর সহিত সমতানবদ্ধ হইয়া বিশ্বনাথের অনুগত হইয়াছে, জগতের বিশ্বের অবয়বী ভাব—দেবী বৈশারদি মতি—বিশ্বেশ্বরে উপরতা হইতেছেন। কৌশিকভামিনী সর্ব্বান্তঃকরণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে জগতে সকল রমণীই সেই মহাপ্রকৃতির রূপ—পতিতে তৎপরতাই রমণীর একমাত্র ধর্ম্ম। তাঁহার সেই ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবুদ্ধিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে তিনি যদি বাক্কায়মনোবুদ্ধিতে তদ্গতহৃদয়ে আজন্ম পতির সেবায় অনুরতা থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিধি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদায় আস্থাবান্ বিশ্বাত্মা ভগবান্ কখনও তাঁহার বৈধব্যদর্শনে উৎসাহিত হইবেন না। মর্ত্ত্যধামে উদিত হইবেন না। এই মহাসত্যবলে ভগবান্ অংশুমালী উদয়াচলারোহণে অক্ষম। অষ্টাশ্ববাহী অরুণরথের নেমী সঙ্কুচিত ও রুদ্ধ; অশ্বকুল স্খলিতপদে নিপতিত।

কল্পকোবিদ্ ব্রহ্মা জগতের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মোহান্ধকারাচ্ছন্ন ধরণীতে

একটীমাত্র ক্ষীণ আলোকাধারে প্রজ্বলিতশিখা দেখিতে পাইয়া কথঞ্চিৎ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করিলেন। মানবীয় শরীরে একটী মহাপ্রাণ সতীশিরোভূষণ এখনও জাগ্রত দেখিয়া হংসবাহন তাঁহার মানসক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতিপথে বিশ্বকে জাগরিত করিয়া তুলিবার প্রযত্নপরায়ণ হইলেন। মহর্ষি অত্রি-মনোরমা অনসূয়া তখন ব্রহ্মার মানসে বীজভূত বিশ্বচিত্র মসীবিলেপনে সমাচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন—রাজসম্পদহারী চোরগণ সমাধিস্থ মহর্ষি মাণ্ডব্য-সন্নিধানে হৃত ধনরাশি পুঞ্জীকৃত রাখিয়া দূর বনে প্রবেশ করিল। স্থূলদর্শী রাজানুচরগণ চোরজ্ঞানে মহর্ষিকে বন্ধন করত রাজসমীপে আনয়ন করিল। অদূরদর্শী রাজা তাঁহাকে শূলারোপণে শাসিত করিলেন। অপিচ শূল তাঁহার দেহ ভেদ না করাতে শঙ্কিত হইয়া শূলাপনোদনের বহু চেষ্টাতেও বিফলপ্রযত্ন হইলেন এবং তাহাতেও ঋষিপ্রবরের সমাধি ভঙ্গ না হওয়াতে তাঁহার শূলাসন-নিম্নে মঞ্চ নির্ম্মাণ করাইয়া ঋষিদেহ সুসংন্যস্ত করিলেন।

আবার দেখিলেন সূচিভেদ্য অমা রজনীর অন্ধকারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন, আকাশ জলদজালে সমাবৃত, দিগঙ্গনা মেঘনির্ঘোষে কম্পান্বিত। এই দারুণ দুর্য্যোগময়ী রজনীযোগে ঐ কে কোথায় যাইতেছে? ঐ কে? কে এই রমণীমূর্ত্তি? উহার অন্তর-জ্যোতিতে জগন্মণ্ডল উদ্ভাসিত! এই ধরণীর অধিষ্ঠানভূতা সতী-শিরোমণির পৃষ্ঠে ঐ কিসের বোঝা দেখা যাইতেছে? একাকিনী রমণীপৃষ্ঠে বোঝা লইয়া দারুণ রজনীতে কোথায় যাইতেছে? ওঃ ঐ রমণীর পৃষ্ঠে উহার পতি-দেবতার কুষ্ঠরোগবিগলিত দেহাভ্যন্তরে কামকীটপরিদষ্ট তমসাচ্ছন্ন হীনাদপিহীন ঘৃণিত মানসমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এ কি? এই কি এই সতীশিরোমণির পতিদেবতা? ধন্য সতি, সতীকুলে তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা! অহহ! রমণীরত্ন! কুষ্ঠাশ্রিত বিগলিত কদাকার পতির কামতৃষ্ণা পরিতৃপ্তির জন্য তুমি দাসীপণে বেশ্যার সেবা করিতে গিয়াছিলে! মা গো, নারী সব পারে। পতির পরনারী-বিলাস যে রমণী সহিতে পারে না, মা তুমি সানন্দহৃদয়ে তাহাই সাধন করিলে! পতির সুখবাসনার সমীপে আপনাকে বলিদান করিলে! মা তোর পতিপরায়ণতা জগতে দুর্লভ! অনসূয়ে পতিসেবাব্রত শিক্ষা কর; এমন আদর্শ জগতে আর পাইবে না! দেবতারও দুর্লভ!! পতিব্রতার পতির ঐ মৃতপ্রায় দেহ হইতে ও কি শব্দ ফুটিয়া উঠিল!—"পিপাসা! জল!!"—সতী এই বধ্যভূমিতে কোথায় জল পাইবে? দেবী মঞ্চোপরে পতিদেহ রক্ষা করিল; জল আনিতে গমন করিল। কুষ্ঠদেহের স্পর্শে মহর্ষি সমাধিচ্যুত,

শূলবেধবেদনায় কাতর ঋষি কুষ্ঠের বেদনানুভব করিতেছেন। এ কি অভিশাপ! না আশীর্ব্বাদ?—রে কাল কুষ্ঠগ্রাহী, আমার শাপে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার দুঃখময় দেহ বিসর্জ্জিত হউক, ব্যাধিবুদ্ধি বিনষ্ট হউক, শুদ্ধ বুদ্ধি লাভে তুমি নির্ম্মলত লাভ কর!—সতি শোন, শোন! তোমার পতি ব্রহ্ম বাক্যে ঋষিবাক্যে—অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগের জন্য অভিশপ্ত হইয়াছে। দেবি আয়, আর রজনী নাই; মুহূর্ত্তের জন্য পতি-দেহ ত্যাগ করিয়া কি করিলি দেখ! এই যে, এই যে মা আমার স্নেহপরায়ণা মাতার ন্যায় পতি-দেহ অঙ্কে ধারণ করিলেন, কাহাকে স্তনপান করাইবে? উহার আত্মাতে যে ব্রহ্মর্ষি স্বীয় আত্মজ্ঞান আরোপ করিয়াছেন; এলোকে তাহাকে কোথায় পাইবে? সতি, পরধামে ব্রহ্মধামে অনুসন্ধান কর! এই যে মা আমার পতি স্বর্গে প্রবেশ করিল, এই যে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী সতী পতির স্থূল দেহ অঙ্কে ধারণ করিলেন!! সূর্য্যোদয় স্তম্ভিত বিশ্বব্যাপী ব্যাকুলতা ও পদ্মযোনি প্রজাপতি তোমার বিশ্ব যে বিনষ্ট হল!! এমন সময়ে লোকপিতামহ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "দেবী অনসূয়ে, মা, তুমি ভিন্ন এখন আর কে বিশ্ব রক্ষা করে? এই বিশ্বে একমাত্র তুমি স্থূল এবং বিশ্বাতীগ ভাবে প্রবুদ্ধ আছ; মাগো ত্রিজগতের কল্যাণার্থে সতী-শিরোমণিকে জগতে লইয়া আইস। মা আত্রেয়ি, লোকমাতা হইয়া ত্রিলোক রক্ষা কর। পদ্মযোনির অনুরোধ ও বিশ্বের মঙ্গল উদ্দেশ্যে পতিপদ হৃদয়ে ধারণ করত দেবী অনসূয়া স্থূলদেহে পতিব্রতা সমীপে আগমন করিলেন।

তখন অত্রিবনিতা দেবী অনসূয়া পতিব্রতা পতির পুনর্জ্জীবন ও অহোরাত্রের পুনঃসংস্থাপনে সঙ্কল্পবদ্ধা হইয়া ধ্যানযোগে পতিব্রতা-সদনে গমন করত করুণ ও জগতের হিতকর মধুর বাক্যে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন "কল্যাণি, মাণ্ডব্যশাপে পতিবিয়োগভাবনায় কাতরা হইয়া পতির জীবনাশায় সূর্য্যোদয়ের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছ! ভগ্নি, আদিত্যের অনুদয়ে বিশ্ব ধ্বংসপথে উপনীত হইতেছে; লোকগণ মহা ব্যথিত হইতেছে। সতি, এক্ষণে ইহার কি ব্যবস্থা করিবে?"

পতিব্রতা কহিলেন,—"দেবি, আমি অতি দীনা রমণী। আমি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিছুই জানি না। আমার পতিকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানি। ইনিই আমার ইহকাল, পরকাল। ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কোথাও থাকিতে পারিব না। যদি শমনসদনে যাইতে হয় আমিও ইহার সহিত গমনে প্রস্তুত আছি।

যখন যেখানেই কেন থাকি না ইনিই আমার প্রভু; আমি ইঁহার দাসী। ইঁহা ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না।

অনসূয়া। ভগ্নি, তোমার অলোকসামান্য পাতিব্রত্যে জগৎ মুগ্ধ। আমি রমণী, রমণীর মর্ম্মবার্ত্তা কথঞ্চিৎ অবগত আছি। সতী কখনও পতিবিরহিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। সখি ভগ্নি, বিশ্বের মঙ্গলোদ্দেশ্যে ক্ষণকালের জন্য ইহাকে তুমি পরিত্যাগ কর, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাধিবিহীন নবকলেবর লাভ করিয়া ইনি পুনরাগত হইবেন। ইনি অতি সদাশয় ও সুচরিত্রবান্ হইবেন। দেবি, তোমার মত সাধ্বীর পুরস্কারের নিমিত্তই ব্রহ্মর্ষি-সত্তম মাণ্ডব্য ব্রহ্মশাপচ্ছলে এই মহামহিমময় ভগবৎকৃপা প্রদর্শনের সুগম পন্থা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। দেবি, তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না।

অনসূয়ার বাক্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গেই সাধ্বী পতিব্রতার আত্মবোধ স্বীয় পতিদেবতার সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে প্রথমত মানসে ও অতঃপর দেহক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সেই মুহূর্ত্তেই ভাস্করের উদয় হইবা মাত্র সমগ্র জগৎ অন্ধকার ও ক্লেশ-পাশ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে পতিব্রতা-পতি নবজীবন লাভ করত নিদ্রোত্থিতের ন্যায় নবকলেবরে জাগরিত হইয়া উঠিল। পাংশুবিবর্জ্জিত দিক্ সকল প্রসন্নতা লাভ করিল, সমগ্র জগৎ স্বস্থ ও সুখবান্ হইল। তখন অনসূয়া পতিব্রতাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "ভগ্নি, রমণী চির কালই অবলা। কিন্তু সেই অবলার একমাত্র সম্বল পতিধন। একমাত্র পতিদেবতার বলেই রমণী মহাশক্তিময়ী মহামায়াস্বরূপিণী। আয় বোন্, আমরা জগদ্বাসিনী সতীগণের সহিত সমতান চিত্তে সেই—

পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দদায়িনে॥

পতিদেবতার পদপ্রান্তে কায়মনোবুদ্ধি সমর্পণ করত প্রণাম করি—

নমঃ কান্তায় ভর্ত্রে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেব শ্রয়ায় চ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপো নমোহস্তু তে॥

(৩)

বৈদেহী সঙ্গিনী—জীবন্মুক্তা।

চিরবাঞ্ছিতের সমাগমাকাঙ্ক্ষায় কামদ কানন উচ্ছ্বসিত; অত্রিভবন আনন্দান্দোলিত। দক্ষিণাপথের কঙ্করপাষাণবক্ষে কামদ কানন বড় রমণীয় স্থান; ইহার উত্তরে কলনাদিনী কৃষ্ণবেণ্বা, দক্ষিণে গোদাবরী গঙ্গা সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা। মধ্যে সর্ব্বকামদায়িনী সুজলা সুফলা, শস্যসম্পদ্‌শালিনী কামদ বনভূমি। সুদূর বিস্তীর্ণ প্রান্তরব্যবচ্ছেদে উচ্চ মহীরুহকুলের সুদূর প্রসারিত শ্যামল শাখাবাহুর অন্তরালে বিরল গুল্মাবলী ও পুষ্পবাটিকাসন্নদ্ধ তাপসগণের আশ্রমকুটীরাঙ্গনে নিপানসমীপাগত কৌতুকপরায়ণ কুরঙ্গমিথুনের নৃত্য, শ্বদন্তী শ্বাপদকুলের সহিত তৃণাশী পশুকুলের নিরাতঙ্ক বিহার কৌতুক, ও আরণ্য বিহঙ্গগণের কোলাহলমুখরিত উদ্যানসমূহে নানাবর্ণ বিচিত্রাঙ্গ চলন্ত কুসুমোপম প্রজাপতি কুলের রঙ্গ নৃত্য দর্শনে ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তচিত্তে ও অভিনব ভাববিক্ষেপের নবীনতা মুকুলিত হইয়া উঠে। কৃষ্ণসলিলা গোদাবরীর প্রবাহাবচ্ছিন্ন তীরলগ্ন হ্রদসমূহের কমলকহ্লারাদি জলজ কুসুমগন্ধামোদি পুলিন ভূমিতে বিচরণপরায়ণ কোন্ কামিজনহৃদয় পরানুরাগের আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? ভগবতী বসুন্ধরা বিশ্ব প্রকৃতির সহিত গোপন পরামর্শ ক্রমে মুক্ত-হস্তে কামদানতৎপরা হইয়াই যেন এই বনভূমিকে কামদ বন নামে অভিহিত করিয়াছেন। তীর্য্যক্‌গতিশালিনী গোদাবরীর অঙ্ককুণ্ডলীমধ্যে মহর্ষি অত্রির তপোবন বিরাজিত। কুলপতি অত্রি এই মনোরম আশ্রমে দেবী অনসূয়ার সহিত তপশ্চরণে নিরত।

অত্রি-তপোবন আজ রাম-আগমনাকাঙ্ক্ষায় পরম আনন্দময় রূপ ধারণ করিয়াছে। পরার্থ সাধকগণের মন-বুদ্ধি-বাসনা-বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহের ন্যায় কামদ কাননিবাসী জনগণ একমাত্র শ্রীরাম সন্দর্শনলালসায় অত্রিভবনে কেন্দ্রিত হইয়াছে। রাম তাহাদের সর্ব্বস্ব। কেহ দাস্যে, কেহ বাৎসল্যে, কেহ সৌখ্যে অনাগত রামচন্দ্রের তৃপ্তিবিধান আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া শত সহস্র কল্পনাময়ী উপচারে মানসক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিতেছে। তাপস বধূ ও বালিকাকুল প্রিয়দর্শন রামের নিমিত্ত কত কি স্বরুচিসম্মত উৎকৃষ্ট উপচার সংগ্রহে ব্যস্ত। সকল বিষয়ে, সকল কর্ম্মে ও সকল ভাবেই শ্রীরামচন্দ্র জানকী ও রামানুজ তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই দূর বনে সমিৎচয়নকারী

মুনিবালকগণের সহিত আলবালপূরণপরায়ণা ঋষিকুমারীগণ আনমনে গাহিতেছে—রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং সীতাপতিং সুন্দরং—কোনও গোচারণপরায়ণ বৃষভককুদ্বিন্যস্তকক্ষোণি ঋষিকুমার করতলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া আনমনে গাহিয়া উঠিল—কাকুৎস্থং করুণাময়ং—কোথাও বা স্নানপরায়ণ ঋষিবালক স্বীয় মুঞ্জমেখলা প্রক্ষালন করিতে করিতে গাহিয়া উঠিল—গুণনিধে বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং—কোথাও বা বন্যকুসুমমাল্যাভরণবিধায়িত্রী ঋষিকুমারীগণ সমস্বরে গাহিতেছে—শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং—কোথাও বা স্নানতর্পণান্তে স্নাতক বিপ্রগণ ঈশ বন্দনা করিতে করিতে গাহিয়া উঠিতেছে—বন্দে লোকাভিরামং রাঘবং —ইত্যাদি সর্ব্ব ব্যাপারেই রাম সকলের সর্ব্ব বৃত্তির অধিকরণরূপে বিরাজমান। ঋষিকুলের আত্মস্বরূপ অত্রি স্থির গম্ভীর সস্মিতবদনে সকলকেই অভ্যর্থনা করিতেছেন—রামনামে পুলকাশ্রুবিগলিত গদ্‌গদকণ্ঠে আলিঙ্গন করত রামের পরিচয় কহিতে অক্ষমতা প্রচার করিতেছেন। দেবী আত্রেয়ী পুরবাসিনীদিগের মধ্যে যথাশ্রুতরূপে জানকীর অদ্ভুত পাতিব্রত্যকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছেন। আত্রেয়ীর বদননিঃসৃত বৈদেহীর পতিভক্তির অত্যুত্তম আদর্শ বর্ণন শ্রবণে সকলেই স্ব স্ব পতির প্রতি সমধিক আকৃষ্টানুভব করিতেছেন। অত্রি-তপোবনে আজ রামজয়ধ্বনি সর্ব্বত্র সর্ব্বকণ্ঠে মুখরিত ও সর্ব্বহৃদয়ে সমাহৃত হইয়া রহিয়াছে। পরন্তু পরব্রহ্মসঙ্গাভিলাষি উদ্বেল চিত্তক্ষেত্রের ন্যায় সশিষ্য সদার কুলপতি অত্রি পৌরজনগণ সমভিব্যাহারে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের স্থূল মূর্ত্তি লোকাভিরাম রামরূপ দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করিতেছেন।

অদূরে তপোবনপ্রান্তে সমাগত শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "ভাই, তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কর, বৈদেহী মধ্যে অবস্থান করুন, আমি সকলের পশ্চাতে অনুগমন করিব।" শ্রীরামানুজ তখন অগ্রজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "দাদা, সর্ব্বত্রই পুরপ্রবেশ কালে কি আমাদিগকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে?"

রাম। হাঁা ভাই, মিত্রপুরে প্রবেশকালে সর্ব্বত্রই এই পদ্ধতি। বনে ও অরিসদনে প্রবেশে ভিন্নরূপ ব্যবস্থা।

লক্ষ্মণপ্রমুখ রাম জানকী তপোবনে প্রবেশ করিলে ঋষিপ্রবর অভ্যুত্থান-পূর্ব্বক পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে সৌমিত্রেয় অগ্রসর হইয়া ঋষিপ্রবরের চরণ বন্দন করিলে, কুলপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "এস রামানুজ, এস সঙ্কর্ষণ, আমার চিরবাঞ্ছিত এস; আজ তোমার

অনুকম্পা ক্রমে দেবশ্রী সনাথ পরম পুরুষের স্থূল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করত এই স্থূল মানব-দেহের চরম সার্থকথা সম্পাদন করিব। এস, আমার দক্ষিণভাগে অবস্থান কর।"

তদনন্তর জানকীসহ রামচন্দ্র একযোগে ঋষিসমীপে উপস্থিত হইলেন। জানকী অল্প মাত্র দূরে থাকিয়া ঋষিবরের চরণে প্রণত হইলে মুনিসত্তম তনয়ার ন্যায় স্নেহভরে শিরোঘ্রাণ করত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎসে বৈদেহি, সতি! তোমার শুভাগমনে আমার পুরী আজ অনুপম পুণ্য-শ্রী ধারণ করিয়াছে; লক্ষ্মি, তোমার আগমনে আজ আমার পুরী ধন্য হইল।" শ্রীরামচন্দ্রের শিরোঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, "রঘুনন্দন, তোমায় আমি কি বলিয়া অভ্যর্থনা করিব? চরাচর বিশ্বে তোমার অবিদিত কি আছে? অন্তর্য্যামিন্, জন্মাবধি যে বহুবিধ যত্নে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের সেবা করিয়াছি, হৃদয়-নিধি, আজ তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার দেহ ধারণ স্বার্থক হ'ল!" অনন্তর সর্ব্বজনসংকৃতা মহাভাগা অনসূয়াকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি, তুমি এই বৈদেহীকে লইয়া যাও।" পরে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন "বৎস রাজিবলোচন পূর্ব্বে শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি সময়ে এই মহিমময়ী বরবর্ণিনী স্বীয় অসাধারণ তপস্যা বলে আশ্রমপ্রদেশে জাহ্নবীকে আনয়ন করত জীবকুলের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি উগ্র তপস্যা ও কঠোর নিয়মসমূহে অলঙ্কৃতা দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, যাঁহার কঠোর ব্রত দ্বারা সমস্ত বিঘ্নাপসারিত হইয়াছে এবং দশ অহোরাত্র সূর্য্যের উদয় বন্ধ থাকিলে যিনি দৈব কারণবশতঃ তাহার নিয়মিত উদয় বিধান করিয়াছিলেন, যিনি ইহার অসামান্য চরিত্রবলে অনসূয়া নামের যথার্থ অধিকারিণী হইয়াছেন, ইনি সেই সতীশিরোমণি আত্রেয়ী, বৎসে জানকি, তুমি ইহার অনুগমন কর। বৎস রামচন্দ্র, বৎস রামানুজ, তোমরা ইহাঁকে অভিনন্দিত কর।"

সীতা সহ রাম ও লক্ষ্মণ ভগবতী আত্রেয়ীর পাদ বন্দনা করিলে অপত্য-বাৎসল্যপরায়ণা দেবী তাঁহাদের শিরোঘ্রাণ করত আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস রাম, তোমার স্বরূপবিগ্রহ আমার পূজ্যতম পতিহৃদয়ে নিয়ত বিরাজমান থাকিলেও অদ্য তোমার বাহ্যমূর্ত্তি দর্শনে ও তোমাকে অপত্যভাবে গ্রহণ করনে আমার হৃদয় শান্ত হইল। আর বৈদেহি, তোমায় আর কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব? বৈকুণ্ঠ-শ্রী, জগতের জীবকুলে সতীত্বের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আদর্শ

সংস্থাপনের জন্য তুমি যে মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানবকুলকে—আর্য্য-ললনা-দিগকে ধন্যা করিয়াছ, মা তোমার মঙ্গলময় ব্রত সফলতা লাভ করুক। আজ তোমাকে পত্যনুসারিণীবেশে বনপথ পর্য্যটনে কাতরতা দেখিয়াও আমি আনন্দ লাভ করিতেছি। জগতের নারীগণ তোমার আদর্শে পতির অনুগমন করিতে শিক্ষালাভ করুক। বৎসে! এস, অন্তঃপুরে প্রবেশ কর। বৎস রাম লক্ষ্মণ, তোমরা এস্থানে অবস্থান করিয়া শ্রান্তি অপনোদন কর ও আশ্রমবাসিগণের সেবা গ্রহণ করত তাহাদিগকে চরিতার্থ কর।" এই বলিয়া সীতা সমভিব্যাহারে আত্রেয়ী কুটীরাভ্যন্তরে গমন করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণাদি আশ্রমবাসীদিগের শুশ্রূষায় বিগতক্লম হইলে, আত্রেয়ী জনকনন্দিনীকে তাঁহার স্বয়ম্বরসংবাদ ও জীবনের ভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলী বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন। জানকী আশ্রমবাসিনী কুলাঙ্গনাগণের ও আত্রেয়ীর নিকট তৎসমুদয় যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অনেক স্থলে জানকীর যে সকল গূঢ় অভিসন্ধি পৌরবর্গের সহজবোধগম্য হইতেছিল না, তাহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে আত্রেয়ী বিশদরূপে তাহা বর্ণনা করিয়া কহিলেন। তচ্ছ্রবণে পুরবাসিনীগণ সতী ও পতিব্রতামাহাত্ম্য শ্রবণ করত বিশ্বের আদি কারণ বিশ্বজননী শিবসীমন্তিনীর পদে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এবং শ্রীরামচন্দ্রকেই পুরুষোত্তম ভগবান্ এবং বৈদেহীকে তদীয় অঙ্গস্বরূপিণী শ্রীবিদ্যাজ্ঞানে তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি দৃঢ়াসক্ত হইতে লাগিল। পরস্পরের বাক্যালাপে ভগবতী অত্রেয়ী প্রত্যক্ষভূতা শ্রীবিদ্যার সাহচর্য্যে নিজপতির সহিত বিশ্বপতির নিজ আত্মজ্ঞানের সহিত বিশ্বাত্মার অভেদানুভব করত দৈবী সম্পদ্-সম্পন্না অনসূয়া পরম পুরুষে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক নির্ব্বাণের পরমানন্দ অনুভব করিলেন।

মহর্ষি অত্রি তখন শিষ্য ও পৌরজনপরিবৃত হইয়া অনসূয়া সহগামিনী জানকী ও রাম-লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে হোমগৃহে সমাগম করত দেহভৃত পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রে স্বোপার্জ্জিত জপ ও যজ্ঞ তপস্যাদির ফল সমর্পণ করিলেন। অনসূয়া দেবীও তাঁহার তপস্যালব্ধ অত্যুত্তম সম্পদ্সমূহে বৈদেহীর বরাঙ্গ বিভূষিত করিলেন। দেবীকে সেই সমুদয় দিব্য অম্লানমাল্যবস্ত্রাভরণাদি-বিভূষিত কলেবরা ও অক্ষয় গন্ধানুলেপনে সুললিত কান্তিবতী হইয়া পরিশোভিতা হইলেন। তখন কান্ত জ্যোৎস্নাভিস্নাতা গগন মণ্ডলে নক্ষত্রহার-বিভূষণা যামিনীর শুভাগমন পরিদর্শন করত উৎসাহিনী অনসূয়া পতিব্রতা

বৈদেহীকে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের শুশ্রূষার নিমিত্ত তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। ঋষিদম্পতির শুশ্রূষাপরিতৃপ্ত রাম কুটীর মধ্যে অবস্থিত হইলে ধনুর্ব্বাণধারী অতন্দ্রিত লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের প্রহরায় নিযুক্ত রহিলেন।

রজনী যোগে ঋষিদম্পতি সমাসনে অবস্থিত থাকিয়া ধ্যানযোগে পরমপুরুষ ভগবানে শ্রীবিদ্যা সুশায়িত অনুভব করত অনুলোম ও বিলোমক্রমে অষ্টো-ত্তর দ্বিপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণাত্মক আদ্যতম সুমনস্‌রাজি অন্তরতম স্নেহাভিষিক্ত করত পরমাত্মস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় জাজ্জ্বল্যমান বহ্নিতে হবন করত জীবন্মুক্ত হইয়া কালপ্রতীক্ষায় দেহমাত্র ধারণ করিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ও নিত্য সন্ধ্যাদি সমাপনান্তে জানকী লক্ষ্মণ সহ পুরগামী শ্রীরামচন্দ্র ঋষিদম্পতির পাদস্পর্শপূর্ব্বক বন্দনা করত বিদায় গ্রহণ কালে ঋষিপ্রবর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে মুক্তিপ্রদ পুরুষো-ত্তম, পরমাশ্রয়দাতৃ জননী শ্রীবিদ্যে ও শ্রীপাদ সঙ্কর্ষণ, তোমাদিগের এই পর্য্যটন সফল হউক; পুণ্য হউক, সত্য হউক। তোমাদিগের অক্ষুণ্ণ ঐক্যের মধ্যে ভিন্নতার ভাব আছে বলিয়াই—

বৃহদুপলব্ধমেতৎ।
কথমযথা ভবন্তি নৃণাং ভুবিদত্তপাদং॥

হে দেবাদিদেব জগন্নিবাস, তুমি জয়যুক্ত হও। জীবের আত্মভূত পুরুষের সহিত চৈতন্যময়ি দেহেন্দ্রিয় কাম মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদির প্রসবিত্রী সর্ব্বোপাধির জননী প্রকৃতি সতী রমণীর ন্যায় পতির সহিত অভিন্নতা লাভ করুক, অনুরতা ও অনুব্রতা হউক। পরম ভগবানের প্রকৃতি স্বরূপা প্রতি জীব আপনাকে তাঁহারই চৈতন্যময়ী উপাধি বা রমণী জ্ঞানে তাঁহাতে সমাসক্ত হইয়া তাঁহারই পদদ্বয় বন্দনা করুক ও অনুভব করুক—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথ মৎপতিঃ শ্রীজগৎপতিঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ওঁ তৎসৎ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটকচৌধুরী।

ধার্ম্মিক কাহাকে বলে ?

দেবালয়ে বা মস্‌জিদে, গিরিজায় বা সমাজ-গৃহে গিয়া 'হে দেব' বা 'হো আল্লা,' 'হে প্রভু' বা 'ওঁ ব্রহ্ম' বলিয়া ডাকিলে ও সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জীবন-পথে বা সংসার-ক্ষেত্রে ঐ দেব বা আল্লা, প্রভু বা ব্রহ্মকে দর্শন বা স্মরণ না করিয়া চলিলে বা আচরণ না করিলে কি ধার্ম্মিক হয় ? ভজনালয়ে জীবনের সকল ভার ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া দিয়া তাহার চৌকাঠ্‌ পার হইবার কালে সে সমুদয়গুলিকে কুড়াইয়া লইয়া নিজের মাথার বোঝা করিয়া সারাদিন সংসারে ঘুরিলে কি ধার্ম্মিক হয় ? নির্দ্দিষ্ট দিবসে বা নিয়মিত সময়ে উপাসনালয়ে গিয়া যথারীতি উপাসনা করিলে ও সংসারের কার্য্যে ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্যাদি দ্বারা চালিত হইলে কি ধার্ম্মিক হয় ? ধর্ম্মের পুরাতন বা নূতন নামের আশ্রয় লইয়া ধর্ম্মাভিমান করিয়া বেড়াইলে কি ধার্ম্মিক হয় ? এ ধর্ম্ম সত্য, ও ধর্ম্ম অসত্য বলিয়া তর্ক করিলে ও ঐরূপ তর্কে জয়লাভ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলে কি ধার্ম্মিক হয়? কোন এক প্রকার ধর্ম্মের ভেক—বাহ্যিক কি মানসিক—পরিধান করিয়া, যাহাদের ঐ ভেক নাই তাহাদের অবজ্ঞা করিলে কি ধার্ম্মিক হয় ? না, ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মের ভেক—ভেদ নাই,—ভেক থাকিবে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ ধার্ম্মিকের নিকট থাকিবে না। ধার্ম্মিকের নিকট এ ধর্ম্ম সত্য, ও ধর্ম্ম অসত্য এরূপ তর্ক উঠিতেই পারে না ; কারণ তিনি জানেন ধর্ম্মমাত্রই সত্য আর কেবল অধর্ম্মই অসত্য। ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মের নামে কিছু আসে যায় না। যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন জাতি থাকিবে, সেইরূপ ধর্ম্মের বিভিন্ন নাম থাকিবে, যিনি ঐ নামের বিভিন্নতা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি কোন ভেদ দেখেন না ও তিনিই ধার্ম্মিক। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপসনা করিয়া অন্য সময়ে ও স্থানে যে ব্যক্তি চরিত্রবান্‌ না হইয়া অধার্ম্মিকের ন্যায় আচরণ করে, তাহার উপাসনা অভ্যাসগত বা নিজের মন-ভোলান না লোকদেখান বস্তু হইতে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিকের ধন নহে। যিনি ঐরূপ ভজন পূজন করিয়া বা না করিয়া সংসারের সমুদয় কার্য্যে চরিত্রবান্‌ হইতে পারেন তিনিই ধার্ম্মিক। ভজনালয়ে অবস্থিতি কালে যিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাতে সকল ভার সহজে সমর্পণ করিতে পারেন, আর সেখান হইতে যেমন

চলিয়া আসেন অমনি তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া সকল বিশ্বাস আপনাতে স্থাপন করেন, তাঁহার ঈশ্বর এক কল্পিত সসীম দেবতামাত্র, তাঁহার ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নয়। তিনি ভজনালয় ও সংসারক্ষেত্রের মধ্যে এক অভেদ্য প্রাচীর উঠাইয়া দিয়া ঈশ্বরকে ঐ প্রাচীরের মধ্যস্থিত ভজনালয়রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখেন; তিনি অধাম্মিক-চূড়ামণি। যিনি ঐরূপ পাচীর উঠান না বা কোথায় দেখিতে পাইলে সযত্নে ভাঙ্গিয়া দেন তিনিই ধাম্মিক। যিনি দেবালয়ে গিয়া ব্রহ্মকে দর্শন বা স্মরণ করিয়া থাকেন ও জীবনের কার্য্যকলাপে তাঁহাকে দর্শন বা স্মরণ করিতে পারেন না, তিনি ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম ঈশ্বরকে সকলদেশে ও সকল সময়ে পিতা বা মাতা বলিয়া জানাইয়া দেয়; ও মানুষকে অবস্থাভেদে জনক বা জননী, পুত্র বা কন্যা, সখা বা বন্ধু, প্রভু বা দাস, স্ত্রী বা স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া দেয়; এবং যে মধুর রসের মধ্যে সকল রসই বর্ত্তমান তাহার সাহায্যে ঈশ্বরের সহিত মানুষের, মানুষের সহিত মানুষের, ও অপর সমুদয় জীব ও সৃষ্টিত বস্তুর সহিত মানুষের মধুময় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মানুষকে তাহার জীবনের সমুদয় কার্য্যে চরিত্রবান্ ও প্রেম-সুন্দর করিয়া দেয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ গিয়া একজন মাত্র মানুষ কখন হইবে না, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা ধর্ম্ম গিয়া এক মানব-সমাজ বা ধর্ম্ম-সমাজ কখন হইবে না; কিন্তু ধাম্মিক প্রেমচক্ষে তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ দেখিবেন না। এক কথায় ধাম্মিক হইতে হইলে প্রেমিক হইতে হইবে। প্রেমিক না হইলে ধাম্মিক হওয়া যায় না।

"বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মাতৃহীন বালক।

নীলাকাশে হাসে সুধাকর
হাসে গ্রহ-তারকা-নিকর
হাসে শুভ্র নব জলধর;
 হাসিতেই যেন সকলে মগন
 হাসিময় কিবা অনন্ত গগন।

বুকে ধরি রতননিকর
হাসে যেন চঞ্চল সাগর
হাসিমাখা তরঙ্গের থর ;
　　বঁধুর মিলনে গোপিনী যেমন
　　হাসিমাখা ভাব রাগেতে রমণ।

হাসে জাতী চম্পক যূঁথিকা
গন্ধরাজ কুন্দ সেফালিকা
হাসে পদ্ম মালতি মল্লিকা
　　হাসিছে তমাল অশোক পারুল
　　হাসে ফুল্ল মনে মান্দার বকুল।

হাসে নব পল্লবের থর
হাসে কচি মুকুলনিকর
হাসে গুল্ম লতা তরুবর.
　　হাসিময় সারা বিজন কানন
　　হাসে তারি সনে মলয় পবন।

উড়ি ঘুরি কিবা মনোহর
সুধাকরকিরণ বিভোর
হাসে অই চকোরী চকোর ;
　　হাসিময় যেন নবীন জীবন
　　হাসিময় যেন নূতন ভবন।

পিকবর দোয়েল পাপিয়া
ফুল্লমনে কুলায় বসিয়া
হাসে কিবা মধু বিলাইয়া ;
　　হাসিময় মধু বিহগ-কূজন
　　ভাবময় ভাবে ভাবের ভজন !

হাসিময় আজি বিভাবরী
হাসে বিশ্ব ছন্দের লহরী
হাসিময় প্রকৃতি সুন্দরী ;

গগন সাগর বিপিন পুলিন
মায়ের হাসিতে সকলি বিলীন।

পোড়া প্রাণ জুড়াবার তরে
আসিলাম সাগরের তীরে,
আসে পাশে দেখি চারিধারে
প্রাণের আরামে সবে শান্তিরাম
নাহি শুধু মোর দুঃখের বিরাম।

যেই দিকে ফিরাই নয়ন
সকলেরি করি নিরীক্ষণ
হাসিময় প্রফুল্ল বদন ;
গেছে হাসি মোর, হতাশ কেবল
হ'ল কিরে হায় জীবনসম্বল।

জাগে হৃদে জাগে সেইক্ষণ
মা'তৃক্রোড়ে বসিয়া যখন
হাসিমাখা পবিত্র আনন
হেরি মীননেত্রে, হাসির লহর
ছিল জীবনের নিত্য সহচর।

এক মনে কত ভালবাসি
হেরিতাম সারা দিবানিশি
অফুরন্ত সুমধুর হাসি,
বহিত হৃদয়ে হাসির পাথার
উঠিত নাচিয়া অন্তর আমার।

অন্ধকার নিশিতে যখন
হ'ত ঘন মুষল বর্ষণ
কর্ণভেদী অশনি গর্জ্জন,
প্রাণাতঙ্ক ভীম ভীম প্রভঞ্জন
তাণ্ডব নর্ত্তনে করিত নর্ত্তন।

ক্ষীণালোক সম্মুখে বসিয়া
বক্ষ'পরে মোরে আবরিয়া
মুখে স্নিগ্ধ হাসিটী তুলিয়া
　　ভুলাইয়ে হায় বলিত আবার
　　"এই কোলে বসি কি ভয় তোমার ?"

কোথা সেই স্নেহবতী মার
বিমোহিনী হাসির ঝঙ্কার ?
কিবা তাঁর আনন্দ অপার !
　　সেই হাসি যেন এখনো আমায়
　　স্মৃতির আবর্ত্তে আনন্দে নাচায়।

নাহি সেই জননী আমার
নাহি সেই হাসির পাথার
চতুর্দ্দিকে শুধু হাহাকার
　　অশান্তি-কালিমা হৃদয়ে ব্যাপিয়া
　　স্তরে স্তরে সদা উঠিছে ভাসিয়া

সেই হাসি হারায়ে যখন
জর্জ্জরিত দেহ প্রাণ মন
শতমুখে হাসি বরিষণ ;
　　ভাবে যেন তারা সকলেই হ'ন
　　হাসি স্পর্শমণি আমার কারণ।

দেখিলাম বহুতর হাসি ;
দারা সুত ভ্রাতা মাসি পিসি
সকলেই কত ভালবাসি
　　আমার বিষাদে ব্যাকুলা হইয়া
　　হাসির তরঙ্গে উঠিছে নাচিয়া।

মায়ের হাসিলহরী মত
সুধাকর নাহিক বিম্বিত
এ তরঙ্গ জলদ আবৃত

নাহি প্রাণারাম প্রেমময় ভাব
বাজে যেন হৃদে কিসের অভাব।

নাহি বুঝি দুঃখের বিরাম
নাহি শান্তি নাহিক আরাম,
দগ্ধ প্রাণে ঘুরি অবিরাম—
মানব জগতে দেখি যত হাসি
শান্তিবিনিময়ে স্বার্থ রাশি রাশি।

যে অবধি হারায়েছি মার
স্নেহমাখা হাসির পাথার,
সে অবধি জীবন আমার
অশান্তি-অনলে দগ্ধ নিরন্তর
হলাহলপূর্ণ হৃদয়কন্দর।

বহুদিন নানা দেশ ঘুরি
দেখিলাম প্রকৃতি সুন্দরী
সে জীবন্ত হাসির লহরী
সেই স্মৃতি আজ তোমার হাসিতে
মধুর সোহাগ আছে গো খেলিতে।

নিরমল সেই হাসিমাখা
জীবনের প্রথমাঙ্ক রেখা
ছিল হৃদে ছায়া মত আঁকা,
হাসির লহরী দেখি আজিকার
নূতন রাগেতে রাগিল আবার।

তোমার এ হাসির ভিতর
নহে শুধু দিব্য মনোহর
প্রাণারাম লাবণ্য সুন্দর
আছে যেন স্নিগ্ধ সরলতারাশি
সেই হাসি হ'তে শত গুণ বেশী।

চারিদিক্ করিয়া আঁধার
এক মাত্র জীবনের সার
গেছে চলে জননী আমার
　　কিন্তু হেথা আজ দেখিনু চাহিয়া
　　মার সেই হাসি দিগন্ত জুড়িয়া।

বহুকাল মরমব্যথায়
ঘুরিয়াছি যথা আঁখি যায়
শুভক্ষণে এসেছি হেথায়
　　সহস্র মাদের হাসিটী মা ধন্য
　　প্রত্যেকেই যেন রয়েছে ফুটিয়া।

নাহি মোর আর কোন ব্যথা,
গর্ভধারিণী আরাধ্যা মাতা
হ'য়ে আজ লতা ফুল পাতা
　　গ্রহ তারা শশী বিহংকুজন
　　সাগরতরঙ্গ হাসিছে কেমন।

হারাইয় আমার জননী
দেখিলাম নিত্য সুহাসিনী
দিগম্বরা জগত-জননী
　　হাসির লাবণ্যে দেহটী মাখিয়া
　　আছেন সন্তানে কোলেতে করিয়া।

আর আমি নহি মাতৃহারা!
নহে মাতা কভু কাছ ছাড়া—
তাঁরি হাস্যে জগত মুখরা,
　　পেয়েছি মায়ের দিব্য দরশন
　　মাতৃত্বে স্ফুরিত অনন্ত ভুবন।

জগতের যত রূপরাশি
সবাকারে আছে মায় বসি;
মুখে সদা আনন্দের হাসি

হাসিতেই যেন জগত সৃজিত ;
হাসিতেই যেন জগত জীবিত।
ভাবময়ী অনন্তা ভাবিনী
বিশ্বমাতা বিশ্বপ্রসবিনী
হাস্যময়ী চৈতন্যরূপিণী
এ চেতনা মোর হেঙ্গ না জননি।
দেখি যেন সদা এই হাসিখানি

তোমার এ অধম সন্তান
হাসিটুকু শুধু যার জ্ঞান
যেন তব শাশ্বত অম্লান
আনন্দের হাসি দেখিতে দেখিতে
তোমারি কোলেতে পাবে গো ঘুমাতে।

শ্রীরমেশচন্দ্র খাসনবীশ।

পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

স্পর্শ :—স্পর্শ বিষয়ে অশক্তবান্ হস্তী বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে দেশে হস্তী অনেক, সেই দেশে ব্যবসায়ী লোক হস্তীর দাঁত লইতে যায়। অনন্তর যে খানে বহু হস্তী গমনাগমন করে সেখানে প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন করিয়া উপরে পলকা বাঁশ অথবা কাষ্ঠশলাকা বিছাইয়া দেয়। এক প্রান্তে কাষ্ঠের হস্তিনী প্রস্তুত করিয়া উহার উপর দাঁড় করাইয়া রাখে। পরে যখন হস্তিদল নিকটবর্ত্তী অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া ঐ স্থানাভিমুখে আগমন করে, তখন উহাদের মধ্যে কোন না কোন হাতীর দৃষ্টি নির্ম্মিত হস্তিনার দিকে পড়িলে, সে দৌড়িয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্য উহার নিকটে ধাবিত হয়। আসিবার সময় বাঁশ ভাঙ্গিয়া গর্ত্তে নিপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন ব্যবসায়ী আসিয়া দাঁত কাটিয়া লইয়া যায়।

রূপ :—পতঙ্গ প্রদীপ্ত দীপের জ্যোতিঃ দেখিয়া তাহার রূপে আসক্ত হইয়াই যেন তদভিমুখে ধাবিত হয় এবং উহাতে পড়িয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, ইহা মনুষ্যমাত্রেই অবগত আছেন। কাহারও অবিদিত নাই।

দিয়া মাছ ধরিবার জন্য বঁড়সীতে চার বিদ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করে। তখন চারের রস পানেচ্ছু মৎস্য চার খাইবার লালসায় গভীর জল হইতে ঘাই দিতে আরম্ভ করে। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া চার ঠোক্‌রাইতে থাকে। ঠোক্‌রাইতে ঠোক্‌রাইতে যখন ঝটকা মারে তখন বঁড়সী মৎস্যের মুখে বিদ্ধ হইয়া আটকাইয়া পড়ে। তৎপরে যে ব্যক্তি মাছ ধরিতেছিল সে ছিপ দ্বারা তাহাকে টানিয়া ডাঙ্গায় তোলে এবং আছাড় মারিয়া তাহাকে হত্যা করে।

গন্ধ :—গন্ধের অনুরাগী ভ্রমর যখন পদ্মের উপর বসে তখন উহার গন্ধে এরূপ আকৃষ্ট হইয়া যায় যে তৎকালে তাহার স্ব সত্ত্বার ভাণ কিছুই থাকে না। পরে যখন সন্ধ্যা উপস্থিত হয় এবং সূর্য্য অস্তাচলে গমন করে তখন কমল মুদিত হয়। সেই সময় গন্ধে অচৈতন্য ভ্রমর কমলের সমপুটে আবদ্ধ হইয়া যায়. যদ্যপি ভ্রমর কখন কখন পাপড়ী ছেদন করিয়া বাহিরে চলিয়া যায় বটে কিন্তু গন্ধের প্রেমী যে সকল ভ্রমর গন্ধে আসক্ত হইয় কমলের কোমল পাপড়ী ছেদন করিয়া বাহিরে আইসে না, তাহারা উহার মধ্যেই আনন্দভোগ করিতে থাকে। পরিশেষে কোন হাতী আসিয়া কমল খাইয়া ফেলিলে ভ্রমরও কমলের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে গন্ধ বিষয়ও নাশের কারণ. অতএব হে শিষ্য! দেখ যখন এক এক বিষয়ে আসক্ত হইয়া জন্তুগণ এইরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন পাঁচ বিষয়ে আসক্ত জীব কেন না নাশ প্রাপ্ত হইবে? এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল অভিলাষ করে সে ব্যক্তির উচিত যে, পাঁচ বিষয়ে দোষ দৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে বিষবৎ ত্যাগ করেন।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।

হে শিষ্য! অন্তঃকরণ পঞ্চক, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক। ইহারা অধ্যাত্ম, উহাদিগের দেবতা অধিদৈব এবং উহাদিগের বিষয় অধিভূত। এই তিন একত্র মিলিত হইয়া ত্রিপুটী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই ত্রিপুটী দ্বারা মানব, জীবনের সমস্ত ক্রিয়া হয়। তুমি উহাদিগেরও জ্ঞাতা, সাক্ষী, দ্রষ্টা। সুতরাং তুমি উহাদিগের হইতেও ভিন্ন।

শিষ্য :—হে গুরো! আপনি কহিলেন অন্তঃকরণাদিতে অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এই ত্রিপুটী আছে, তদ্দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া হয়। কিন্তু অধ্যাত্ম আদি কাহাকে কহে তাহা আমি জানি না, অতএব আমি যাহাতে বুঝিতে পারি এরূপে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য! শুন, অন্তঃকরণে ত্রিপুটী এই প্রকার।

অন্তঃকরণের ত্রিপুটীর কোষ্ঠক।

অধ্যাত্ম	অধিভূত	অধিদৈব
অন্তঃকরণ	স্ফুরণ	বিষ্ণু
মন	সংকল্প বিকল্প	চন্দ্রমা
বুদ্ধি	নিশ্চয়	ব্রহ্মা
চিত্ত	চিন্তন	নারায়ণ
অহঙ্কার	অভিমান	রুদ্র

অন্তঃকরণ :—অধ্যাত্ম, স্ফুরণ অধিভূত এবং বিষ্ণু অধিদৈব।—এই তিন মিলিত হইয়া অন্তঃকরণের ক্রিয়া স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই তিনের মধ্যে একটী যদি না থাকে তবে ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয় না।

মন :—অধ্যাত্ম, সংকল্প বিকল্প অভিভূত, চন্দ্রমা অধিদৈব ;—এই তিন একত্রে মিলিত হইয়া কল্পনা রূপ ক্রিয়া হয়।

বুদ্ধি :—আধ্যাত্ম, নিশ্চয় অধিভূত, ব্রহ্মা অধিদৈব,—এই তিন মিলিয়া নিশ্চয়াত্মক ক্রিয়া হয়। ইহাদের মধ্যে একের অভাব হইলে কোন বিষয় নিশ্চয় করা যায় না।

চিত্ত :—চিন্তন অধিভূত, নারায়ণ অধিদৈব ;—এই তিনের যোগে চিন্তন রূপ ক্রিয়া হয়।

অহঙ্কার :—অধ্যাত্ম, অভিমান অভিভূত এবং রুদ্র অধিদৈব ;—এই তিন সংযোগে অভিমান হয়।

হে শিষ্য ! এই ত্রিপুটীর তুমি জ্ঞাতা এজন্য তুমি ত্রিপুটী নহ, বরঞ্চ ইহাদের সাক্ষী স্বরূপ। এজন্য উহাতে অহংতা মমতা ত্যাগ কর।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ত্রিপুটী কোষ্টক।

আধ্যাত্ম	অধিভূত	অধিদৈব
শ্রোত্র	শব্দ	দিক্
ত্বক্	স্পর্শ	বায়ু
চক্ষু	রূপ	সূর্য্য
জিহ্বা	রস	বরুণ
ঘ্রাণ	গন্ধ	অশ্বিনীকুমার

শ্রোত্র :—অধ্যাত্ম, শব্দ অধিভূত, দিক্ অধিদৈব। এই তিন একত্রে মিলিত হইয়া শ্রবণ ক্রিয়া হয়। এই তিনের মধ্যে একটী যদি না থাকে তাহা হইলে শ্রবণ কার্য্য হইবে না।

ত্বক্ :—অধ্যাত্ম, স্পর্শ অধিভূত, বায়ু অধিদৈব। ইহাদের সংযোগে স্পর্শরূপ ক্রিয়া হয়।

চক্ষু :—অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, সূর্য্য অধিদৈব। যদি চক্ষু ও রূপ দুই থাকে কিন্তু অধিদৈব সূর্য্য না থাকে তবে কি প্রকারে দর্শন ক্রিয়া হইবে? অর্থাৎ দেখিতে পাইবে না। তদ্রূপ সূর্য্য এবং রূপ সত্ত্বে যদি চক্ষু না থাকে তাহা হইলেও কিছু দেখা যাইবে না। ঐরূপ সূর্য্য ও চক্ষু বর্ত্তমান কিন্তু রূপ নাই তবে কাহাকে দেখিবে?

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমস্ত ত্রিপুটী এই প্রকার জানিবে। হে শিষ্য! এই ত্রিপুটীকে তুমি অবগত আছ এজন্য তুমি এই ত্রিপুটী নহ এবং ইহাদের কৃত সমস্ত কার্য্য ইহাদের, এজন্য উহারা তোমার নহে। তুমি সকলের দ্রষ্টা সাক্ষী।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ত্রিপুটী কোষ্টক।

অধ্যাত্ম	অধিভূত	অধিদৈব
বাক্	বচন (কথন)	অগ্নি
পাণি	আদান (দেওয়া লওয়া)	ইন্দ্র
পাদ	গমন (আসা যাওয়া)	উপেন্দ্র (বামন)
শিশ্ন	আনন্দ (রতি ভোগ)	প্রজাপতি
উপস্থ	বিসর্গ (মলত্যাগ)	যম

বাক্ :—ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বচন অধিভূত এবং অগ্নি অধিদৈব। এই তিনের দ্বারাই বাক্য কথনরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। যদি এই তিনের মধ্যে একটী না থাকে তাহা হইলে কথনরূপ ক্রিয়া হইতে পাবে না।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমস্ত ত্রিপুটীকে এইরূপে বিবেচনা করিবে। হে শিষ্য! এই ত্রিপুটীকেও তুমি জান, এজন্য তুমি উহা হইতে ভিন্ন, ইহার দ্রষ্টা। এই সমস্ত ত্রিপুটী কৃত ক্রিয়া ঐ ত্রিপুটীর, সুতরাং তোমার নহে, এ জন্য তুমি উহার সাক্ষী।

চতুর্থ প্রক্রিয়া।

হে শিষ্য! উপরি উক্ত অন্তঃকরণাদি পঁচিশ তত্ত্ব পঞ্চ মহাভূতের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাগ হইতে উৎপন্ন। সে জন্য উহারা মহাভূতের কার্য্য এবং তুমি উহাদের সাক্ষী, সুতরাং উহা হইতে ভিন্ন।

শিষ্য—হে গুরু! এই পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে কোন্ কোন্ তত্ত্ব কোন্ কোন্ মহাভূতের কোন্ কোন্ অংশ উৎপন্ন তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু—হে শিষ্য! পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক ভাগ হইতে পাঁচ অন্তঃকরণ এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। রাজস অংশ হইতে পাঁচ প্রাণ ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তামস অংশ হইতে পাঁচ বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) উৎপন্ন হইয়াছে।

শিষ্য—হে গুরো! আপনি আকাশাদি পাচ ভূতের সাত্ত্বিকাদি অংশ হইতে পঁচিশ তত্ত্বের উৎপত্তি কহিলেন, তাহা আমি শুনিলাম। কিন্তু এক এক ভূতের এক এক সাত্ত্বিক রাজস তামস ভাগ হইতে যে যে তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, এজন্য উহ স্পষ্ট করিয়া আমাকে বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য। শুন আমি তোমাকে সমস্ত তত্ত্বের বিষয় স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি।

পঞ্চভূতের ত্রিগুণ অংশ হইতে উৎপন্ন তত্ত্বের প্রকাশক কোষ্টক।

পঞ্চভূত	সাত্ত্বিক ভাগ হইতে		রাজস ভাগ হইতে		তামস ভাগ হইতে
	পাঁচ অন্তঃকরণ	পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়	পাঁচ বায়ু	পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়	পাঁচ বিষয়
আকাশের	অন্তঃকরণ	শ্রোত্র	ব্যান	বাক্	শব্দ
বায়ুর	মন	ত্বক্	সমান	পাদ	স্পর্শ
তেজের	বুদ্ধি	চক্ষু	উদান	পাণি	রূপ
জলের	চিত্ত	জিহ্বা	প্রাণ	শিশ্ন	রস
পৃথিবীর	অহঙ্কার	ঘ্রাণ	অপান	গুহ্যদেশ	গন্ধ

আকাশের সাত্ত্বিক ভাগ হইতে অন্তঃকরণ এবং শোত্র ইন্দ্রিয়। রাজস ভাগ হইতে ব্যান বায়ু এবং বাগিন্দ্রিয় হইয়াছে এবং তামস ভাগ হইতে শব্দ বিষয় হইয়াছে।

এই প্রকারে উপরি উক্ত কোষ্টকের অনুসারে বায়ু আদি অবশিষ্ট চারি ভূতেরই সাত্ত্বিক আদি অংশ হইতে মন, ত্বক্ আদি তত্ত্বের উৎপত্তি জানিবে।

শিষ্য :—হে ভগবন্! আপনি কহিয়াছেন পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক ভাগ হইতে অন্তঃকরণ ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য! শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে

জ্ঞানং” অর্থাৎ সত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্ম। দেখ অন্তঃকরণ মন বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে সুখ দুঃখ প্রভৃতি জ্ঞান জন্মে এবং শ্রোত্র ত্বক্ আদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, এজন্য উহারা সাত্বিক ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে।

শিষ্যঃ :—হে স্বামিন্, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের রাজস অংশ হইতে হইবার কারণ কি ?

গুরু :—হে শিষ্য। যে প্রকার রজোগুণ হইতে ক্রিয়া হয়, সেই প্রকার পঞ্চ প্রাণ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতেও শারীরিকী ক্রিয়া হয়, এজন্য ইহাদিগের রাজস অংশে উৎপত্তি জানিও।

শিষ্য :—হে গুরু! পাঁচ বিষয়, তামস অংশ হইতে উৎপত্তি কহিবার কারণ কি, তাহা বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য। পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান নাই। উহা কেবল জড় মাত্র। এজন্য উহারা পঞ্চভূতের তামস ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে।

এই সমস্ত তত্ত্বকে তুমি জান। এই পাঁচ বিষয় তুমি নহ। উহাদিগের তুমি জ্ঞাতা, অতএব তুমি উহাদিগের দ্রষ্টা। এ সমস্ত পঞ্চভূতের, সুতরাং তোমার নহে। তুমি ত অকর্ত্তা অভোক্তা উহাদের সাক্ষী, সর্ব্বদা উহা হইতে ভিন্ন আত্মা।

পঞ্চম প্রক্রিয়া।

শিষ্য :—হে গুরু। আপনি আমাকে কহিলেন যে আত্মা অকর্ত্তা অভোক্তা সাক্ষী। তবে এক্ষণে আমাকে বলুন এই দেহে কর্ত্তা কে? এবং সুখ দুঃখের ভোক্তাই বা কে? এবং কি কি সাধন দ্বারা কিরূপে ভোগ হয় তাহা আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এরূপে আমাকে বলুন যাহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

গুরু :—হে শিষ্য। এই দেহে পঞ্চ অন্তঃকরণ কর্ত্তা ভোক্তা, পাঁচ প্রাণ কর্ত্তা ভোক্তার বাহন। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় উহার দ্বার। পাঁচ বিষয় উহার ভোগ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় উহার সেবক। তুমি উহাদের সকলের জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, সাক্ষী, অকর্ত্তা, অভোক্তা, অসঙ্গ আত্মা।

শিষ্য :—হে গুরু! আপনি সাধারণ রীতিতে আমাকে বুঝাইয়াছেন যে অন্তঃকরণ কর্ত্তা ভোক্তা, পাঁচ প্রাণ উহার বাহন, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ বিষয়

ভোগ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সেবক। কিন্তু পাঁচ তত্ত্বের কোন্ কোন্ কর্ত্তা, ভোক্তা, কোন্ কোন্ বাহনের উপর বসিয়া, কোন্ কোন্ দ্বারে আসিয়া, কি কি ভোগ করে এবং কোন্ কোন্ সেবক উহাদের সেবা করিয়া থাকে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিন।

গুরু :—হে শিষ্য। আকাশের তত্ত্ব অন্তঃকরণ কর্ত্তা ভোক্তা ব্যান বাহনের উপর বসিয়া, শ্রোত্র দ্বারে আসিয়া শব্দ বিষয় ভোগ করে। অর্থাৎ কর্ণ দ্বারা অনুকূল অথবা প্রতিকূল শব্দ শুনিলে অন্তঃকরণে সুখদুঃখরূপ ভোগ হয় এবং বাক্ রূপ সেবক, উহার সেবা করিতে থাকে। এই প্রকার অন্তঃকরণ কর্ত্তা ভোক্তা তুমি উহার দ্রষ্টা, সাক্ষী আত্মা।

বায়ুর তত্ত্ব মন কর্ত্তা ভোক্তা সমান বাহনের উপর বসিয়া ত্বক্ দ্বারে আসিয়া স্পর্শ রূপ বিষয় ভোগ করে এবং হস্ত (পাণি) তাহার সেবক, উহাকে সেবা করে। অর্থাৎ ত্বকের সর্দ্দি লাগিলে সে হস্ত দ্বারা বস্ত্র আবৃত করে, গ্রীষ্ম কালে ঘর্ম্ম বাহির হইলে হস্ত দ্বারা পাখার বাতাস খায় ইত্যাদি সেবা করে। ত্বকের উপর কোমল চন্দন প্রভৃতি অনুকূল স্পর্শ দ্বারা সুখ এবং কঠিন ও উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ দ্বারা প্রতিকূল দুঃখ মনে জন্মে। উহার জ্ঞাতা তুমি আত্মা, সুখী দুঃখী নহ কিন্তু উহার সাক্ষী নির্লেপ।

তেজের তত্ত্ব—বুদ্ধি কর্ত্তা ভোক্তা উদান বাহন উপর বসিয়া চক্ষু দ্বারে আসিয়া সেখান হইতে রূপ বিষয়কে গ্রহণ করে ইহাই তাহার ভোগ। পদদ্বয় সেবক রূপে যেখানে রূপ আছে সেই প্রদেশে বুদ্ধিকে লইয়া যায় অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা প্রিয় অপ্রিয় রূপ দর্শন করিয়া বুদ্ধি সুখী, অথবা দুঃখী হয় কিন্তু তুমি উহাদের দ্রষ্টা, উহাদিগের হইতে ভিন্ন, নির্লিপ্ত আত্মা

আপ জল—জলের তত্ত্ব চিত্ত কর্ত্তা ভোক্তা। ইহার বাহন প্রাণ। প্রাণের উপর বসিয়া জিহ্বা দ্বারে আসিয়া রস বিষয় ভোগ করে এবং শিশ্ন (উপস্থেন্দ্রিয়) ইহার সেবক রস ত্যাগ করে অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা মধুর প্রভৃতি অনুকূল রস এবং কষায় প্রভৃতি প্রতিকূল রস আস্বাদন দ্বারা চিত্ত সুখী ও দুঃখী হয়। তুমি ত কেবল উহার দ্রষ্টা, সাক্ষী এবং অভোক্তা।

পৃথিবীর তত্ত্ব—অহঙ্কার কর্ত্তা ভোক্তা। ইহা অপান বাহন উপর চড়িয়া ঘ্রাণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া গন্ধ বিষয় উপভোগ করে। ইহার সেবক গুহ্যদেশ মলত্যাগ করে। অর্থাৎ ঘ্রাণ দ্বারা আতর প্রভৃতি সুগন্ধ এবং অন্য দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অহঙ্কার সুখী দুঃখী হইয়া থাকে। তুমি উহার জ্ঞাতা

অকর্ত্তা অভোক্তা, তোমার আত্মাতে সুখ দুঃখ নাই, তুমি সদা পরমানন্দ রূপ; ইহার দ্রষ্টা সাক্ষী

এই প্রকারে কর্ত্তা ভোক্তার প্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া এক্ষণে অন্য রীতিতে আকাশাদি পাঁচ মহাভূতের প্রত্যেকের পাঁচ পাচ তত্ত্ব দেখান যাইতেছে।

ষষ্ঠ প্রক্রিয়া।

গুরু :—হে শিষ্য। আকাশের পাঁচ তত্ত্ব (১) অন্তঃকরণ (২) ব্যান (৩) শ্রোত্র (৪) বাক্ (৫) শব্দ।

শিষ্য :—হে স্বামিন্! আপনি অন্তঃকরণাদি পাঁচ তত্ত্ব কি হেতু আকাশের কহিলেন তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য। স্ফুরণ রূপ অন্তঃকরণ হৃদয়াকাশে উৎপন্ন হইয়া উহাতেই লয় হইয়া যায় এ কারণ উহা "আকাশের"।

ব্যান সর্ব্ব অঙ্গে আকাশের ন্যায় ব্যাপক এই জন্য আকাশের।

শ্রোত্র ইন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দ শ্রবণ করে, এ জন্য উহা আকাশের।

বাগিন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দ উচ্চারণ করে এ জন্য আকাশের।

শব্দ প্রত্যক্ষ আকাশের গুণ ইহা প্রসিদ্ধই আছে

এই প্রকার বায়ুর পাঁচ তত্ত্ব (১) মন (২) সমান (৩) ত্বক্, (৪) পাণি ও (৫) স্পর্শ

শিষ্য :—হে গুরু! এই যে বায়ুর পাঁচ তত্ত্ব ইহা কি প্রকার তাহা বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য! মন বায়ুর ন্যায় চঞ্চল এই জন্য উহা বায়ুর তত্ত্ব জানিবে।

সমান ত স্বয়ং বায়ু।

ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শ অনুভব করে এজন্য উহা বায়ুর।

পাণি (হস্ত) দ্বারা বায়ুর গুণ স্পর্শ হইয়া থাকে এ জন্য উহা বায়ুর।

স্পর্শ ত বায়ুর প্রসিদ্ধ গুণ।

এই প্রকার তেজের পাঁচ তত্ত্ব :—(১) বুদ্ধি, (২) উদান (৩) চক্ষু (৪) পাদ (৫) রূপ।

শিষ্য :—হে ভগবন্! এই পাঁচ তত্ত্বকে তেজের তত্ত্ব বলিবার কারণ কি?

গুরু :—হে শিষ্য! বুদ্ধি ত প্রকাশমান তেজোময় এ জন্য উহা তেজের।

উদান বায়ু কণ্ঠে অন্ন ও জলের বিভাগ করিয়া জঠরাগ্নিতে তাহাদিগকে লইয়া যায়। এ জন্য উহা তেজের। (ক্রমশঃ)

নবপর্য্যায়, ৬ষ্ঠ ভাগ] ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৪। [২৮ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধীয়

মাসিকপত্র

পুরুষার্থ পরং কিঞ্চিৎ

পন্থা

প্রেমা পুমর্থো মহান্

মহাজনো যেন গতঃ স

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি এল্‌,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্‌, } সম্পাদিত;
পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ
সহকারি-সম্পাদক।

সূচী।

ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা] [প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা।

নিবেদন।

পন্থার সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন পন্থা বাহির হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইল। গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে কাগজের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে ও গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়াতে, পন্থা দুই মাস করিয়া একত্রে বাহির হইবে। আর একটি বিশেষ নিবেদন এই—আপনাদের অনেকের নিকট গত বৎসরের চাঁদা পাওনা আছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিবেন এবং ১৩২৪ সালে অগ্রিম মূল্যের জন্য পরবর্ত্তী মাসে ভি পি করিব। বোধ হয় আপনারা তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

ইতি—

ম্যানেজার।

পন্থার নিয়মাবলী।

১। "পন্থার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সমেত ২, দুই টাকায়, ভি পিঃতে ২/০ দুই টাকা এক আনা। শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ মূল্যে দেওয়া হয়। এক সংখ্যা নমুনার জন্য ।০ চারি আনা দিতে হইবে।

২। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর সংখ্যা পাইবামাত্র না জানাইলে, আমরা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী নহি।

৩। গ্রাহকগণ পত্রে এবং টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্টরূপে লিখিবেন। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবার জন্য টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা কুপনে "নূতন" এই কথাটি যেন লিখিয়া দেন। গ্রাহকগণ কোন বিষয়ের উত্তরের প্রত্যাশা করিলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৪। "পন্থা"য় বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য মলাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেজ মাসিক ৪, চারি টাকা হিঃ চতুর্থ পেজ ৫, পাঁচ টাকা হিঃ এবং অন্যত্র ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে লওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে পত্রিকা প্রচারের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইবে।

৫। "পন্থা"য় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বা দ্বেষভাবাপন্ন প্রবন্ধ গৃহীত হয় না। প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী হইবেন।

৬। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট না পাঠাইলে, তাহা ফেরত দেওয়া হয় না।

৭। "পন্থা" সম্বন্ধীয় টাকা, পত্রাদি, প্রবন্ধ এবং বিনিময়ার্থ পত্রিকা আমার নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

"পন্থা" কার্য্যাধ্যক্ষ,

১৯ নং রামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৬ষ্ঠ ভাগ।] ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৪। [৫ম, ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

"নাম।"

সখা!

তুমি পরম আনন্দ-ধাম।
তিরপিত নহে রসনা আমার
লইতে তোমার নাম॥
মধুর মধুর নামটী তোমার
প্রেমরস মাখা তায়।
বিসরিতে নারে কোন কালে সে যে
একবার স্বাদ পায়॥
সুখে দুখ বোধ বিপদে সম্পদ
হৃদয় আনন্দে পুর।
সুখ দুখ সব এক হ'য়ে যায়
সঙ্কট পলায় দূর॥
হেন সুধামাখা নামটী তোমার
না জানি কি গুণ জানে।
জপিতে জপিতে জ্ঞান হয় সর্ব্ব
বিশ্ব মত্ত নামগানে॥
প্রভাত সমীরে নামের লহরী
কাননে বিহগ গায়।

কুল কুল রবে তুলি নাম তান
হরিষে তটিনী ধায়॥
তরুণ-তপন কনক-কিরণ
চাতক মাখিয়া গায়।
আকাশের কোলে তুলিয়া সুতান
তব নামগুণ গায়॥
পাপিয়ার কণ্ঠে সেতান, কোকিল
কু-জনে তোমারই নাম।
প্রেমাশ্রু বরিষে হরিষে কাননে
বিকচ কুসুমদাম॥
ময়ূর ময়ূরী কেকা রবে তব
নামের মহিমা গায়।
প্রেমে হেলিদুলি বন-লতাকুল
তরুবর পানে চায়॥
যথা চিত ধায় প্রেমে মাতে প্রাণ
শুনি সুধামাখা নাম।
মধুর মুরতি ফুটে হৃদিমাঝে
পরম আনন্দ-ধাম॥

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ।

কাঞ্চীপুরী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

ইতিপূর্ব্বে শিবকাঞ্চীর কয়েকটি প্রধান মন্দিরের বর্ণনা করা হইয়াছে। এবার আমরা আরও দুইটী মন্দিরের বর্ণনা করিয়া বিষ্ণুকাঞ্চীর কথা বর্ণনা করিব।

কৈলাসনাথের মন্দির।—শিবকাঞ্চী হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী। পরদিন প্রাতে বিষ্ণুকাঞ্চী যাইবার সময় আমরা কৈলাসনাথ দর্শন করি। পথপার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত হরিৎ বর্ণের তরঙ্গায়িত ধান্যক্ষেত্রের

মনোরম শোভা ; দূরে নারিকেল বৃক্ষসমূহ আকাশপটে চিত্রিত বলিয়া বোধ হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর কৈলাসনাথের মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইল। পথে দেখিলাম কয়েকটী ভস্ম-বিভূতিবিলেপিতা ভক্তিমতী তামিল নাটকোটী বণিক্-রমণী জলপাত্র মস্তকে বহন করিয়া পদব্রজে কৈলাসনাথদর্শনার্থ যাইতেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মন্দিরের গঠন-প্রণালী এবং প্রস্তরলেখমালা হইতে স্থির করিয়াছেন, ইহাই কাঞ্চীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দির, এবং প্রাচীনত্বে দাক্ষিণাত্যে ইহার স্থান মহাবলীপুরের মন্দিরের পরেই। একটী প্রাচীন শিলালিপিতে লিখিত আছে যে,—পল্লবরাজ রাজসিংহ কর্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত। সুতরাং কৈলাসনাথ রাজসিংহেশ্বর নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। Dr Hultzsch ৫৫০ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহ কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, স্থির করিয়াছেন। অধুনা মন্দিরটীর অবস্থা অতি শোচনীয়। বহুকাল সংস্কার হয় নাই; এবং আবর্জ্জনাপরিপূর্ণ খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি কালপ্রভাবে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। প্রত্যহ পুরোহিত দু'বার আসিয়া পূজা আরত্রিকাদি করিয়া চলিয়া যান। অন্য সময় মন্দিরদ্বার বন্ধ থাকে। প্রাতঃকালে পাণ্ডাজি কৈলাসনাথের পুরোহিতকে সংবাদ দিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়া মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করাইয়া আমাদিগকে কৈলাসনাথ দর্শন করাইয়াছিলেন।—মন্দিরের কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ। মন্দিরের বিমান চূড়া ও মণ্ডপম্ বৃহৎ। চারিদিকে প্রায় ৬০।৭০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। সম্মুখে একটী সরোবর। সমস্ত মন্দিরেরই বাহিরে ও ভিতরে অসংখ্য দেবলীলা ও পৌরাণিক কাহিনী খোদিত। এই সকল মূর্ত্তির কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য চমৎকার। ১৩।১৪ শত বৎসর পরেও এই মন্দির, ইহার নির্ম্মাতা পল্লবসম্রাট্ রাজসিংহের কীর্ত্তি গৌরব বিঘোষিত করিতেছে। এই মন্দিরের ভাস্কর্য্য, কারুকার্য্য, গঠন নৈপুণ্য ও প্রাচীনত্ব বিস্ময়জনক। ইহার গোপুরম্ নাই। মন্দিরের বিমানের গঠনপ্রণালীও একটু বিচিত্র রকমের (১)। Fergusson সাহেবের Indian Architecture গ্রন্থে ইহার চিত্র দ্রষ্টব্য। এই মন্দিরগাত্রে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় বহু লেখমালা খোদিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ তাহা হইতে উদ্ধার করিতেছেন। কাঞ্চী পল্লভ রাজগণের রাজধানী ছিল। একটী শিলালিপি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লভরাজকে পরাস্ত করিয়া কাঞ্চীনগরী অধিকার করেন। এই বিজয়ের স্মরণার্থ তিনি ব্রাহ্মণ ও নিরাশ্রয়

দরিদ্র আতুরগণকে অজস্র অর্থদান দ্বারা পরিতুষ্ট করেন। এবং কৈলাসনাথের চরণেও স্তূপাকার সুবর্ণরাশি উপঢৌকন দেন। এইরূপ অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব শিলালেখা হইতে আবিষ্কৃত হইয়া দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের অনেক অন্ধকারময়ী যুগকে আলোকিত করিয়াছে।

ত্রিবিক্রম বা বামন অবতারের মন্দির।—সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা বামনদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইহা একাম্রনাথের মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরসম্মুখে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। এই মন্দিরেরও গোপুরম্ প্রায় একশত ফুট উচ্চ। মন্দিরমধ্যে ত্রিবিক্রম বামনদেবের বিশাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। মূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত ৩০ ফুট উচ্চ, এক পাদ আকাশে উত্থিত আর এক পাদ বলির মস্তকে স্থাপিত। বামনদেবের এই বিশাল মূর্ত্তির কারু কার্য্যও মনোহর। তাঁহার পরিহিত বস্ত্রের ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত থাকে থাকে সুকৌশলে খোদিত। হঠাৎ দেখিলে বস্ত্র বলিয়াই ভ্রম হয়। কেহ কেহ বলেন এই মূর্ত্তি কাষ্ঠনির্ম্মিত। এরূপ বিশাল বামনমূর্ত্তি আমরা কখনও দেখি নাই। ভগবান্ ভক্ত বলিকে ছলনা করিবার জন্য ত্রিপাদে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া যে বিরাট্—বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এই মূর্ত্তি সেই বিরাট্রূপের প্রতিমূর্ত্তি। অর্চ্চক মহাশয় লম্বা বংশখণ্ডসংযুক্ত প্রকাণ্ড একটি মশাল জ্বালাইয়া যথাক্রমে বামনদেবের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আলোকিত করিয়া এই বিরাট্ মূর্ত্তির দর্শন করাইলেন, এবং কর্পূরালোকে আরত্রিক করিলেন। আমরা যুগপৎ বিস্মিত ভীত এবং ভক্তিপুলকিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম।

মেঘাকারস্থলাধীশং বামনং বলিবঞ্চকম্।
আশ্রিতাভীষ্টদাতারমাশ্রয়ে কপটোক্তিদম্॥

ত্রিবিক্রমদেবের পঞ্চধাতুনির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও লক্ষ্মীমূর্ত্তিও দর্শন করিলাম।

এই সকল দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা কাঞ্চীর পরাবিদ্যা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাঘব আইয়ার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলাম। আমাদের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে নিয়ম ছিল যে, আমরা যখন যেখানে যাইতাম তাহার পূর্ব্বেই সেই নগরীর Theosophical Societyর সভাপতি বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আমাদের পত্রাদি যাইত। আমরাও সম্পাদক মহাশয়কে পূর্ব্বেই একখানি পত্র লিখিয়া জানাইতাম—আমরা তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে তথায়

উপস্থিত হইব; এবং আমাদের পত্রগুলি তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রাখেন। ইঁহাদের অনেকের নামেই আমাদের নিকট পরিচয়পত্রও ছিল। মাদ্রাজী ভদ্রলোকগণ ভদ্রতা উদারতা এবং পরোপকারের জীবন্ত মূর্ত্তি। বিশেষতঃ যাঁহারা পরাবিদ্যা সমিতির সভ্য, তাঁহাদিগকে মাদ্রাজী ভ্রাতারা পরমাত্মীয়ের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। আমরা প্রাতে পৌঁছিয়াই দেব-দর্শনাদিতে ব্যস্ত থাকায়, আইয়ার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের সময় পাই নাই। আমাদের পত্রাদি লইবার জন্য পাণ্ডাজিকে পাঠাইয়া ছিলাম এবং সংবাদ দিয়াছিলাম যে তাঁহার সহিত বৈকালে সাক্ষাৎ করিব। আইয়ার মহোদয় বলিয়া পাঠান যে তিনি আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈকালে স্বয়ংই আমাদের ছত্রে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। আইয়ার মহাশয় এখানকার একজন প্রধান উকীল। মনে করিয়াছিলাম তাঁহার গৃহে যাইয়া বিলাতী আসবাবযুক্ত একটী Drawing room বা বৈঠকখানা দেখিব; কিন্তু তথায় গিয়া ডাকাডাকি করায় পরিবারস্থ একটী রমণী আসিয়া বলিলেন, 'আপনারা বসুন, তিনি সন্ধ্যা পূজায় বসিয়াছেন। সত্বরেই আসিবেন।' দাক্ষিণাত্যে রমণীর অবরোধ প্রথা নাই। সুতরাং তাঁহারা আগন্তুকগণের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন। অবশ্য কথা হইয়াছিল তামিল কি তেলেগু ভাষায়। আমাদের পাণ্ডা ইংরাজিতে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা বাহিরে আইয়ার মহোদয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম একটী বালক সুমধুর স্বরে বলিতেছে,—

শরীরাণি অনিত্যানি বিভবো নৈব শাশ্বতম্

তৎপরেই আরও মিষ্টি সুরে অপর বালক গাহিল, -

নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যং ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ॥

আইয়ার মহোদয়ের দুইটী পুত্র সুর করিয়া এই শ্লোকটী সকাল বিকালে আবৃত্তি করিয়া থাকে। বালককাল হইতেই এইরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পরক্ষণেই পূজা সমাপনান্তে বালক দুটীকে সঙ্গে লইয়া শুভ্রকেশ বৃদ্ধ আইয়ার মহাশয় করযোড়ে দীন ভাবে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে বলিলেন, 'আমি আপনাদের নিকট বড় অপরাধী। অপরাহ্নে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব প্রতিশ্রুত ছিলাম। আদালত হইতে ফিরিতে অত্যধিক বিলম্ব হওয়ায় মনে করিলাম সন্ধ্যা বন্দনা সারিয়াই যাইব। হয়ত আপনারা আমার প্রত্যাশায় বসিয়াছিলেন?' আমরা বলিলাম, 'আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদের বসিয়া থাকিলে চলে না। আমরা দেবদর্শনে বাহির্গত হইয়াছিলাম। আপনি

আমাদের বাসায় যাইলেও আমাদের সাক্ষাৎ পাইতেন না।' যাহা হউক, তাঁহার সহিত আলাপে পরমানন্দিত হইলাম। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বয়স ১১ ও ৮ বৎসর। উভয়ে কৌপিনপরিহিত। এ স্থলেও মাদ্রাজের অন্যান্য নগরে দেখিলাম বাল্যকাল হইতেই শেখান হয় যে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল অর্থ উপার্জ্জন নহে; ধর্ম্ম এবং মোক্ষই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। স্কুল কলেজের ছাত্রেরাও অধিকাংশই বিলাসিতা-বর্জ্জিত। স্কুলে যাইবার সময়েও নগ্নপদ এবং মাথায় তিলক দিয়া মোটা কাছাখোলা কাপড় পড়া এবং গায়ে একটী উত্তরীয় অথবা মোটা পিরাণ।

মাথায় চুল সামনে কামান। মাদ্রাজী ছাত্রগণ আচার-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ও বিলাসী নহেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টে দেখিয়াছি হিন্দুজজ এবং উকিলগণও অনেকেই চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করেন না এবং ধুতির উপরে গাউন পরিধান করিয়া থাকেন। কপালে তিলক এবং মস্তকে পাগড়ী ব্যবহার করেন। শুনিলাম মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রথম দেশী জজ মুথুস্বামী আইয়ার যখন নিযুক্ত হয়েন, তখন খালিপায়েই এজলাসে বসিতে যাইলে সাহেব জজ আপত্তি করিয়া বলেন 'জুতা ও মোজা ব্যবহার করিতে হইবে।' তিনি উত্তরে বলেন 'চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবহার আমার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, সুতরাং আমি চাকরী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু নিজের জাতীয়তা ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহি।' হাইকোর্টে মুথুস্বামী আইয়ারের মর্ম্মরনির্ম্মিত যে প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার দেহত্যাগের পর স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বোঝা যায় তিনি কিরূপ বেশে হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিতেন। আইয়ার মহোদয় জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি আপনাদের কি সেবা করিতে পারি?' আমরা বলিলাম 'আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। কেবল কল্য যখন বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শনে যাইব সেই সময় আমাদের আসবাবগুলি চত্রম্ বা ধর্ম্মশালায় না রাখিয়া আপনার বাড়ীতে রাখিবার অনুমতি দিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।' তিনি বলিলেন 'তাহাই করিবেন।'

রাত্রে কচ্ছপেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তির উৎসব দর্শন করিয়াছিলাম সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কাঞ্চীতে এখনও বেদ বেদান্তের চর্চ্চা যথেষ্ট আছে। আইয়ার মহোদয়ের বাড়ীর নিকটেই একটী বেদ-বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিয়াছিলাম। কয়েক জন ছাত্র একত্রে সুর করিয়া মধুর স্বরে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন।

বিষ্ণুকাঞ্চী ।

পরদিন প্রত্যুষে (২৫ শে ফাল্গুন । ১৩১৫ বঙ্গাব্দে) আমরা ৮০ বারআনা ভাড়ায় একটী ঝট্‌কা গাড়ী ভাড়া করিয়া বিষ্ণুকাঞ্চী যাত্রা করিলাম। কথা হইল আমরা কৈলাসনাথ দর্শন করিয়া বেগবতীনদীকায়ারোহণ তীর্থে স্নান করিব। হাসপাতালে গিয়া প্লেগ পাশ্‌পোর্ট সহি করাইয়া বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় ইন্দ্রতীর্থ এবং ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া শিব-কাঞ্চীস্থ ছত্রে ফিরিয়া আসিব। ঝট্‌কা একরূপ সংস্কৃত গো-গাড়ী। এই ভ্রমণে আমাদের প্রাতঃ ৫॥টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত লাগিয়াছিল সুতরাং গাড়ী-ভাড়া সুলভই বলিতে হইবে। গাড়োয়ানটী জাতিতে গোয়ালা এবং বড়ই বচন-বাগীশ, সমস্ত রাস্তা আমাদিগকে বকাইয়াছিল। তাহার প্রধান কথা—সে অতি কম ভাড়ায় স্বীকার করিয়াছে; এত সস্তায় আর গাড়ী পাওয়া যাইবে না; এই কথাই নানারূপে পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল। মান্দ্রাজে গাড়ীভাড়ার নিরিখ ঐ রূপই। সে ঠকে নাই। আমরা কৈলাসনাথ দর্শন করিয়া বেগবতী-তীরে আসিয়া স্নান করিলাম। নদীর গর্ভ শুষ্ক। নদীর ধারামধ্যে একটী প্রধান পুষ্করিণী। ইহার প্রসিদ্ধ কায়রোহণতীর্থ অর্থাৎ এইস্থানে এখানে স্নান করিলে পুণ্যসঞ্চার হয়। পুষ্করিণীর চারিধার সানাইটি পস্তরের ঘাট বাঁধান। এই পবিত্রতীর্থে স্নানানন্তর নদীতীরে কয়েকটী মন্দিরে নানা দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলাম।

তীর্থোৎপত্তির পৌরাণিক বিষয়।

"কাঞ্চী-মাহাত্ম্যে" লিখিত আছে কোন সময় জগৎপিতামহ ব্রহ্মার উপর সরস্বতী দেবী অসন্তুষ্ট হইয়া পৃথক্ স্থানে বাস করিতে থাকেন। এই সময় প্রজাপতি পুণ্যতীর্থ কাঞ্চীপুরে—যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কাঞ্চীপুরে একটী যজ্ঞ করিলে শত যজ্ঞের ফল হয় বলিয়া তথায় যজ্ঞস্থান নিরূপিত হইল। সেই যজ্ঞের উত্তরদ্বার নারায়ণ বন, পশ্চিমদ্বার বরিঞ্চাবর, দক্ষিণ দ্বার চিঙ্গলিপুত ও পূর্ব্ব দ্বার মহাবলী পুরম্। সরস্বতী দেবী নারদপ্রমুখাৎ ব্রহ্মার যজ্ঞারম্ভসংবাদ শ্রবণে এবং সরস্বতী দেবীকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন শ্রবণে সাতিশয় কুপিতা হওয়া নদীরূপ ধারণ করত যজ্ঞস্থল ভাসাইতে উদ্যতা হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু নদীর বেগরোধ করিলে অন্তঃ-সলিলা হইয়া নদী প্রবাহিতা হইলেন।

তখন বিষ্ণু অনন্যোপায় হইয়া উলঙ্গাবস্থায় নদীর সম্মুখে পতিত হইলে, সরস্বতী দেবী লজ্জায় অধোবদনা হইয়া যজ্ঞধ্বংসাভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। সরস্বতী দেবী নিবৃত্ত হইলে বিষ্ণু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন যে অন্তঃসলিলা সরস্বতী-ধারা গঙ্গাসদৃশ পুণ্য তীর্থ হইবে। ইহাই বেগবতীর ধারা। ইহারই স্থানীয় নাম পালার। বেগবতী ধারা বর্ষাভিন্ন বারমাসই অন্তঃসলিলা; বর্ষাকালে নদী জলপূর্ণা হয়, তাই পূর্ব্বোক্ত সরোবরে তীর্থস্নানের ব্যবস্থা। অন্য সময় প্রান্তরের নিম্নস্তর দিয়া বেগবতী গুপ্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। (কাঞ্চীতে যে জলের কল আছে তাহা এই পালার নদীর শুষ্ক গর্ভেই স্থাপিত। নদীগর্ভস্থ দুইটী প্রকাণ্ড কূপ হইতে সহরের জন্য অনবরত জল উত্তোলিত হইয়া থাকে; অথচ অন্তঃসলিলা নদীর গর্ভ বলিয়া জল নিঃশেষিত হয় না। কলে জল উত্তোলিত হইয়া—নলযোগে 'শিবকাঞ্চীর বড় জলের চৌবাচ্চায় প্রেরিত হয়, সেখান হইতে সহরে সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়া থাকে)। যাহা হউক, প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। যথাসময়ে যজ্ঞে ব্রহ্মা চরম আহুতি প্রদান করিলে "ভোক্তারং সর্ব্বযজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরঃ" ভগবান্ মহাবিষ্ণু শ্রীশ্রীবরদরাজরূপে যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মা ও ঋষিবৃন্দকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। ব্রহ্মার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ঋত্বিক্ এবং দেবগণ "সর্ব্বভূতহিতক মনায়" নারায়ণের স্তব করিলেন। সেই সময় হইতেই শ্রীবরদরাজ স্বামী অর্চ্চা বা প্রতিমাকারে অবস্থিত হইয়া ভক্তগণের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মহিমাসূচক নানাপুণ্যকাহিনী পুরাণে এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য ও অন্যান্য ভক্তচরিতে বর্ণিত আছে।

আর যিনি ভক্তিমান্, যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও সংযত হইয়াছে, যিনি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তীর্থভ্রমণ করিয়া থাকেন তিনি শ্রীবরদরাজের শ্রীমূর্ত্তির অনুপম মাধুরী দর্শন করিয়া তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তের এই মধুর বরদ শঙ্খ চক্র গদা শোভিত মূর্ত্তির অনুপমরূপ ও করুণামৃতবর্ষী মুখারবিন্দ 'জনম অবধি মরণ পর্য্যন্ত' দর্শন করিলেও 'নয়ন তিরপিত, হয় না। শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের পরমগুরু পরমভক্ত শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্য যখন শ্রীরঙ্গমধামে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কহিলেন "আপনার অদর্শনে আমরা কাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিব?" যামুন মুনি কহিলেন "বৎস, তোমরা কেহই উদ্বিগ্ন হইও না। শ্রীরঙ্গনাথ রহিয়াছেন। তিনি তোমাদের আশ্রয় দিয়াছেন, দিতেছেন এবং দিবেন। সর্ব্বদাই তাঁহাকে দর্শন করিও; মধ্যে মধ্যে তিরুপতিস্থ

বালাজী এবং কাঞ্চীপুরস্থ বরদরাজকে দর্শন করিও।" শ্রীরঙ্গমনারায়ণের পরম ধাম তিরুপতি—নারায়ণের পাদপদ্ম প্রাপক চরম শ্লোক এবং বরদরাজ তারক মন্ত্র।

"শ্রীশ্রীবরদরাজ তারক মন্ত্র" যামুন মুনির এই কথা হইতে কাঞ্চীতীর্থের মাহাত্ম্য ও বরদরাজবিগ্রহের অদ্ভুত প্রভাব অনুমিত হয়। তারক মন্ত্রের প্রভাবে জীব পরমপদ লাভ করেন। বরদরাজের সেবায় আত্মসমর্পণ করিলে ভক্ত কিরূপে সত্বরে পরমপদ লাভের অধিকারী হয়েন তাহার পরিচয় আমরা শ্রীরামানুজ স্বামী ও কাঞ্চীপূর্ণ প্রভৃতি ভক্তগণের জীবনেতিহাসে পাইয়া থাকি। করুণাময় শ্রীভগবান্ জীবের উদ্ধারার্থ ১। পরব্রহ্ম (নির্গুণ), ২। পরব্যূহ (বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ যাহাকে চতুর্ব্যূহ বলা যায়) ৩। বিভব (শ্রীরামকৃষ্ণাদি অবতার), ৪। অন্তর্যামী, ৫। অর্চ্চাবতার বা শ্রীমূর্ত্তি—এই পঞ্চ স্বরূপে ভক্তাভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ অর্চ্চাবতার বা শ্রীমূর্ত্তির সেবা। জীব প্রথমতঃ অন্তর্যামী বিগ্রহের পূজার অধিকারী হয়েন না। তাই তাহার মূর্ত্তি বা অর্চ্চা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা করার ব্যবস্থা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন :—

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥

ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ অর্চ্চা বা প্রতিমায়, স্থণ্ডিলে (মন্ত্রাদি শোধিত বেদীতে), অগ্নিতে অথবা সূর্য্যে, জলে ও হৃদয়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া অকপট ভাবে পত্র-পুষ্পাদি যথাশক্তি উপচার দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবেন। সেই প্রতিমা অষ্ট-বিধা,—

শৈলী দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা অষ্টবিধা স্মৃতা॥

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা (মৃত্তিকা-চন্দনাদি নির্ম্মিত), লেখ্যা অর্থাৎ চিত্রপট, বালুকা-নির্ম্মিত, রত্ননির্ম্মিত এবং মনোময়ী।

অর্চ্চাদিষু যদাযত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ।
সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্ব্বাত্মাহমবস্থিতঃ॥
এবংক্রিয়াযোগে পথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্।

শ্রীমদ্ভাগবৎ ১১ স্কন্দ, ২৭ অধ্যায়।

প্রতিমা স্থণ্ডিল প্রভৃতি যখন যে আধারে শ্রদ্ধা হয় তখন সেই আধারেত আমাকে অর্চ্চনা করিবে। যেহেতু আমি সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্ব আত্মাতে অবস্থিই আছি।

পুরুষ এই প্রকার বৈদিক বা তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়া আমার প্রসাদে অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

জগজ্জননী মহামায়াও তাঁহার পিতা হিমালয়কে বলিয়াছিলেন,—

রূপাণ্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কন্যাদিকানি চ।
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু পূর্ব্বং মুক্ত ভবালয়ে॥
অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং যে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।
ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
স্বল্পং্শালোচয়েৎ সূক্ষ্মং রূপং মে পরমব্যয়ং॥

হে পিতঃ! উল্লিখিত (প্রতিমা) এবং তোমার প্রত্যক্ষ আমার কন্যামূর্ত্তি এই সমস্তই আমার স্থূলরূপ। এই স্থূল রূপের অভিধ্যান না করিয়া কেহ আমার সূক্ষ্মরূপের ধ্যান করিতে পারে না—যে সূক্ষ্মরূপ দর্শন করিলে জীব নির্ব্বাণ কৈবল্য লাভ করে। এই হেতু মুক্তিকামী সাধক প্রথমে অবশ্য আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করিবে এবং যথাবিধানে ক্রিয়াযোগ দ্বারা এই সমস্তরূপের সম্যক্ উপাসনা করিয়া ধীরে ধীরে আমার অব্যয় পরম সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনা করিবে।

তাই সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব বলিয়াছেন—'জগজ্জননী জীবের প্রাণের ব্যথা বুঝিয়াছেন; ধরিতে হইবে বলিয়াই ধরাধর-কুমারী নানারূপে ধরা দিয়াছেন। তাই আজ ধরাতলে বসিয়াও তুমি আমি তাঁহাকে ধরিবার জন্য ঊর্দ্ধে কর প্রসারণ করিতে সাহসী হইয়াছি।"

শ্রীভগবানের অখণ্ড অনন্ত অদ্বিতীয় অন্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী রূপের ন্যায় তাঁহার অসংখ্য সাকার রূপগুলিও সনাতন। যিনি সর্ব্বভূতে আছেন সেই সর্ব্বকল্যাণগুণের আকর করুণাময় অনন্তশক্তি শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রতিমায় প্রকট হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বকালে ভক্তমনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। কাঞ্চীপতি বরদরাজস্বামী ব্রহ্মাকে বলিয়া-ছিলেন—

অর্চ্চাত্মনাবতীর্ণোঽস্মি ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া।
আত্মামর্চ্চাবতারং মে নিত্যমর্চ্চয় মুক্তয়ে॥
ঈক্ষণধ্যানসংস্পর্শৈর্ম্মৎস্যকূর্ম্ম-বিহঙ্গমাঃ।
পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ॥
যজমানস্য তে ব্রহ্মন্নধ্বরাগ্নৌ চ সংচিতে।
অহমাবির্ভবিষ্যামি বরদঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥
তথাবিধাং মৎপ্রতিমাং তত্র ত্বং স্থাপয়িষ্যামি।
তদাপ্রভৃতি তদ্রূপং স্থাপয়িষ্যন্তি মামিহ॥

ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া আমি অর্চ্চাস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। হে কমল-যোনি! যাহাতে জীবগণ নিত্য অর্চ্চনা করিতে পারেন। যেরূপ মৎস্য কূর্ম্মাদি জীব সকল নিজ অপত্যগণকে পালন করিয়া থাকে অর্চ্চারূপী আমিও সেইরূপ জীবগণ আমাকে ঈক্ষণ ধ্যান সংস্পর্শ করিলে তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকি। যেরূপে আমি তোমার যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বদেহিগণের বরদ হইলাম। সেই রূপ প্রতিমা নিম্মাণপূর্ব্বক স্থাপন কর, আমি সর্ব্বদেহীর বরদ এই হইয়া কাঞ্চীপুরীতে অবস্থান করিব।

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বভূতেই আছেন তাঁহার মূর্ত্তির মধ্য দিয়া জীবের প্রতি কৃপা করা কিছুই বিচিত্র নহে। তিনি যদি স্বরূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ মায়াতীত ও গুণাতীত অবস্থায় থাকেন তবে ক্ষুদ্র জীব কেমন করিয়া তাহা ধারণা করিবে। তাই করুণা করিয়া "ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া" তিনি প্রতিমার মধ্যে প্রকট হইয়া থাকেন। ভগবৎবিগ্রহ রুচিজনকত্ব শুভাশ্রয়ত্ব অশেষলোকশরণত্ব এবং অনুভবত্ব প্রভৃতি অশেষ কল্যাণগুণের আকর। তাই মানবের শ্রীমূর্ত্তির ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন ও সেবা করিতে করিতে ভগবৎ ভজনে রুচি হয় ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাহার পর ক্রমশঃ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত স্থির হয়, চিত্ত স্থির হইলে অন্তর্যামী বিগ্রহ অন্তরে ও মূর্ত্তিতে তাঁহার অনন্ত মহিমাসূচক অনন্তরূপ দেখাইয়া তন্ময় করিয়া দেন। তখন ভক্ত মায়ামুক্ত হইয়া থাকেন। তাই শ্রীযামুনাচার্য্য বলিয়াছেন—শ্রীবরদরাজ তারকময়; তিনিই তোমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, দিতেছেন এবং দিবেন। যুগে যুগে শ্রীমূর্ত্তির সহিত সেবক ভক্তগণের নানা লীলা খেলা এবং তাঁহারা কিরূপে মায়ামুগ্ধজীবকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিয়া থাকেন তাহা ভক্ত-মাল গ্রন্থে ও সকল দেশের ভক্তচরিত্রে লিপিবদ্ধ আছে। অধুনাতন কালেও

পরমহংসদেবের জীবনেও শ্রীমূর্ত্তির সহিত মনুষ্যবৎ জীবন্ত ব্যবস্থার এবং লীলাখেলার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বরের শ্রী৺কালী মাতা কথা কহিতেন এবং তাঁহার যখন যাহা সন্দেহ হইত তাহা ভঞ্জন করিয়া দিতেন; ও রামলালা নামক রামচন্দ্রবিগ্রহ কিরূপে জনৈক রামায়ত ভক্ত বাবাজীর নিকট বাৎসল্য ভাবে সেবা গ্রহণ করিতেন এবং পরিশেষে তিনি পরমহংসদেবের নিকট সেবা পাইবার জন্য রহিয়া গেলেন ও নানা লীলা খেলা খেলিতেন তাহার কাহিনী ভক্ত পাঠক "শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গে" পাঠ করিবেন। আজিও অধিকারী ভজনপরায়ণ ভক্তগণ প্রতিমার সন্মিয় দেবদেবীর দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। পন্থায় "মাস্তার দুর্গাপূজা" "গাঁজায় দম" প্রভৃতি সত্য ঘটনামূলক উপাখ্যানে পাঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। যামন মুনি বলিয়াছিলেন যে—শ্রীবরদারাজ তারকমন্ত্র। তাই রামানুজসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য ও ভক্তগণ অনেকেই কাঞ্চীর শ্রীবরদারাজ স্বামীর সেবায় জীবন যাপন করিয়া পরমাগতি লাভ করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ স্বামীর জীবনের প্রথমভাগ এই কাঞ্চীপুরীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি এখানেই যাদবপ্রকাশ নামক শুষ্কজ্ঞানবাদী পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। ভক্ত রামানুজ শ্রুতিসমূহের যাদবপ্রকাশের জ্ঞানপথের ব্যাখ্যা ভক্তিপক্ষে খণ্ডন করিতেন। ইহাতে যাদবপ্রকাশ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলে কাঞ্চীপূর্ণ নামক জনৈক শূদ্র ভক্ত যিনি বরদরাজের সেবায় দিবারাত্র যাপন করিতেন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ শ্রীবরদরাজকে চামর ব্যজন করিতেন এবং বরদরাজ তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে বলিলেন, "ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁহার সেবাই পরম পুরুষার্থ। তুমি প্রতিদিন এক কলস শালকূপের বারি শ্রীবরদরাজের অর্চ্চনার্থ স্বয়ং আনয়ন করিও। অতিশীঘ্রই বরদরাজ তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।" কিন্তু নানারূপ শাস্ত্র অধ্যয়নেতে রামানুজের চিত্ত সন্দেহে উদ্বেলিত হইলে তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে বলিলেন "আপনি শ্রীবরদরাজকে কহিয়া আমার সন্দেহ দূর করিয়া দিলে আমি শান্তি পাই।" কাঞ্চীপূর্ণ কহিলেন "আমি প্রভুকে এ বিষয় নিবেদন করিব।" পরদিবস রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন "বৎস। তোমার সম্বন্ধে গত রজনীতে শ্রীবরদরাজ কহিয়াছেন:—

অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে॥

মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম।
মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিম স্মৃতিরিষ্যতে॥
দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদং।
পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ং।
ইতি রামানুজাচার্য্যায় ময়োক্তং বদ সত্বরম্॥

"আমিই জগৎকারণ প্রভৃতির কারণ পরব্রহ্ম। হে মহামতি! জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই একমাত্র মুক্তির কারণ, মদীয় ভক্তগণ অন্তিম সময়ে আমার স্মরণ করিতে না পারিলেও তাঁহাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। দেহত্যাগ হইলেই আমার ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাত্মা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি এই সকল কহিয়াছি ইহা শীঘ্র রামানুজকে গিয়া বল।" বরদরাজের অনুজ্ঞায় মহাপূর্ণ প্রভৃতি গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া রামানুজের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল। এই কাঞ্চীপুরেই শ্রীরামানুজ স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবরদরাজের শ্রীপাদস্পর্শ করিয়া মন্দিরসম্মুখস্থ অনন্ত সরোবরের তীরে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তন্মধ্যে বিত্তৈষণা দারৈষণা প্রভৃতি যাবতীয় এষণা আহুতি দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ-শিষ্য মহানুভব কুরেশের চক্ষুদ্বয় রাজা ক্রিমিকণ্ঠ চোল কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইলে তাহার গুরুদেব তাঁহাকে বলেন "শ্রীবরদরাজের শ্রীচরণে তোমার নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিয়া লও। তিনি নিশ্চয়ই তোমার অন্ধতা নাশ করিবেন।" বরদরাজ কিরূপে কুরেশের চক্ষুদ্বয় দান করিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন তাহা রামানুজচরিতে বর্ণিত আছে। শ্রীবরদরাজ স্বামীর মাহাত্ম্যসূচক এইরূপ অসংখ্য কাহিনী ভক্ত-চরিতে বর্ণিত আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল। বারান্তরে বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দিরাদির কথা বলিব। অদ্য শ্রীশ্রীযামুনাচার্য্যের ভাষায় শ্রীবরদারাজের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বিদায়-গ্রহণ করি।

যস্য প্রসাদকণয়া বধিরঃ শৃণোতি।
পঙ্গুঃ প্রধাবতি জবেন চ বাক্তি মূকঃ॥
অন্ধঃ প্রপশ্যতি সুতং লভতে চ বন্ধ্যা।
তং দেবদেবং বরদং শরণং গতোঽস্মি॥

ক্রমশঃ।

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

বিগ্রহ-পূজা।

কাল রাত্রে স্বামীজী অনন্তরামের সহিত সাক্ষাৎ হয়। অনেক দিনের পর প্রিয়জনের সাক্ষাৎ যে কত চিত্ত বিনোদন করে তাহা সকলেই জানেন। তিনি যে কটি কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সন্নিবেশিত করা হইল। অনেক গুলি কথার ভাব এখনও বুঝিতে পারি নাই।

স্বামী।-- আজকাল হিন্দুশাস্ত্র লইয়া অনেক আলোচনা হইতেছে বটে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মস্থানটী এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। আংশিক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন কোন তত্ত্বের সম্বন্ধে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ আলোক প্রদানে সক্ষম হইতেছেন বটে, কিন্তু মূল ভাবটী বিস্মৃত হওয়ায় তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈষ্ণব-শাস্ত্র লইয়া অনেক লেখালেখি চলিতেছে। লেখকগণের অভিপ্রায় মূলতঃ এই যে বৈষ্ণব ধর্ম্মটী একটী বিশেষ অভিনব পদার্থ হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিকট সম্বন্ধ নাই।

আমি।—তাহাতে কি দোষ উপস্থিত হইতেছে?

স্বামী।—মানবদেহ লইয়া বিচার করিলে আমার ভাবটী তুমি বুঝিতে পারিবে। মানবদেহের স্বরূপ তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, গতি ও ধর্ম্ম,—সনাতন ধর্ম্মে যেরূপ ভাবে বিবৃত হইয়াছে আমার বোধ হয় জগতে আর কোথাও সেরূপ করা হয় নাই। একদিকে প্রাকৃত জগতের সহিত মানবদেহের নিকট সম্বন্ধ। সমস্ত প্রকৃতি মানবদেহ রচনা করিবার জন্যই সদা সচেষ্ট। উদ্ভিদ পশু দেবতা পিতৃ প্রভৃতি স্তরে যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইল, সেই স্রোতগুলিকে সমানুপাত ও ঘন করিয়া লইয়া মানবদেহের অভিব্যক্তি হয়। উদ্ভিদে চৈতন্যের সামান্য ভাবে স্ফুরণ, পশু-জীবনে কামনার অভিব্যক্তি, ও অপর দিকে দেবতাগণের পরাভাবের ব্যঞ্জনাশক্তি, এইরূপ বিভিন্ন শক্তি ও ভাবগুলিকে লইয়া মানবদেহ গঠিত হইয়াছে। কাজেই হিন্দুপুরাণে মানবের প্রকৃত ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া 'সমুদ্রমন্থন' বৃত্রসংহার হইতে স্থূল শক্তিগুলির সমানভাব নির্ণীত হইয়াছে। আমরা বুঝিনা যে আমাদের ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে গিয়া এ সকল অসম্ভব কথা অবতারণা করা হইল কেন। ভগবানের লীলা বর্ণনা করাইত ভাগবতের উদ্দেশ্য, তবে তাহার ভিতর পৃথু, ভরত, বেন রাজার উপাখ্যানগুলি কেন।

সেইরূপ চণ্ডীতে উক্ত ঘটনাগুলির সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত যে কি সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে পারি না।

যেমন বীজের অন্তর্গত শক্তিটী আপনা আপনি চালিত হইয়া শাখাপল্লব-সমন্বিত বৃক্ষরূপে পরিণত হয় ও ঐ বৃক্ষটীই বীজের আত্মপ্রকাশ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র ও শাস্ত্রোক্ত ঘটনাগুলি সর্ব্বভূত গূঢ়তর ভগবদ্ভাবের আত্মবিকাশ ও আত্মাভিব্যক্তি; ঐ অভিব্যক্তি সমস্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়া, প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্ব ও শক্তিগুলিকে অনুস্যূত করিয়া এক ভগবানের উদ্দেশে তাঁহার দিকে ছুটিতেছে। এই উদ্দেশ্যরূপ পরতত্ত্বটি না বুঝিলে এই অভিব্যক্তির কোন অংশই বুঝা যাইবে না। যেমন আমাদের শারীরিক ও মানসিক কার্য্যগুলি কেবল বাহির হইতে দেখিলেই বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উদ্দেশ্যটী বুঝিতে পারিলে সেই সমস্ত কার্য্যগুলি এক শৃঙ্খলার অন্তর্গত হইয়া পরস্পর সম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হয়—সেইরূপ ভগবানই হিন্দুশাস্ত্রে ও শাস্ত্রজনিত ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা ও শক্তিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য, গতি-লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে সমস্ত ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্নতা-বিরোধ ও ভেদভাব ত্যাগ করিয়া, এক মহান চৈতন্যময় একতাসূত্রে গ্রথিত হইয়া মানবের ক্রমাভিব্যক্তির পথে আলোক প্রদান করে। তখন প্রকৃতির আপাত প্রতীয়মান নিয়ম নিয়মগুলি—আর নিয়ম ও নিষ্করুণ বলিয়া বোধ হয় না। প্রাকৃতিক স্রোতগুলি তখন পরমাত্মার ভাবের ব্যঞ্জক হয়।

আমি।—আপনি যে নিয়মতার কথা বলিলেন ও যাহার দৃষ্টান্ত আজকাল প্রতীচ্যমস্তে প্রতিদিন মানবের হৃদয়ফলকে অঙ্কিত হইতেছে, সেটি কি করিয়া পরম প্রেমময় ভগবানের ব্যঞ্জক হইতে পারে?

স্বামী।—এই খেলাটী বুঝিতে পারিলে ভগবানের কালরূপের ও মহামায়া আত্মার কালীরূপের খেলা বুঝিতে পারিবে। এ কথাটি পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ বল দেখি কোন কোন্ ভাব সংসিক্ত না হইলে প্রকৃতির ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত ভাবটীকে গ্রহণ করা যায় না? সাদা কথায় কি প্রতি-বন্ধকের জন্য আমরা অভিব্যক্ত ভাবটী গ্রহণ করিতে পারি না। আপেলটী মাটিতে পড়িল, তাহাতে কেমন করিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার হইল বলিতে পার? নিউটন যদি আমাদের মত 'ছোট' আমিটি লইয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি পাকা আপেল লইয়া তৃপ্ত হইয়া থাকিতেন, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার হইত না। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভিতর যদি কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা

বুদ্ধি না থাকিত, তাহা হইলে একটী আপেল পড়া হইতে সার্ব্বজনীন শক্তির তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন না। আমাদের মত হইলে তিনি "পড়েত পড়ে" বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহার কারণ খুঁজিতে যাইতেন না।

এখন বুঝ, সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যাভাব কেন ফুটা চাই। জীবনে সর্ব্বঘটনার মধ্যে আমির বিশেষ বুদ্ধি বা অহংকারের মোহ না টুটিলে সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি আসিবে না। এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই মৃতব্যক্তি দেখিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের হৃদয়ে সমস্ত জগতের ধ্বংসসম্ভাবটী ফুটিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবিনশ্বর তত্ত্ব আছে কিনা জানিতে ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। আমরাত তাহা করি না প্রতিদিন মৃত্যুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমরা ত মৃত্যুর সাহায্যে অমৃতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে যাই না। মৃত্যু যে জীবের ভেদভাবগত মোহ হইতে প্রসূত তাহাও বুঝিতে পারি না। সেই জন্য আমাদের উন্নতি এত মন্দ গতিতে হইতেছে; জন্মের পর জন্ম আমরা যেন এক ভাবেই রহিয়া যাইতেছি। কিছুতেই যেন মোহ ভাঙ্গিতেছে না, কিছুতেই যেন প্রকৃতি দেবীর প্রিয়তম শিক্ষা বা সর্ব্বাত্মিকতার মহাভাবটী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না। এই খেলা যে ভগবানের সুতরাং এই খেলার ভিতর যে তাঁহার কিছু আছে তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

তারপর আমাদের 'আমি' জ্ঞানটী এত ছোট করিয়া রাখি যে, সে 'আমি'র ভিতর বড় ভাব আসিতে পারেন না। আমি যে ভগবানের দাস বা আধার ক্ষেত্র, আমার সহিত ভগবানের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, আমার ভিতর দিয়া—প্রকটিত খেলাগুলির ভিতর দিয়া—যে বাস্তবিক ভগবান্ প্রকটিত হইতেছেন ও তাঁহার মহিমার অভিব্যক্তি হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না, কেন বলিতে পার? ভোগবুদ্ধিই ইহার কারণ। আমরা 'আমি'টিকে বাহিরের বস্তু দিয়াই মাপি। বাহিরে সর্ব্বাত্মিকা ভাব সিদ্ধ হয় নাই; বিচ্ছিন্ন ভেদ ভাব লইয়াই ত আমাদের বাহিরের খেলা; সুতরাং বাহিরের বিচ্ছিন্ন ভাবটিকে আমিতে আরোপ করিয়া, সুখের সঙ্গে সুখী, দুঃখের সঙ্গে দুঃখী হইয়া, হাসিতে কান্নাতে জীবন অতিবাহিত করিয়া যাই।

আমি।—এই দুটীকেই কি আবরণ বিক্ষেপ বলে?

স্বামী।—হাঁ। আমিটি ছোট বলিয়া আবরণ শব্দে আচ্ছাদন হইয়া যায় প্রকৃতির খেলাতে আমিটীকে হারাইয়া ফেলি। আঃ—সমন্তাৎ বরণ—সর্ব্ব ভাবই সেই পরমাত্মার বরণের জন্যই খেলিতেছে, ইহাইত আবরণ।

সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানকে আঁকার জন্য ও তাঁহার পদ প্রাপ্তির জন্যই ত প্রকৃতির প্রয়াস। বিশেষ ভাবে 'আমি'টার সংস্থাপনই 'বিক্ষেপ' তাহা ভুলিয়া গিয়া অথবা বিচ্ছিন্নতার মোহে আমিটী টুকরা টুকরা করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিই। ভোগের সময় এক আমি, যোগের সময়—অন্য আমি, সুখের সময় এক আমি, দুঃখের সময় অন্য আমি, সুতরাং আমরা আমির ঘন অবিনশ্বর সত্তা দেখিতে পাই না। আমরা ভুলিয়া যাই যে আমির পরম বিশেষতা কেহই নষ্ট করিতে পারে না। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড আমির ভিতর ডুবাইয়া দিলেও আমির কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, কেননা আমি যে তিনি। এই দুটী তত্ত্ব যদি কতকটা বুঝিতে ও ভিতরে ফুটাইতে পার, তবে হিন্দু বিগ্রহতত্ত্বের আভাস পাইবে। তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতিগুলির ভিতরকার তথ্য এইরূপ।

আমি। কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলুন।

স্বামী। তন্ত্রোক্ত পূজায় দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত সাধককে শুদ্ধ অহংজ্ঞানে স্থির হইতে হয়। এজন্য এ অবস্থায় সোঽহং ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম-সংস্কার ত্যাগ করিয়া আমিটীকে পরমাত্মরূপে স্থাপিত করিতে হয়। ঐ রূপে না আসিতে পারিলে তত্ত্ব প্রভৃতির শুদ্ধি ও সেই শুদ্ধ তত্ত্বগুলিকে ভগবৎ-চৈতন্যের বিকাশের জন্য নিয়োজিত করা যায় না। যে তত্ত্বে যতটুকু অস্মিতা জ্ঞান থাকে, সেই তত্ত্বটীকে আমির বাহিরে ন্যস্ত করা যায় না। ইহাই ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মের মূল মন্ত্র। যে বস্তু শক্তি বা গুণটাকে আমার বলিয়া মনে হয়, সেটীকে আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। অপর পক্ষে যেটিকে আমরা সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানি, সুতরাং যাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র আমির স্পৃহা আসিতে পারে না, তাহাই আমরা ত্যাগ করিতে পারি, ও সেই ত্যাগের ফলটী অন্য জীবে আসিতে পারে। স্থূল ভগবৎমূর্ত্তিকে সজীব করিতে হইলে তাহাতে সমস্ত তত্ত্বগুলি ন্যস্ত করা চাই। ঐরূপ ন্যাসের ফলে মূর্ত্তি সর্ব্বাত্মক ভাব প্রাপ্ত হইয়া—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় হয় ও সর্ব্বজীবের কল্যাণপ্রদ হয়। আমিটীকে সোঽহং ভাবে রাখিয়া সাধককে অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে তত্তৎ ক্রিয়া-শক্তিগুলিকে চিন্ময় বিগ্রহ গড়িবার জন্য ত্যাগ করিতে হয়। তারপর ঋষ্যাদি ন্যাস ও তত্ত্বন্যাস করিতে হয়। তারপর সূর্য্য-অগ্নি-সোমাত্মক অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্মভাবের অহং-কেন্দ্রগুলিকে ভগবদ্‌ভাবে ন্যাস করিতে হয়। তাহার পর ক্ষেত্রজ্ঞ বা সোঽহংরূপ শক্তির সাহায্যে, অভেদ প্রেমের সাহায্যে আপনার ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবটীকেও অর্পণ করিতে হয়। ইহাই তন্ত্রোক্ত ভূতশুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

(২)

আমি। আপনি যে সকল কথাগুলি বলিলেন তাহা হইতে মনে অনেকগুলি প্রশ্নের উদয় হইতেছে। প্রথমতঃ বিগ্রহপূজার আবশ্যকতা কি?

স্বামী। আমাদের ভাবরাশি ও সুতরাং কর্ম্ম প্রভৃতি যে ভাবের সাহায্যে একীকৃত করা যায় তাহাকে গ্রহ বলে এবং যে বিশেষ ভাবে মানবের সর্ব্বভাব ভগবানের বিশেষ তত্ত্বের প্রতিবিম্ব হয়, সেই আধারকে বিগ্রহ বলে। আমাদের আমিটী সব সর্ব্বভাবে অবস্থিত; সর্ব্বভাবটী যেন তাহার বাহিরের মূর্ত্তি। আমিটী সব জানিতে চায়, সব করিতে চায়, সব হইতে চায়, অথচ আত্ম-স্বরূপেও থাকিতে চায়। এই সর্ব্বের প্রতি প্রয়াসই ক্রম-অভিব্যক্তির একটী প্রধান কারণ। আমি সব চাই কিন্তু স্থূল বুদ্ধির বশে আছি, তাই স্থূল জগতের বস্তুগুলিকে গৃহরূপ আধারে সন্নিবেশিত করিয়া মনে করি বুঝি আমার ঐ প্রবৃত্তির তৃপ্তি হইল। "যাহা পাই তাহা ঘরে লইয়া যাই আপনার মন ভুলাতে" কিন্তু ইহাতেও আমার তৃপ্তি হয় না—বাহিরের স্থূল বস্তুগুলি আমার সহিত স্বরূপেত মিলে না। তার পরের স্তরে বস্তুগুলিকে স্থূল ভাবে না লইয়া বস্তুর সংকল্পপ্রসূত সূক্ষ্মবুদ্ধি সংগ্রহ করি। তারপর বস্তুর স্বরূপ প্রভৃতি বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিয়া, ঐ জ্ঞানে বস্তু সকলকে মিশাইয়া রাখি। আবশ্যক হইলে সেই জ্ঞান হইতে বস্তু প্রস্তুত ও সংগ্রহ করা যায়—অথচ স্থূল বস্তুগুলির বোঝা সর্ব্বক্ষণ বহিতে হয় না। এইরূপে মানবজাতির উন্নতির সহিত, মানব বাহিরের বস্তুগুলিকে বাসনা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে আমির সহিত মিশাইতে চায়। তাহার উচ্চস্তরে বুদ্ধির বিকাশের সহিত কবিবর ওয়ার্ডওয়ার্থের ন্যায় সমস্ত জগৎবস্তুতে পরমাত্মতত্ত্বের ভাষা বা ইঙ্গিত দেখিতে পায়। এই প্রকারের ইঙ্গিতই সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুর বিগ্রহপূজা এই সর্ব্বাত্মক প্রকৃতির চরম সীমা। দর্শনের সাহায্যে আমরা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শব্দের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে শিখি এবং সাধনার সাহায্যে সর্ব্ব পদার্থে কখন কখন ভগবানের অভিব্যক্তি, ভগবানের রূপ দেখিতে পাই। সর্ব্বজীবে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে প্রয়াস করি; সত্য, শৌচ, শান্তির সাহায্যে সর্ব্বজীবে তাঁহার পূজা করিতে যাই। কিন্তু এই সর্ব্বাত্মক জ্ঞানটী ঠিক কি না তাহার প্রমাণ ও পরীক্ষা বিগ্রহপূজায়।

কথাটা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আজকাল জার্ম্মাণীর Chemistryর synthetic method যেমন বৈজ্ঞানিক জগৎ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছে,

তদ্রূপ বিগ্রহ পূজাই সর্ব্বাত্মক জ্ঞানের প্রয়োগ স্থান। আমি শিশু মানবের মূর্ত্তির সাহায্যে ধ্যান ধারণার কথা বলিতেছি না। অবস্থাতেও বিগ্রহের দ্বারাও মানবের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কথাটী ভাল করিয়া শুন। রসায়ন শাস্ত্রে বিশ্লেষণ (Analysis) প্রথম স্তর। এই বিশ্লেষণ বুদ্ধির সাহায্যে বুঝা গেল যে শর্করাতে এই এই পদার্থ আছে, শর্করা ও অঙ্গারকের (Carbon) একত্ব আছে। কিন্তু তা বলিয়া ত অঙ্গার হইতে শর্করার উদ্ভব স্থির করা গেল না। Syntheticএর সাহায্যে মানব কেহ অঙ্গারকেই শর্করা রূপে পরিণত করিতে পারিতেছে। তদ্রূপ ভগবৎভক্তি ও শাস্ত্রোক্ত সাধনার ফলে সর্ব্বতত্ত্ব বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সাধক দেখিতে পান যে সর্ব্বতত্ত্বতেই ভগবান্ সর্ব্বাত্মক সাক্ষাত সত্ত্ব আছে, সর্ব্বাত্মিকা মহামায়া ভগবানকে সর্ব্বভাবে প্রতিবিম্বিত করিয়া তত্ত্বরূপে খেলিতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া স্থূল পৃথিবী, মনোময় অগ্নিতত্ত্বগুলিকে শ্রীভগবানে ন্যস্ত করিতে পারা গেল না। পূর্ব্বোক্ত অবস্থাটীকে আমরা analytic অবস্থা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি ও ঐ অবস্থায় সর্ব্বজীবে তাঁহার আভাস দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ জ্ঞানটী প্রয়োগ করিতে পারি না। প্রয়োগ করিতে গেলে ছোট ভাবেই প্রয়োগ হইয়া যায়।

তারপর ভূতশুদ্ধির অবস্থা। সর্ব্বতত্ত্বে সাক্ষাৎ রূপে ভগবানকে দেখিয়া সেই তত্ত্বগুলিকে বীজরূপ তন্মাত্রে পরিণত করাই ভূতশুদ্ধি। যেমন সমস্ত জীবনের ঘটনাগুলি এক বিশেষ আমি জ্ঞানরূপে মাত্রাতে মিশাইয়া দেওয়া যায়—ইহাও ত তদ্রূপ। জীবনে অভিব্যক্ত ঘটনাগুলি একটী পর্য্যায় (series) রূপে সন্নিবেশিত। ক = ক + খ + গ etc —বড় কটী বিশেষ অহং মাত্রা এবং সেই অহংএর বিশেষ ভাবটী পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে। আমরা বিশেষ ভাবটীর সূক্ষ্ম স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া, অভিব্যক্তির ভাব-গুলিকে জড় করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। রামের 'আমিকে' জানি না; তাই তাহার জন্ম কর্ম্ম পিতামাতা প্রভৃতিঘটনা গুলি সন্নিবেশিত করিয়া তাহার সাহায্যে রামকে বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাহাত পারা যায় না। সাধুস্বভাব রাম কেন যে পাপ করিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তাহার জীবনে এত দুঃখের খেলা কেন তাহাও বুঝিতে পারি না। কেবল মুখে "নিশ্চয়ই ভগবান তাহার মঙ্গলের জন্য করিতেছেন" বলিয়া মনকে সান্ত্বনা করি। অর্থাৎ অভিব্যক্ত ভাবগুলিকে পুনরায় বীজরূপে পরিণত করিতে পারি না। অভিব্যক্ত ভাবরাশিকে যে সংহননকৌশল (synthetic method) এর সাহায্যে একীকৃত করা

যায় এবং যাহার ফলে কার্য্যভাব প্রাপ্ত শক্তিগুলিকে পুনরায় বীজে লইয়া যাইতে পারা যায়) সেই সেই প্রয়োগতত্ত্ব ভূতশুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার ভিতর রহিয়াছে।

ভবিষ্যতে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এখন এইমাত্র বুঝিলেই চলিবে য ভূতশুদ্ধি না হইলে ভূতগুলির ভিতর শুদ্ধ ভগবানের ভাব ফুটে না এবং বিগ্রহে এই শুদ্ধভূতের বিনিয়োগ করা যায় না। বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ অকুতোভয় ও সাহসের কার্য্য দেখা যায় না। অন্য ধর্ম্মে সাধক নিজের দেহটীকে dust thou art ধূলিকণা বলিয়াই নিশ্চিন্ত করে; তাহাতে শরীর হইতে অহংটী পৃথক্ হয় বটে এবং সেই শুদ্ধ অহংএ ভগবানের আভাসও ফুটিতে পারে বটে, কিন্তু দেহজ জ্ঞানটীকে ত ভগবানে অর্পণ করা যায় না। হিন্দু পরাভক্তি বশে বলী হইয়া শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে অহংএর মোহ অতিক্রমপূর্ব্বক, শারীরিক তত্ত্বগুলিকেও ভগবানে প্রত্যর্পণ ও প্রয়োগ করিতে চাহে।

আমি। সোজাসুজি ভাবে ভগবানকে ত আত্মনিবেদন করাই ভাল, এত গোলমালের পথে যাইবার আবশ্যকতা কি? প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে আরাধনা-পূর্ব্বক আমিটীকে ভগবানের পদে ছাড়িয়া দিলেই ত হয়?

স্বামী। তোমার এ প্রশ্ন আজকালের যুগে স্বাভাবিকই বটে। তবে আমিটীর সম্বন্ধে কতকগুলি মূল তত্ত্ব আছে, সেইগুলি না জানাতে তোমাদের এই ভ্রম উপস্থিত হয়। প্রথমে এইটী স্মরণ রাখ, যে শাস্ত্রে দুই ভাবে আমির কথা বলা হয়। একটী শুদ্ধ অহং; ইহাতে কোন বিশিষ্টতার ভাণ নাই। পাপ-পুণ্য, সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সবই ইহাতে বিনা অবশেষে ডুবিয়া যায়। এ আমি জন্মায় না, মরে না, সদাই একভাবে আছে। ব্যক্ত অ হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণমালা-ত্মক সপ্তলোক ও সপ্ততল একভাবে গ্রথিত করিয়া এই আমিতে ভাসমান। এই আমির চক্ষে অষ্ট কুলাচল ও সপ্ত সমুদ্র প্রভৃতি কত প্রকার সৃষ্টি প্রতিপলে হইতেছে ও যাইতেছে। অততি ইতি আত্মা—সর্ব্বত্র বিস্তৃত সর্ব্বগ পরাগতি রূপ আমি। এবং এই গতিটী যে সব এবং ভগবানে পরিসমাপ্ত এবং ভগবানই যে এই পরাগতির অভিনব সচ্চিদানন্দ আমির আধার বা লয়স্থান এই আমি না ফুটিলে রাসলীলা সংঘটিত হয় না। এ আমি ভগবানের সহচরী। কারণ এত খেলা, এত ভাবরাশি, এত পরাগতি,—এক কথায় বৈষ্ণব ভাষায় আমির এত যৌবন সম্ভার ও মাধুর্য্য ত কেবল ভগবানেরই জন্য, আর কোন

পদার্থ ত এ আমিকে তৃপ্ত করিতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃতি পুরুষ, আর ভগবান পুরুষোত্তম। দেখ এভাবে সাধনা নাই চাওয়া পাওয়া নাই। প্রেম বা টান থাকিতে পারে, প্রেমের বিবর্ত্ত বা জ্ঞানের বিবর্ত্ত থাকিতে পারে; কিন্তু জগৎরূপে বা বস্তুরূপে এ আমিকে ত পরি কল্পিত করা যায় না।

এই আমির তিনটী প্রতিবিম্ব প্রকৃতিক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। প্রথমটীকে কারণ শরীরস্থ, দ্বিতীয়টী সূক্ষ্ম শরীরস্থ ও তৃতীয়টী স্থূল শরীরস্থ বলিয়া অভিহিত করা হয়। ঘন একত্ব হইতে এই শরীরগুলি কি করিয়া কোথা হইতে আসে? ইহাই ত মায়ার কার্য্য। স ও অহংএর একত্ব অনুভূতি চৈতন্যময়ীর ক্ষেত্রে হয়। মা তখন মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে আসেন, জীব এই ঘন একত্বের মহিমা অথচ ভগবানের পরাভাবের রহস্য বুঝিতে পারে। বাস্তবিক সোহহং তত্ত্বে সএর ভিতর অহং মিশিয়া যায়;—সো—হ—ম্ মিশ্রণের ফলে কেবল একটী অব্যক্ত গতির ভাব অনুভূত হয়। ইহার নিম্নস্তরে স ও অহং ভিন্নরূপে থাকে, মধ্যে মহাযোগিনা যোগমায়া অবস্থিতি করেন। সতে বিসর্গ আছে; বিসর্গকেই সৃষ্টিশক্তি বলে, অবুদ্ধিমানেরা ইহাকেই কর্ম্ম বলে, কিন্তু মহাযোগিনীর কৃপায় যখন একত্বের প্রেম জাগে তখন বিসর্গও স্বরাত্মক হইয়া অহংএর আশ্রয় স্থান হয়; আর ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সর্ব্ববিশেষ ব্যক্তভাব 'হ'টী 'ম'এর সঙ্গে মিশিয়া অব্যক্ত গতি প্রাপ্ত হয়; ইহাই সন্ধি। অর্থাৎ যোগমায়ার প্রভাবে বেচারা জীবটী দুই খণ্ড হইয়া যায়। মুণ্ড বা অটী সএ মিশিয়া যায়, আর এই এত ব্যক্ত-বিশেষের খেলাটী 'ম'এর ভিতর দিয়া ভগবানের অব্যক্ত ভাবে মিশিয়া যায়। ইহাই "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। ইহাই "সর্ব্বভাব পরিত্যাগময় সমাধি ইতি কথ্যতে"। বিপরীত ক্রমে বিগ্রহের পূজা বুঝিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

কালো চোরা কুচ্‌কুচে

(১)

তারে ছেড়ে একটু চা'ব
তারত আমার নেইক যো'টী ;
এমন পাকা কুটীল চোরা
ফুরসুতে নেয় সব লুটী।
রাত্রি দিনে স্বপন জ্ঞানে,
কাঁপিয়ে সদা পড়্‌ছে প্রাণে,
রুদ্র দেবের দৃষ্টি জিনে,
চেয়ে আছে চোখ্‌ দুটী ;
(আমি) পালাই কোথা লুকাই কোথা
সে যে নেবে সব লুটী॥

(২)

(আমি) যতই লুকাই গভীর খাদে
ভিন্ পাহাড়ে শেষ নীচে,
ততই ধরে ঝড় উড়িয়ে
কালো মাণিক কুচ্‌কুচে॥
যতই স'রে মুদি আঁখি
ততই ঘনান্ বক্ষে দেখি ;
কেমন কি এক পর্দ্দা ঝাকি
গুলিয়ে নে যায় সব মুছে,
(আমার) একটী করে সব নিলরে
কালো চোরা কুচ্‌কুচে॥

(৩)

আকাশ থেকে আলোর বাণে
চোখ্‌ করে দে ঝল্‌মলা,
লুকিয়ে আসে মলয় ঢেউয়ে
খেলে নিয়ে গাছ পালা ;

তারার বুকে চক্ষু মেলে,
নির্জ্জনে সে দে-দোল দোলে ;
চাঁদের ছটায় স্নেহে গলে
ফুলের মুখে তার ছলা,
প্রেমের তার করে পাগল
জ্বালায় বুকে দীপ জ্বালা ॥

(৪)

কে জাগেরে এমন ক'রে
অরুণ রাঙা চোখ্‌ চেয়ে,
ছাপিয়ে আকাশ পাতাল ভুবন
ছোটে আমার বুক্ ছেয়ে ;
মানে নারে বিঘ্ন বাধা
পাহাড় ফাটায় লুটোয় সদা,
মেঘ পাথারে বিষম ধাঁধা
ঝিলিক্ হ'য়ে যায় ব'য়ে,
বন্ধ দুয়ার হাওয়ায় উড়ে
নূপুর গাথা পায় ঘায়ে ॥

(৫)

আমি চাইব' কোথা দু'ট চোখে,
সে যে ছোটে চারদিকে ;
ছন্দে গানে ঝিঝির তানে
ঝি-ঝি-করা লাখ্‌ ঝাঁকে ॥
ঝাপিয়ে কখন শূন্যে মিশে,
কুজ্ঝটীকার আঁধার পাশে,
বুঝিনা সে কোথায় পশে,
কেন জ্বালায় কোন্‌মুখে,
(আবার) চম্‌কে দেখি সাগর হ'য়ে
লুটিয়ে আছে কেন দুখে ॥

(৬)

নদীর বুকে লাখে লাখে
উর্ম্মিমালায় যায় নেচে,
ঝড় তুফানে লড়াই করে
বৃষ্টি হ'য়ে জল সেচে॥
শেষ আকাশে রঙ্গিন ফাঁদে,
ভুলায় নয়ন অরূপ ছাঁদে,
(আবার) মেঘ-আঁচলে বেড়ায় কেঁদে
চাতক হ'য়ে জল যেচে
কত ছাঁদে নিত্য নূতন
লুট্‌ছেরে সে কুচ্‌কুচে॥

(৭)

বেণু বনের আড়াল দিয়ে
হরিণ লাফায় পিছু ধরে,
কে আসেরে রুণ-রুণিয়ে
করুণ ভীতি চোখ্‌ ঝরে ;
লেজ নাচায়ে আকাশ ছেয়ে,
মাতায় ভুবন করুণ গেয়ে,
কখন আসে কি ভাব নিয়ে
(আমি) বুঝ্‌তে নারি শঠ কেরে,
(সে যে) লুকো'য় শুধু কাঁদায় শুধু
রত্নরাজি সব হ'রে॥

(৮)

আমি বুঝতে নারি এমন তারিফ,
কোথায় বসে গুম হ'য়ে
টুক্ ক'রে সে গোপন বুকে
দরাজ প্রেমে যায় বয়ে॥

ভাসায় বধির-রুদ্ধ-ছাদন,
রোমাঞ্চে বয় বিশ্ব ভুবন ;
ইন্ধনে সে পোড়ায় বাঁধন
নীল নীলিমায় যায় ছেয়ে,
আমি অবাক্ চোখে চেয়ে দেখি
শঠের খেলা গুম্ হ'য়ে ॥
তর্ তরান' স্নেহের মাঝে
গুমোট্ দুঃখের ঘুরপাকে
ছানিত-চাঁদের পর্দ্দা মোড়া
দিপক্ জ্বালান্ দিব-সুখে ;
লুকিয়ে আসে বদন ঢাকি
আঁধার কোলে আঁধার মাখি ;
হাওয়ার বসন উড়িয়ে নাকি,
লোটে আমার সব ফুঁকে ;
আমি যখন শূন্যে হাতাই
হাসে তখন মাঝ্-বুকে ॥

(১০)

(সে যে) মর্ম্মে আমার লুকিয়ে আছে
দেখিনিত' চোখ্ খুলে,
শীরায় রক্তে জড়িয়ে আছে
ছুট্‌ছে বুকে বুক্ ভুলে ;
একিরে মোর সকল ফাঁকা
আমার ধনে সেই ঢাকা
চোরে আমার দেছে ধোকা
লুঠ্ করেচে কোন্ ছলে,
(সে যে) ভেঙ্গে দেয় রুদ্ধ কবাট
স্বর্ণ-শিকল নিজ বলে ॥

(১১)

ওগো বাঁকা কুটিল চোরা -
লুঠ্ করেছ জোর ক'রে

(এখন) লুঠের ধনে তুমিই মালিক
রাখ তাহায় পায়ে ঘিরে॥
ব্যোম্ বাঁধনের অরূপ ছলা
অই যে ধূসর অন্ধ খেলা
ফাঁক্ হ'য়ে যাক্; দেখি আমার
প্রেমের চোরা চোখ্ ভ'রে,
(আমি) সব হারায়ে পেয়েছি আজ
কুটিল বাঁকা শঠ চোরে॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

মোহভঙ্গ।

(গল্প)

রামদাস ঘোষাল তাঁহার সহৃদয়তার গুণে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেও বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তির হেতু তাঁহার আচার ব্যবহার, সহানুভূতি ও দীনদরিদ্রের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ। বর্দ্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যে তাঁহার স্যায় স্বচ্ছল গৃহস্থ আর দেখা যাইত না। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ভোগবিলাসবর্জ্জিত সরলতাই তাঁহার আদর্শ ছিল। ভোগ-সুখটাকেই পরম পদার্থ মনে না করিয়া, আহার-বিহারের বিলাসিতায় সমস্ত অর্থ ব্যয় না করিয়া সরল ও মিতব্যয়িতার সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের অবশ্য পালনীয় আতিথ্যসংকার ও পূজা পার্ব্বণাদি যথারীতি সম্পন্ন করিয়াও কিঞ্চিৎ সঞ্চয় রাখিতেন।

ঘোষাল মহাশয় সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পরহিত সাধনের সময় কতকটা বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। বৃদ্ধ হইলেও জরার করস্পর্শ তাঁহার দেহের কতকটা কান্তি ম্লান করিতে পারে নাই, যেন ব্রহ্মতেজোদীপ্ত কলেবর দর্শন করিয়া বার্দ্ধক্য ভয়ে তাঁহার দেহ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া পুষ্পচয়ন ব্যপদেশে গ্রামের নিকটস্থ অনেকেরই সংবাদ লইয়া থাকেন। অপরাহ্নে শুভ্র উত্তরীয়খানা স্কন্ধে ফেলিয়া একগাছি যষ্টী হস্তে প্রায় দুই মাইল ভ্রমণ করিয়া, যাহাতে লোকের

দুঃখ দুরীভূত হইয়া চিত্ত একটু উন্নত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। "মেমোরিয়াল" "পার্টি" প্রভৃতি চাঁদার খাতায় কিংবা খবরের কাগজে তাঁহার নাম প্রায় দেখিতে পাওয়া নাগেলেও, তাঁহার আন্তরিক পরোপকার-ব্রতে গ্রামের কেহ কোন দিন তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। রোগীর ঔষধ পথ্য বিষয়ে ঘোষাল মহাশয় মুক্তহস্ত; কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায় প্রভৃতি বিপদের সময় ঘোষাল মহাশয় সেই স্থানটী ইজারা করিয়া লইয়া থাকিতেন।

এরূপ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুত্র দু'ইটীরও যে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ঘোষাল মহাশয় পুত্রদের শিক্ষাবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি মুখে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে এমন উপদেশ দিতেন, যাহাতে তাহাদের হৃদয় উন্নত ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন

কনিষ্ঠ পুত্রের ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে প্রথমে তত মত না থাকিলেও পরে নানারূপ বিবেচনা করিয়া গ্রামের নিকটেই একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে পুত্রকে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র সুধীরচন্দ্র উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর কান্তি-বিশিষ্ট, স্বল্পভাষী, বিনীত ও আচারনিষ্ঠ। ব্রাহ্মণোচিত গায়ত্রী, ও সন্ধ্যাবন্দনাদি পিতার নিকট শিক্ষা করিয়া তিনি তাহাতে কোন দিন বিরত হন নাই। অখাদ্যাদি ভোজনে কোন দিনই তাঁহার স্পৃহা দেখা যায় নাই। ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, আজ কালকার মত সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিরাগ কোন দিন তাঁহার প্রাণে জাগ্রত হয় নাই। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট মুগ্ধবোধ পাঠ করিয়া গীতা পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে ঘোষাল মহাশয় এক দিন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—দেখ বাবা সুধীর! কলিকাতায় গিয়া যেন অনাচারী হইয়া পড়িও না। আমি শুনিয়াছি. আজকালকার অনেক ছেলেরা হোটেলে গিয়া, নানাবিধ অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া হিন্দুধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি ত বাল্যকাল হইতে নিরামিষ ভোজী, তাই বলিয়া কি আমার শরীরে সামর্থ্য কম! আমার চক্ষের জ্যোতি এখনও একটুকুও কমে নাই। আজ কাল পনের বছরের ছেলেরা রোগেই হউক বা সখেই হউক চসমার ঠুলি ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু আমি-ত এ পরিণত বয়সেও সাদাচোখেই লেখা পড়া যাবতীয় কার্য্যই করিতেছি। তুমি হিন্দু-সন্তান—ব্রাহ্মণ-সন্তান সর্ব্বদা একথা

মনে রাখিবে। কখনও ঐরূপ প্রবৃত্তির বশ হইও না, কিংবা ঐরূপ সঙ্গ করিয়া আমাদের আর্য্যধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা যেন না আসে।"

সুধীর বলিল "বাব', আপনি আমাকে বাল্যকাল হইতে যেরূপ ভাবে গঠিত করিয়াছেন, তাহাতে যে আমার চিত্ত ঐরূপ ভ্রান্তপথে মরীচিকার উদ্দেশে ধাবিত হইবে এমন ত বোধ হয় না। তবে আশীর্ব্বাদ করুন যেন ঐরূপ প্রবৃত্তি হৃদয় অধিকার করিলেও আপনার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ যেন আমাকে সেই প্রলোভন হইতে রক্ষা করে।"

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সেত বটেই। আমার আশীর্ব্বাদ ত থাকিবেই, ভগবান্ তোমায় সুমতি দিবেন। ভগবানই তোমার মঙ্গল করিবেন। প্রত্যহ তাঁহার মঙ্গলময় নাম জপ ও স্মরণ করিয়া তবে কার্য্যে অগ্রসর হইবে।"

কলিকাতার মেশে থাকিয়া সুধীরচন্দ্র 'এফ এ' পাশ করিয়া 'বি, এ' পড়িতে আরম্ভ করিল। ছাত্রমহলে সুধীরচন্দ্রকে সহপাঠীদের 'অসভ্য' "পাড়াগেঁয়ে" 'বাঙ্গাল' প্রভৃতি মধুর সম্বোধন পরোক্ষে প্রায়ই শুনিতে হইত। লেখা পড়া শিখিয়াও, 'সন্ধ্যা আহ্নিক এবং নিরামিষ ভোজন-দেখিয়া মেশের ছেলেরা অপদার্থ কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া মনে করিত। 'মুখচোরা লাজুক' এই ছোকরাটী শিক্ষিত হইয়াও সংসারে কিছুই করিতে পারিবে না, এই কথাই তাহারা পরস্পর আলোচনা করিত। সুধীর কাহারও সহিত মিশিত না এবং অযাচিত ভাবে কাহারও সহিত আলাপ আপ্যায়িত করিত না; কিন্তু কি জানি সহপাঠী মোহিনীর সহিত তাহার কিরূপে বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তাহার সহিত সুধীরের কোন অংশে মিল নাই। সুধীর গোড়াহিন্দু আর মোহিনী আজকালকার লিবারেল বিলাত ফেরৎ হিন্দু—অর্থাৎ হিন্দুমতে শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া 'দত্ত' 'পাল' প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে পুরোহিত বরণ করিয়া বিবাহাদি সংস্কার করেন। মেয়েরা কাপড়-খানি পড়িবার সময়, কোঁচাইয়া ঘুরাইয়া সেপ্‌টিপিনের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া জুতা পায়ে টম টম হাঁকাইয়া ইডেন গার্ডেনের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে গমন করেন। প্রাতঃকালে চা-পানের সঙ্গে বেয়ারার ডিম্বসিদ্ধ আনিয়া দেয়—আহারাদি বাবুর্চ্চি কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়—কাঁটা চামচে দ্বারা টেবিলের উপরই ভোজনকার্য্য সমাধা হয়; কিন্তু টেবিলের উপর একটী তুলসীগাছ হিন্দুত্বের নিদর্শন দেয়। রবিবারে হবিষ্যান্ন ভোজন, এবং একাদশীতে অন্ন আহার না করিয়া পাঁউরুটী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন।

সুধীর মোহিনীর বাটী যাওয়ার পূর্ব্বে মোহিনীকে হিন্দু বলিয়াই মনে করিত।

প্রথম তাহাদের বাটী গিয়া সুধীর বুঝিল এ কিরূপ হিন্দু! তৎপূর্ব্বে কলিকাতার নামজাদা ধনাঢ্য বিলাত ফেরৎ হিন্দুর বাটী সে দেখে নাই। আজন্ম সংস্কারের বিরুদ্ধে সে এইরূপ দেখিয়া মোহিনীকে বলিয়াছে যে-এ কিরূপ তোমাদের হিন্দুয়ানী ভাই'? মোহিনী নানাবিধ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহাদের উদারতার সমর্থন করিয়াছে কিন্তু সুধীরের প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই।

কিন্তু সুধীরের একটু মোহেরও উৎপত্তি হইয়াছে। মোহিনীর ভগিনী কমলার সরল সহাস্য বদনখানি সুধীরের হৃদয়ের মধ্যে একটু গোলযোগ উৎপন্ন করিয়াছে। সুধীর সচ্চরিত্র সরল যুবক, ইহাতে তাহার মনে কোন রূপ কুভাবের উদ্রেক হয় নাই। সুন্দর প্রস্ফুটিত কমল দেখিলেই যেমন মনের মধ্যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়, সেইরূপ কমলার রূপটী তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। একদিন কমলা সুধীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"দাদা, সুধীরবাবু এতদিন আমাদের বাটীতে আসেন, কৈ কোন দিন ত তিনি আমাদের বাটীতে চা পর্য্যন্ত খান না। কেন দাদা! সুধীর বাবু কি চা খান না?"

মোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল "সুধীর বড় গোঁড়া হিন্দু! ব্রাহ্মণ ভিন্ন উনি কারো হাতে খান না! তা ছাড়া এই কার্পেটের উপর জুতা পায়ে দিয়ে ওর খেতে প্রাণে দ্বিধা বোধ হয়।"

"ও! উনি নিতান্ত কু-সংস্কারের অধীন। আমরা কি হিন্দু নই! বেয়ারা কি ভগবানের সৃষ্ট নয়? আর ওত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে আনিয়া দেয়; হাত দিয়ে স্পর্শও করে না। এতে দোষ কি?"

সুধীর ইহার বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ করিবেন মনে করিল। কিন্তু কি জানি তিনি কোন প্রতিবাদ না করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিল। কমলার এই ঔদ্ধত্য তাহার নিকট সরলতা বলিয়া বোধ হইল। ঘরে বসিয়া বাক্স হারমোনিয়ম বাজাইয়া কমলা যখন সুমধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীতের গান গাহিত তখন সুধীর বিমোহিত হইয়া এরূপ সঙ্গীলাভে আপনাকে পরম গৌরবান্বিত মনে করিত এবং সরলভাবে এরূপে ভগবানের গুণগান করা হিন্দু সমাজেও প্রচলিত হওয়া উচিত তাই মনে হইত। ক্রমশঃ যাতায়াতে ঘাত প্রতিঘাতে তাহার সংস্কারের বেলাভূমি একটু বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে এখন মনে ভাবে যে আর্য্যদিগের প্রচারিত বর্ণাশ্রম এখন ঠিক সম্যক্‌রূপে অনুসরণ সম্ভবপর হয় না। আগমন কালীন পিতার উপদেশস্মৃতির রত্নভাণ্ডার তাঁহার হৃদয়সিন্ধুর অতল প্রদেশে বর্ত্তমান থাকিলেও, সুধীর মনে ভাবে যে যদি আমাদের পরস্পরের মধ্যে

এই ব্যবধান না থাকিত, তবে হয়ত কমলা তাহার গৃহলক্ষ্মী হইয়া জীবনের সঙ্গিনী হইয়া তাহার জীবনকে সুখময় করিতে পারিত। কিন্তু লোকাচার-বিরুদ্ধ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভাবে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে সে কোনদিনই মনের মধ্যেও কল্পনা করে নাই। তবে এ একটা মোহ। কিশোরমাধুর্য্যে মণ্ডিত মুখখানি হইতে শিশুর মত সরল ফুলের মত কোমল কথাগুলি শুনিতে তাহার চিত্ত ব্যগ্র হইলেও সে কোন দিনই তাহার আদর্শ হইতে চ্যুত হয় নাই। মনে মনে সে আত্মসংযমের চেষ্টা হইতে কোন দিনই বিরত হয় নাই, কিন্তু তবুও এ একটা মোহ।

এই পরিবারের সহিত সুধীরের মতের একটু মিল নাই—চরিত্রের একটু মিল নাই, অথচ ইহাদের উভয়ের প্রাণে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় একটী স্বচ্ছ অনাবিল স্রোতপ্রবাহ কেমন করিয়া বহিয়া যাইতেছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিত, বন্ধু বলিয়া মনে করিত, বিশ্বাস করিত।

মোহিনীরা জানিত যে সুধীর প্রবঞ্চক বা শঠ নহে, ধর্ম্মের একটা আবরণকে সে বৃথা ধরিয়া নাই, তাহার হৃদয়ে একটা অপরিমেয় বিশ্বাস আছে। সুধীর জানিত যে বিদেশী আদর্শের অনুকরণে ইহাদের চরিত্র গঠিত হইলেও ইহারা সরল, উদার ও অমায়িক; তাই ইহাদের পরস্পরের মতের অনৈক্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে সত্য সত্যই একটা প্রীতির বন্ধন আসিয়া পড়িয়াছে।

এবার পূজার সময় মোহিনীরা সকলেই বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য 'মুশৌরী' যাইবেন। তাঁহারা সুধীরকে যাইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আহারাদির পৃথক্ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং যাহাতে তাঁহার কোনরূপ অসুবিধা না হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। পিতার বিনানুমতিতে তিনি কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না। পিতার মতের জন্য সুধীর পত্র দিলেন কিন্তু তদুত্তরে পিতা লিখিলেন "পূজার সময় মা আনন্দময়ীর আগমনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই বাটী আসিতেছে। এ সময় তোমার "মুশৌরী" যাওয়া হইবে না; তুমি ছুটী হওয়া মাত্র বাটী চলিয়া আসিবে।"

সুধীর চিঠি পাইয়া তাহাদের বাটীতে গিয়া সে কথা জানাইল যে "বাবা কিছুতেই মত দিলেন না। বাটীতে পূজা।"

কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে মোহিনীর পিতা বলিলেন "সুধীর! পিতার

অনুমতি ব্যতীত তোমাকে যাইতে বলিতে পারি না। কিন্তু বল ত এইরূপ প্রতিমা পূজায় কি উপকার? পুতুল পূজায় কি ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়?"

সুধীর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আমি হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মত বিশেষ ভাবে আলোচনা করি নাই। কিন্তু পিতার নিকট শুনিয়াছি যে এ পূজাও ব্যর্থ নয়। এও সেই ব্রহ্মের উপাসনা। তবে অধিকারী ভেদে এইরূপ উপাসনা প্রচলিত।"

"সুধীর! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ! যদি তুমিও এই কুসংস্কার ছাড়িতে না পার, তবে তোমার লেখাপড়া শেখা বৃথা। তোমার পিতা না হয় এরূপ শিক্ষালাভ না করিয়াও সেই উচ্চভাব ধারণা করিতে পারেন না। কিন্তু তুমি বিজ্ঞান পড়িয়াও যদি পুতুল পূজার সমর্থন কর তবে আর কি বলিব!"

সুধীরের মুখ এই কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তাঁহার পিতার ন্যায় সচ্চরিত্র সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় উদারধী ব্যক্তি যদি উচ্চভাব ধারণ করিতে না পারে তবে ধারণা করিবে কি বিলাসের ক্রোড়পালিত সুখদুঃখের মোহে আবদ্ধ, আত্মসুখপরায়ণ, দেহাত্মবাদী এই সকল নরপুঙ্গব? কিন্তু হৃদয়ের কথা ভাষায় ব্যক্ত না করিয়া একটু দৃঢ়তার সহিত বলিল—"হিন্দুদিগের পূজার মধ্যে একটী উচ্চ ভাব আছে, সে কথা আমি বিশ্বাস করি। আমি বিজ্ঞান দ্বারা ইহার সমর্থন করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু ইহাও যে সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা ইহা নিশ্চিত। শাস্ত্রকারগণ মূর্খ ছিলেন না; আমার নিজের বিশ্বাস যদি শুনিতে চান, তবে আমি দু'চার কথায় আমার মত প্রকাশ করিতে পারি।"

"বেশ বল না; শুনিতে দোষ কি? তোমার বিশ্বাস কি দেখা যাক না কেন।"

"আপনি যে কোন পূজার মন্ত্রগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন দেখিবেন উপাসককে সেই এক লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছে। শিবপূজা হিন্দুদিগের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে—এই শিবপূজাতেই দেখুন প্রথমে উপাসক স্নানাদি করিয়া বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া, বামে 'গুরুভ্যো নমঃ' দক্ষিণে 'গণেশায় নমঃ' ঊর্দ্ধে 'ব্রহ্মণে নমঃ' অধঃ 'অনন্তায় নমঃ' সম্মুখে 'শিবায় নমঃ"—

কমলা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল "যে পূজার মন্তর আওড়াইতে লাগিলেন। আপনি এই সব শিখে আপনার বহুমূল্য সময় নষ্ট করেচেন—বিজ্ঞান চর্চ্চা—"

সুধীর একটু বিরক্তিভাবে বলিয়া উঠিল "ব্যস্ত হয়ো না কমলা! আমি

তোমার পিতার সঙ্গে কথা কইছি—যে বিষয় আমি বলতে যাচ্ছি তাতে ঐ মন্ত্রগুলি বলার প্রয়োজন আছে।"

কমলার পিতাও বলিলেন—"না না কমলা! তোমার এ বিষয়ে কোন কথা বলা উচিত নয়। সুধীর, তুমি ওর কথা শুনো না। তুমি বলে যাও।

সুধীর তখন গম্ভীর ভাবে বলিল—"এই মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য প্রথমে যাঁহার নিকট হইতে উপাসনা সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ হয়েছে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যেন এই উপাসনার ফল সিদ্ধ হয় তদুদ্দেশ্যে সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম। উপাসনার সিদ্ধি আর কিছুই নয় উর্দ্ধস্থ সেই ব্রহ্ম, এবং অধস্থ তাঁহার অনন্তশক্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ। তবেই দেখুন এই উপাসনার মূল প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞান।

"এ কথায় কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সম্মুখে একটা পুতুল না রাখলে কি চলে না! ঐ পুতুলটা ত আর ব্রহ্ম নয়!"

"হিন্দুমাত্রই জানেন যে ঐ মূর্ত্তিটী ব্রহ্ম নন। এমন কি বিধবা স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত পূজার উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ অবগত আছেন। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ দেখেছিলেন যে দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান যতদিন লাভ না হয়, ততদিন প্রতিমাদির পূজার প্রয়োজন আছে।"

"ঐ কথাটা আমি স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত নই। সাকার একটা জড় পদার্থকে ঈশ্বর মনে করিলে, ভগবানের মহিমা খর্ব্ব করা হয় না কি? যে বস্তু যা নয়, তাকে কল্পনা করা কি ভ্রান্ত পথে গিয়া নিজের ভ্রান্তি দেখাইয়া হাস্যাস্পদ হওয়া নয়? সেই জন্যই ত সাহেবরা আমাদের কত ঠাট্টা করে।"

"সাহেবরা ঠাট্টা করুক, কিন্তু আমাদের পরস্পর ঝগড়া করা উচিত নয়। আমরা তাঁদের চক্ষে দেখব কেন? আমাদের নিজের চক্ষে দেখি না কেন। আমি প্রথমেই বলেছি—যে পূজার উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ—তাই এই পূজার প্রধান অঙ্গ মানসপূজা—মানসপূজায় "শিবো ভূত্বা শিবমর্চ্চয়েৎ" আর বাকী থাকিল কি?

"উদ্দেশ্য বিষয়ে মতভেদ নাই, কিন্তু উপায় বিষয়ে মতভেদ নিবারণ হ'ল কৈ? প্রতিমার প্রয়োজনীয়তা ত বুঝা গেল না!"

"দেখুন একটা কথা হচ্ছে যে জ্যামিতির প্রথমেই বলা আছে—A point is that which has position but no magnitude! Board এ যখন point লেখা হয়, সত্যই কি তাহার magnitude থাকে না? কিন্তু ঐ থাকনের উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত জ্যামিতি শাস্ত্রটার জ্ঞান অর্জ্জিত হয়। মূর্ত্তি একটা

অবলম্বন, সেই অবলম্বনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকারণ সম্বন্ধে হিন্দু চিন্তা করে। ঐ অবলম্বনীয় বস্তুতে ভগবানের মহিমা আরোপিত করিয়া সেই বিষয়ের—তথ্যানুসন্ধায়ী হইয়া এবং সেই মহিমামাহাত্ম্যে ভাবগ্রাহী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি। এ পূজা সাকার পূজা নয়—সাকার পদার্থ বিষয় চিন্তার সাহায্যে অনাদি কারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা গর্ভাবস্থায় সৎ চিন্তার ফলে যদি গর্ভস্থ-সন্তানের সেই ভাব সংক্রামিত হইতে পারে তবে উপাসক আত্মচিন্তার ফলে তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইবে ইহাতে বিচিত্রতা নাই। মোটের উপর সাকার নিরাকার দুই ভাবেই কিছু বুঝি না। আমাদের এ বিষয়ে তর্ক না করাই ভাল। বিশেষতঃ আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মুখে কথা বলা আমার পক্ষে বাচলতা। এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন।" কমলার পিতা বলিলেন—"না, না! তুমি কোনরূপ বাচালতা কর নাই—তর্ক যুক্তি না হইলে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে কেন?"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইল। সুধীরচন্দ্র বিদায় হইলেন, বাবুর্চ্চির আহার দিবার হুকুম হইল।

আজ কমলাদের মুশৌরী যাওয়ার দিন। সেকেণ্ডক্লাস একখানি গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছে। জিনিষ পত্র পূর্ব্বেই পৌছিয়াছে, যথাসময়ে ইঁহারা ষ্টেসনে পৌছিলেন। সুধীরের সহিত তাঁহাদের এই আসন্ন বিচ্ছেদব্যথা উভয় পক্ষের মনেই নিদারুণ পীড়া দিতেছিল। ট্রেন যথাসময়ে ছাড়িয়া চলিল, সুধীরচন্দ্র যতক্ষণ ট্রেন দেখা যাইতে লাগিল ততক্ষণ সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিল। অবশেষে বিষণ্নমনে রাত্রি ১২টার সময় মেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সংসারে যত কিছু মনের চাঞ্চল্য উৎপাদক বস্তু আছে রূপই বোধহয় তাহার মধ্যে প্রধান। এই সৌন্দর্য্যময়ী কিশোরী মূর্ত্তি কোন দিন যে তাহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে পারে না ইহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও কেবল মাত্র দর্শন-ইন্দ্রিয়ের জন্যই তাহার হৃদয় আজ অশান্তিপর। মেশের ছেলেরা যখন রজনীর সেই স্তব্ধ মুহূর্ত্তে নাসিকাধ্বনি করিতে করিতে সুষুপ্তির আনন্দে নিমগ্ন, সুধীরচন্দ্র আপনার চিত্তখানি আত্মবিস্মৃতির মধ্যে হারাইয়া কোন অদৃশ্য আকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া যেন ঐ দ্রুতগামী ট্রেনের সহিত চলিতেছে।

সুধীর এই বিচ্ছেদের জন্য কমলার বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। কমলার স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্য-শ্রীটুকু তাহাকে অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে

দিল না—তাঁহার মনে জাগিতেছে—সেই বিদ্যুদ্দামতুল্য যুগলনেত্র-তারকা—সেই অবিস্মৃত মধুর মূর্ত্তির চিন্তাতেও বুঝি সুখ আছে। সুধীরচন্দ্র কায়মনে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু যতই সে চেষ্টা করিতেছে ততই মরুভূমে মরীচিকার ন্যায় কত ছবি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে সুধীব ভাবিতে পারে নাই, যে তাহাদের বিবাহে এরূপ গভীর দুঃখের আক্রমণ তাহাকে সহ্য করিতে হইবে। ধন্য রূপ! ধন্য তোমার মহীয়সী-শক্তি! নতুবা ট্রয়নগর ধ্বংস হইবে কেন? সোনার লঙ্কা ভস্মীভূত হইবে কেন—আলাউদ্দিন চিতোরের পর্ব্বতপ্রান্তে শিবির সন্নিবেশ করিবেন কেন?

সুধীরচন্দ্র মনে মনে একটু বিরক্তই হইল—একঘেয়ে পূজার সেই আনন্দ উল্লাস তাহাব প্রাণে আকর্ষণ অনুভব করাইতে পারিল না। দুঃখের সহিত সুধীরের দিন কাটিতে লাগিল—মনে করিল পূজার কয়টাদিন কোনরূপে সেই মশকের দংশনের মধ্যে থাকিয়া পিতাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া শেষ কয়দিন মুশৌরীতেই কাটাইবে।

শরৎকাল আবাব ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্বরাণী মায়ের আগমনে দিব্যালোকেব উচ্ছ্বাসে সুশোভিত হইয়া প্রস্ফুটিত কুমুদ কমল শেফালিকাদি অনন্ত কুসুমভার লইয়া জগন্মাতার পবিত্র চরণসরোজে অঞ্জলি প্রদানার্থ প্রণতমস্তকে দণ্ডায়মান। অমরজগতের দিব্যভাবের আভাস পাইয়া মরজগৎ আজ সেই ভাবে অনুপ্রাণিত, দিগঙ্গনাগণ সুমিষ্ট স্বর্গীয় সঙ্গীতে দিগন্ত মাতাইয়া তুলিতেছে। বিহঙ্গের কাকলী মায়ের আগমনী সঙ্গীতের সহিত মিশ্রিত হইয়া কি এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে—আজ যেন সত্য সত্যই স্বর্গের মন্দাকিনী স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া মর্ত্ত্যবাসিগণকে ত্রিদিবের আনন্দে প্লাবিত করিতেছে। রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া, শোক-সন্তাপিত ব্যক্তিগণ শোক ভুলিয়া মহানন্দে মায়ের অপরিসীম প্রেমের আনন্দে মূর্চ্ছিত। যাহা এতদিন বালুকাময়ী মরুভূমি ছিল, মায়ের চরণরেণু স্পর্শে তাহা তৃণপল্লবময়—কুসুমসুবাসিত স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকরসিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। কি এক বিশ্বব্যাপী প্রসাদ বিশ্বখানিকে এতদূর আনন্দে উন্মত্ত করিয়াছে!

শারদীয়া পূজার মঙ্গলবাদ্য যখন ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠিল, নরনারী বালক-বালিকা যখন নববেশ পরিধান করিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-দায়িনীর আবাহন-

সময়ে সারি দিয়া দাঁড়াইল—বিবাদের কথা, দুঃখের কথা, বাসনার কথা একেবারে ভুলিয়া "জয় মা দুর্গার জয়" বলিয়া নারীদিগের হুলুধ্বনির সহিত সেই ঢক্কানিনাদে যখন গগনদেশ আলোড়িত করিল, তখন সত্য সত্যই হৃদয়ে কোন সুদূরশ্রুত অস্পষ্ট নিশীথ সঙ্গীতের ন্যায় কি এক অপূর্ব্ব ইঙ্গিত আসিয়া একেবারে মোহিত করিয়া ফেলে।

সুধীরচন্দ্র প্রতিবারই পূজায় বাটীতে থাকেন। কিন্তু এ ভাবের উপলব্ধি করিতে তিনি কোন দিনই সক্ষম হন নাই। সুধীরের মনে হইল—এ পূজা সার্থক—আনন্দময়ী এ ছেলেখেলার পূজা সার্থক না করিলে এ আনন্দ আসে কোথা হইতে।

সুধীরের বাড়ী আত্মীয় বন্ধুবান্ধবে পূর্ণ। সুধীরের পিতা সমাগত ব্যক্তিদিগের আদর অভ্যর্থনায় যেন কত আনন্দ অনুভব করিতেছেন। গ্রামের সকলেই আজ সুধীরের বাড়ীতে প্রসাদ পাইবে। অন্ধ, আতুর, অনাথ সুধীরের পিতার দত্ত নববস্ত্র পরিধান করিয়া যখন তাহাদের মণ্ডপে আসিয়া আনন্দাশ্রুর সহিত ইহাদের মঙ্গলের জন্য মায়ের নিকট অকপট প্রার্থনা করিতেছে সে দৃশ্য কি মধুর!

জগজ্জননী দশপ্রহরণী দশদিক্ রক্ষা করিয়া দক্ষিণে সার্ব্বার্থপ্রদায়িনী লক্ষ্মী ও মোক্ষদাতা গণপতি, বামে সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়িনী ভারতী ও সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তিরূপ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সঙ্গে লইয়া—সিংহপৃষ্ঠে মহিষাসুরবধে নিযুক্ত। এই অনিন্দ্যসুন্দরী তপ্তকাঞ্চনাভা জটাজূটসমাযুক্তা মূর্ত্তি। সুধীর ভাবিতে লাগিল, এ মূর্ত্তি কি মৃন্ময়ী জড়মূর্ত্তি! পুরোহিত যখন উচ্চৈঃস্বরে 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতন্যেত্যভিধীয়তে" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখন সত্যই সুধীর বুঝিল হিন্দু পৌত্তলিক নয়। হায়! হায়! কমলারা এই সপ্রাণ মূর্ত্তিতে কেন বিশ্বাস করিতে পারে না! ভক্তিচক্ষে কেন তাহারা মায়ের শরণাপন্ন হয় না?

ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই তাহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আনন্দ মধুর—অসীমতার মধ্যে কোথায় গেল সুধীর উহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা সৌম্য প্রশান্ত মধুর এবং জীবন্ত হাস্যময়ী বলিয়া বোধ হইল। এইরূপে কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে সুধীর তাহা বুঝিতে পারে নাই। পুরোহিত বলিলেন—"সুধীর, দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও।"

সুধীর চমকিয়া উঠিলেন, মায়ের চরণে কুসুমাঞ্জলি দিয়া সুধীর বলিল,—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

পশ্চাৎ ফিরিয়া সুধীর দেখিতে পাইল, একটী আলুলায়িতকুন্তলা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা স্থির দৃষ্টিতে প্রতিমার পানে চাহিয়া আছে,—চক্ষের পলক নাই—বদনখানি আনন্দে উদ্ভাসিত। সুধীর ইহাকে চেনে, মেয়েটী দূরসম্পর্কীয়া কোন দরিদ্রার কন্যা; প্রতি বৎসর পূজার সময় তাহারা এই খানেই আসিয়া থাকে।

সুধীর ডাকিল—"বিন্দু কি দেখিতেছ?"

বিন্দু বলিল,—"দেখুন না মা কেমন হাসিতেছেন, আবার যেদিন মা যাইবেন সেদিন কাঁদিবেন?"

সরলা বালিকার হৃদয়ে এই ভাব দেখিয়া সুধীর বলিল, "তুমি দেখিতে পাইতেছ মা হাসিতেছেন?"

"আপনিই দেখুন না! পূজার আগেও ত এই ঠাকুরই ছিল কিন্তু কৈ এমন হাসি ত দেখি নাই?" এই বলিয়া বালিকা তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সুধীর বলিল, "বিন্দু যাইতেছ কেন?"

"আমি তাড়াতাড়ি যাই—জ্যেঠামহাশয়ের পূজার আয়োজন করিয়া দিতে হইবে। আজ পূজার যোগাড় করিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে।"

এমন সময়ে একটী জীর্ণবাসপরিহিতা অনাথা বৃদ্ধা ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া মণ্ডপে আসিতে আসিতে সহসা ভূমিতে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ বিন্দু আর কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল, বৃদ্ধার পতনে বিন্দুর প্রাণে কি একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা আঘাত করিয়াছে—স উঠিলে বিন্দু বলিল—"মা তোমার কি কেও নাই?" বৃদ্ধা বলিল "না মা, আমার কেহ নাই।"

"বেশ! তুমি এইখানে থাক, এইখানে এই কয় দিন মায়ের প্রসাদ খাবে।"

সেইখানেই সুধীর দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল, সুধীরকে দেখিয়া বিন্দু বলিল "দেখুন, এই বুড়ীটার কেউ নাই, এর বড় দুঃখ; পুজোর দিন সবাই নতুন কাপড় পড়েছে, একে কেউ একখানা কাপড় দেয় নাই! আপনি একখান কাপড় দেন।"

সুধীর হাসিয়া বলিল—"তুমিই একখান দাও না।"

বিন্দু বলিল—"আমার এই একখানা নূতন কাপড়—তা আমিই এইখান দিব।"

" না না তোমাকে দিতে হবে না। আমি এর ব্যবস্থা করিব।" বিন্দু আনন্দে হাসিতে হাসিতে জ্যাঠামশায়ের পূজার যোগাড় করিতে গেল।

এই কয়দিন বিন্দুর ব্যবহার এবং কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিয়া সুধীর দেখিল যে বিন্দুর হৃদয় অতি উচ্চ। কমলার রূপ:সৌন্দর্য্য ইহার হৃদয়ের নিকট স্থান পাইতে পারে না। কমলা ত বলে "ভিক্ষা দেওয়া আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া, অথবা তাহারা বলে বিশ্বপ্রেম আমাদের আদর্শ" কমলার বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত বিলাসিতা অপেক্ষা পল্লিবাসিনী বিন্দুর সরলতার সহিত দারিদ্র্যও অনেক গুণে ভাল।

এই তিনদিন মহামহোৎসব। কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং"—ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে যে কোন জাতির এ তিন দিন অবারিতদ্বার। বিন্দু যতটা পারে এসব বিষয়ে প্রাণ দিয়া খাটিতেছে—ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরাম নাই। সুধীর মনে ভাবিয়াছিল পূজার কয়দিন পরে মুর্শোরী যাইবে, কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠিল না। কমলার কথা কিছু ঢাকা পরিয়াছে। ছুটীর পর মোহিনীর সহিত সুধীরের সাক্ষাৎ হইলে মোহিনী ঠাট্টা করিয়া বলিল "কেমন হে সুধীর, পুতুল পূজা কেমন হ'ল ?"

সুধীর দৃঢ় ভাবে বলিল—"বেশ ভালই হইয়াছে—এবার পুতুলের মধ্যে প্রাণ দেখিয়াছি——প্রাণের বড় দুঃখ থাক্‌ল যে তোমাদের দেখাতে পেলেম না।"

(৬)

বি, এ, পাস করিয়া সুধীর গৃহে প্রত্যাগত হইল। সুধীরের মাতার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা সুধীরের বিবাহ দিয়া একটী সুন্দরী বধূ ঘরে আনেন; কিন্তু স্বামীর অনভিমতে সে সাধ মিটাইতে পারেন নাই। পুত্রেরও তত মত ছিল না। এবার ঘোষাল মহাশয় পুত্রের বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন। অনেক জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। এইরূপ পাত্রের আজকালকার বাজারে দর অনেক বেশী। এই দর দিয়া ক্রয় করিতে পারেন এইরূপ কোন কোন খরিদ্দার মেয়ে দেখার জন্য—টাকাকড়ি গহনার ফর্দ্দ দিবার জন্য ক্রমাগত পত্র দিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন যে তিনি অর্থ-বিনিময়ে পুত্রকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নন।

সুধীরচন্দ্রও বলিল "আমি দরিদ্রের ঘরে বিবাহ করিব।" তাহার বৌদিদি

বলিল—"তা কি হয় ঠাকুর পো! পয়সা না থাকলে তোমার মত গুণের জামাই এর সাধ সম্মান তত্ত্ব তল্লাস করবে কি করে? আর আমাদেরই বা কুটুম কুটুম্বিতার সাধ মিটবে কি করে?"

অবশেষে দরিদ্রার কন্যার সহিতই সুধীরের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। ঘোষাল মহাশয় উভয় পক্ষের খরচ সম্পাদন করিয়া সমারোহের সহিত আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন। বিন্দু বুঝিল মা ভগবতীর কৃপাতেই সুধীরের ন্যায় স্বামী তাহার কপালে মিলিয়াছে।

এখন সুধীরের সে মোহ আর নাই। কমলার সহিত একজন বিলাত ফেরতের বিবাহ হইয়াছে। মোহিনীর সহিত এখনও মধ্যে মধ্যে সুধীরের দেখা হয়।

বিন্দু প্রাতঃকালে উঠিয়াই চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম না করিয়া কোন কার্য্যই করে না। সুরেন—

চূড়ালা ও শিখিধ্বজ।

(৪)

রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণকুমার তখন আপনার পরিচয় দিলেন। কহিলেন "রাজন্, আমি কমলযোনি ব্রহ্মার পৌত্র, দেবর্ষি নারদের পুত্র। কুম্ভ হইতে জাত বলিয়া আমার নাম কুম্ভ। বেদ আমার গুরু, উপনিষৎ আমার শিক্ষয়িত্রী, বেদান্ত আমার ক্রীড়াসহচর, দেবী সরস্বতী আমার মাতা, ব্রহ্মশক্তি-রূপা গায়ত্রী আমার মাতৃস্বসা, ব্রহ্মলোক আমার গৃহ। ইচ্ছামত ত্রিভুবন বিচরণে আমার আনন্দ, তত্ত্বব্যাখ্যানে আমার সন্তোষ। আজ আমি মন্দাকিনী-শীকরসিক্ত আকাশপথ দিয়া যাইতে যাইতে আপনাকে দেখিলাম। রাজা হইয়া রাজ্য-ধন অবহেলায় ত্যাগ করিয়া তপস্যামগ্ন আছেন জানিয়া আপনার সহিত পরিচয় করিবার জন্য আসিলাম। আপনার মত সাধুসঙ্গ লাভের আশায় আজ আমার অন্তর বড়ই লালায়িত হইয়াছে।"

রাজা শিখিধ্বজ বিস্ময়স্তিমিত দৃষ্টি সেই সরল কিশোর ব্রাহ্মণের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিলেন—"দেব, দেবর্ষি নারদ কমলযোনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, কিন্তু আপনি দেবর্ষি নারদের পুত্র হইলেন কিরূপে? তিনি ত দারপরিগ্রহ করেন নাই। আর তাঁহার কোনরূপ পুত্রের কথাও ত আমরা অবগত নহি?"

ব্রাহ্মণ। শুনুন মহারাজ, একদিন দেবর্ষি সুমেরুর গুহায় ধ্যানমগ্ন। সম্মুখে সুমেরু লক্ষ্মীর কণ্ঠে বিলম্বিত মুক্তামালার মত মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গা উচ্ছল কল-কলস্বনে বহমানা। অকস্মাৎ সেই মন্দাকিনীর তীরে বলয়সিঞ্জনমুখর লীলাময় হাস্যের কলকলধ্বনি উত্থিত হইল। ঋষিবরের অর্দ্ধস্তিমিত নেত্রদ্বয় ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন কমলকোরকযুগ্মের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ঋষি চাহিয়া দেখেন —রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা ও উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরারা জলক্রীড়ায় মত্ত। কবরী আলুলায়িত, বসন বিস্রস্ত—বক্ষ সম্পূর্ণ অনাবৃত। স্বচ্ছজলে সেই সব লাবণ্যময়ীদের স্বচ্ছদেহের প্রতিবিম্ব দোলায়িত। বাতাস সাদরে সানুরাগে সঙ্গোপনে কখন বসন, কখন কুন্তল লইয়া খেলা করিতেছে, নাচাইতেছে, আলোড়িত সলিলতরঙ্গের উপর মৃদু মৃদু উর্ম্মিমালার সৃষ্টি করিতেছে। ঋষির মন ক্ষণেকের জন্য মোহিত, হৃষ্ট ও বিচলিত হইল। শান্তিবারিধি-বক্ষে কিসের সংক্ষোভ দেখা দিল। ঋষির দেহে ভাবের আবেশ ফুটিয়া উঠিল। তখন সদ্যশ্ছিন্ন লতাবৃন্তের মত, দ্বিধাভিন্ন মৃণালসূত্রের মত মহর্ষি স্খলিত-ধাতু হইলেন। তারপর সংযমী তপস্বী, বিশুদ্ধ বুদ্ধিরজ্জু দ্বারা সেই মদমত্ত মনোহস্তিকে বিবেক-আলানে বদ্ধ করিয়া সেই ধাতু কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তার পরই সেই কুম্ভেই আমি জন্মগ্রহণ করিলাম। ইহাই আমার জন্মবৃত্তান্ত। জন্মদাতা পিতা আমাকে লইয়া স্বর্গে গেলেন। সেইখানেই আমি লালিত পালিত, সংবর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিলাম। দেবর্ষি আমার জন্মদাতা, আচার্য্য, গুরু ও শিক্ষক। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্যনিয়মে অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাব্য ব্যবস্থায় ভগবানের কল্যাণময়ী ইচ্ছার উপর কথা কহা চলে না। ব্রহ্মবিৎ সুখদুঃখবিমুক্ত মহর্ষির আচরণের বিষয়ে সমালোচনা করা আমাদের সাজে না।

এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেন আপনি সংসারীর স্বধর্ম্ম পালন, গৃহস্থের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন, রাজার রাজ্যরক্ষা পরিহার করিয়া বনগমনক্লেশ স্বীকার করিলেন? নির্জ্জন শৈলগহ্বরে বৃথা তপঃক্লেশে কেন জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন? এ বহির্মুখী দুশ্চেষ্টা আপনার কেন হইল?

রাজা। দেব, আপনি ব্রহ্মার পৌত্র, দেবর্ষি নারদের পুত্র; আমাদের নমস্য—গুরুস্থানীয়। আপনাদের মত মহাত্মাদিগের দর্শন অনেক সুকৃতির বলে লাভ হইয়া থাকে। আপনাকে বলিতে বাধা কি, আমি রাজা শিখিধ্বজ—অপ্রতিদ্বন্দ্ব রাজ্যের অধীশ্বর, দেশব্যাপী যশের অধিকারী, মনোরমা সতী

চূড়ালার একমাত্র আশ্রয়, আমার রাজ্য আর ভাল লাগিল না ; সংসার কটু, ধনসম্পত্তি বিষাক্ত, স্ত্রীসঙ্গ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। মানব সংসারে যাহা চায়, যাহা পাইলে সুখী ভাবে, আমার সে সবই ছিল। তবু আমি শান্তি পাইলাম না। সে সব ত্যাগ করিয়া বনবাসে মতি স্থির করিলাম। আর যাহাতে সংসারের ধূলা খেলা না খেলিতে হয় জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ আর সহ্য না করিতে হয়, সেই আকাঙ্ক্ষায় এই সংসারত্যাগব্রত লইয়াছি। কঠোর সাধনা—আমরণ তপস্যা করিয়াও যাহাতে সেই পরমপদ লাভ করিতে পারি, সেই আশায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া এই শৈলগহ্বরে আসিয়াছি। কিন্তু দেব, ফলত কিছু পাইলাম না ; দিঙ্মণ্ডল বিচরণ করিয়া, কঠোর তপস্যায় মন দিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াও ত শান্তি পাইলাম না। রাজ্যে থাকিয়া সৎসঙ্গে যাহা লাভ কবিতাম, শাস্ত্র অধ্যয়নে শাস্ত্রার্থ শ্রবণে যে শান্তি পাইতাম, সতী চূড়ালার সাহচর্য্যে যে আনন্দের অধিকাবী হইতাম, তাহাও ত এক্ষণে পাইতেছি না। আমি ক্রমেই যেন অসহায় হইয়া পড়িতেছি। দুঃখে আকুল, নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পতনের দিকে নামিয়া যাইতেছি ; আপনি গুরুর মত, বন্ধুর মত, যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন আমার যাহাতে ভাল হয়, তাহা করুন। উপদেশ দিয়া আশ্রিত—শরণাগত আমাকে কল্যাণের পথে লইয়া যান।

ব্রাহ্মণ। রাজন্, আপনি সংসারে অনেক ধর্ম্মকার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, শম-দমাদি দ্বারা মনের মালিন্য অনেকটা কাটাইয়া দিয়াছেন, এক্ষণে জ্ঞান-পথ অবলম্বনই আপনার কর্ত্তব্য। মলিন সংসারবাসনা যখন আপনি এক প্রকার পরিহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন সিদ্ধি সুদূরপরাহত নহে। এক্ষণে সাধনা আবশ্যক, জ্ঞানানুশীলন প্রয়োজন, সর্ব্বত্যাগ অবলম্বনীয় ; নানারূপ ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকার আর সময় নাই। বাসনাই ক্রিয়ার জনয়িত্রী। বাসনা না থাকিলে ক্রিয়া নিষ্ফল। বাসনার সমূল উচ্ছেদ তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। আপনি তত্ত্বজ্ঞ, সকলই ত জানেন। বাসনার সম্পূর্ণ পরিহার ব্যতীত সে জরামৃত্যুহীন অক্ষয় পদ লাভ করা যায় না। সম্পূর্ণ বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। আপনি মনে মনে হয়ত ধারণা করিয়াছেন, বাসনা আপনার সম্পূর্ণ জিত হইয়াছে। না মহারাজ, উপরকার বাসনা জয়ের অপেক্ষা ভিতরের বাসনা জয় করাই কঠিন ব্যাপার। পার্থিব বস্তুর উপর অনুরাগ ত্যাগ করুন, ঐহিক ভোগের আকাঙ্ক্ষা দমিত করুন, শ্রীভগবানে কর্ম্মফল ন্যস্ত করিয়া, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই উপাসনায় মন দিন।

এই যে কমণ্ডলু, দণ্ড-আসন-অক্ষমালা, এই যে পর্ণাচ্ছাদিত কুটির, এই যে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বনভূমি—এই সকলের উপর আজিও আপনার মায়া কেন? সংসারের আকর্ষণরজ্জু ছিন্ন করিয়া বনবাসের কঠিন সুত্রে যে বাঁধা পড়িয়াছেন? বলুন দেখি মহারাজ, ঐহিক পারত্রিক ভোগের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়াছে কি না? পার্থিব সকল জিনিষের উপর মায়া সম্পূর্ণ কাটিয়াছে কি? ভাবেন কি মহারাজ, এই জগৎটা কি? আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? কোথায় যাইবেন? জন্ম মৃত্যুর বন্ধন কিসে কাটে? আপনিও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, সর্ব্বত্যাগের একটা মোটামুটী ধারণাও করিয়া রাখিয়াছেন, বলুন দেখি সে সর্ব্বত্যাগে অধিকার কি আপনার জন্মিয়াছে? যে সর্ব্বত্যাগ বিশ্বের নিখিল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করে, যাহা অপূর্ব্ব শান্তিরসাশ্রিত আনন্দ আনিয়া দেয়, তাহা কি সিদ্ধ হইয়াছে? ভোগের সকল বস্তুই ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখনও যে অহং মম রূপ অবিদ্যা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যে অহং ভাবের জন্য মানব বদ্ধ, তাহা ত আপনার ষোল আনাই বর্ত্তমান। অহংভাব যে মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ে ওত প্রোতভাবে বিদ্যমান। অহং অভিমান না উচ্ছেদ করিতে পারিলে পরমানন্দ মোক্ষ লাভ কখন করা যায় না। আজই আপনি যে অহং অভিমানকে সূক্ষ্মতম অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন, কিন্তু দেখিবেন, উহাই আবার ভাবনার ফলে ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে, তখন সর্ব্বত্যাগ কোথায় থাকিবে? এই ভাবনা যখন অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ঐ ত্যাগবুদ্ধি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারে।

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যগণ বলেন, কর্ম্মত্যাগ বর সহজ, কিন্তু কর্ম্মের ভাবনা ত্যাগ করা বড় কঠিন। কুকর্ম্মানুষ্ঠান অনেকে করে না, করিতে পারে না; কিন্তু কুকর্ম্ম চিন্তার পরিহার কয় জন করে, করিতে পারে? রাজন্, আপনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই যে দেখিতেছি আপনার অন্তরে প্রচ্ছন্ন অভিমান আসিয়া আধিপত্য করিয়াছে। ত্যাগ করিয়াছেন তার আবার অভিমান কি? যে দারা পুত্র বিষয় সম্পত্তি আপনার নহে, তাহার আবার ত্যাগ কি, আর সে ত্যাগজনিত অভিমানই বা কিসের? স্থূল বন্ধন কাটাইতে গিয়া দেখিতেছি যে সূক্ষ্ম বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। বিষয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন সত্য, বিষয়ের উপর রাগ ত সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিষয়রাগ ত্যাগ করিতে না পারিলে কেবল বিষয় ত্যাগে কোন ফল নাই।”

রাজা কিশোর ব্রাহ্মণের তপঃ-উজ্জ্বল মুখনিঃসৃত জ্ঞানময়ী বিবেকবাণী একমনে শুনিতে লাগিলেন। সেই শ্রুত তত্ত্ব-উপদেশগুলি অন্তরে মনন করিতে আরম্ভ করিলেন। চিন্তা করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আপনার হৃদয়নদের তটে অভিমানের বালুরাশি এখনও জাগিয়া আছে। সূক্ষ্ম বাসনা মৃগনাভি গন্ধের মত এখনও তাঁহার অন্তরপুট ত্যাগ করে নাই। বিষয়ানুরাগ-বহ্নি ধূমায়িতভাবে এখনও তাঁহার চিন্তাগহ্বরে বর্ত্তমান আছে। উপদিষ্ট তত্ত্বগুলি মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে রাজা শিখিধ্বজের বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইল। আশ্রমের প্রতি আস্থা দূরে গেল। বৃক্ষ, জল, স্থল, গুল্ম লতা, বিতান, পর্ণশালা যে তাঁহার নিজের নহে, এ বোধ জন্মিল। দণ্ড কমণ্ডলু আসন প্রভৃতির মায়াও অপগত হইল।

রাজা এতদিন মন্ত্রকাননে বিচরণ করিয়া কর্ম্মপথে বিহার করিয়া দ্রষ্টব্য ধর্ম্মস্থলী দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে উপরম আবশ্যক। কর্ম্মোপশমরূপ উপরতির সেবা ব্যতীত শান্তি মিলে না। তখন রাজা অক্ষমালাগুলি তারকা-শ্রেণীর মত হৃদয়াকাশ হইতে উন্মোচিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর মৃগচর্ম্ম, দণ্ড আসন প্রভৃতি অগ্নিতে বিশুদ্ধ করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে সেগুলি দান করিলেন, এইরূপে রাজা নিঃস্ব হইলেন।

রাজা এইবার আপনাকে প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী, সম্যক্ প্রবুদ্ধ, যথার্থ বিশুদ্ধ জানিয়া ঋষিতনয় কুম্ভের নিকট দাঁড়াইলেন। রাজা শুনিলেন যে, তাঁহার অন্তরে অভিমানের সূক্ষ্ম কণিকা সম্পূর্ণ লুপ্ত ও সর্ব্বোঙ্গীণ রাগ সর্ব্বাদি বিদূরিত হয় নাই। রাজা নিশ্চয় করিলেন "ইন্দ্রিয় সর্পে পরিপূরিত রক্তমাংসের অশুচি জড় দেহ থাকিতে বাসনার সমূল উচ্ছেদ হইবে না।" রাজা এই নিন্দিত অভিপ্রায় মনে মনে করিয়া যেই গাত্রোত্থান করিবেন, অমনিই ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন,—

"ছিঃ মহারাজ, এ দৌর্ব্বল্য এ ভ্রান্তি আপনার সাজে না! এ আত্মহত্যা আপনার মত ধীর ব্যক্তির কার্য্য নহে? নিরপরাধ জড়যন্ত্রস্বরূপ দেহের দোষ কি? এই মূক অতিদীন তুচ্ছ জিনিষের উপর ক্রোধ কেন? জলে ভাসমান কাষ্ঠ আপনিই যেমন ভাসিয়া যায় না, এই দেহও তেমনই আপনি কোন কার্য্য করে না। একের দোষে অপরের সাজা দেওয়া আপনার মত ধীর বিবেকীর কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। সহস্র প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ন্যায়বান্ বিচারকের এ অবিচার শোভা পায় না। দোষী আপনার মন। মন জয় করুন। মন-অশ্ব

আয়ত্তে থাকিলে দেহ-রথ বিপথে যাইবে না। বৃক্ষের স্পন্দন বাতাসের জন্য, নিজের প্রকৃতির জন্য নয়; ইহা ভাবিয়া দেহের উপর রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ, গৃহ সংসার, রাজ্য ধন সকল বস্তুর বীজস্বরূপ চিত্তকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্যাগ সাধিত হইবে। চিত্তত্যাগই সর্ব্বত্যাগের উপায়। চিত্তত্যাগেই চিত্তনাশ ও বাসনাক্ষয়। চিত্ত সম্যক্ জিত হইলেই চিত্তত্যাগ সম্ভব। বাতাসে বৃক্ষের মত, ভূমিকম্পে পর্ব্বতের মত চিত্তের দ্বারাই দেহ বিচলিতও হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ ভোগ যৌবন, জরা, মৃত্যু, শম দম তিতিক্ষা উপরতি প্রভৃতি সবই চিত্তরূপ পেটিকায় আবদ্ধ আছে। চিত্তকে ত্যাগ করিতে পারিলে এই দেহপ্রপঞ্চ লয় পাইবে, শান্তিময় নির্ম্মল ঐক্য দেখা দিবে। চিত্তই সংসারক্ষেত্রের শস্য। ক্ষেত্রের ক্ষেত্রত্ব নষ্ট হইলে যেমন শস্য জন্মে না, চিত্তের নাশ হইলে তেমনই বাসনার উৎপত্তি হয় না। বাসনার উচ্ছেদেই সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কালকালেও সর্ব্বত্যাগের প্রভাবে সিদ্ধার্থ সুমেরু শৃঙ্গের মত অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

চিন্তা করুন মহারাজ, বিষয় অনিত্য, তুচ্ছ ও হেয়; একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য মহান্ ও উপাদেয়। অভিমান অহঙ্কারই বড় রকমের শত্রু; এই শত্রু জয়ে মন দিন, ক্রমে চিত্ত জয় হইয়া আসিবে। সাধনা করুন বাসনার উচ্ছেদ দেখা দিবে। পরমধন মোক্ষলাভে আপনি কৃতকৃত্য হইবেন—ইহা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

দেবীসূক্ত।

আমি বসুগণ আমি রুদ্র একাদশ,
আমি বিশ্বদেব আমি আদিত্য দ্বাদশ;
আমি ইন্দ্র আমি অগ্নি আমি সে বরুণ,
অশ্বিনীকুমার (ও) আমি আমিই অরুণ ॥১॥

সোমরূপে আমি সর্ব্ব-শত্রুনাশকারী,
ত্বষ্টা পূষা ভগ আদি স্বরূপ আমারি ;
যজমান হয়ে করি সত্র অনুষ্ঠান,
যজ্ঞেশ্বর রূপে পুনঃ করি ফলদান ॥২॥
সর্ব্বেশ্বরী আমি সর্ব্বসম্পদদায়িনী
ব্রহ্মরূপা আমি সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপিণী ;
সর্ব্বভূতে জীবরূপে মম অধিষ্ঠান,—
আমাতেই সর্ব্বকর্ম্ম হয় অবসান ॥৩॥
শ্রবণ দর্শন আদি, আহার বিহার—
জীবে যত কর্ম্ম করে কর্ত্তা আমি তার ;
এভাবে না ভাবে মোরে তা'র অধোগতি ;—
কহি এ পরম তত্ত্ব শুন শুদ্ধমতি ॥৪॥
দেব নরে যার তরে করে মোর স্তব
এই সে চরম তত্ত্ব কহি আমি সব।
সবার প্রধান করি তুষ্টা যার প্রতি,—
কা'রে ব্রহ্মা, ঋষি, কা'রে পরম সুমতি ॥৫॥
ব্রহ্মদ্বেষী ত্রিপুরের বিনাশ সাধনে
আমি হই মৃত্যুরূপা শিবশরাসনে।
ভক্তের লাগিয়া রণে দুষ্টে করি নাশ,—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সর্ব্বস্থলে আমারি বিকাশ ॥৬॥
সৃষ্টির প্রথম সূত্র—সবার আধার—
এই মহাকাশ—আমি প্রসূতি তাহার।
পরমাত্মরূপে আমি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী
ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপি অধিষ্ঠিতা আমি ॥৭॥
বায়ু যথা বহে সদা আপন ইচ্ছায়,
সৃষ্টিকার্য্য করি আমি আত্ম-প্রেরণায় ;—
কিন্তু আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য সবারি অতীত,
অচিন্ত্য মহিমাময়ী অনাদি অনন্ত ॥৮॥

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ।

বোধন।

আজি চারিদিকে আয়োজন—আড়ম্বর। কেন—কি নিমিত্ত এ ঘোরঘটা—এ বিপুল আয়োজন—এ তুমুল বাগ্যোত্তম? নিত্যবোধরূপা জগদ্ধাত্রী—জননী নাকি নিদ্রাতুরা; তাই তাঁর ভক্ত সন্তানগণ তুমুল কোলাহলে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে চলিয়াছে।

তাই কি? 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা', তাঁহার এ গভীর নিদ্রাবেশ কেন? নিদ্রারও কি নিদ্রা আসে? অথবা আমরাই নিদ্রাবশে জাগরণের স্বপ্ন দেখিতেছি? তাহা যদি না হইবে তবে 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে', তাঁহাকে জাগাইবার জন্ম এ ব্যস্ততা এত আড়ম্বর কেন? যিনি চৈতন্যস্বরূপা চিরপ্রবুদ্ধা চিন্ময়ী তাঁহাকে জাগাইব কি? যিনি 'বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে,' যিনি বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী তিনি নিদ্রাঘোরে অচেতনা; আর আমরা তাঁহার জাগ্রৎ-সন্তানগণ সেই চিতিস্বরূপার চৈতন্য-সম্পাদনে সচেষ্ট। ইহা কি সম্ভব—ইহা কি স্বাভাবিক? যিনি 'সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী', যিনি বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা', যিনি 'বিশ্বস্ত বীজং'—তাঁহার এ নিদ্রাবিকার সম্ভব? না অবিদ্যাবিজৃম্ভিত মুগ্ধ জীবের পক্ষে স্বপ্নাবেশে চিন্ময়ীর চৈতন্যসম্পাদনচেষ্টারূপ কাল্পনিক উদ্যম সম্ভব? 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা', যিনি শান্তিস্বরূপা, সেই শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণ-পরায়ণার চিরনিরাপদ্ অনাবিলস্নেহশীতল উৎসঙ্গে সুখশায়িত সন্তান জাগরিত; আর অসংখ্য বিশ্বের বিধাত্রী, অসংখ্য সন্তানের পরিপালিকা, সর্ব্বকর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী, সর্ব্বশক্তিমতী মা উদাসীনের ন্যায়—জড়ের ন্যায় নিদ্রালসা? ইহা কি বিশ্বাস-যোগ্য?

রাজসিক উপাসক শ্রুতির দোহাই দিয়া বলিবেন—"অথৈতদ্দক্ষিণায়নং দেবানাং রাত্রিঃ।"

অপিচ—

"রাত্রাবেব মহামায়া ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।
তথৈব চ নরাঃ কুর্য্যুঃ প্রতিসংবৎসরং নৃপ॥"

হউক দক্ষিণায়ন দেবদেবীগণের পক্ষে রাত্রি! করুন ব্রহ্মা সেই রাত্রিতে মহামায়ার বোধন! তাহাতে কি আসে-যায়? মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—

মহাজনের অবলম্বিত পন্থাই অবলম্বনীয় হইতে পারে;—হইতে পারে বিধাতৃ-প্রবর্ত্তিত পন্থা অনুসরণ করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ প্রাগৈতিহাসিক সময় হইতে অকালবোধনের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহাতে কি সপ্রমাণ হয় যে বিধাতৃবরদা হিমাচলসুতানাথসংস্তুতা অচিন্ত্যরূপচরিতা মা আমার নিদ্রাপগতচেতনা হইয়া থাকেন? হরি যোগনিদ্রাবশে শেষশায়ী হইতে পারেন, হর তন্দ্রালস্যে জড়ীভূত হইতে পারেন—কিন্তু যিনি 'হরিহরাদিভিরপ্যপারা', যিনি 'আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী', 'যয়া ব্রহ্মাদিদেবতাঃ॥ যয়া জয়তি বিশ্বঞ্চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে। যয়া বিনা জগন্নাস্তি—'সেই নিত্যবোধস্বরূপিণী জননী আমার নিদ্রাভিভূতা?—এ কি প্রহেলিকা? যাঁহার অতুল অচিন্ত্য প্রভাবে জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা জগৎসংহর্ত্তা বিষ্ণুও বিগতচেতন হইতে পারেন, তাঁহার উপরও নিদ্রার প্রভাব কার্য্যকর হয় কি? ইন্দ্রাদি দেবতার দিনরাত্রি ভেদ থাকিতে পারে; কারণ দেবগণও কর্ম্মাধীন—এমন কি বিধাতাও বিধি-নিষেধের বশীভূত। কিন্তু জগৎ-জননী "দেবানামপি দেবতা"—পরমেশ্বরেরও ঈশ্বরী।

"দয়া নিদ্রা চ ক্ষুৎ তৃপ্তিস্তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতা চ সা॥
বৈকুণ্ঠে সা মহালক্ষ্মী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী চ সা॥
সা দুর্গা মেনকা-কন্যা দৈন্যদুর্গতিনাশিনী।
স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ দুর্গা সা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে॥
সা বীণা সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা॥
মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সংসারিকস্য সা।
মদ্‌ভক্তানাং ভক্তিশক্তির্ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা॥
নৃপাণাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভারূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং ত্রয়ী দুস্তরতারিণী॥

সৎস্থ সদ্বুদ্ধিরূপা চ মেধাশক্তিস্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ।"

এবম্ভূতা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী জননী আমার প্রাকৃত জনের ন্যায় নিদ্রাপহৃত-চেতনা ?

"যস্যা প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।"—

ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মা, হর—ইঁহারাও যাঁহার অতুল প্রভাব ও অপ্রমেয় শক্তির সম্যক্ বর্ণনা করিতে অক্ষম, সেই অনন্তশক্তির আধারস্বরূপা মা আমার নিদ্রার বশবর্ত্তিনী ? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিবিলয়কর্ত্রী যিনি, তাঁহার কি মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চেষ্টতা সম্ভব ? যিনি স্বয়ং সর্ব্বচেষ্টাস্বরূপিণী তাঁহার নিশ্চেষ্টতায় যে শক্তির উৎস শুষ্কীভূত হইবে, বিরাট্ বিশ্বযন্ত্র নিশ্চল হইবে, শিব শব হইবেন। অসংখ্যকোটি জীবের জননী লালন-পালনকর্ত্রী রক্ষাবিধাত্রী জগদ্ধাত্রীর আমার কি নিদ্রার অবসর আছে ? যাঁহার অসীম শক্তির আশ্রয়ে এ বিপুল বিশ্ব সুরক্ষিত স্থানয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, সেই গুণময়ী নিদ্রাবশে নির্গুণা হইলে যে মহাপ্রলয় হইবে ? তিনিই যে এ নিরাশ্রয় ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপা ;—

"ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।"

আমরা নিদ্রাবশে অচেতন হই। পুরাণেতিহাসে শুনিতে পাই দেবতারাও নিদ্রার প্রভাববিমুক্ত নহেন ; নিদ্রাপ্রভাবে ভূতভাবন নারায়ণেরও সংজ্ঞা লোপ হইয়াছিল। তাই আমরা হরি হর-বিধাতার ভাগ্যবিধাত্রীরও নিদ্রাবেশ কল্পনা করি। কিন্তু সর্ব্বেশ্বরী জননী যে আমার তুলনার বস্তু নহেন ; তাঁহার সহিত যে অপর কাহারও তুলনা সম্ভবে না ! তিনি যে—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

কি দেব কি মানব সকলেই তাঁহার অলঙ্ঘ্য বিধানে নিয়ন্ত্রিত—তাঁহারই অমোঘ প্রেরণায় পরিচালিত। সর্ব্বগ্রাসী শমন, সর্ব্বভুক্ দহন, অপ্রতিহতগতি প্রভঞ্জন, সর্ব্বদেবাধিপতি আখণ্ডল—সকলেই সেই মহামহেশ্বরীর আজ্ঞাকারী,—তাঁহারই নির্দেশ পালনে সদা তৎপর ;—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি ভাস্করঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

তবে কেন এ অহেতু বোধন? চিরজাগ্রতের নিদ্রাভঙ্গের ব্যপদেশে কেন এ অকারণ কোলাহল? মা আমার বহুরূপধারিণী। মাতৃরূপে তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না;—তাঁহার ভ্রান্তিরূপই আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাই আজি এ বিড়ম্বনা। তাই যিনি—

"তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ"

তিলে তৈলের ন্যায়, দধিতে ঘৃতের ন্যায়; দ্রববস্তুমাত্রে রসের ন্যায়, কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, তাঁহার উদ্বোধন করিবার জন্য বিল্বমূলে চলিয়াছি। তিনি অদ্বিতীয়, একমাত্র প্রভু, সর্ব্বভূতহৃদিস্থিত;—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"—

তিনি সর্ব্বাশ্রয়, কোন বস্তুই তদতীত নহে;

"তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।"

কিন্তু আমরা এমন ভ্রান্ত যে তাঁহাকে আপনার মধ্যে ত পাইলামই না—যাহাদিগকে বড় আপনার মনে করি, আমার আমার করিয়া আকুল হই, তাহাদিগের কাহারও মধ্যে তাঁহার ছায়ামাত্রও দেখিতে পাইলাম না। রোগে শোকে বিপদে ব্যসনে সেই শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণার অভয়পদারবিন্দ মোহ-মলিন হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল না; সুখসমৃদ্ধিতে সেই বিধাতৃবরদার বরদ হস্ত দেখিয়াও দেখিলাম না। অন্তরের নিধির অনুসন্ধানে ঘরের বাহির হইয়া আপনাকে হারাইলাম। সেই বহুরূপার ভ্রান্তিরূপে আত্মহারা হইলাম; মাতৃ-রূপ দেখিয়া নয়ন সার্থক করা হইল না।

জননী আমার জ্যোতিরীশ্বরী;—চন্দ্রে সূর্য্যে গ্রহে তারকায় তাঁহারই পরা-জ্যোতিঃ প্রতিফলিতা;—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকাং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

কিন্তু এ সর্ব্বাভিভাবিনী জ্যোতিঃ আমাদের অন্ধ নয়নে প্রতিভাত হইল না; মূঢ় আমরা জ্যোতির্ম্ময়ীর তামসী মূর্ত্তিই দেখিয়া আতঙ্কে নয়ন মুদ্রিত করিলাম। তীব্র জ্যোতিঃপাতে সহসা দৃষ্টি কলুষিত করিল বলিয়া আর আঁখি মেলিলাম না; ঘনকৃষ্ণ অবিদ্যার আবরণে নয়ন আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলাম।

"নয়নে বসন বাঁধিয়া, মরিগো আঁধারে কাঁদিয়া"—

এইরূপে অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সে অনির্ব্বাণ আলোকের কথা বিস্মৃত হইলাম; প্রথমে অন্ধকার বাহিরের বস্তু ছিল, পরে অন্তরও অন্ধকার হইয়া গেল। তখন আপনিই পথ হারাইয়াছি তাহা মনে না করিয়া অপরকে পথ দেখাইতে চলিলাম।—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধে নৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

অন্ধ অন্ধের হস্ত ধরিয়া সেই সর্ব্বতশ্চক্ষু সর্ব্বদ্রষ্টাকে দেখাইতে চলিল। কি বিড়ম্বনা, কি পরিতাপ! আত্মবোধবঞ্চিত নিত্যবোধস্বরূপার বোধনের জন্য ব্যাকুল হইল। কি বাতুলতা!

তবে এ বোধন নিরর্থক—অকর্ত্তব্য? কে বলিল? সর্ব্বার্থদর্শী সর্ব্বসংশয়-ছেত্তা মহাজনগণের ব্যবস্থিত—প্রযত্নাতিশয্যে অনুষ্ঠিত বোধন কি নিরর্থক হইতে পারে? তাহা নয়; তবে আমরা যে এ চরম অনুষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গিয়াছি। যাহারা প্রকৃতই মোহনিদ্রাভিভূত তাহাদিগকে জাগাইবার কথা বিস্মৃত হইয়া—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি"—অন্য সকলে সুপ্ত হইলেও যিনি জাগিয়া থাকেন সেই স্বপ্নবর্জ্জিতাকে জাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এ বোধন সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী পরমাত্মরূপার জন্য নহে। ইহা মায়াপগতশক্তি জীবাত্মার জন্য। নারায়ণ নরদেহ ধারণ করিয়া আত্মশক্তি বিস্মৃত হইয়াছিলেন; তাই রাবণ বধের জন্য তাঁহাকে শক্তির বোধন করিতে হইয়াছিল—আত্মশক্তি জাগরিত করিতে হইয়াছিল। মানুষ অবিদ্যাকুহকে পড়িয়া আত্মশক্তি বিস্মৃত হইয়াছে; সে শক্তিময়ীর সন্তান তাহা ভুলিয়া হীনের ন্যায় রিপুগণের দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে। তাহার লুপ্তশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে—আপনাকে চিনাইতে হইবে—মনে প্রাণে বলাইতে হইবে "সোঽহং।" তাই এ বোধন—ইহা—সচ্চিদানন্দময়ী শুদ্ধচৈতন্যরূপিণী শক্তিস্বরূপিণী জননীর জাগরণোৎসব নহে।

মা চিরদিন জাগিয়াই আছেন,—মায়ানিদ্রামুগ্ধ সন্তানকে চিরদিনই ডাকিয়া বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

তথাপি সুখস্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিল না দেখিয়া করুণারূপিণী জননী আমার দুর্গতিনাশিনী দুর্গা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। অদম্য উদ্যমস্বরূপ মৃগেন্দ্রবাহনে

অধিষ্ঠিত হইয়া অহঙ্কাররূপ অসুরকে পদদলিত করিয়া, বামে বুদ্ধিরূপা সরস্বতী ও পুরুষকার কার্ত্তিকেয়, দক্ষিণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপা লক্ষ্মী ও সিদ্ধিস্বরূপ গজাননকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী মা আমার দৈন্যদলিত সন্তানের জীর্ণকুটীরপ্রাঙ্গণে উপনীতা হইয়াছেন। ডাকিয়া বলিতেছেন—উঠ, জাগ, অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।

অরে মাতৃ-হারা মন! মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধূলিশয়ন হইতে উত্থিত হ! নয়ন হইতে কামনার কলুষবসন অপসারিত করিয়া জননীর বরাভয়দায়িনী মূর্ত্তি অবলোকন্ কর। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দুঃখদৈন্য আর তোকে পীড়িত করিতে পারিবে না। আর 'রূপং দেহি ধনং দেহি' বলিয়া দীন ভিক্ষুকের মত ব্যর্থ আবেদন করিতে হইবে না। আপনাকে মহৈশ্বর্য্যময়ী মায়ের সন্তান বলিয়া চিনিলে আর ভিক্ষা করিবার প্রবৃত্তিই থাকিবে না। সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণীর আত্মজকে আর হীন রিপুগণ অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া দাসত্ব করাইতে পারিবে না। অভয়ার সন্তানের আবার ভয় কি? আত্মদর্শী বীর সাধকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অত্যাচারীকে বলিয়া দে—"আমরা ত আটাশে নই।" আত্মশক্তির বিকাশে তাহাকে জানাইয়া দে—আমরা আটাশে নই; শক্তির সন্তান আমরা মোহনিদ্রায় জড়ীভূত হইয়াছিলাম মাত্র—মরি নাই।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জননী অনন্ত সম্পদ্ তোদের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কেন তবে কাল্পনিক ভয়ে জড়সড় হইয়া দীনের ন্যায় 'দেহি' 'দেহি' করিতেছিস্। মায়ের ধন কি চাহিয়া লইবার অপেক্ষা রাখে? অহেতু ভয় পরিহার কর—বল—

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥"

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ।

নিরাশ।

যদি আমারে কাঁদায়ে সুখে থাক প্রভু
থাক সুখে দেখা দিও না,
দেখা দিলে যদি বাজে গো মরমে
দিওনা গো দেখাদিওনা।

আঁখিজলে ভাসি আজীবন আমি
রব পথপরে পড়িয়া,
কাঁদিবে জগত, কাঁদিবে সবাই
কাঁদিবে আমার লাগিয়া ;
যুগে যুগে পারি নিরাশে ফিরিতে
(কিন্তু) আশা ফিরে দিতে পারি না!

শ্রীসুবিমলচন্দ্র ঘোষ।

প্রেমের লক্ষ্য

যথা ক্ষুদ্র প্রবাহিনী জনমি পর্ব্বত মাঝে
ভ্রমে কত বন উপবনে।
কত নদী জনপদ আসারে সরস করি
মিশে শেষ বারিধি-জীবনে।
তেমতি মানব-হৃদে জনমি প্রেমের নদী
সরসিয়া বিশ্ব পরিবারে।
অনন্ত—অশ্রান্ত ধায় যতক্ষণ নাহি পায়
মিলন সে প্রেম পারাবারে।

শ্রীদ্বারকানাথ মিশ্র।

নীরব-আঁধার

তার বুকভরা প্রেম তার ওই হাসি
হৃদয় মাঝারে মোরে বেঁধে দিবানিশি।
কি আর বলিব সখি বলিব তোমায় গো
সেপদ পরশ আশে জীবন বিতায় গো।
প্রাণ মোর কি যে ক'রে কি করে বুঝাই বল
প্রাণসখা বিনা মোর দিবসে আঁধার ভেল।
  এ ঘোর যাতনা মোর, কে বুঝিবে বল সখি
তাই যেরে নিয়তই নীরব হইয়ে থাকি।
সংসারের শত কাজ জোর করে করে চলি
নাহিক শকতি প্রাণে বারেক তাহারে ভুলি।
নীরব হইয়ে সহি জগতের সব জ্বালা
তাহার বিরহ হ'তে নহে তীব্র কোন জ্বালা।
জগতের যত কথা নাহি ভাল লাগে আর
নীরবে বিরলে ভাবি প্রেমময় মুখ তার।
আসিবে কি আসিবে না জানিনা জানিনা সই
তবু তার আশা-পথপানে চেয়ে রই।
জগতের হাসি খেলা জগতের ভালবাসা
সে সবে মজে না চিত সে সবে করিনি আশা।
ভাবি বসে ভাবাবেশে কোথা সেই চিত-চোর
গোপনে পশিয়া হৃদে হরিল হৃদয় মোর।
যদি তারে নাহি পাই সবই মোর অন্ধকার
তাই সে একক আমি আঁধারে বেঁধেছি ঘর।

ভূপেন্দ্রনাথ

অসীম স্নেহ

প্রভাতে বিহগ ললিত কাকলি ভাঙাইলে ঘুমঘোর
অলস জড়ানো নয়নে নেহারি হয়েছে রজনী ভোর।
আধেক সুপ্ত আধ জাগরণে, নিশার স্বপন শুধু জাগে মনে,
চেতনা বিমুখ জড় আয়তনে, তখনো পড়িয়া রহি।
কে যেন অদূরে স্বপনের পারে, কল্যাণময়ী চিনি না উহারে,
দিনের করমনিবহ আমারে, প্রত্যহে যায় কহি'।
তন্দ্রা-বিধুর পাণে আমার পশিলে তাহার বাণী
চমকি পলকে আবার নিদ্রা!—কি যে মোহ নাহি জানি!
কে ঐ তখন রক্তনয়ন বিনাশি আঁধার উজলি গগন
গৃহকোণে মোর ছড়ায় কিরণ তন্দ্রারে দূরে রাখি?
ত্রস্ত তাপিত চকিত হৃদয়ে সকল শকতি নিয়োজি সভয়
অমনি কাহার আদেশনিচয়ে মাথায় বহিয়া থাকি!
উদ্যম আশে সঙ্গে লইয়া মোহিনী সে এক ভ্রান্তি
প্রভুর কার্য্যে আপন প্রতীতি অপগত করি শ্রান্তি।
কার্য্যকলাপে সারা দিনমান ব্যাপৃত রহি আসে অভিমান
অহমিকা ঢাকে মুগ্ধ পরাণ 'আমার' 'আমার' হাঁকি।
ফুরাইল দিবা রজনী অর্দ্ধ তবু না ফুরায় কাজের ফর্দ্দ
নিশ্বাস পড়ে ব্যাকুল দীর্ঘ তোমারে বারেক ডাকি।
ব্যর্থ প্রয়াস ব্যথিত পরাণে তোমার স্মৃতিটি আসে
চূর্ণিত হয় দর্প আমার তোমার মহিমা পাশে।
তোমার প্রেরিত ঊষা দিবাকর প্রতিদিন তারা আসি পরপর
পশে যে আমার মোহঢাকা ঘর তোমারি সে নিয়োজন।
সন্ধ্যায় যবে নিরাশায় বাণী, চিন্তাপীড়িত ম্লান হিয়া খানি
চরণোপান্তে লও তুমি টানি, সেও তব প্রয়োজন।
নির্দ্দেশ করি কর্ম্ম মানবে পাঠাও জগতে কাজে
ভ্রান্ত মানব পণ্ড করিল ডুবিয়া 'অহং' মাঝে।
তুমিই তাহার ফিরাও চেতন, দুঃখের রাশি করি বিতরণ
কে আছে দয়াল তোমার মতন সংসার নিয়ে ব্যস্ত?

বার বার প্রভু বিফলতা লভি, তোমার চাতুরি বুঝেছি ত সবি
নিখিল বিধানে তাই অনুভবি বিরাট তোমার হস্ত।
ক্ষেমময় ওগো ক্ষমার আধার করুণা তোমার কত
মার্জ্জনা মোরে নিত্য করিছ অপরাধ শত শত।
ক্লান্তি শ্রান্তি ভ্রান্তি মিলিয়া তুলে যদি মোরে ব্যাকুল করিয়া
নিদ্রাঞ্চলে দিবে আবরিয়া তখনি আসিয়া তুমি।
মান অভিমান উচ্চ বাসনা, আশা নিরাশার ছলনা তাড়না
(হবে) শান্ত সকল যাতনা ভাবনা চরণকমল চুমি।

শ্রীশশধর মৈত্র বি, এ,

প্রেমভিখারী।

কি বলিতে চাহ তুমি শুনিতে পাই না আমি
স্পষ্ট ক'রে বল ওগো প্রেমিক আমার,
করুণ কোমল সুরে কি যে বল বারে বারে
জাগায়ে প্রাণের মাঝে শুধু হাহাকার।
কে তুমি গো হৃদিমাঝে জাগ অপরূপ সাজে
তোমারে হেরিয়া প্রাণ কাঁদে অনিবার,
কে তুমি আমার কহ হে ভিখারী কিবা চাহ
অহরহঃ কি চাহিছ নিকটে আমার।
নয়নে নয়ন রেখে হৃদয়ে হৃদয়ে রেখে
কে তুমি আমাকে ওগো ডাক বারবার,
অত যে আদর করে কি বলিতে চাহ মোরে
নয়ন পাগল হেরে মাধুরী তোমার।
কত যে মধুর কথা শুনে যায় প্রাণব্যথা
বুঝিতে পারি না কি তা মহিমা অপার,
তবু মনে হয় এই তব পদ ছুঁয়ে রই
কে তুমি অপরিচিত প্রেমিক আমার?

আমার হৃদয়ে ব'সে　　　কি যে তুমি বল হেসে
　　বিনায়ে বিনায়ে গীতি গাহ অনিবার,
সঙ্গীতের কলতান　　　করে প্রাণ উচাটন
　　কোথা টেনে লয়ে যায় প্রাণকে আমার।
মনে হয়ে দিয়ে ফেলি　　　জগতে "আমার" বলি
　　যাহা কিছু আছে ওই চরণে তোমার,
ছুটি ওই লক্ষ্য-ধরে　　　যেথায় বাঁশরী স্বরে
　　ডাকিছ আমায় নিত্য প্রেমিক আমার।
ও হাসিতে কি যে ফুটে　　　সকল বন্ধন টুটে
　　হৃদয় চরণে লুটে পড়ে বার বার,
নাহি শক্তি থামাবার　　　কিম্বা পিছে হটিবার
　　আকুল আবেগে প্রাণ ছুটিছে আমার।
কে তুমি গো প্রিয়তম　　　প্রাণবঁধু মনোরম
　　কি চাহিছ মোর কাছে যাচকের প্রায়,
দুটি হাত পশারিয়া　　　কি চাহিছ প্রাণ পিয়া
　　কি দিয়া তুষিব তোমা বলনা আমায়।
ভিখারীর মত ছুটি　　　ভূমেতে পড়িছ লুটি
　　করুণ আঁখিতে কেন ছুটে অশ্রুধার,
হে ভিখারী মোর কাছে　　　কি চাহিছ কিবা আছে
　　আমি যে তোমার দ্বারে ভিখারী আবার।
বিনম্র সলাজ মুখে　　　সজল করুণ চোখে
　　প্রাণভরা নিবেদন মিনতি তোমার,
স্মরিয়া মানস কাঁদে　　　প্রাণে নাহি ধৈর্য্য বাঁধে
　　তব ও চরণে প্রাণ ছুটে অনিবার।
বুঝেছি এবার আমি　　　তুমি যে জীবনস্বামী
　　তুমি যে আমার "আমি" পেম পারাবার,
লহ প্রাণ লহ মন　　　জীবনসম্বন্ধ ধন
　　তোমাকে অদেয় কিছু নাহি তো আমার।
হৃদয়কমল মাঝে　　　আসন বিছানো আছে
　　বস সেথা নমি আমি চরণে তোমার,

তুমি এস চিদানন্দ ঘুচুক মনের ধন্ধ
প্রেমানন্দে পূর্ণচিত হউক আমার।
ভেদাভেদ পড়ে থাক পরাণ জুড়ায়ে যাক
সব বাধা টুটে যাক চরণে তোমার,
দ্বন্দ্ব মিটে এক হ'ক ঘুচুক সকল শোক
হৃদয়ে পুলক চির তুমি যে আমার॥

ভূপেন্দ্রনাথ

রাসলীলা।

ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥

দেহদৃষ্টি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পরমাত্মার সহিত জীবের মিলন-অধিকার জন্মে না। যিনি অখণ্ড অনন্ত, এই মায়িক দেহের সীমায় তাঁহাকেও সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে। তাই অভিন্ন হইয়াও জীব ও শিবের মধ্যে একটি ভেদদৃষ্টির ব্যবধান খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই ভেদদৃষ্টি যতক্ষণ না ঘুচে ততক্ষণ পরমাত্মার সহিত জীবের মিলনপথ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। এই ভেদদৃষ্টি থাকিতে ভক্ত, প্রাণনাথকে আত্মসমর্পণ করিতে কথনই সমর্থ হন না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণের অভিনয় ইহাই বুঝাইয়া দিলেন।

যখন মোহ ঘুচিল, বন্ধন টুটিল তখনই প্রকৃত রাস-রস-সম্ভোগ। সিদ্ধদেহ পাইয়া অকামচিত্তে এখন রাসেশ্বরকে লইয়া গোপীদিগের যে সম্ভোগবিলাস সে এক অপূর্ব্ব কথা। গোপিকারা বিষয়বিনিবৃত্তচিত্তা, অতএব অকামা; কিন্তু তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণকামা। কৃষ্ণপ্রিয়া হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের চিত্ত ভোর। এ আকাঙ্ক্ষা যদিও আকাঙ্ক্ষা তথাপি সাত্ত্বিক; কেন না ঈশ্বর ব্যতীত অন্য বস্তুর ইচ্ছাকে কামনা বলে। ভগবৎ-প্রাপ্তির ইচ্ছাকে কামনা বলে না।

"ন তু কামায় কল্পতে" ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত। তথাপি ইহা যে কামনাই সে বিষয়ে কেহ কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? কিন্তু যাই হ'ক এ কামনাকে আমরা ছাড়িতে পারি না, এ কামনাটুকু মুছিয়া যাইতে কত

যুগ যুগান্তর লাগিবে তাহা কে বলিতে পারে? যদিও সর্ব্বকামনাবিমুক্ত হওয়াই মুক্তি, কিন্তু জীব-হৃদয়ে যতক্ষণ এই ভগবৎ-মিলনকামনা সম্পূর্ণ জাগিয়া না উঠে ততক্ষণ মুক্তি-শিখরের সোপান স্পর্শ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। সুতরাং এ কামনা থাকিবেই, এবং ইহা থাকিলেও ক্ষতি নাই। মুক্ত-পুরুষেরা মুক্ত হইয়াও এই লীলার অনুসরণ করেন। ইহাতে সংসারকামনা তো কিছুই নাই। সংসারকামনা তাঁহাদের থাকিবে কি করিয়া? কারণ ভগবদ্ ভজনের দ্বারা তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং জ্ঞানের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধান্তঃকরণে কি কামনার দাগ লাগিতে পারে? মুক্তাত্মাদের এই কৃষ্ণ-কামনাকে মহাজনেরা "অনিচ্ছার ইচ্ছা" বলিয়া বর্ণনা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তো বলিয়াছেন 'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।" সংসারে সৃচনা, বা সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনা ভগবান্ অকামী হইয়াও কেবল লোকস্থিতির জন্য করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণকাম, সর্ব্বশক্তিমান সুতরাং কামনা হেতু সংসার রচনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, ঠিক সেই প্রকারেই মুক্তাত্মারা এই লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। বিষয়সম্ভোগ তো ইন্দ্রিয় দ্বারেই হয় কিনা, কিন্তু এ যে ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপার, ইন্দ্রিয় সংযমরূপ হোমাগ্নিমাতে সর্ব্বকামনা দগ্ধ করিয়া তবে সেই লীলাক্ষেত্রে পৌছিতে পারা যায়। কোন ইন্দ্রিয় দোষযুক্ত থাকিলে, কাহারও এ লীলা দর্শন হয় না! স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ প্রভৃতি হইতে অদূরে কর্ম্ম ও ভোগ ভূমির বাহিরে এক অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ মনোগ্রাহ্য পরম রমণীয় স্থান আছে, সেই পরম ধামই বৃন্দাবন নামে আখ্যাত। ইহাকে আনন্দধাম বলে। অন্যত্র লীলার জন্য ভগবানের মায়াশ্রিতা শক্তির বিদ্যমানতা আংশিক, কদাচিৎ পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু এ লোকের লীলা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণ বিকাশদ্বারা, সম্ভব হইয়া থাকে। এ লোকে অন্য শক্তিসমূহ সংযত, পূর্ণানন্দের মধ্যে সংহৃত। এখানে বিশুদ্ধ আনন্দেরই নিত্য নবোচ্ছ্বাস, নিত্য নব নব ভঙ্গিমা।

যেখানে বিশুদ্ধ আনন্দ, সেখানে বাস্তবিক কোন কামনা নাই, সেখানে সবই যে পূর্ণ, যেখানে অপূর্ণতা সেইখানেই না কামনা! সুতরাং এ যে আনন্দ তাহা পূর্ণত্বের আনন্দ, অনন্তের আনন্দ, এ অকামের আনন্দ! ইহাই প্রকৃত পূর্ণানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। এ আনন্দ কোন বিষয়াশ্রয়ী নহে, এ যে পরিপূর্ণ সত্তার অনুভবের বিরাট্ আনন্দ। ইহা সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবার নহে। ইন্দ্রিয় দ্বারা কতটুকু ভোগলালসাই বা পূর্ণ হয়? ইন্দ্রিয়শক্তিই বা আমাদের কতটুকু!

কিন্তু এ পূর্ণানন্দের প্রচণ্ড বেগ সমুদয় অসীম ইন্দ্রিয়শক্তিকে চূরমার করিয়া অসীমের পানে অসীমবেগে যাত্রা করে। যে এ আনন্দের স্বাদ পাইয়াছে, বিষয়ানন্দ তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে! এ আনন্দের খোঁচা যাহার গায়ে লাগে সেই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে! ইহা সম্যক্ বুঝিয়াই ভক্ত জ্ঞানীর হৃদ্‌রোগ নষ্ট হয়। হৃদ্‌রোগ যাঁহাদের নষ্ট হয় নাই তাঁহারা এ লীলা বুঝিবার অধিকারী নহেন। সেই জন্য এ লীলার অভিনয় যখন হয়, তখন সে সভায় দেবতাদেরও স্থান হয় নাই। কতিপয় বাছা বাছা ভক্তজ্ঞানী ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণ, এবং মদন-মথনকারী কৈলাসপতি শিবই এই মদনমোহনের মদনলীলা দর্শনে পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন!

দর্শনের কথা দূরে থাক এ লীলা শ্রবণেরও আমরা অধিকারী নহি। বহু ভাগ্যফলে, জন্মজন্মান্তর তপঃসঞ্চিত বলে এই লীলা শ্রবণে চিত্তের চাঞ্চল্য-রহিত কামগন্ধহীন আনন্দ সমুদ্ভূত হয়। যাঁহাদের দেহাত্মজ্ঞান প্রবল সুতরাং যাঁহারা জড়াত্মা, তাঁহারা এ লীলা শ্রবণ করিলে ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবেন। অমৃতলাভ না করিয়া বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইবেন। তাঁহারা ইহাকে প্রাকৃত নরনারীর কাম চরিতার্থ ছাড়া অন্য কিছু মনে করিতে পারিবেন না। সুতরাং হিতে বিপরীত হইবে। সমুদ্রমন্থনে অমৃত ও বিষ উভয়ই উত্থিত হইয়াছিল, যোগীশ্বর যদি সে বিষ ভক্ষণ করিয়া হজম না করিতেন, তবে বিষের জ্বালায় ত্রিলোক ধ্বংস হইয়া যাইত। এই কামবিষে জগৎ আজ জর্জ্জরিত, অন্ধীভূত, উন্মত্ত। জগদ্‌বাসী সমগ্র জীব কামের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে! যদি শুনিবার মত কর্ণ না থাকে, যদি দেখিবার মত চক্ষু না থাকে, তবে এই মদনমোহনের মদনবিজয় লীলা প্রাকৃত জীবের নিকট চিরচ্ছাদিত থাকে, জগৎ শান্তি লাভ করুক। যাঁহার জীবভাব ঘুচে নাই, যিনি শিবত্ব লাভ না করিয়াছেন, তিনি এ লীলা দর্শনের যোগ্য অধিকারী নহেন। তিনি কখনই ইহার বিষভাগ হজম করিয়া অমৃতলাভে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইতে পারেন না। ভাগবতে "যঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" এই শ্লোকাংশ দেখিয়া অনেক বাবাজি কৃষ্ণ-লীলার অনুকরণ করেন। হা কপাল, ইহা কি তাঁহার লীলানুকরণের আদেশ? স্পষ্টই তো ভাগবত বলিয়াছেন যিনি গোপীদিগের ও তাহার স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, তিনি বুদ্ধি আদিরও সাক্ষী, তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া লীলা করিয়া থাকেন। জীব এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারিবে। যাঁহারা ঈশ্বর নহেন তাঁহারা

কখনও এতাদৃশ আচরণ করিবেন না। রুদ্র ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ বিষ পান করিলেই মরিয়া যাইবে। তিনি যে আমাদের অন্তরের অন্তরতম, এত নিকটে আর কেহ নাই, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার "আমিত্ব"ও নাই, সে কথাটি বুঝাইবার জন্যই এই প্রসঙ্গ। আমরা কিন্তু ভাবকে একবারে উল্টাইয়া দিয়াছি, কেননা বুদ্ধি আমাদের এতই মলিন !!

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণের উপাসনা সম্বন্ধে এই কথাটি লিখিত আছে, "কামবীজ কামগায়ত্রী তাঁর উপাসন"। এ তো প্রাকৃত দেহের কামলীলা নহে। দুর্ব্বলচেতারা এ কথাটা ঠিক হজম করিতে না পারিয়া এক আজগুবি অতি হেয় সাধনপন্থার আবিষ্কার করিয়াছে !

কথাটা বড়ই শক্ত ! ইহা প্রকাশ করিতে গেলে সে ভাষায় বলা যাইতে পারে, তাহা শুনিলেই ছাই কথাগুলিই আগে মনে পড়িয়া যায়। তাই গীত-গোবিন্দ পড়িয়া অনেকে তাহার মধ্যে "গোবিন্দ" দেখিতে পান না ! যাঁহাদের এতাদৃশ দৃষ্টিদোষ বর্ত্তমান, এতটাই যাঁহাদের বুদ্ধির মলিনতা, তাঁহারা যেন এ সকল গ্রন্থ স্পর্শও না করেন ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই রাসলীলা সম্যক্ গুরুমুখে উপদিষ্ট হইয়া না পড়িলে, অপ্রাকৃত কামভাবের উদয় হইবে না, পরন্তু পশুভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে ! কৃষ্ণ-কামও এক প্রকারের কাম বটে, কিন্তু এ যে অপ্রাকৃত-কাম, এ তো স্থূল শরীরে স্থূল ইন্দ্রিয়ের রতি কামনা, বা আনন্দ-লিপ্সা নহে ! ভগবদনুরাগ ইহারই নামান্তর ! ইহাতে কামগন্ধ নাই, ধন পুত্র বিষয় লাভের প্রত্যাশা নাই ! এ যে আত্মরতি, এ যে আত্মবিসর্জ্জন। ভগবানের সঙ্গলাভে ঐকান্তিকী ইচ্ছা। শাস্ত্র ইহাকেই "ভক্তি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন ! "সা পুরানুরক্তিরীশ্বরে", "সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা" ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগকে বলিতেছেন "ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ। তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥ শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥" এই জগতে অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলেই যে মনুষ্যদিগের সুখ বা স্নেহবৃদ্ধি হয়, এরূপ নহে ; তোমরা আমাতে মন সমর্পণ করিয়াছ, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমার নামাদি শ্রবণ, আমাকে দর্শন ও চিন্তা এবং আমার গুণকীর্ত্তন করিলে যেরূপ আমাতে প্রেম জন্মে, কেবল আমার নিকট থাকিলেও সেরূপ সম্ভাবনা নাই।"

এইবার রাসলীলার কথা বলিব। বসন্তকালে, কোন্ নৈসর্গীয় নিয়মের ফলে জানি না যুবক-যুবতীদের প্রাণে মদনানন্দের এক প্রবল বেগ আসিয়া উপস্থিত

হয়। তখন বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেও এই আনন্দের উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়! শীতবায়ুর প্রচণ্ড জড়তা যেন স্বপ্নের মত অদৃশ্য হইয়া যায়, দিক্‌সকল নির্ম্মল এবং স্নিগ্ধ মলয়বায়ুর হিল্লোলে নর-নারীর হৃৎপিণ্ডের তালে তালে তাহাদের মনকেও নাচাইতে থাকে! কি এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহাদিগকে মাতোয়ারা করিয়া রাখে। শাখায় শাখায় নব মঞ্জরী, বৃক্ষসমূহে নব পত্রোদ্গম, নবকুসুমকলিকার শোভা ও গন্ধের যুগপৎ সঞ্চার প্রাণে কি এক কদর্য্য ভাবকে জাগাইয়া তোলে! যেন কাহারও সঙ্গে মিলিবার, কাহার সঙ্গ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত চিত্তকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলে! প্রেমিক প্রেমিকার চিত্ত-কলিকা কাহারও ইঙ্গিতে যেন বিকশিত হইতে থাকে, সে যেন তাহার নিতান্ত আপনার জন, তাহাকে পাইবার আশায় চিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠে! মহাকবির নিপুণ হস্তের বর্ণনা এই :—

"মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ॥
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং
মৃগী মকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥"

বসন্তকালের মত শরৎকালেরও আমাদের দেশের একটা নৈসর্গিক শোভা আছে। বরষার পর মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ ঠিক যেন রজস্তমোমুক্ত সিদ্ধপুরুষের চিত্তের ন্যায় সুন্দর শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। অজস্র বারিপাতে ধরণীতল স্নিগ্ধ হইতে থাকে। শীতের প্রচণ্ড হিমবর্ষী বায়ু তখনও বহিতে আরম্ভ করে না। জলাশয় সকল জলভারে পূর্ণ থাকে, বিবিধ জলজ ও স্থলজ কুসুম মাতৃক্রোড়ে অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ শিশুর কোমল হাস্যের মত বিকশিত হইয়া উঠে। মল্লিকা, সেফা-লিকা, চম্পক ও বক মানবের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার মত সমস্ত নর-নারীর চিত্তকে প্রফুল্লিত করিয়া রাখে! শারদ রাত্রির মেঘমুক্ত শুভ্র কৌমুদী প্রিয়সমাগমে প্রিয়ার উৎফুল্ল চিত্তের মত সমগ্র অবনী-তলকে প্রফুল্ল ও হাস্যসরস করিয়া তুলে।

এই আনন্দই ভগবানের রূপ। আনন্দে চিত্তকে হাল্কা করে, বন্ধনমুক্ত করে, ভেদ-জ্ঞান নষ্ট করে। তাই প্রকৃতির এই বিমুক্ত শোভায় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শারদ পূর্ণিমার রাত্রে, তরুলতা পুষ্প বন যখন হাসিয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিসার রাত্রি নির্দ্দিষ্ট হইল। ভাগবতে দশম স্কন্ধে :—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞানুরূপ সেই শারদীয়া শোভনীয়া যামিনী সমাগত হইল। সেই সুখময়ী যামিনীতে মল্লিকা পুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়া আশ্রয়পূর্ব্বক বিহার করিতে মানস করিলেন।

ভগবান্ এই যোগমায়া আশ্রয় করিয়া বিহার করিবেন, এই যোগমায়া কি? এই যোগমায়াই তাঁহার "স্বাং প্রকৃতিং"। যোগমায়া ব্যতীত ভগবান্ আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন না। যেখানে তাঁহার লীলা, সেইখানেই তিনি সগুণ, সেইখানেই তিনি মায়াশ্রিত। কিন্তু তিনি মায়াশ্রিত হইয়াও মায়াতীত; কারণ তিনি জীবের ন্যায় মায়াধীন নহেন, পরন্তু মায়ার অধীশ্বর। এই মায়া হইতে পৃথক্ করিয়া কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কেহই তাঁহার সহিত কথা কহিতে সমর্থ হয় না, কেহই তাহাকে নিজ জন বোধে সমাদর করিতে বা ভালবাসিতে পারে না! তাঁহার এই মায়াবরণ আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে বহুরূপে প্রকাশিত দেখি। পুনঃপুনঃ এই জগৎ সংসারে সৃষ্টি ও ধ্বংস হইতে দেখি। আমাদের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মনে হয় যোগমায়ার সাহায্যেই তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কার্য্য সাধন করেন, যেন পুরুষ ও প্রকৃতির বিভিন্ন কর্তৃত্ব, কেহ কাহারও অধীন নহেন। যেন একজন ঈশ্বর, এবং অপরটি ঈশ্বরী! কিন্তু তাহা নহে, এই বিভিন্নমুখী লীলা দুটি বিভিন্ন শক্তি হইতে জাত মনে হইলেও, তাঁহারা স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। ভগবানের দুটি প্রধান দিক্ ভাবুকের চিন্তার বিষয়। একটি যোগীর ধ্যানগম্য ও জ্ঞানীর জ্ঞানগম্য কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য মায়ামুক্ত নির্গুণ ভাব। অন্যটি মায়াশ্রিত সগুণ ঈশ্বর ভাব,—যাহা এই ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির গোচর। নির্গুণভাবে কোন লীলা-বিলাস নাই, কোন প্রকাশ নাই, আপনাতে আপনি স্তব্ধ হইয়া থাকা; আর সগুণভাবে কেবল আপনাকে প্রকাশিত করার চেষ্টা, আপনাকেই বহু-রূপে প্রকাশ করিয়া বহুর মধ্যে সেই একটিকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা। তাহারই ফলে সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু প্রকাশ-অপ্রকাশ আলোক-অন্ধকারের এক বিরাট্ অভিনয় সাগরবক্ষে তরঙ্গরাশির অবিশ্রান্ত নৃত্যের মত সমস্ত জীব ও জগৎকে সচকিত করিয়া রাখিছে। ইহাই তাঁহার যোগমায়া, ইহা অনির্ব্বচনীয়। কে এ জগৎ সৃষ্টি করিল, কেন করিল, কোথা হইতে এই জীবনধারা প্রবাহিত হইয়া কোন্ অনির্দ্দেশ্য সাগরসঙ্গমে মিলিতেছে, তা কে বলিবে। সকলের

প্রাণেই এই জিজ্ঞাসা ; ইহা অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সর্ব্ব যুগে সর্ব্ব কালে মন প্রাণের এক মহা দুর্ব্বোধ্য প্রশ্ন। কিন্তু উপায় নাই, এ রহস্য জানিবার উপায় নাই। সুতরাং যোগমায়া সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আর মোটামুটি তাহার একটা অর্থ সকলে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। পরমাত্মা যখন স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন আর এ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য কিছুই থাকে না। জীবমাত্রেই যখন স্ব-স্বরূপ থাকে, তখন তাহার নিকট এ জগৎ-প্রপঞ্চের প্রকাশ থাকে না। তখন এক অচিন্তনীয় অব্যক্ত ভাব, ইহা প্রকাশ করা যায় না। এ অবস্থায় সাক্ষী কেবল তিনিই। তারপর যখন তাঁহার মধ্যে "একোঽহম্ বহু স্যাম্" এই ভাবের উদয় হয়, তখনই সৃষ্টি প্রকাশ হইতে থাকে। এই যে ইচ্ছাশক্তি যদ্দ্বারা তিনি বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহাই মূলা প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি মা ভগবতী। এ শক্তি বাহির হইতে উৎ-ক্ষিপ্ত হইয়া এখানে আসিয়া পড়ে নাই, এ তাঁহার মধ্যেই ছিল, তাহা হইতেই উদ্ভব হইয়াছে। এই মায়াশক্তি যদি ভগবানের না থাকিত, তবে এ বিচিত্র সৃষ্টির প্রকাশ হইত না। তবে তিনি এ শক্তির অধীন না হইলেও গুণত্রয় হইতে হয় ত অতিরিক্ত নহেন, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। এবং এই জন্যই হিন্দু দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে নির্গুণ সাব্যস্ত করিতে গিয়া গুণকে প্রকৃতির কার্য্য এবং প্রকৃতি তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা যে এক হিসাবে সত্য তাহা ঠিক, কিন্তু প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখাইলে দুই ঈশ্বরকে মানিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আর অনন্ত বলা চলে না। এইজন্যই কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের এই মত যে, প্রকৃতি একটা স্বতন্ত্র শক্তি নহে, সে তাঁহারই স্বশক্তি। যদিও ইহাতে গুণযুক্ত হওয়ায় তাঁহাকে "শুদ্ধসত্যান্তনির্ম্মলং" স্বীকার করা কঠিন হয় বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু সে আপত্তি সমীচীন নহে ; কেন না জলপূর্ণ সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে কোথায় এক বিন্দু মল পড়িয়া আছে, সেজন্য কেহই সমুদ্রজলের নির্ম্মলতাহানির আশঙ্কা করিতে পারেন না। এ তাঁহারই লীলা বলিয়া মানিয়া লইলে সকল দিক্ বজায় থাকে। ছোট ছোট মেয়ে পুতুল লইয়া যখন খেলা করে, তখন কোন পুতুলটি হয় কর্ত্তা, কোনটি হয় তাহার গিন্নী ; তিন চারিটি পুতুল উক্ত কর্ত্তা গিন্নীর পুত্র-কন্যারূপে পরিকল্পিত হয়। সেখানে জামাতা কুটুম্ব দাসদাসীর কোনই অভাব নাই। উহাদের মধ্যে পুত্র-কন্যার বিবাহ, মিলন, ভোজ কিছুরই ত্রুটী নাই। দেখিলে মনে হয় যেন একটি

বৃহৎ সংসারের ব্যাপার চলিতেছে। পুতুলগুলি কিন্তু সেই অচেতন; বালিকারা আপন আপন ইচ্ছামত তাহাদিগকে খাওয়ায়, শোয়ায়, বিবাহাদি দেয়। তাহাদের সমস্ত ব্যাপার প্রত্যেকের হইয়া সে একাই সব করে। তদ্রূপ আমরাও তাঁহার হস্তে পুত্তলিকা মাত্র, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া সেইরূপ ক্রীড়া করাইয়া থাকেন। পুতুল খেলার সঙ্গে এই খেলার তফাৎ এই যে তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানময় ও চৈতন্যস্বরূপ, এবং তাঁহার ক্রীড়নক গুলিও জ্ঞান ও চৈতন্যশূন্য নহে। ইহা তাঁহারই ইচ্ছা। তিনি ছাড়া যখন জগতে কিছুই নাই, তখন জীবের স্বরূপ তাঁহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, এই যে চেতনাটুকু ইহাতে জীবকে সম্পদ্‌যুক্ত জ্ঞান করিলেও ইহাই তাহার বিপদেরও কারণ হইয়াছে। যাহাই তাহার গৌরবের কারণ তাহাই আবার তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। এখন এই শিকল কাটিবার হানাহানিতে জীব বিপন্ন।

এই মায়ারচিত সংসারে আমরা মায়িক জীব, আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত পরিমিত। ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের জ্ঞানের দ্বার, অথচ এগুলি আবার এত চঞ্চল ও দোষযুক্ত যে, ইহাদের সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময়ে আমাদিগকে মহাভ্রমে নিপাতিত করে। সুতরাং এই ভ্রমজাল হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাকে পাইলে এই মায়া-যবনিকা অপসারিত হইতে পারে, কৈ তাঁহাকে ধরিবার তো কোন পথ নাই! এই মনে হয় সর্ব্বত্রই আছেন, আবার এই মনে হয় কোথাও নাই; সুতরাং পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখের ভীষণ উত্থানপতনে চিত্ত আলোড়িত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া জীব হাবুডুবু খাইতেছে। এ চঞ্চল সংসার-তরঙ্গ হইতে উদ্ধারের কোন আশা দেখি না; আর কাহারও সাধ্য নাই যে, এই ভবান্ধকে উদ্ধার করে। তাই ভগবান্ এই জগতীতলে আপনাকে সময়ে সময়ে প্রকাশিত করেন। এই যে—তাঁহার আপনাকে স্থূল ইন্দ্রিয়গোচরে প্রকাশ, ইহাও তাঁহার যোগমায়া। তাহা না হইলে তাঁহার অবিদ্যমানতা তো কোথাও নাই। যদি বল, মানব সূক্ষ্ম ও শুভ বুদ্ধির মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তো মনুষ্যের সংশয় নিরাস করিতে পারেন? নিশ্চয়ই। তিনি তো করেন ও তাই! মুনিরা সংলীনমানস হইয়া আপনাদের হৃদয়গুহায় শুদ্ধবুদ্ধরূপে তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অতটা সূক্ষ্মে পৌছিতে যাঁহাদের শক্তি নাই, অথচ তাঁহাকে পাইতে চায়, তাহাদের জন্যই করুণাময় ভগবান্ আপনাকে একটি ক্ষুদ্র দেহকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রকাশ করেন। ইহা যে কিরূপে

সম্ভব হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাঁহার এই যে "জন্মকর্ম্ম" ইহা প্রাকৃত মনুষ্যদিগের মত নহে, ইহা "দিব্যং"—ইহা অলৌকিক—ইহা মানব-বুদ্ধির অগোচর। তিনি জন্ম লইলেও স্বস্ব রূপ হইতে কথন চ্যুত হন না। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেও অতিব্যাপ্ত করিয়া তদতিরিক্ত রূপে পরিপূর্ণস্বভাব চির বর্ত্তমান, আবার এই ক্ষুদ্র বালুকাকণার মধ্যেও সেই পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বিরাজিত। একথার মানে কি তা তিনিই জানেন। কোন রূপ নাই, কোন মূর্ত্তি নাই, অথচ সর্ব্বরূপে সর্ব্বমূর্ত্তিতে তিনি পূর্ণভাবে বিরাজমান। এ তাহার অপূর্ব্বশক্তি। তাই তিনি সাকার হইয়াও নিরাকার, আবার নিরাকার হইয়াও সাকার। আমরা তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া জানি, তবু তাকে সাকাররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। মনে হয় যিনি এতরূপ, এত রস, এত গন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার রূপ না জানি কি অপরূপ। প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্য তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই সত্য, কিন্তু তাহাতেও আমাদের প্রাণের পিপাসা মিটে না।

"অসীম এ বিশ্ব ছাড়ি কি যে গো অনন্ত আছে
প্রাণসিন্ধু সেই মুখে ধায়।"—কুরুক্ষেত্র।

ক্রমশঃ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

(রাসলীলা)

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশামৃত আলোচনাকালে দেখিয়াছি যে ব্রজরামাগণের সর্ব্বত্যাগমূলক শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাই তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাষ্যগ্রন্থের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন ভাষ্যগ্রন্থ তদানীন্তন কালে রচিত হয় নাই। তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত রাসলীলা। রাসলীলার পাঁচটী অধ্যায় ভাগবতের যেন পঞ্চ প্রাণতুল্য। ইহা ভক্তের নিকট কমলমধুবৎ স্বাদু, ত্রিদিবের পরিজাত-তুল্য সুগন্ধী, এবং ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নিবৃত্তিপরায়ণ সাধকের চিত্তোন্মাদকর। আমরা প্রথমে ইহার আখ্যানভাগ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার মর্ম্মগ্রহণে প্রয়াস করিব।

ভাগবতের দশমস্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে গোপীদিগের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর বস্ত্রহরণলীলা। বস্ত্রহরণের সময় কাত্যায়নী-ব্রতসিদ্ধা ব্রজগোপীদিগকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"তোমরা গৃহে যাও, তোমাদের ব্রত সিদ্ধ হইয়াছে, তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হইবে।"

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। ১০।২২।২৭

শরৎকালীন শশিশোভনা পূর্ণিমা রজনীতে সেই কামনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া সত্যসংকল্প শ্রীভগবান্ বেণুগীতে গোপবালাদিগকে আকর্ষণ করিয়া নিবিড় কাননে যমুনাপুলিনে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সেই মহারাসে যোগদান করিতে পারিলেন না, তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া ধ্যান সহায়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নানাবিধ বাগ্‌বিলাসে মোহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উপদেশ করিলেন। সর্ব্বকামত্যাগী সেই গোপবালাগণ কিছুতেই গৃহে প্রত্যাগত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে গোপীদিগের সকলেরই সৌভাগ্যমদ উপস্থিত হইল। অমনি শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। তদ্বিরহে তাঁহারা বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া যতগুলি গোপী ছিল, আপনাকে ততগুলি কৃষ্ণরূপে

প্রকট করিয়া তাঁহাদের সহিত নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। ভগবানের সহিত গোপিকাগণের এই নৃত্যগীতই বৈষ্ণবগ্রন্থে মহারাস বলিয়া বর্ণিত।

এই হইল রাসের আখ্যান অংশ। বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারদিগের-উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে মধুরভাবাত্মক উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাঁহারা এই প্রেমলীলার উপাদেয়ত্ব স্বীকার করিয়াও তাহার মধ্যে বর্ণিত প্রথমাংশে যে অঙ্গসঙ্গের কামনা দেখিয়া সেগুলির উপযোগিতা স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের প্রতি আমাদের বলিবার কথা এই যে, উপাসক তাঁহার প্রাণের সামগ্রীর সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের বিলাস-কামনা একবারে দূরীভূত হইতে পারে না। এ অবস্থায় তাঁহাদিগের প্রেম কথঞ্চিৎ লালসামিশ্রিত থাকাই স্বাভাবিক। এবং এইরূপ সাধক যদি সরল এবং অকপটভাবে হৃদয়ের বাসনা তাঁহার প্রাণবধুর নিকট ব্যক্ত করিতে যায় কিংবা প্রেমলীলায় মত্ত হয় তাহাতে যে স্ত্রীসুলভ বিলাসভাব কতকটা আসিয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে। কিন্তু এই লীলা যদি নিত্যলীলা হয় এবং ভক্ত ভগবানের পরম পবিত্র মিলনলীলারূপ একটী অপ্রকট লীলার প্রকটতামাত্র হয়, তবে ইহাতে দূষণীয় এবং অপবিত্র ভাব কি থাকিতে পারে?

আধুনিক সুরুচিবাদী জনসমাজের নিকট রাসলীলা শ্রদ্ধার বিষয় নহে। বাহিরের ভাষায় বর্ণিত বিষয়টী কামের সহিত সাদৃশ্য থাকায় তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন ভাগবতের দশমস্কন্ধ শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়া পরে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন। একেবারে ভিতরের একটা খেলা বাহিরের ভাষায় প্রকাশ হইতে গেলে তাহার প্রতিবিম্বে বিপরীত ভাব ফুটিতে পারে। শ্রীধর স্বামী এই লীলাকে "স্মরদুষ্করা" বলিলেন। কারণ এ লীলা ত এ জগতের নয়, ইহা পরমপুরুষের চিন্ময়লীলা। স্থূলভাবে দেখিলে স্থূল শরীর ও ভোগের কথা মনে পড়ে বলিয়াই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রে গুরুমুখে শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেই জন্যই অধিকারী নির্ব্বাচনের জন্য পূর্ব্বজগণ এত প্রসায় পাইয়াছেন। যে বুদ্ধিতে শাস্ত্র অনুশীলন করিলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, সে বুদ্ধি আমাদের কৈ? "ভাগবত শাস্ত্র" নামক অধিকারে উপনীত হইলে ভাগবত শ্রবণ মাত্রই সেই সর্ব্ববেদবেদ্য শিবদ শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে বিকাশ হইবেন। সুতরাং তখন সাধনার অবসর থাকে না; প্রযত্ন বা কৌশল কিংবা কোনরূপ প্রয়াসের অপেক্ষা থাকে না। কারণ

ভাগবত বলেন যে, মানব বেদান্তের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের "ইদং" ভাবের পশ্চাতে ভগবানের সত্তার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া যে কোন বৃত্তি ভগবানের দিকে প্রয়োগ করিলে ভগবানে তন্ময়তা আসিবেই আসিবে। তাই ভগবান্ বলিলেন,—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদ্য.মব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতঃ যাতি তন্ময়তাং হি তে ॥১০।২৯।১৫

দর্পনে যদি প্রতিবিম্ব দেখিবার ইচ্ছা থাকে তবে মলিনতা দূর করিতে হইবে। নির্ম্মল চিত্তই ভাগবতীয় তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইবার উপযোগী ক্ষেত্র। জন্মমৃত্যু জরাব্যাধির প্রচণ্ড দাহনে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সন্তাপ সন্দর্শন করিয়াও যাঁহারা বাহিরের ভোগে পূর্ণরূপে মত্ত, অনন্তরূপে বিস্তৃত বিশ্বকে শ্রীভগবানের রূপ ও অনন্ত জীবকুলকে তাঁহার ব্যঞ্জনা বলিয়া বুঝিয়া সংসারনাট্যের মহা নাট্যকারীর চরণে আশ্রয় লইবার ঈষৎ প্রবণতাও যাহাদের চিত্তে জাগ্রত হয় নাই, "অমানিমানদ" ভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে অমৃত লাভের জন্য সংসার-কোলাহলের অন্তরালে একটু শান্তিময় স্থানে প্রবেশ করিয়া যাহাদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষারও উদ্রেক হয় না, এইরূপ অনধিকারী ভক্তিহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ অধিকারতত্ত্ব না মানিয়া এই লীলার অনুকরণে লীলারস আস্বাদন করিতে গিয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ ভক্ষণ করিয়া ইহকাল পরকাল দুই-ই বিনষ্ট করিতেছে। নিজ নিজ সংস্কার বশে নানাবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে।

ভগবানের বাচক বলিয়াই ভাগবত নামের সার্থকতা। ভাগবতের আদ্যন্ত সকল বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যেই এক সুর, এক তান, এক লয়। কি পুরুষ প্রকৃতি, কি কর্ম্ম ও দেবতা সকল তত্ত্বের ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে অপ্রাকৃত পুরুষোত্তমের স্ফুরণ। যেমন মনুষ্যগণ যেখানেই পদনিক্ষেপ করুন না কেন, মৃত্তিকাই হউক আর পাষাণই হউক, অট্টালিকাই হউক কিংবা রাজপথই হউক বাস্তবিক পক্ষে উহা পৃথিবী; তেমনি ঋষিরা বিকারজাত যে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা জীবের কথাই বলুন না কেন, প্রত্যেক শব্দই ভগবানের প্রতিপাদক। তাই ভাগবত বলিলেন—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরব্রহ্ম ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥

তাই আমাদের বিশ্বাস, যিনি গর্ভবাসকালে স্বয়ং ভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন,

সেই রাজা পরীক্ষিৎ আসন্ন মৃত্যুকালে রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি পরিবেষ্টিত হইয়া পরব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত প্রেমরসময় শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে যে লীলা শ্রবণ করিলেন, পরদারের ফল মহানরক ইহা পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়া পরীক্ষিতের পরম নিঃশ্রেয়সের জন্য, স্ত্রীপুরুষভেদবুদ্ধিশূন্য শুকদেব যে কামময়ী একটী প্রাকৃত লীলার অবতারণা করিবেন ইহা অসম্ভব। শুকদেব দৃঢ়ভাবে বলিলেন —এ লীলা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে শ্রবণ করে তাহার হৃদ্‌গত কাম দূরীভূত হইয়া পরাভক্তি লাভ হয়।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতো নু শৃণুয়াৎ অথ বর্ণয়েৎ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ১০।৩৩।

মহাপ্রভু প্রেমের মূর্ত্তিমান আদর্শ কঠোর সন্ন্যাসী, তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত এই রাসরস আস্বাদন করিতে করিতে সেই রসসমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেন। সুতরাং এ লীলা সম্পূর্ণ ভিতরের অন্তরঙ্গ লীলা, তাই এ লীলা নিত্য আস্বাদনীয়, তাঁহাদের উপজীব্য, তাঁহাদের প্রাণের সামগ্রী।

রাসলীলা দ্বাপরযুগের একটী অতীত ঘটনা। শাস্ত্রোক্ত এই ঘটনা যদি ঐতিহাসিক হিসাবে ধরা যায় তবে আমাদের উহার সহিত সম্বন্ধ অতি অল্পই বিদ্যমান। শাস্ত্র কেবল একটী বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপদেশ দেন না, শাস্ত্রের দৃষ্টি পরমার্থতত্ত্বের দিকে, প্রত্যক্ষের অতীত নিত্য সত্যের দিকে। তাই এই লীলার ভিতর দিয়া, অমোঘলীল শ্রীভগবানের জীবের হৃদয় বৃন্দাবনে অভিব্যক্তির আশা, যদি প্রাণের নিভৃত অন্তরালেও না জাগ্রত হয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এমন নিত্য সত্যের আভাস ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হৃদয়েও যদি উকিঝুঁকি না মারে, তবে ঐ লীলার আলোচনায় ফল কি? সার্থকতা কোথায়? যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী রতি উৎপন্ন না হয় সে ত বৃথা শ্রমমাত্র। তাই মহাপ্রভু সাময়িক প্রয়োজনের পশ্চাতে ভগবানের নিত্যলীলার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে লীলার আবির্ভাবতিরোভাব নাই—নিত্যবস্তুর লীলাও নিত্য, তাই সে লীলারস অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। লীলা যদি নিত্য না হয় তবে তাহার সহিত নিত্যদাসত্বসম্পর্ক সম্ভব হয় না। তাই বৈষ্ণবেরা প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দ্বিবিধ লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বলোকের জন্য, কারণ উহা তত্ত্বাংশে নিত্য, যখনই সাধক তত্ত্ব-

গুলিকে ভগবানের মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন তখনই তাহার হৃদয়ে লীলারস বহিতে থাকে। তখনই অপ্রকট লীলা তাঁহার নিকট প্রকট। আপন আপন হৃদয়ে রাস রসিক শ্রীভগবানকে দেখিবার জন্যই ভাগবত। সেই ভাগবতের প্রাণই রাসলীলা। সেইজন্য রসিক না হইলে, 'রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" হইতে পারে না। যে রসপান করিলে মানব আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, যে রস গায়ত্রী-তত্ত্বের তৃতীয় বিকাশ, যাহা আপ্ জ্যোতি এই দুই ভাবের উপরে থাকিয়া এই দুই ভাবকে ঘনরূপে মিশাইয়া দেয় সে রস রসিক ভিন্ন আর কে পান করিবে—

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহু রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।১।১।৩

রাসলীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে লীলার তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত অংশ অবগত হওয়া প্রয়োজন। ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রুতির সহিত অবিরোধ। কারণ ভাগবত নিগমকল্পতরুর গলিত অখণ্ড ফল। সেই জন্যই মহাপভু বলিলেন—শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ। মহাপ্রভুভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজও সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহাতে লাগিবে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে লীলাবিলাস অংশটী শুনিতে মধুর এবং কথঞ্চিৎ সহজ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু কঠিন হইতে কঠিনতর সিদ্ধান্তে চিত্তের আলস্যই উৎপন্ন হয়। এই আলস্যবশতঃই সিদ্ধান্তে আপনার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। পুনঃ পুনঃ বিচার ও ধ্যান করিলে সিদ্ধান্ত মনে প্রতিভাত হয়, সিদ্ধান্ত পরিজ্ঞাত হইলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মনের অজ্ঞানতা দূর হয়, অজ্ঞানতা দুর হইলে মন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দৃঢ় সংলগ্ন হয়। তাই কবিরাজ গোস্বামী পাঠকবর্গকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্তসমুদ্রে অবগাহন কর, সিদ্ধান্ত ভিন্ন লীলাবিলাসের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে না।

বেদ পুরাণ স্মৃতি শ্রুতি সকল শাস্ত্রেই সেই পরম পুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম প্রভৃতি সকল পথই পর্ব্বতজাত বর্ষাগমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নদীকুলের ন্যায় শ্রীভগবান্-সমুদ্রেই পরিসমাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভাগবতেই আছে—

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥১০।৪০।১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবের উপদেশকালে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষে মুক্তিপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ।
তিন সাধনে ভগবান তিন স্বরূপে ভাসে,
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্বে প্রকাশে॥

মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ভক্তিমার্গের অন্তর্গত। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবানকে প্রাপ্ত হন। এই ভক্তির সাধারণতঃ দুইটী বিভাগ। সগুণ ও নির্গুণ—যে অনুরাগে কোন হেতু নাই, কোনরূপ কামগন্ধ, নাই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির ছায়া নাই, তাহাই অহৈতুকী নির্গুণ ভক্তি—এই নির্গুণ ভক্তির একটী চিত্রপট বৃন্দাবন-লীলা। কাজেই এ লীলা বুঝিতে হইলে সেই লীলার নায়কটীকে বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে।

বৈষ্ণবগ্রন্থ আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে পুরাণে যাহাকে সপ্তলোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ড বলে, উপনিষদে তাহাই 'ব্যক্ত' শব্দের ইঙ্গিত। এই সপ্তলোক, ত্রিলোক এবং চতুর্লোক দুই ভাগে বিভক্ত। ত্রিলোকের ঈশ্বর তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদক-শায়ী অনিরুদ্ধ। সপ্তলোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন। ব্যক্তের উৎপত্তি যে অব্যক্ত হইতে তাহার ঈশ্বর প্রথম পুরুষ সংকর্ষণ কারণার্ণবশায়ী। অব্যক্তের পর বৈকুণ্ঠ ও গোলোক, তাহার অধিপতি বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই গীতার—"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" ইহাই হইল সিদ্ধান্তের দিগ্‌দরশন।

প্রকট বৃন্দাবনলীলা অপ্রকট গোলোকলীলার ছায়া। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥

এ লীলা যখন অব্যক্তের অতীত তখন মায়াসমুদ্রে ভাসমান জীবের কিরূপে হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইবে! সেই লীলাই যে আমাদের আদর্শ, তাহাকে না পাইলে যে সংসারের উপরম হইবে না, ইহা ভাগবত বেশ করিয়া দেখাইয়া তবে বৃন্দাবন লীলার কথা বলিয়াছেন। আমরাও ভাগবতের সেই কথা কয়টী মনে রাখিয়া তৎপরে নির্গুণ ভক্তির কথা আলোচনা করিব।

ভাগবত সকামতা ও নিষ্কামতা লইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একভাগে ভূ, ভুব ও স্বর্লোক; অপর ভাগে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক। সত্যলোক ব্রহ্মলোক ও পরমেষ্ঠি লোক নামেও খ্যাত। মহর্লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক্। ত্রিলোক কাম্য কর্ম্মের ফল বলিয়া অনিত্য, প্রতিকল্পেই নাশ প্রাপ্ত হয়। মহঃ প্রভৃতি উর্দ্ধতন লোকবাসিগণ দ্বিপরার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়া তাহাদের প্রায়ই মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিলেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনশীল। ত্রিলোকের স্থায়িত্ব অপেক্ষা ব্রহ্মলোকের স্থায়িত্ব বেশী বটে কিন্তু তাহাও ত নশ্বর। শ্রীধর স্বামী ব্রহ্মলোক-গত প্রাণীদিগের ত্রিবিধ গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা পুণ্যোৎকর্ষে তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহারা পুণ্যতারতম্যে অধিকারী হইয়া কল্পান্তরে জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভ উপাসনাবলে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। আর যাঁহারা ভগবদুপাসক তাঁহারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈষ্ণব ধাম প্রাপ্ত হন।

করুণহৃদয় ঋষিগণ দেখিলেন যে কলির জীব অতি অল্পায়ু, অলস এবং সুমন্দমতি; তার উপর কত বিঘ্ন, রোগশোকে তাহার চিত্ত ব্যাকুল। বিশিষ্ট-তার মোহে বদ্ধ অহঙ্কারের দাস, অপার অনন্ত অসীম গতির কথা চিন্তা করিতেও ভয় পায়; সেই অপার অনধিগম্যপুরুষকে কে কবে বাক্য ও মনের গোচর করিতে পারিয়াছে? তিনি যে চিরদিনই পিছাইয়া যান। আকাশ বাতাস অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় সকলেই যাঁর কথা কয়—তাঁরই গান গায় সেই তিনি জীবের ভিতরে বসিয়া হৃদয়পদ্মে সমাসীন হইয়া অবিরত অনাহত বংশীধ্বনি করিতেছেন। তাই মহাপ্রভু বলিলেন, জীব তুমি বংশীবাদকের দাসত্ব ভুলিও না। কেন মিছা ধন জন, পুত্র পরিবারের দাসত্বে আপনাকে নিযুক্ত করিতেছ, তোমার "আমিটাকে" ক্ষুদ্র বিশিষ্টভাবের সহিত এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলিতেছ। তোমার এই অভিমানটা উচ্চস্বরে চড়াও—তুমি ত কৃষ্ণদাস অমৃতের অধিকারী। তোমার লক্ষ্যই ঐ পুরুষ—তুমি ত তাঁহারই তটস্থা শক্তি—তটস্থা শক্তির প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্তই এই রাসলীলার অভিনয়।

এইবার আমারা লীলারহস্যের আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের

সর্ব্বপ্রথমেই জানিতে হইবে যে ভগবান্ লোকের নিঃশ্রেয়স নিমিত্তই—ভক্তকে অনুগ্রহ নিমিত্তই এই সকল লীলা করেন।

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১০।২৯।১৪

শুকদেব রাসলীলার প্রথম শ্লোকেই ভগবান্ এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাগবতে ভগবানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই বলিয়াছেন। সেই অজস্র সুখজ্ঞানৈকরস উপরাগ শূন্য, আকার ও করণগত ভেদশূন্য পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবানই চিদানন্দ ঘনরূপে প্রকাশিত। আমরা যে প্রাকৃত দেহধারী মনে করি, সে আমাদেরই আরোপিত ভ্রমমাত্র। নির্লেপ আকাশে মেঘের বর্ণ যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিরা আরোপ করে, পার্থিব রেণুতে বর্ত্তমান ধর্ম্ম যেমন বায়ুতে আরোপ করে, ভগবানে প্রাকৃত দেহস্থ বুদ্ধিও তেমনি অবুদ্ধিজনের কল্পনা।

যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টার দৃশ্যত্ব আরোপিতমবুদ্ধিভিঃ।১।৩।৩১

ভগবানের রূপ স্বপ্রকাশ। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে মহাভাবে আমাদের মনবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত একেবারে নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের স্বরূপের আভাস প্রদান করে তাহাকেই বিগ্রহ বলে। ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্তিহ কিঞ্চন"

সাধারণ জীবের দেহ দেহীর পৃথকত্ব আছে কিন্তু ভগবানের দেহ দেহীর ভেদ নাই তাই সে রূপ সব উছলিয়া আপনি ফুটিয়া উঠে। যাঁহার ছটায় চন্দ্র সূর্য্য উদ্ভাসিত, যাঁহার রূপের কণা পাইয়া ধ্যানপরায়ণ সমাধিস্থ যোগীর প্রশান্ত বদন, সংকীর্ত্তনরসে মত্ত ভক্তসংঘের পুলককম্পান্বিত প্রোজ্জ্বলকান্তি সেই অপ্রাকৃত রূপ অবতাররূপে যখন প্রেমরত্ন হাতে করিয়া "কে আছ প্রেমিক গ্রহণ কর" বলিয়া অবনীতে অবতীর্ণ হন, যোগীদিগের অধিগম্য অনুভবের অতীত, চিন্তিত হইয়াও অচিন্ত্যতেই রূপ দেখিতে পারে এমন চক্ষুও বিরল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

নবপর্য্যায়, ৬ষ্ঠ ভাগ। } কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ, ১৩২৪। { ২১বর্ষ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও

BENGAL LIBRARY WRITERS BUILDINGS CALCUTTA

"সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়"

মাসিকপত্র

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

পুরস্কারং পরং কিঞ্চিৎ,

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্‌, } সম্পাদিত :

পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ
সহকারি-সম্পাদক।

সূচী।

ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা] [একত্র চারি সংখ্যা ১৲ ।

পন্থার নিয়মাবলী।

১। "পন্থার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফঃস্বল ডাক মাশুল সমেত ২৲ দুই টাকায়, ভিঃপিঃতে ২৴০ দুই টাকা এক আনা। শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ মূল্যে দেওয়া হয়। এক সংখ্যা নমুনার জন্য।০ চারি আনা দিতে হইবে।

২। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর সংখ্যা পাইবামাত্র না জানাইলে, আমরা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী নহি।

৩। গ্রাহকগণ পত্রে এবং টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্টরূপে লিখিবেন। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবার জন্য টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা কুপনে "নূতন" এই কথাটি যেন লিখিয়া দেন। গ্রাহকগণ কোন বিষয়ের উত্তরের প্রত্যাশা করিলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৪। "পন্থা"র বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য মলাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেজ মাসিক ৪৲ চারি টাকা হিঃ, চতুর্থ পেজ ৫৲ পাঁচ টাকা হিঃ এবং অন্যত্র ২৷০ আড়াই টাকা হিসাবে লওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে পত্রিকা প্রচারের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইবে।

৫। "পন্থা"র ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বা দ্বেষভাবাপন্ন প্রবন্ধ গৃহীত হয় না। প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী হইবেন।

৬। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট না পাঠাইলে, তাহা ফেরত দেওয়া হয় না।

৭। "পন্থা" সম্বন্ধীয় টাকা, পত্রাদি, প্রবন্ধ এবং বিনিময়ার্থ পত্রিকা আমার নামে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

"পন্থা" কার্য্যাধ্যক্ষ,

১৯ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ"

৬ষ্ঠ ভাগ।] কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৪ [৭ম, ও ৮ম সংখ্যা।

গণেশ-বন্দনা।

(গণেশায় নমঃ ।)

১

এস দেব গণপতি করুণা-নিধান!
ভকত-হৃদয়ে বসে, কর কৃপা দান।
পার্ব্বতীর প্রিয়তম,
কিবা শোভা অনুপম!
রকত-রঞ্জিত তব সর্ব্ব কলেবর!
গজমুণ্ড সংযোজিত পরম সুন্দর!!

২

অমৃত-ক্ষরিত গণ্ডে উড়ি ভৃঙ্গগণ,—
সেই গন্ধে লুব্ধ হ'য়ে, করিয়া গুঞ্জন,
মানস মোহিত করি,
পুষ্পমধু পরিহরি,
মুহুর্মুহুঃ গণ্ডদেশে করি পরশন,
আনন্দে করিছে পূর্ণ ভাব নিধুবন!

৩

একদন্তে গজানন! হ'য়ে সুশোভন
ললাটে সিন্দুর আভা করি বিকিরণ,
নিমীলিত ত্রিনয়ন,
শিব-পুত্র সুমোহন,
দিয়া পরিচয় কত মাতাও ভুবন!
ভাবরাশি তব ভাবে কর মধুবন!!

৪

শোভায় অতুল শিখি-পুচ্ছ-চূড়া শিরে,
চারি দিকে হেমলতা আছে যেন ঘিরে,
লম্বোদর কি সুন্দর,
কণ্ঠহার মনোহর,
অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কি ভাবে মগন!
আছ তুমি জানি না ত আমি অজ্ঞজন!!

৫

এক হস্তে শঙ্খ, আর চক্র এক হাতে,
অপর হাতেতে গদা কিবা শোভা তাতে!
অন্য হাতে পদ্ম ধরি,
বনমালা গলে পরি,
অলক্তরঞ্জিত পদে নূপুর ধারণ
করেছ কি সিদ্ধেশ্বর! ভকত-কারণ?

৬

কৌস্তুভরতন মণি নানা আভরণ,
হেরিলে জুড়ায় মরি সন্তাপিত মন,
নয়ন ঝলসি যায়,
সেই রূপের আভায়,
বস দেব যোগাসনে হৃদয়ে এখন।
দীন-আশা-লতা হ'ক তোমাতে মিলন॥

৭

সর্ব্বাগ্রে তোমার পূজা বিধান তন্ত্রের।
তব মন্ত্রে সিদ্ধি ঘটে সকল মন্ত্রের॥
যোগী ঋষি মুনিগণ,
ভবারাধ্য সুধী জন,
তোমারি কৃপায় সিদ্ধি হয় তাঁহাদের।
তুমিই মঙ্গলময় বটে জগতের॥

৮

প্রণমি তোমায় দেব, আমি অভাজন।
যদি কিছু থাকে লও ভকতি-চন্দন,
তোমারি পদত্ত পাত্রে
ধূলিধূসরিত গাত্রে,
পূজিবারে শক্তি, মতি, দাও অনুক্ষণ!
ভকত-হৃদয়-ধন, তুমি এক জন॥

শ্রীমনোরঞ্জন দাস।

উপনিষৎ-চর্চ্চা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মনই বিষয়াকারে প্রতিভাত হইতেছে। রূপ রসাদি রূপে কিংবা ক্ষিতি অপ্ আদি রূপে, যাহা তোমার আত্মসত্তাকে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করিতেছে, উহা মন ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদান্ত শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—যতক্ষণ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়াকারে আকারিত না হয় ততক্ষণ বিষয়জ্ঞান হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি একমাত্র সর্ব্বব্যাপী পরমপদ হইতে আগত ভাব বা স্পন্দন-সমূহ তোমার মনে আসিয়া প্রাক্তন সংস্কারের সহিত প্রতিহত হইয়া যাহা অর্থ রূপে প্রকটিত হয় তাহাই পদার্থ। সাধারণতঃ আমাদিগের পদার্থই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই পরমপদ পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বহু হইবার সংকল্প হইতেই এই আকাশ আদি পঞ্চভূত সৃষ্ট হইয়াছে। সংকল্প মনের ধর্ম্ম, মন ব্যতীত সংকল্প

হয় না। সুতরাং একটু ধীরচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ও, এক অখণ্ড বিরাট্ মনের ভাবসমূহ যেমন আমারই মনোময় জগতের চিত্র, অনন্তকোটী বিশ্বও সেইরূপ পরমেশ্বরের বিরাট্ মনোময় জগতের চিত্র মাত্র। আমার মন ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল বলিয়া তদবস্থিত ভাবসমূহ আমি ব্যতীত অন্যে দেখিতে পায় না, কিন্তু বিরাট্ ও অখণ্ড মন মহান্ অমিতবীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া তদবস্থিত ভাবসমূহ সাধারণের ভোগ্য হইয়াছে। ব্রহ্মের এই সংকল্পময় অবস্থার নাম পরমেশ্বর, মায়া, বা প্রকৃতি; এইরূপ ব্যষ্টি ভাবে তোমার প্রকৃতি এবং আত্মা বা চৈতন্যই তোমার প্রাণ।

এইবার বুঝিতে পারিলে তোমারই মন প্রকৃতিরূপে, জগৎসাজে সাজিয়া তোমার প্রাণের উপরে দাঁড়াইয়া প্রতিক্ষণে উদ্দাম নৃত্য করিয়া, তোমাকে অভিভূত করিতেছে; অথবা পক্ষান্তরে—তোমার কল্পিত শিশু চৈতন্যকে পূর্ণত্বে পৌঁছাইবার জন্য দ্রুতগতি ধাবিত হইতেছে

যাহা হউক, সাধন-জগতে এইরূপ বাচনিক জ্ঞানের বিচারের কোনও প্রয়োজন নাই। সাধনা ও বাচনিক জ্ঞানের বিচার পরস্পর বহুদূরবর্ত্তী ও বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ওরূপ আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ পিপাসিত পাঠকের জন্য সাধন-জগতের রহস্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

এই মনকে প্রাণ বলিয়া বা এই প্রকৃতিকে পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি করাই সাধনা। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। এই "ঈশাবাস্য" মন্ত্রেও তাহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। জগতের প্রত্যেক বিষয়কে "ঈশাবাস্য" করিয়া লওয়া এবং মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করা একই কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহারই নাম "সত্যপ্রতিষ্ঠা" তোমার নেত্রদ্বয় রূপ-আকারে যাহা তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে, উহাকে রূপ মাত্র না বুঝিয়া পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে অভ্যাস কর। ঐ তোমার সম্মুখে যে বৃক্ষটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বাস্তবিক উহা তোমার মন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ বৃক্ষকে বা তোমার মনকে ক্ষুদ্র পরিণামী বলিয়া না বুঝিয়া পরমেশ্বর সত্য ও প্রাণরূপে ধারণা করিতে অভ্যাস কর।

এইরূপ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। সাধারণ জগৎ যাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছে; তুমি তাহাকেই সত্য বলিয়া, ইষ্টদেব বলিয়া নিজের প্রাণ তাঁহাতে সমর্পণ করিলে দেখিবে মিথ্যা বলিয়া আর কিছুই নাই, একমাত্র মহান্ সত্য সর্ব্বত্র সুপ্রতিভাত রহিয়াছে। মনকে প্রাণ

বলিয়া চিনিতে পারিলেই "ঈশাবাস্য" মন্ত্রের সাধনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহারই প্রথম অনুষ্ঠান জগতের প্রত্যেক পদার্থে পদার্থে সত্যপ্রতিষ্ঠা। পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহে এই সকল কথা আরও বিশদভাবে পরিব্যক্ত হইবে।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শতসম্বৎসর কাল জীবন ধারণের ইচ্ছা পোষণ করিবে। মনুষ্যক্ষেত্রে (বা তোমার) ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে কর্ম্মসকল তোমাতে লিপ্ত না হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বত্র পরমেশ্বর বা ইষ্টদেব জ্ঞানে বিষয় ভোগ করিবে। বিষয়স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইবে না।

পূর্ব্বাভাষ।

এই স্থলে দুইটী আশঙ্কা হইতে পারে ; প্রথম—যদি বিষয় মাত্রই সত্য ও ব্রহ্মস্বরূপ, এই ক্ষুদ্রত্ব ও পরিণামিত্ব যদি ব্রহ্মের স্বেচ্ছাকৃত লীলাবিশেষই হয়, তবে আর বৈধ কর্ম্মাদি করিবার আবশ্যকতা কি ? কর্ম্মমাত্রই যখন ব্রহ্ম, তখন আর বৈধাবৈধ কর্ম্ম বিচারের প্রয়োজন কি ? আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যাহাই করি সবই যখন ব্রহ্মে পর্য্যবসিত, তখন আর সাধনাদি কর্ম্মের কোনও প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় আশঙ্কা—পরিদৃশ্যমান নামরূপ ও ব্যবহার যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তবে তাঁহার এই ক্ষুদ্র স্বরূপে কেন অবস্থান করিব ? দেহ আছে বলিয়াই ত ক্ষুদ্র স্বরূপ ভোগ করিতে হইতেছে। দেহ সম্বন্ধশূন্য হইলেই ব্রহ্মের বিরাট্‌রূপে অবস্থান করা যাইতে পারে। শাস্ত্রেও ভৃগু অর্থাৎ পর্ব্বতাদি হইতে পতন এবং অগ্নি ও জলে প্রবেশাদি নানাবিধ উপায়ে ধর্ম্মার্থ দেহ নাশের বিধান আছে, তবে আর দেহের প্রয়োজন কি ?

এই দ্বিতীয় আশঙ্কায় আবার আর একটী গণ্ডাপত্তি হইতে পারে যে, স্থূল দেহের সম্বন্ধ নাশ হইলেই ত আর ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান হয় না। সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের সহিতও সম্বন্ধ নাশ আবশ্যক। এই দ্বিবিধ দেহের সম্বন্ধ যখন ইচ্ছা মাত্রেই নাশ হয় না তখন আর স্থূল দেহ নাশ করিয়া কি ফল ? কেন জীব-দেহ নাশ করিতে উদ্যত হইবে ? তাহার উত্তরে বলিতে হয়—ভবিষ্যতে সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ নাশ করিতে পারিব না ভাবিয়াই যে লোকে স্থূল দেহ নাশে যত্নশীল হইবে না এইরূপ যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ আপাতভোগ্য ক্ষুদ্রত্ব পরিণামিত্বরূপ বিষময় ফল হইতে মুক্তিলাভ করিবার অভিপ্রায়বশতঃ ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত

ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধির উপদেশ প্রদত্ত হইলে প্রথমেই তাহার বর্ত্তমান দুঃখের হাত হইতে মুক্তির উপায় অবলম্বন করিতে অভিপ্রায় হয়। ভবিষ্যতে কারণ ও সূক্ষ্মদেহ নাশ করিতে পারিব কি না সে চিন্তায় তাহাকে বর্ত্তমান দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় হইতে বিমুখ করিতে পারে না। মানুষমাত্রেই আপাতভোগ্য ফলে লোলুপ, সুতরাং দেহত্যাগ করিবার বাসনা অসম্ভব নয়। দেহত্যাগ করিতে পারিলেই যখন জাগতিক দুঃখ সন্তাপের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়, দেহত্যাগও যখন ব্রহ্মস্বরূপ তখন আর দেহের প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে।

এই উভয়বিধ আশঙ্কার অপনোদন করিবার জন্যই ঋষি দ্বিতীয় মন্ত্রের উপদেশ করিতেছেন। ইহার ব্যাখ্যা বুঝিবার পূর্ব্বে আর একটু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা বলিয়া মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। এই বহুভাবাত্মক জগৎকে ঈশ্বর বা ইষ্টদেবস্বরূপে সম্যক্ উপলব্ধি হইলে তখন আর কর্ম্মহীনতা অথবা দেহনাশের অভিলাষই হয় না, তখন প্রতি কর্ম্মে, প্রতি বিষয়ে ব্রহ্মসত্তার আনন্দময় বিকাশ দেখিতে দেখিতে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ অশেষ দুঃখ-সমাকুল এই নশ্বর জগতে অবস্থান করিয়াই সেই ভূমানন্দ উপভোগ করা যায়। যখন কর্ম্মমাত্রেই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হয়, তখন কর্ম্ম ত্যাগ হয় না বরং কর্ম্মশক্তি বহু মুখে প্রসৃত হয়। ইহা কর্ম্মের একটী গূঢ়রহস্য। যে ব্যক্তি এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে "ঈশাবাস্য" করিয়া লইতে পারিয়াছেন, এই জগতের প্রত্যেক বিষয় ভোগে, যাঁহার চিত্তে ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকেন, যাঁহার মন ও প্রাণ সম্যগ্ভাবে মিলিত হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি কখনও কর্ম্মত্যাগ বা দেহধ্বংস করিবার সংকল্প করিতে পারেন না। তখন স্থূল দেহে থাকিয়াই অনণু অস্থূল ব্রহ্মস্বরূপ ভোগ হয়। তবে এই কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মবীজস্বরূপ দেহনাশের আশঙ্কা হয় কেন? যখন এই জগতে নিয়ত পরিণাম দর্শন করিতে বার বার জন্ম-মৃত্যুর পেষণে পিষ্ট হইয়া, ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিতচিত্তে নিত্য স্থিরত্বের সন্ধানে জীব লালায়িত হয়, তখন যদি সে বুঝিতে পারে যে এই পরিণামী ও ক্ষুদ্র বিষয়সমূহও পরমেশ্বরেরই স্বরূপবিশেষ, এই অগ্নিই আমার ইষ্টদেব, এই জলই আমার ইষ্টদেব, তবে আর কেন কর্ম্ম করিব? কেনই বা দেহে অবস্থান করিব? এই অগ্নি কিংবা জলরূপী ইষ্টদেবে প্রবেশ করিয়া সকল দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করি। এইরূপ জ্ঞান কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান নহে, জ্ঞানাভাস মাত্র। যে পর্য্যন্ত প্রতি পদার্থে প্রতি ভাবে প্রতি চিন্তায় প্রতি কল্পনায় প্রতি কর্ম্মে সেই পরমেশ্বরের মহান্ স্বরূপ

উপলব্ধি না হয়, সর্ব্বত্র ঈশ্বরজ্ঞানে স্বাধীনতার নবীন উল্লাসে বিষয়সমূহ নির্ব্বিচারে ভোগের অধিকার না হয়, বুঝিতে হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার "ঈশাবাস্যমিদং" এই মন্ত্রের সাধনা হয় নাই। কেবল গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণে এইরূপ জ্ঞান-সূর্য্যের আভাসারুণের রক্তিমচ্ছটাময় একটা ক্ষীণ আলোকরেখা মাত্র আসিয়া পড়িয়াছে; এখনও প্রাণ ঐ ধ্রুব সত্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ তাদৃশ স্থির ও নিত্য প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য লালায়িত হইয়াছে, তখনই কর্ম্মত্যাগ ও দেহ নাশ-রূপ দ্বিবিধ আশঙ্কায় জীবের প্রাণ আন্দোলিত হইতে থাকে; তাই ঋষি সেই আশঙ্কার নিরাশের জন্যই এই দ্বিতীয় মন্ত্রের উপদেশ দিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন,—আত্মজ্ঞানহীন অনধিকারীর জন্য এই দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উহ সন্ন্যাস ও মিথ্যাবাদের কথা। ওরূপ ব্যাখ্যা সর্ব্বজনীন নহে। যাঁহারা প্রথম মন্ত্রে ত্যাগ শব্দে সন্ন্যাস অর্থ করিয়াছেন তাঁহারাই এ স্থলে তদ্‌বিরোধী কর্ম্মোপদেশের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রসঙ্গ ও উপক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধিকারভেদরূপ কল্পিত অর্থের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। সে যাহা হউক, আমরা মন্ত্রগুলির সরলার্থ গ্রহণ করিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিব।

ঋষি বলিতেছেন—এই জগতে কর্ম্ম করিয়াই শতসম্বৎসরকাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ করিবে। একশত বৎসরই পুরুষের আয়ুর পরিমাণ। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ অকালে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেহ দেহ নাশ করিতে অভিলাষী হইও না, অথবা জীবিত থাকিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিও না। পূর্ব্ব মন্ত্রে ভোগরূপ কর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে। যেরূপ ভোগের এক দিক্ দিয়া দেখিলে উহা ত্যাগরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেরূপ ভোগ ক্ষুদ্রত্ব ও বহুত্ব ব্যাপক হইয়াও তদ্‌গত ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করে না, সেই ত্যাগাত্মক ভোগরূপ কর্ম্মই এই মন্ত্রস্থ কর্ম্মশব্দের তাৎপর্য্য। "কুর্ব্বন্নেব" এস্থলে ঐ এব শব্দটীর দ্বারা কর্ম্মত্যাগ ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে। অর্থাৎ এই মানব-ক্ষেত্রে কখনও এমন কোনও অবস্থা আসিতে পারে না যাহাতে পূর্ণভাবে কর্ম্ম-ত্যাগ হইতে পারে। কারণ মানব দেহই কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। এই জন্যই ইহাকে কুরুক্ষেত্র বলা হয়। একমাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ হইয়া থাকে; কারণ তখন আত্মা বা চৈতন্য কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করে না।

যখন যে, ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে, তখন সেই ক্ষেত্রোচিত ধর্ম্ম রক্ষা করাই প্রকৃত স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে

উভয় ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমি কর্ম্মক্ষেত্রে দেহে অবস্থান করিব, অথচ কর্ম্ম করিব না এরূপ হয় না।

যখন যে ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে, যত অধিক কাল সেই ক্ষেত্রীয় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেকেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। কারণ, এক ক্ষেত্রের ধর্ম্ম পূর্ণভাবে প্রতিপালিত না হইলে, উচ্চতর অন্য ক্ষেত্রে গমন একান্ত অসম্ভব। সুতরাং যে ক্ষেত্রে যতদিন অবস্থান সম্ভব তৎপূর্ব্বে সেই ক্ষেত্র পরিত্যাগের সংকল্প সঙ্গত নহে। তাই এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে কেহ এরূপ আশঙ্কা করিবেন না যে, ব্যক্তিবিশেষের স্বক্ষেত্রোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান শেষ হইলে আর তথায় কি জন্য অবস্থান করিবে? তাহার উত্তরে বুঝিতে হইবে ওরূপ হয় না। কোন ক্ষেত্রোচিত কর্ম্ম পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইলে জীবকে আর সে ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে হয় না। প্রকৃতির নিয়মবশতঃই তাহাকে বাধ্য হইয়া সে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষেত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হয়, সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে "জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"।

জীব! সত্যই যদি তোমার প্রাণে ব্রহ্মলিপ্সা জাগিয়া থাকে, সত্যই যদি এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগৎকে পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তোমার প্রাণে জাগিয়া থাকে, তবে "ঈশাবাস্য" করিয়া এই জগৎকে ভোগ কর। কণ্টকের দ্বারা যেরূপ কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে হইবে। তুমি "কৃতম্নকর্ম্মকৃৎ" হও, তোমার কৃতঘ্ন কর্ম্ম কৃন্তন হইবে। সংসার ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? কর্ম্ম ও সংসারের কেন্দ্র অন্বেষণ কর, দেখিবে তুমি যেখানেই যাও, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পার নাই। নির্জ্জন অরণ্যে কিংবা পর্ব্বতকন্দরে অবস্থান করিয়াও তুমি সংসার বা কর্ম্মের……পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কর্ম্ম ও সংসারের বীজরূপী সংস্কারসমূহ ঐ যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনোরূপে ধাবিত হইতেছে, যাহাকে পাইবার জন্য কর্ম্মত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেইত বহুরূপে, বহুভাবে কর্ম্মাকারে প্রতিনিয়ত তোমার বুকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই বহুভাবে পরিব্যক্ত চৈতন্যকে আগে বুঝিতে চেষ্টা কর, সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি কর, তবেই ত কর্ম্মাতীত তত্ত্বাতীত ব্রহ্মত্বের সন্ধান পাইবে। কর্ম্মত্যাগের দ্বারা কর্ম্মত্যাগ হয় না; কারণ ত্যাগফল, অনুষ্ঠান বা ভোগ উহার উপায়স্বরূপ, উপায় ব্যতীত কেহ কখন ফললাভ করিতে পারে না।

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ; ঈশাবাস্থ বা পরমেশ্বরানুসন্ধান-বিশিষ্ট যাবতীয় অনুষ্ঠানই কর্ম্ম। ঈশ্বরানুসন্ধানশূন্য যাগযজ্ঞাদি বৈধকর্ম্মাদিও অকর্ম্ম। ঈশ্বরানুসন্ধানযুক্ত শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম বিকর্ম্ম, দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপাররূপ সাধারণ কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর উপাসনা পর্য্যন্ত প্রত্যেক অনুষ্ঠানটীকে কর্ম্মরূপে পরিণত করিতে হইবে; ইহাই মনুষ্যক্ষেত্রের কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্ব। সে কর্ম্ম কি? জগৎরূপী ঈশ্বরকে ভোগ করা বা মনোরূপে পরিব্যক্ত ব্রহ্মকে লাভ করা। মাত্র জগৎ ভোগ কর্ম্ম নহে, উহা অকর্ম্মপদবাচ্য। বর্ত্তমান কালে যে অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, উহাতে ঈশ্বরানুসন্ধান নাই। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত হইলেও উহা অকর্ম্ম। আবার আহার, বিহারাদি সাধারণ কর্ম্মগুলি ঈশ্বরানুসন্ধানযুক্ত হইলে উহাও কর্ম্মপদবাচ্য।

মনে কর একটী সুপক্ক মধুর আম্রফল তোমার সম্মুখে উপস্থিত, তোমার বহু-জন্মার্জ্জিত সংস্কারবশে উহা খাইবার জন্য তুমি প্রলুব্ধ হইলে। তখন যদি সেই ক্ষুদ্র আম্রটীকে 'এই আমার সর্ব্বাভীষ্টপূরক সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর' এইরূপ বলিয়া সরল প্রাণে সবল বিশ্বাসে গ্রহণ করিতে পার, এবং ফলভক্ষণজন্য লালসা, ভক্ষণ ক্রিয়া ও তদ্‌গত মধুরতা ও তোমার তৃপ্তিবিষয়ক জ্ঞান এই সকলকেই পূর্ব্বোক্তরূপে "ঈশাবাস্থ" করিয়া লইতে পার (অভ্যাসদ্বারা উহা অনায়াসসাধ্য হয়) তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, একদিকে তোমার আম্রদর্শন অবধি গলাধঃকরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মই ঈশ্বরত্বে পর্য্যবসিত হইয়া আম্রভোজন-রূপ ভোগটী সংসাধিত হইল। অথচ অন্যদিকে ফলতঃ আম্রস্বরূপ ক্ষুদ্র সংস্কারের পরিপুষ্টি না হইয়া উহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। তুমি আম্রের নাম, রূপ, মধুরতা প্রভৃতি ধন বা ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিলে না। এইরূপে যুগপৎ ত্যাগাত্মক ভোগের সাধনারূপ কর্ম্ম প্রতিনিয়ত করিতে হইবে এবং ইহার যে কি অমৃত-ময় ফল তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রসকলে পরিব্যক্ত হইবে। মনে করিও না যাহারা আম্রজ্ঞানে আম্র ভোজন করে তাহারা যেরূপ তৃপ্তি পায়, আম্ররূপী ঈশ্বরকে ভোগ করিয়া তুমি সেই তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। বরং তদপেক্ষা বহুশতগুণে আনন্দ ভোগ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে হয়ত আম্রমাত্র ভোগীর পক্ষে, ঐ আম্র দৈহিক কোনরূপ অপচয়ের কারণও হইতে পারে। কিন্তু আম্ররূপী ঈশ্বর ভোগী তোমার পক্ষে অপচয়ত হইবেই না, অধিকন্তু সত্যই আম্ররূপে ব্রহ্মভোগ করিবে। এই ভোগকে ভোগ বলিতে হয় বল, ত্যাগ

বলিতে হয় বল। বাস্তবিক যুগপৎ ঈশ্বরত্বের ভোগ ও বিষয়ত্ব ত্যাগের ইচ্ছাই একমাত্র কৌশল। তাই ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে "যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্।" এইরূপ সুকৌশল কর্ম্মই যোগ। উপনিষদে যে "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ" অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই অমৃতলাভ হয় এইরূপ উক্তি আছে। সে উক্তিরও তাৎপর্য্য ঐরূপ ভোগদ্বারা ত্যাগ, সন্ন্যাস নহে। সন্ন্যাস বা ত্যাগ ব্রহ্মলাভের উপায় নহে। উহা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির পর স্বতোলব্ধ অবান্তর ফল। তাই বলিয়াছিলাম, ভোগ দ্বারাই ত্যাগরূপ ফললাভ হয়। এইরূপ অমৃতময় তত্ত্বোপদেশ গীতায় বহুস্থানে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই গীতাকে উপনিষদের সার বলা হইয়া থাকে। ইহাই অমৃতলাভের সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন অক্ষয় সেতু ও নৈষ্কর্ম্মের হেতু।

যাহা হউক, এইরূপ কর্ম্ম করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার অভিলাষ করিবে। কখনও কর্ম্মত্যাগ করিবে না। ইহা ঋষির আদেশ। কেন এরূপ করিবে তাহার কারণ পরার্দ্ধে পরিব্যক্ত হইয়াছে। একমাত্র এই ত্যাগাত্মক ভোগ অথবা ভোগাত্মক ত্যাগরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কোনও উপায়ই নাই। যাহাদ্বারা এই মনুষ্যক্ষেত্রে কর্ম্মবন্ধন দূর হইতে পারে। বিষয়ে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিলে আর বিষয়সংকল্প থাকিবে না। সর্ব্বত্র ঈশ্বরসত্তাই প্রাণে ফুটিবে এবং তাহার ফলস্বরূপ ক্ষুদ্রত্ব ও বহুত্ব জ্ঞানরূপ যে কর্ম্মবন্ধন, তাহা দূর হইয়া এক অদ্বিতীয় এবং ঈশ্বরস্বরূপে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখনই বুঝিতে পারিবে, চিরদিনের জন্য কর্ম্মবন্ধন বিদূরিত হইয়াছে।

কেহ কেহ "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" এই স্থলে কর্ম্ম শব্দে অশুভকর্ম্ম রূপ অর্থ করিয়াছেন। শুভ কর্ম্মে ত শুভ বন্ধন জন্মায়। তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় তাঁহারা বলেন নাই, অথচ বিনিগমনাশূন্য অযথা সঙ্কোচ করিয়া কর্ম্মশব্দের অশুভ কর্ম্মরূপ অর্থ করিয়াছেন। ওরূপ অর্থ কোনও বিশেষ মতবাদ প্রচার করিবার জন্য ভাষ্যকারগণের স্বীয় প্রতিভা হইতে সঞ্জাত। সরল শৈশবীয় আর্যজ্ঞানে মস্তিষ্ক ধর্ম্মের তীব্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩

যাহারা আত্মহন্, তাহারা মৃত্যুর পর অজ্ঞানান্ধকারাবৃত অসূর্য্যনামক লোকপ্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এ জগতে আত্মহন্ চতুর্বিধ। (১) যাহারা এই জগৎকে জগৎ-মাত্র-স্বরূপে ভোগ করে অর্থাৎ জগৎ যে পরমেশ্বরেরই বিলাসক্ষেত্র, পরমেশ্বরই

যে জগদাকারে প্রতিভাত, পরমাত্মাই যে বহুভাবে জগৎরূপে পরিব্যক্ত, ইহা যাহারা উপলব্ধি না করিয়া মাত্র রূপ রসাদি কিংবা ভার্য্যা পুত্র ধনাদি বিষয়-সমূহ ভোগ করে, তাহারা নাস্তিক না হইলেও ফলতঃ আত্মার বা পরমেশ্বরের সর্ব্বত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না বলিয়া তাহাদের নিকট আত্মা হত বা আচ্ছাদিত থাকেন, তাই তাঁহারা আত্মহন্। (২) যাহারা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া কর্মক্ষেত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জগৎ-অতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধানে নিরত, তাহারা কার্য্যতঃ আত্মান্বেষী হইয়াও আত্মার লীলাবিলাসময় একপদ বা এক অংশ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া আত্মহন্ পদবাচ্য হইয়া থাকে। (৩) যাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে অর্থাৎ পূজা, জপ, হোম ধ্যান, কিংবা কীর্ত্তনাদিতে নিরত, আত্ম বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিলে, পরমেশ্বরের লিপ্সু হইয়াও আত্ম বা প্রাণ অংশ পরিত্যাগ নিবন্ধন তাহারাও আত্মহন্। (৪) যাহারা সর্ব্ব আত্মসত্তায় সম্যক বিশ্বাসবান্ না হইয়া সর্ব্বত্র আত্মসত্তায় সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া শুধু বাচনিক জ্ঞানে সর্ব্বত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া পুরুষায়ুষ পরিমাণের পূর্ব্বেই অকালে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেহসম্বন্ধ নাশ করে, তাহাদিগকেও আত্মহন্ বলে।

এই চারি শ্রেণীর লোকেই মৃত্যুর পরে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আত্মজ্ঞানহীন পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি কর্ম্মফলাত্মক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকেই অসূর্য্যালোক বলা হয়। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, যাহারা আত্ম এবং পর দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ বা অসূয়া করে, আমি তাহাদিগকে বারংবার অশুভ আসুরযোনিসমূহে প্রেরণ করি।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, আত্মহন শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ, স্বকপোলকল্পিত, বাস্তবিক তা নয়। আচার্য্য শঙ্করপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রথমোক্ত তিনপ্রকার অর্থই পাওয়া যায়। শেষোক্ত অর্থটী আত্মহন্‌শব্দের সরলার্থদ্যোতক। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ইহার আভাস বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে, বাস্তবিক কি উদ্দেশ্যে ঋষি "যে কে চাত্মহনো জনাঃ" এই চারিটী পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কোন ভাষ্য-কারই স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন নাই। সকলেই প্রায় এক কথা বলিয়াছেন যে,—"যাহারা অবিদ্যাদি দোষের দ্বারা আত্মাকে তিরস্কৃত করে, তাহারাই আত্মহন্।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পদচতুষ্টয়ের সরলার্থ করিলে পাওয়া যায় "যে কোনও জন আত্মহননকারী"; এই স্থলে "যে কোন" শব্দের দ্বারা যতপ্রকার

আত্মহনকারীর সম্ভব তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ঋষির অভিপ্রায়; অন্যথা যৎ ও কিম্ শব্দ প্রয়োগের বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না।

যাহারা সংসারিক উৎপীড়নে সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ উদ্বন্ধনাদির দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্বকালে নিন্দনীয়। পরমাত্মস্বরূপ-নির্ণয়প্রসঙ্গে উপনিষদ্ জ্ঞানলিপ্সুর নিকট তাদৃশ আত্মহত্যাকারীর আসুরী-যোনি প্রাপ্তি কথনের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেরূপ অর্থ করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত আমরা যাহা পাইলাম তাহাতে বুঝা গেল,—জগতের সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন করিবে, ক্ষুদ্রত্ব ও বহুত্বের ভিতর দিয়া অনন্তত্ব ও একত্বের আস্বাদন করিবে। বহুত্বের পরিত্যাগ ও একত্বের ভোগরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দীর্ঘকাল দেহ ধারণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিবে, অকালে বাচনিক জ্ঞানের উন্মাদনায় আত্মহত্যা করিবে না। পূর্ব্বোক্ত সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করিতে অভ্যাস করিবে, সর্ব্বত্র সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষতঃ ধর্ম্মকার্য্যে অর্থাৎ পূজা, জপ ও কীর্ত্তনাদিতে আত্মা বা প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিবে, আত্মা বা প্রাণ প্রতিষ্ঠাশূন্য উপাসনা উষর ভূমিতে বীজবপনের ন্যায় প্রায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। তাই উপনিষদের ঋষি বলিলেন—' সাবধান আত্মহন্ হইও না।" ' প্রাণ প্রতিষ্ঠাশূন্য উপাসনা করিও না।"

এই যে ধর্ম্ম জগতে "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" বলিয়া উচ্চ চীৎকার শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ যে গগনভেদী রবে মৃদঙ্গ করতালধ্বনিতে পল্লীপ্রান্তর মুখরিত করিয়া ভগবন্নাম কীর্ত্তনের সুধাময় ধ্বনি দিগন্ত প্লাবিত করিতেছে, ঐ যে ভক্তনামে পরিচিত বৈষ্ণব, পবিত্র হরিনাম করিতে করিতে ভাবনিমগ্ন হইয়া পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে, কিংবা ঐ রুদ্রাক্ষ ত্রিপুণ্ড্রধারী শৈব সাধু হর, হর, ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে জগদ্গুরুর আহ্বান করিতেছে, কিংবা ঐ যে রক্তবস্ত্রপরিহিত, সিন্দূরাঙ্কিতভালদেশ বীর সাধক "মা" "মা" রবে অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে মধুময় মাতৃ-অঙ্ক লাভের জন্য হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া নিঃস্পন্দভাবে ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া আছে, ইহার সর্ব্বত্রই দেখিবে কেবল একটী মাত্র জিনিষের অভাবে, অক্লান্ত পরিশ্রমেও আশানুরূপ ফল পাইতেছে না। সে জিনিষটী আত্ম বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যে প্রাণের অনুসন্ধান পাইয়া প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব নামের হিল্লোলে দেশ মাতাইয়াছিলেন, সেই নাম আজ গগনভেদী রবে আজীবন উচ্চারণ করিয়াও অনেকে বলিয়া থাকেন "হায়! আমার কিছুই হইল না।" যে নাম একবার মাত্র

উচ্চারিত হইলে কোটী-জন্মার্জ্জিত পাপসংস্কার ধ্বংসীভূত হয়, সেই নাম অহর্নিশ কীর্ত্তন করিয়াও যে, আবার অন্ধতমসাবৃত অসূর্য্যালোকে গমন করিতে হয়, তাহার একমাত্র কারণ ঐ আত্মঘাত বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভাব।

বর্ত্তমানকালে যে ধর্ম্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারও একমাত্র কারণ ঐ আত্মঘাত বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভাব। গাণপত্য, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব এবং শাক্ত এই পঞ্চবিধ উপাসক যে একই আত্মার পঞ্চবিধ উপাসক যে একই আত্মার পঞ্চবিধ অনুভূতির ক্রম, মানুষ মাত্রেরই যে এই পঞ্চবিধ স্তরের ভিতর দিয়া আত্মলাভ করিতে হয়, তাহা না বুঝিয়া অযথা বহিরাবরণের বৈচিত্র্য-মোহে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মকেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে। এই সকলই অন্ধতমসাবৃত অসূর্য্যালোক প্রাপ্তির ফল।

এই আত্মা বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রণালী গুরুবক্ত্রগম্য। তবে যতটা প্রকাশযোগ্য তাহা এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে; যখন তুমি ভগবৎ প্রাপ্তির কোন বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বসিবে, তখন সর্ব্বপ্রথমে চিন্তা করিও আমারই আত্মা, আমারই প্রাণ, এই বিরাট্ জগৎরূপে বাহিরে পরিব্যক্ত এবং ভাব, কল্পনা, চিন্তা, বৃত্তি প্রভৃতিরূপে অন্তর্জ্জগতে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত। আমি তাহারই অন্বেষণ করিতেছি—তাহার জন্য আমার এই উপাসনা, আমার জাগতিক প্রত্যেক কার্য্যের উদ্দেশ্য একমাত্র তাঁহাকে লাভ, আমি সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত এবং অস্ত হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু করি, সকলই তাঁহার পূজা। তাঁহাকে না পাইলে আমার জন্ম, জীবন বৃথা। আমার প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ, ধন, মান, বিদ্যা, যশঃ, স্বর্গ, নরক, পুণ্য, পাপ, সকলই তিনি। তাঁহাকে না পাইলে—যিনি আমার আমি, তাঁহাকে না পাইলে আমার সকলই বৃথা। এইরূপে ভগবান্‌কে যতদিন না দেখিতে পারিবে ততদিন তোমার সকল কার্য্যই আশানুরূপ ফল প্রদানে বিমুখ হইবে। তাই বলিতেছিলাম, "আত্মহন্" হইও না। হায়! আমরা পূজার সকলই করি, কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না, কোন অঙ্গের বিকলতা হয় না, কেবল আমার দেবতার, কেবল আমার প্রাণের আবাহন করি না, তাই আমরা আত্মলিপ্সু হইয়াও আত্মহন্।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এ জগৎ অর্থাৎ আমি যে জগৎ ভোগ করি তাহা বস্তুতঃ আমার বাহিরে নাই। আমারই অনাদি জগৎ সংস্কার বহিরাগত স্পন্দনে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জগতের সাজ ধরিয়া আমাকে মুগ্ধ করিতেছে। ঐ সুদূর অবস্থিত চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত আমারই অন্তরে, ঐ দূরত্ব ঐ ব্যাপকতা ঐ সূর্য্যচন্দ্র সকলই আমার

আত্মমূর্ত্তি, আমার অন্তরে অবস্থিত। আমারই প্রাণ, আমারই আত্মা এই অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্তভাবে বিরাজিত, ইহা কল্পনা নহে, সম্যক্ অনুভূতির বিষয়; ঐ অনুভূতি, উহাই চৈতন্য, উহাই আত্মা, উহাই প্রাণ। সাধক মাত্রেরই ঐ অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া সাধনা প্রয়োগ করিতে হইবে—যতদিন না আত্মপ্রকৃতিকে, আত্মচৈতন্যকে পরমেশ্বরভাবে উপাসনা করিতে পারিবে; যতদিন না ব্রহ্মভাবের কাছে জীবভাবকে নমিত করিতে পারিবে ততদিনই আত্ম-হন্ হইতে হইবে। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বড় দুঃখে বলিয়াছেন "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরংভাবমজানন্তো মমভূত মহেশ্বরম্" যতদিন আমরা আত্মপ্রকৃতিকে, আমার প্রাণকে অবজ্ঞা করিব ততদিনই আমরা আত্মহন্। আমরা যখনই যাহা কিছু করি, তাঁহারই পূজা করি, কিন্তু অজ্ঞানে, অবিধিপূর্ব্বক। যতদিন আমরা এই অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারিব, ততদিন আমরা আত্মহন্। ভগবান্ বলিয়াছেন "যাহারা আমাকে (অত্মানুভূতিকে) পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারাও আমারই পূজা করে বটে, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক।

ব্রহ্ম অনন্ত, কিন্তু আমার নিকট তাঁহার যতটুকু প্রতিভাত হইতেছে, সংসারাসক্ত, পাপমলিন, অতিচঞ্চল, পরিণাম যাহাই হউক—যতই না কেন দীনভাবে আসুক, তিনিইত আসিয়াছেন; প্রতিভাবে প্রতিকম্পে তাঁহারই স্পর্শ হইতেছে। সাধক! তুমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার কাতর প্রার্থনা, তোমার ভক্তিযুক্ত প্রণাম, তোমার আবেগযুক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রেরণ কর, দেখিবে, ঐরূপ কিছুদিন করিতে পারিলে দেখিবে—তোমার দান, ঐ ক্ষুদ্র ঐ চঞ্চল একদিন রাজরাজেশ্বর মহান্ ও স্থিরমূর্ত্তিতে তোমাকে কৃতার্থ করিবে।

তাই ঋষি বলিলেন,—তুমি ঈশাবাস্য মন্ত্রের সাধনারূপ কর্ম্ম চিরজীবন করিবে বটে, কিন্তু আত্মহন্ হইও না, জগতের প্রত্যেক পদার্থকে পরমেশ্বর স্বরূপে ভোগ করিবে, সেই পরমেশ্বর তোমারই অন্তরে অবস্থিত—তোমারই হৃদয়ের দেবতা ঐ ক্ষুদ্র ও পরিণামী রূপে তোমার অগ্রে উপস্থিত, তোমার গর্ভধারিণী মাতা যদি ভাগ্যদোষে বিকলাঙ্গ হইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, তুমি কি তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া মা মা বলিয়া থাকিতে পার? কখনই নয়। সেইরূপ "যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"রূপে আজ তোমারই মা তোমারই আত্মা সম্মুখে বিরাজিত। তুমি সহস্রশীর্ষে তাঁহাকে প্রণাম কর, তোমার প্রাণ তাঁহার পায় ডালি দেও, গুরু বলিয়া তাঁহারই চরণে আশ্রয়৲

লও। দেখিবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" রূপে "সত্যং জ্ঞানমানন্দমনন্তং" রূপে তোমার জন্মজীবন চরিতার্থ করিয়া দিবে। জন্মমৃত্যুর ধাঁধা অবসান হইবে। তুমি অমৃতের বরপুত্র, অমৃতলাভে অমর হইবে।

পরম আনন্দময়।

তুমি পরম আনন্দময়
সর্ব্ব বিশ্বময়　　রূপটি তোমার
তুমি সর্ব্ব বিশ্বলয়।
এ বিশ্বের মাঝে　　ছড়াব হৃদয়
মাতিবে হৃদয় মন
বাসনা তোমারে　　ধরব হৃদয়ে
তুমি মোর সরবস্বধন।
পিতা হ'য়ে তুমি　　পুষিছ পালিছ
মা হ'য়ে করিছ কোল
সন্তানের মত　　তুষিছ কখন
মুখে মধুমাখা বোল।
প্রিয়তমা সম　　সেবিছ তুষিছ
বরষি মধুর ভাষ
উপদেষ্টা হ'য়ে　　করিছ মনের
অজ্ঞান-তিমির নাশ।
সোদর সোদরা　　সাদর সোহাগে
বাঁধিয়া রাখিছ প্রাণ
প্রাণের বঁধুয়া　　জানিয়া মরমে
গাইছ প্রাণের গান।
জীবের কারণ　　নিজের পরাণ
জগতে করিছ দান
আপনার ভাবে　　মাতোয়ারা কভু
গাও নিজ যশোগান।

তুমি মোর সব আমিত তোমারই
তুমি আমি ছাড়া নাই।
করিতে আপন ভাবিতে তোমায়
আপনা হারায়ে যাই।
যে তব আপন তুমি যার প্রাণ
এ ভবে কি তার ভয়
তুমিত আমার সেই প্রাণসখা
পরম আনন্দ ময়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ।

ছায়াময়ী।

ওগো তুমি রহিয়াছ কোন্‌খানে?
অপরাহ্নে গবাক্ষের পথে
মৃদুল মলয় যবে
সুরভি বহিয়া আনে,
চেয়ে থাকি উদাস হৃদয়ে
প্রশান্ত মেদুর স্বচ্ছ
নীল আকাশের পানে,
ধীরে ধীরে সেই উর্দ্ধ হ'তে
অজানা গোপন পথে
নেমে এস তুমি মোর প্রাণে,
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্র যেন
পূর্ণ হয়ে যায় এক
সুমধুর শব্দহীন গানে।
আবরিয়া আপনার রূপ
ছায়াময়ীবেশে
বেলা অবসানে
কে তুমি গো এমন করিয়া
নিতি নিতি আসি মোরে
তোষ তৃপ্তি দানে?

ঢেলে দাও অমৃতের ধারা
নিমেষে সরস কর
অবসন্ন প্রাণে,
দূর কোন স্বপন রাজ্যের
বীণা যেন অকস্মাৎ
বেজে ওঠে কাণে।
নয়নে ত পাব না দেখিতে
দিবে না ধরা এ কয়ে
তবু যে ক্ষণিক টানে
টেনে রাখ হৃদিখানি মোর
মুগ্ধ থাকি ক্ষণতরে
ওগো যেই মধু পানে
তাহাতেই বেঁধে রাখ মোরে
ভুলাইয়া চিরতরে
পমের আহ্বানে।
অলক্ষিতে যেও না চলিয়া
মায়াপুরী মাঝে আর
সেই শূন্য যানে,
লুকালে যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া
আনিতে পার না আমি ধরি
ক্ষুদ্র মোর জ্ঞানে,
আঁধারে ডাকিতে হয় শুধু
ওগো ছায়াময়ি মায়াময়ি মোর
তুমি রহিয়াছ কোন খানে?

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।

যোগশক্তি লাভ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ইন্দ্রিয়ে নূতন শক্তি বিকশিত হইতে হইলে কি কি প্রকারের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ও কি কি প্রকারে সাধন প্রয়োজন তাহা দেখা যাউক।

ইন্দ্রিয়ের নূতন শক্তির বিকাশ অর্থে যেন কেহ কোনও ইন্দ্রিয়ের বিসদৃশ শক্তি লাভের কথা মনে না করেন। দর্শনেন্দ্রিয়ে শ্রুতিজ্ঞান লাভ করাকেই আমরা বিসদৃশ শক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। এক্ষেত্রে কেহ কেহ বলিতে পারেন জগতে এমনও জীব আছে যাহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে শ্রুতির জ্ঞান জন্মে। যেমন সর্পজাতির কর্ণ নাই, উহারা চক্ষুশ্রবা—চক্ষুদ্বারাই শ্রুতিজ্ঞান লাভ করে। কোনও কোন সম্মোহিত ব্যক্তি (Hyhnotic midium) সম্মোহনকারীর ইচ্ছাবশে নাসাগ্রদ্বারা দর্শন করে। ফলতঃ আমাদের কতকগুলি প্রচলিত ভ্রান্তি আছে তাহা আমরা একটু তলাইয়া বুঝি না বলিয়াই ঈদৃশ ভ্রমে পতিত হই। চক্ষু নেত্রাদি আমাদিগের "ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র" হয়াবা ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়গণ "সূক্ষ্মভূত শক্তিকেন্দ্র"। আমরা সকলেই প্রতিদিন না হউক, মাসে অন্ততঃ চারি পাঁচ দিনও স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলির সত্যতা সম্বন্ধীয় বিচার এক্ষেত্রে নহে। স্বপ্নে আমরা কিপ্রকার অনুভব করি তাহাই বিচার্য্য এবং তাহা হইতে আমরা কি সত্যে আগমন করিতে পারি তাহাই দ্রষ্টব্য।

আমি যখন আমার পল্লীভবনে শয়ান আছি তখন আমি স্বপ্ন দেখিলাম আমি কলিকাতার এক ত্রিতল হর্ম্ম্যমন্দিরে বসিয়া আমার প্রাণোপম বন্ধুবরের একমাত্র শিশু পুত্রের সহিত নানাপ্রকার ছুটাছুটি খেলা করিতেছি। শিশু বারংবার ছুটিয়া আসিয়া আমার কোলে উঠিতেছে। আমি তাহার বদন চুম্বন করিতেছি, সেও আমাকে চুম্বন করিতেছে। আমরা উভয়েই নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ইত্যাদি। সহসা—বায়স্কোপের দৃশ্য পরিবর্ত্তনের মত—আমি এক প্রকাণ্ড মাঠে আসিয়া পড়িলাম, বন্ধুর শিশুসন্তান কি হইল বলিতে পারি না, দেখিলাম এক প্রকাণ্ড বৃষ আমাকে তাড়াইয়া আসিতেছে, বিশাল প্রান্তরে নিকটে কোনও বৃক্ষাদি নাই। হায় হায়! আমি প্রাণভয়ে দৌড়াইতে চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমার অচল চরণদ্বয় আমাকে গন্তব্য

পথে লইয়া যাইতে অক্ষম। আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, জাগিয়া দেখি আমার পল্লাগৃহে আমি শুইয়া আছি।

এই যে স্বপ্নে এত কাণ্ড কারখানা প্রত্যক্ষ করিলাম, আমার বন্ধু-পুত্রের চেহারা দেখিলাম, তাহার সুকোমল কপোলে চুম্বন করিলাম। কি বিশাল প্রান্তর ও বৃহদাকার বৃষ দর্শন করিলাম। তখন ত আমার এই চক্ষু দুটী নিদ্রায় নিমীলিত ছিল—আমি দেখিলাম কিপ্রকারে? আমার হস্তদ্বয় বিছানাতে নিপতিত ছিল—আমি সুকুমার শিশুকে আলিঙ্গন করিলাম কিপ্রকারে? অপিচ স্বপ্নসময়ে দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শনাদি যাহা কিছু করিয়াছি সকলই ঠিক জাগ্রতের ন্যায় অনুভব করিয়াছি, তাহাতেও কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় নাই। আমি জাগ্রতেও যেটী যেরূপে অনুভব করি স্বপ্নেও সেইটী সেইরূপেই অনুভব করিলাম কি প্রকারে? আমার চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত পদাদি নিদ্রায় বিকল থাকা সত্ত্বেও আমিই আমার সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ঠিক মত করিয়াছি। হয়ত প্রত্যুত্তরে কেহ বলিবেন যে, মনের সাহায্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করা হইয়াছে। আমিও তাহাই স্বীকার করিতে বাধ্য। তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ইন্দ্রিয়নিকর মনোময় উপাদানে গঠিত; তাহাতে স্থূল চক্ষু যন্ত্র না থাকিলেও দর্শনের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। এ প্রকার কোনও ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র না থাকিলেও তাহার কোনও ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে না। এক মাত্র মন দ্বারাই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ও তত্তৎ কার্য্য বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। এবং আমার স্থূল চর্ম্ম মাংসাদি নির্ম্মিত দেহ অসাড় হইয়া থাকিলেও আমি দেহবানের মত অনুভব করিয়া থাকি এবং আমি স্বপ্ন এবং জাগ্রত উভয় অবস্থাতেই এক আমিই থাকিয়া যাই। ইহা হইতে কি ইহাই প্রমাণ হয় না যে আমি কেবল স্থূল দেহেই সীমাবদ্ধ নহি; অপিচ আমি দেহাবচ্ছিন্ন হইয়াও কার্য্যক্ষম থাকি?

আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় এখন যেরূপ আছে ইহাতে আমরা বায়ু দর্শন করিতে পারি না, আকাশ দেখিতে পাই না, শব্দের গতি স্পন্দন দেখিতে পাই না; এববিধ অনেক বস্তুই দেখিতে পাই না। যদি ইহার কিছু নয়নগোচর হয় তাহা হইলেই আমাদিগের দৃষ্টিশক্তির অভিনব ক্ষমতা লাভ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। যদি দর্শনযন্ত্র চক্ষুর সাহায্যে কাহারও "শ্রুতি" জ্ঞান লাভ হয় তাহা হইলে তাহাকে দৃষ্টির অভিনব শক্তি লাভ না বলিয়া শ্রবণশক্তির যন্ত্র বা সংস্কার পরিবর্ত্তনই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কোনও ইন্দ্রিয়-

যন্ত্রদ্বারা অপর কোনও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেও উহা ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি বা নবশক্তি লাভ বলিয়া স্বীকার্য্য নহে। অপিচ যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তাহার অনুরূপ নবশক্তি লাভেই ইন্দ্রিয়ের শক্তিলাভ বলা যাইতে পারে।

ইন্দ্রিয়ে নবশক্তিলাভ করিতে হইলে "আমি ইন্দ্রিয়বান্ ব্যক্তি" আমার এই সংস্কার খুব দৃঢ় থাকা আবশ্যক। এই সংস্কার সুদৃঢ় না হইলে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যকারী ও জাগ্রত থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও মন আমিতে কেন্দ্রিত না হইতে পারিলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, অস্মিতা বোধ ক্ষীণ হইয়া যায়। "আমি আছি" "আমি বিশ্ব মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সত্তাস্বরূপ কিছু আছি" এই প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বোধকেই অস্মিতা বলে। অহং প্রত্যয় বা আমি বোধে অস্মিতার এই মদতিরিক্ত কিছু আছে ও "আমি আছি" 'এই প্রকার ভ্রান্তি থাকে না। সুতরাং অহং প্রত্যয়ে আমিই সর্ব্ব ও সর্ব্বই আমি হইয়া অন্য সবই লয় হইয়া একমাত্র আমিই বিদ্যমান থাকে। সেই "আমি" একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় বোধস্বরূপ। তাহা যে বুঝে সে বুঝে; কোনও প্রকারেই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই অহং সিদ্ধ মহাত্মার দ্রব্য, ক্রিয়া ও ভাবের প্রভেদ থাকে না, সব এক হইয়া যায়। সুতরাং সেই ভাবে যে 'শক্তি'' তাহাকে শক্তি লাভ বলা যায় না। যেহেতু কিছু লাভ করিতে হইলেই কিছু প্রাপ্য এবং কেহ প্রাপক থাকা চাই। সুতরাং যেই ভ্রান্তিবশে "অস্মিতা"-শক্তি বা ক্রিয়ার অনুপাতে আমি বোধ স্থির থাকে—অর্থাৎ আমি প্রাপক ও আমার প্রাপ্য "শক্তি" মদতিরিক্ত ভিন্ন এই প্রকার বোধ জাগ্রত থাকা চাই।

একটী উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী বিবৃত করিবার চেষ্টা করা যাউক। যেমন জন্মমাত্রেই কেহ কবি, চিত্রকর, বা শিল্পী হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। অথচ সেই কবিত্ব প্রভৃতি বীজরূপে তাহাতে না থাকিলেও সে সময়ে কবি শিল্পী প্রভৃতি হইতে পারে না। কবিকেও যেমন ভূয়োদর্শন, অভ্যাস ও অনুধাবনা দ্বারা কবি হইতে হয়, প্রত্যেক মানবকেই সেইরূপে নিজের অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে জাগরিত করিয়া তুলিতে হয়। যে "কথা" আমরা প্রতিক্ষণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি—যেই বাক্য ব্যবহার ব্যতীত সচরাচর আমরা কোনও বিষয় চিন্তা করিতেও পারি না। সেই ভাষা আমাদিগের পৌনঃপৌনিক অভ্যাস দ্বারা লব্ধ। কবিত্ব লাভে বা ভাষা শিক্ষায় আমাদের যে পূর্ণতা লাভ হইল এতদু-ভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ এই যে, কবিত্বটা আমার বিশেষ সম্পদ মনে করিয়া একটু গৌরবান্বিত হই; ভাষা শিক্ষার প্রথম অবস্থায় আধ আধ কথা কহিতে

শিখিয়া তৎকালে কিছু গৌরব বোধ করিলেও পরে যখন বুঝিতে পারি উহা সকলেরই সাধারণ সম্পদ্, তখন আর সেই অহঙ্কার বা গর্ব্ব থাকে না, উহা সাধারণ হইয়া যায়। এই উভয় ক্ষেত্রেই আমি কবি হব, বা 'আমি' ভাষা শিক্ষা করিব এই প্রকার একটা অনুরাগ বা বলবতী ইচ্ছার দরকার। কবিকেও এক একটা ভাব লইয়া অনুক্ষণ সেই ভাবের উপর স্থির থাকিতে হয়। শিশুকেও এক একটী বাক্য বা বাক্যাংশ লইয়া পুনঃ পুনঃ উহার আবৃত্তি করিতে হয়।

যে ব্যক্তি স্বভাতঃ কবি নহে বা যে স্বভাবতঃ মূক বধির তাহাকে প্রথমতঃ কষ্টকল্পনাদ্বারা ও ভাবে থাকিতে বা এক একটী বাক্যের উপর ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিতে হয় ও অভ্যাসবশে উহা যখন তাহাদের সংস্কারবদ্ধ হইয়া পড়ে তখনই সে কবি হইতে বা কথা কহিতে পারে, অন্যথা পারে না। সেই প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ করিতে হইলেও শক্তিলাভের প্রবল ইচ্ছা, বিশ্বাস ও অতন্দ্রিত আস্থা বোধ থাকা আবশ্যক।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সংখ্যাপূর্ব্বক বীজ-মন্ত্রাদি জপের পদ্ধতি প্রচলিত আছে উহা এই প্রকার সিদ্ধি লাভের একটী প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। সকল শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে দেবতাগণ বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তির এক একটী ভাবরূপ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে দেবতার যে বীজ অর্থাৎ যে মন্ত্র সাধন করিলে ও মন্ত্রের স্বরূপ অবগত হইলে বিশ্বশক্তির সেই বিশিষ্ট বিকাশ বা দেবতাতত্ত্ব সম্পূর্ণ অধিগত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এস্থলে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মনোযোগ সহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া কোনও বিশেষ মন্ত্র যথারীতি সংখ্যাপূর্ব্বক জপ করিলে সেই মন্ত্র সিদ্ধ হয় ও তাহা হইতে অভিনব শক্তি লাভ হয়। যোগিনী, সুন্দরী, ভূতিনী প্রভৃতি সাধন বিদ্যাদি এই শ্রেণীর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ-জনক সাধন ও অপেক্ষাকৃত অল্প অল্প সাধনেই ইহার ফল পাওয়া যায়।

ইন্দ্রিয় শক্তি লাভ করিতে হইলে স্বসঙ্কল্পে দৃঢ়বদ্ধ হওয়া আবশ্যক। "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" এই উভয়ের একটা করিতেই হইবে। সঙ্কল্পিত বিষয়ে যেমন দৃঢ়তা দরকার তেমনি সঙ্কল্পটী সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ (well defined) হওয়া চাই অর্থাৎ বেশ সুস্পষ্ট সঙ্কল্প হওয়া চাই। সঙ্কল্প মনের কার্য্য। কেবল মৌখিক বচনে সঙ্কল্প হয় না। যাহা সঙ্কল্প তাহা স্পষ্টরূপে

মনে জাগরিত থাকা চাই। সর্ব্বপ্রকার মানসিক চিন্তা ও দৈহিক কার্য্যাদি সেই সঙ্কল্পিত মননানুসারে হওয়া চাই। অটল বিশ্বাস সহকারে কায়মনো-বাক্যে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া তদ্গতচিত্তে কার্য্য আচরণ করিলে তাহার সদ্য ফল লাভ হয়। পাতঞ্জল দর্শনেও ইহা উক্ত হইয়াছে, "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।" পা ১। সূ ২১।

এই স্তরের সাধনপথে 'কাম' একটী প্রবল সাধন। নির্দ্দিষ্ট কোনও কিছু পাইবার প্রবল ইচ্ছা বা কামনা না থাকিলে এই স্তরের সাধন হয় না; ফলতঃ একমাত্র ভগবানকেই স্থূল সূক্ষ্ম, দৃশ্যাদৃশ্য সকল ভূমিকায় সর্ব্বভাবের মধ্যে যে দেখিতে না পারে তাহার পক্ষে নিষ্কাম ধর্ম্ম বা কর্ম্মাচরণ করার কথা মুখে আনা বাতুলতা মাত্র। যাহার স্বপ্নে জাগরণে সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে, ভগবান্ জাগ্রত রহিয়াছেন—যে ব্যক্তির মর্ম্মের মর্ম্ম কক্ষা হইতে সকল ভাবেই কেবল ভগবান্ই ফুটিয়া উঠেন, যে অকৈতবচিত্তে কহিতে পারে—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ—কেবল মাত্র সেই নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার অধিকারী। তদ্ভিন্ন যে নিষ্কাম কর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায় সে মিথ্যাবাদী, শঠ। যাহার কাম থাকে না তাহার দেহাদি ব্যাপারও থাকে না। কাম কেবল ইন্দ্রিয়-প্রীতির কারণ নহে, কামের অস্তিত্বেই জীবের অস্তিত্ব।——"কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতিঃ লাভো জীবেত যাবতা"—

- ভাগবত।

স্থূল কথা "আমি একব্যক্তি আমার শক্তি বিশেষ লাভ করিতে হইবে।" এবম্বিধ বোধটী বেশ টনটনে থাকা আবশ্যক। তাহাই কামের বন্ধন শিথিল হইলে থাকে না। কামের বন্ধন শিথিল হইলে তখনকার বুলি হয়—"হৌক, না হয় না হউক! যদ্ভাব্যং ভবতু হে ভগবন্!—ইত্যাদি।

শক্তিলাভেচ্ছু সাধকের পক্ষে অস্মিতাবোধটী বেশ জাগ্রত রাখা চাই। আমরা যেমন জাগ্রতাবস্থায় নানাপ্রকার ভাব একই সময় পোষণ করিয়া নিজের গন্তব্যপথে গমন করিতে পারি, বিচার ও স্মৃতি প্রভৃতি সাহায্যে অনেক অভীপ্সিত কুকার্য্যের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে ও অনৈচ্ছিক সৎকার্য্যও আচরণ করিতে পারি, স্বপ্নচৈতন্যেও সাধক যখন সেই প্রকার আপনাকে স্থির রাখিয়া তথাকথিত স্বপ্নরাজ্যের ঘটনাবলির মধ্যেও স্বাধীন থাকিতে পারেন—বিবিক্তভুক স্বপ্নচৈতন্যের ঐকদেশিক ভাবসমূহের মধ্যে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত না হইয়া

স্থির থাকিতে পারেন তখন তাঁহার ভুবর্লোকের পরিজ্ঞান জন্মে। তখন সে তাহার চিত্তে ভুবর্লোকের ঘটনাসমূহকে আর নিজের সুখ দুঃখের সহিত বিজড়িত করিয়া না দেখার জন্য ঐ লোকের সত্যতা নির্দ্ধারণে সমর্থ হয়। সে তখন সর্ব্বেন্দ্রিয় লইয়া জাগ্রতাবস্থার ন্যায় স্বপ্নাবস্থায়ও বিচরণক্ষম হইয়া থাকে। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার মধ্যে তাহার স্বকপোলকল্পিত বেশী কিছু থাকে না বলিয়াই সে স্বপ্নরাজ্যের বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারে ও স্বপ্ন দর্শন তাহার পক্ষে সিদ্ধি দর্শনই হইয়া থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধককে অস্মিতাভাব, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও সকাম সাধন ঠিক মত রাখিতেই হইবে। এই ভাবে সাধনার পরিপক্কতা লাভ হইলে সাধক নিজেই জীবন ও মরণের অর্থ বুঝিতে পারে ; তাহার পক্ষে স্থূল দেহের বিনাশে মৃত্যু মিথ্যা হইয়া পড়ে। ক্রমে যখন সেই সাধক আরও উচ্চতর সাধন ও সিদ্ধি ভূমিকায় উন্নীত হইতে থাকে তখন সেই সাধক চতুর হইলে, বুঝিতে পারে অস্মিভাব দেশ অতি ক্ষুদ্র ; ইহার পরিণাম অতি অকিঞ্চিৎকর। তখন এই অস্মিতা বর্জ্জন করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর বোধ হয়। এবং তাহার "আমিকে"ই বিশ্বের আমির অংশ বুঝিয়া ও নিজেই যে অনন্ত শক্তির আধার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার স্বহৃৎ আমিতে অস্মিতা বিসর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হয়। একমাত্র সেই ভূমিকায় আরুরুক্ষু সাধকই কিয়ৎ পরিমাণে স্থূল কাম বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় পরমকারুণিক শাস্ত্র আশ্রমিক মানবের জন্য সকাম কর্ম্মেরই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এবং ইহার মধ্যেও যাঁহারা একটু উন্নত তাঁহাদিগের জন্য "অকামঃ বিষ্ণুকামো বা" বলিয়া ভগবানের প্রীতিকামী হওয়াই যে অকাম হইবার প্রধান সাধন তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ যিনি সবই ভগবানে বা ভগবানকেই সর্ব্বময় না দেখেন তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম হওয়া বা নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ করা অসম্ভব।

শক্তি লাভ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কথিত হইল তাহা সমস্তই শক্তি লাভের মূলতত্ত্ব। যদি কোনও পাঠকের শক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে এই মূল তত্ত্বের সহিত মিলাইয়া সঙ্কল্পানুসারে সাধন করিলে অবশ্যই তাহার সমুচিত ফল লাভ হইবে। ভৈষজ্য শাস্ত্রে কেবল ঔষধের ক্রিয়া ও গুণাগুণ থাকে, যাহার প্রয়োজন সে রোগের অবস্থার সহিত ঔষধ লক্ষণ মিলাইয়া ব্যবহার করে ও ফল লাভ করে। ইহাও তদ্রূপ। যিনি যতদূর অনুসন্ধিৎসু ও মর্ম্মজ্ঞ, যিনি আপনার ভাবের

সহিত যতটা মিলাইয়া দেখিতে বুঝিতে পারিবেন তিনিই সুফল লাভে সমর্থ হইবেন।

একমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানই সত্য। জগৎটা অবভাসক সত্য বা আসলে মিথ্যা, কেবল প্রসঙ্গত সত্য। যেমন অল্পান্ধকারে, রজ্জু, দণ্ড, জলধারা, ভূমির ফাটল বা তদ্বৎ কিছুতে সর্প ভ্রম হইয়া থাকে, দণ্ডাদিতে মিথ্যা সর্পত্ব বোধ হয় অর্থাৎ যাহা সর্প নয় তাহাকে সর্প বোধ হয়, সেইরূপ এই মায়াকল্পিত জগৎ যাহা সত্য নহে তাহাকে সত্য বোধ হয়। যেমন পূর্ব্বোক্ত দণ্ডে সর্পবোধের মূলে দণ্ডের অস্তিত্ব সত্য কিন্তু সর্পত্ব মিথ্যা; তদ্রূপ জগতের কারণস্বরূপা মায়ার অস্তিত্ব সত্য। কারণ শক্তিমান্ ভগবানের শক্তির নামই মায়া। মায়াপরিকল্পিত জগতের সত্যতা বোধটাই মিথ্যা সর্পবোধের ন্যায় পূর্ব্বদৃষ্টের পরত্র অবভাসস্বরূপ মায়া কল্পিত, মিথ্যা। সকল শাস্ত্রই নানা ভাষায় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন একমাত্র ভগবান সত্য। জীব ভগবানের অবভাসিত কণামাত্র হইলে জীবের পক্ষে যে কোন শক্তি লাভ সকলই যথার্থতঃ মিথ্যা বা মায়িক সত্য। জীব যদি কোনও কৌশলে এই দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করিয়া সার সত্য ভগবানকে ধরিতে পারে তখন মায়া তাহার কাছে ভেল্কিবাজি হইয়া পড়ে ও সর্ব্বপ্রকার মায়িক শক্তির অধীশ্বর হইতে পাবে। ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না বোধ হয়। মায়া অনন্ত, তাহার শক্তি অনন্ত; সুতরাং তাহার সাধনপথও অনন্ত। আমাদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনানিচয়ের মধ্যে বহু জাগতিক খেলা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, এই সকলের মূল তাৎপর্য্য ও কারণ অনুধাবনপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলেই তাহার নিয়মেরও অনেকটা বোধ হয়। এবং সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে আরো অনেক অভিনব রহস্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভ্রূণমধ্যস্থ (:Sparmatozoa) জীবাণু যে কৌশলে একটা নানা ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মানুষ হইতে পারে, সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াই মানুষও নানাবিধ অভিনব শক্তি লাভ করিতে পারে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইচ্ছা প্রভৃতি ইহার উপাদান এই সকলের যথাবিহিত ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধন সিদ্ধি হয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল কেহ তাহা বুঝিতে ও তদ্বৎ কার্য্য করিতে চাহেন জানিতে পারিলে, তাঁহার আবশ্যকানুসারে আরও লিখা যাইতে পারে অন্যথা নিজে নিজে বসিয়া নিজের মনে কত কহা যায়! পন্থা-আফিসে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যাইবে। ইতি— শ্রীযোগানন্দ দাস।

"মাভৈঃ"

(১)

ওরে ভয় কেন তোর
চমক্ নদীর ঢেউ দেখে ?
যেথা নীল নীলিমায়—
ফুক্‌ছে জীবন শাঁক ফুঁকে ॥
দুলুক্ না সে রক্ত মুখে
গর্জ্জে উঠুক মৃত্যু পাকে
ঝলক্ দোলায় প্রলয় মেঘে
ঢেউয়ের পরে ঢেউ ঝোঁকে ;
ভাঙ্গুক্ না তোর পারের মাটী
ভয় কেন সে রং দেখে ?

(২)

আসে আসুক লক্ষ ঝাপট্
উতোল পাগল ঝাপ্‌ খেয়ে,
খেলে খেলুক্ এস্ত ঝিলিক
আগুন ভরা বাজ্‌ ছেয়ে ;
ঝাকে ঝাকে ধ্বংস ফেটে
রক্ত গোলা আসুক্ ছুটে ;
কুজ্ঝটিকার পিছিল টুটে
ছুটুক পিশাচ চোখ্ চেয়ে,
চমকা নদীর ভ্রূকুটীতে
দুলুক না সে দোল খেয়ে ॥

(৩)

তোর তরীতে ধরেছে হাল
চমক পারের দীপ্ নেয়ে,
সে যে তুফান দোলায় দুলে তরী
নিয়ে যাবে ঠিক বেয়ে ;

চেয়ে থাক্ তার চরণ পানে
ভরুক্ নদী ঝড়ের বাণে
হাহাকারের আস্ফালনে
ভয় কেন তার পদ ছুঁয়ে
কুহেলির যে পাকা নেয়ে
নিয়ে যাবে ঠিক বেয়ে ॥

(৪)

ভাঙ্গুক্ না তোর জীর্ণ তরী
ডুবুক্ বিষম ঘুর্‌পাকে,
অন্ধকারের হিংস্র নয়ন
গুমোট্ ব্যাথা দিক্ বুকে ॥
জীন পিশাচের নখর ধারে,
যাক্ নারে তোর বক্ষ ছিঁড়ে ;
মরণ-ভেরীর হুহুঙ্কারে
সকল গ্রন্থি যাক্ ফুঁকে,
নিক্ লুফে তোর সকল আশা
সারা বুকের দিব-সুখে ॥

(৫)

তুই শুধু থাক্ নিনিমিখে
জোড় করে তার মুখ পানে,
কণ্ঠে চেপে ব্যাকুলতায়
ভাঙ্গুক না সে বুকখানে ॥
দুলুক্ না প্রাণ কাঁপুক্ হিয়া,
ফাটুক্ বক্ষ উত্তেজিয়া ;
তুই সঁপে দে চরণে তার
বক্ষ খানি বুক-ছিনে ;
চরণ যদি মরণ আনে
আদরে তায় নে চিনে
মরণে তুই নে জিনে॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর চিন্তাশীল সুধীগণ এই নীতিশাস্ত্রকে তিনটী ভিত্তির উপর উপস্থাপিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমতঃ—সহজাত বা স্বাভাবিক জ্ঞানের উপর; দ্বিতীয়তঃ—হিতবাদের উপর; তৃতীয়তঃ—ধর্ম্মের উপর। এক্ষণে এই তিনটী বিষয় ক্রমান্বয়ে বিচার করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ—স্বাভাবিক জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করা যাউক। সদাচরণ, কর্ত্তব্য এবং অন্যায় আচরণ যে দূষণীয় ইহা মানবমাত্রেরই সহজাত জ্ঞান। প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে একজন অন্তর্যামী সাক্ষী বা চৈতন্য অবস্থান করেন, ইনিই বিবেক। এই বিবেকবাণীই মানবাত্মায় ঐশীবাণী। অনেকে তর্কের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে বিবেককেই নীতির ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ইহার পরিচালনে প্রত্যেক জাতি তাহার নব অভ্যুদয়ে নীতিমার্গের অনুসরণ করিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, বিবেক অতিশয় পরিবর্ত্তনীয় পদার্থ। ইহা বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ক্রমোন্নতির বিভিন্ন সোপানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব গ্রহণ করে। অভ্যস্থ অবস্থায় ইহার অনুসরণ সুফলপ্রসূ, কিন্তু নূতন বিষয়ে ইহার প্রয়োগ বিফল।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল ভয়ঙ্কর অহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই যে বিবেকজাতি প্রেরণের ফল, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যাহারা স্পেনীয় পাষণ্ড দমন বিচারালয় স্থাপনপূর্ব্বক বিরোধমতাবলম্বীদিগকে অত্যাচারে প্রপীড়িত ও জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করিত, তাহারাও তাহাদের বিবেকেরই অনুসরণ করিত। তাহারা এবম্প্রকারে মনুষ্যদিগকে নির্য্যাতিত করিয়া মনে করিত যে, এই উপায়ে ভগবানেরই সেবা করা হইতেছে;—চিকিৎসকের ন্যায় অস্ত্রোপচারে সমাজ-দেহের ধর্ম্মবিরোধরূপ অর্ব্বুদ দূরীকৃত হইতেছে—ঘাতকের অস্ত্রে সুন্দর সমাজ-শরীরের বৈকল্য সাধন হইতেছে না। জনৈক পিউরিসিয়ান্ বিবেকের দোহাই দিয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধাচরণের সমর্থন করিলে আঙ্গলিক আর্চ্চবিশপ (Anglican Archbishop) উত্তর করেন—"হয়ত তোমরা প্রকৃতই

বিবেকানুমোদিত কর্ম্ম করিতেছ, কিন্তু সাবধান! তোমাদের বিবেক যেন মূর্খের বিবেক না হয়।" বিশপের এই বাক্য শ্রুতিকটু হইলেও বস্তুতঃ সত্য। মানবের পক্ষে বিবেকানুমোদিত কর্ম্ম করাই সমীচীন; কিন্তু প্রত্যেকের বিবেকানুমোদিত কর্ম্মমাত্রই যে প্রকৃত, এরূপ অনুমোদন কোন প্রকারেই করা যাইতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্রে পদে পদে ভ্রমের ফল ভোগ করিয়া নবীন কর্ম্মীর বিবেকবুদ্ধি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে; সে বর্ত্তমানে অপরিণত বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় বিপদে পতিত হইয়াই ভবিষ্যতে সাবধান হইতে শিক্ষা করে। তাহার তরুণ বিবেক-প্রণোদিত অপকর্ম্ম হইতে যে দুঃখ দুর্দ্দশার উদ্ভব হয়, তাহাই তাহার পক্ষে জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশের সোপানরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কেন এখন হয়, আমরা এক্ষণে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কোনও সম্প্রদায়বিশেষের মতামত পর্য্যালোচনা দ্বারা তৎসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাধারণ মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কখন সমকালবর্ত্তী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুশাসনের সমকক্ষ হয় না, অপিচ তদপেক্ষা নিকৃষ্টই হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তি বিবেকবশে এমন অনেক কর্ম্ম করেন যে, কোনও মহানুভব চরিত্রবান্ ব্যক্তি হয় ত তাহার বিরুদ্ধে বলিলেন—"ইহা আমার বিবেকানুমোদিত কর্ম্ম নহে।" সাধারণ ব্যক্তির বিবেক উচ্চ চিন্তাশীল পূত-চরিত্র ঋষি কিংবা উন্নতমনা ব্যক্তিদিগের বিবেক অপেক্ষা বহু পরিমাণে নিকৃষ্ট। জনসাধারণের বিবেকানুসারে শাসন-বিধি রচিত; এবং ক্রমোন্নতির সোপানা-রোহী সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যে সকল কর্ম মন্দ বলিয়াছেন জনসাধারণের বিবেকপ্রসূত রাজবিধি সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

কিন্তু সংসারে এমন কতকগুলি পাপ ও দুষ্কর্ম্ম সাধিত হইতেছে, যাহা রাজবিধির দ্বারা শাস্তি দেওয়া যায় না। যে সকল অবৈধ উপায় অবলম্বনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সত্যহানি ও ইহার উন্নতির অন্তরায় হইতেছে, সেই সকল অপরাধের নিবারণকল্পে আইন বা বিধি দোষী ব্যক্তিগণকে কোনও প্রকারে শাস্তি দান করিতে পারে না। হুণ্ডির ব্যবসায়ে (Operations on stock exchanges) কতিপয় বুদ্ধিমান্ লোক ব্যতীত অধিকাংশ নির্ব্বোধ এবং অজ্ঞ ব্যক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। এবংবিধ ব্যবসা কতিপয় পরিবারে যে দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে, কোন দস্যু বা তস্কর তাহার শতাংশও করিতে পারে না; কিন্তু রাজবিধি ইহার দমনকল্পে অপারগ। সাধারণ নীতিবাদিগণ এরূপ

দস্যুতাকে ক্ষমা করে; শুধু তাহাই নহে, এরূপ দস্যুর মনস্তুষ্টি সাধনে প্রয়াসী হয়। অন্য দিকে এইরূপ ব্যবসার ফলে যে ব্যক্তি কুবের তুল্য হইয়াছে, সমাজ তাহার প্রতি প্রসন্ন; কিন্তু সকলেই সম্যকরূপে অবগত যে নীতিপথে এবং বৈধ উপায়ে এরূপ অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব। বিবেক যখন এরূপ ছন্দানুবর্ত্তনশীল, যখন অবস্থা ও পাত্রভেদে তাহার ভিন্নভাব লক্ষিত হয়, তখন বিবেকরূপ ভিত্তির উপর নীতির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

বিবেক কি? অতি হীনাবস্থ মানব ব্যতীত অন্য সকল মানবের মধ্যেই এই বিবেকের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। অভিজ্ঞতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিবেকেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। অতীত জীবনে বা অতীত জন্মে প্রত্যেক ব্যক্তিই অভিজ্ঞতার ফলে শিখিয়াছে যে কতকগুলি পন্থার অনুসরণে সুখ ও কতকগুলি পন্থার অনুসরণে দুঃখ। আমরা অতীত জন্মে যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাই ধীরে ধীরে একত্রীভূত হইয়া সংস্কাররূপে গঠিত হইয়াছে; এবং পরবর্ত্তী জন্মে আমরা সেই সংস্কারমূলক সহজ প্রেরণা লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকি। পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমরা দেখিতে পাই, এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সহিত অন্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সর্ব্বকালে তুল্য হয় না বলিয়া এক ব্যক্তির বিবেকের সহিত অন্য ব্যক্তির বিবেকের সর্ব্বথা ঐক্য দৃষ্ট হয় না। যেরূপ বিবর্ত্তনের একই স্তরস্থিত মানবসকলের অভিজ্ঞতার পরিমাণ স্থূলতঃ সমান, তদ্রূপ তুল্যাবস্থ ব্যক্তিবর্গের বিবেকও স্থূলতঃ তুল্যরূপ। জনসাধারণের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা মহাজনগণের অভিজ্ঞতা সমধিক বিচিত্রা, বিচারপূতা এবং বহুমার্গানুসারিণী; সেইরূপ তাঁহাদের বিবেকও অনন্যসাধারণ এবং বহু গুণে মার্জ্জিত। প্রচলিত নীতি বিষয়ে সাধারণের বিবেক এবং নীতিজ্ঞানই শেষ সীমা। কারণ সাধারণের বিবেকবুদ্ধি যে পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে, তাহারা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বা উন্নত তত্ত্ব কদাচ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা বিবেকের যে স্তরে উঠিয়াছে, আমরা তাহাদের নিকটে তাহারই উপযুক্ত নীতিজ্ঞান আশা করিতে পারি। একটী বেহালা যে সুরেই বাঁধা থাকে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর সুর প্রদানে সে যেরূপ অক্ষম, ইহারাও তদ্রূপ। জ্ঞানবৃদ্ধি, সভ্যতার উন্নতি ও জন্মাধিক্যে বিবেক উত্তরোত্তর মার্জ্জিত হয় ও প্রসার লাভ করে; এতদ্ব্যতীত উচ্চ ব্যক্তির সঙ্গলাভে ও সুশিক্ষায় ইহা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। অতএব বিবেকরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নীতিসৌধ প্রতিষ্ঠিত

হইতে পারে না; বিবেকের বহুকণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্নমতাবলীর সমন্বয়ে কোন স্থিরা উপদেশবাণী সমুত্থিত হইতে পারে না।

এক্ষণে আমরা হিতবাদের আলোচনা করিব। দেখা যাউক, ইহাই আমাদের প্রস্তাবিত ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে কি না। যে সম্প্রদায় হিতবাদকেই ভিত্তিরূপে নির্দ্দেশ করেন, তঁহাদের মূল সূত্র এই যে, যাহাতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ তাহাই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্যের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি, দার্শনিক এবং সমাজতত্ত্ববিৎ এই মতের পক্ষপাতী; তাঁহারা বলেন, লোকহিতই একমাত্র সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি। তাঁহাদের তর্কের বিষয় এই যে মানবের অভিজ্ঞতা পর্য্যবেক্ষণ ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিদর্শন ফলে কর্ত্তব্য নির্ণীত হইতে পারে। মানব যে আচরণের ফলে সংসারে সুখ প্রাপ্ত হয় তাহাই প্রকৃত কর্ত্তব্য; আর যে আচরণে দুঃখভোগ করে তাহাই অন্যায় বা অকর্ত্তব্য। উক্ত বাক্যের মধ্যে মহান্ সত্য নিহিত আছে; ন্যায় আচরণে পরিণামে সুখ এবং অন্যায় আচরণে পরিণামে দুঃখ। যে আচরণের ফলে বিশ্বজনীন সুখ লাভ হয়,—শুধু অধিক সংখ্যকের নহে,—তাহাই সন্মার্গ। কিন্তু মূল ও পরিণাম এক নহে; এবং যদিও হিতবাদিগণের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথ অনুসরণ করিলে পরিণাম সার্ব্বজনীন সুখে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, তথাপি এই সুখ এত দূরবর্ত্তী এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের আপাত ভাবী ফল অনুষ্ঠাতার পক্ষে প্রায়শঃ এত অসুখকর যে জনহিতের দোহাই কোন নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে বলিলে সাধারণে সে আদেশের বশবর্ত্তী হয় না, কেবল যে সকল অতি মহান্ স্বার্থলেশশূন্য, পুরুষ আপনিই আপনার নিয়ন্তা, কর্ত্তব্যপালন বিষয়ে যাঁহাদের কোন বহিঃপ্রেরণার আবশ্যক হয় না, তাঁহারাই এরূপ আপাতবিষম পরিণামমধুর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা ও বৈজ্ঞানিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ড (William Kingdon Clifford) অতি উদারচরিত ও পবিত্রচেতা পুরুষ; তিনি অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক নরনারীকেই পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ঋণ পরিশোধের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমরা যে অবস্থায় এবং যেরূপ সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি তাহা আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল নহে; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বহু মনীষীর অক্লান্ত অনুশীলনের ফলে বর্ত্তমান যুগের মস্তিষ্কের এ পরিপুষ্টি, বহু চিন্তাশীল রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিকের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় বর্ত্তমান সমাজের এ উন্নতি। বহু অক্লান্তকর্ম্মীর প্রাণপণ পরিশ্রমে আজিকার এ ঐশ্বর্য্য;—এ সমস্তই আমরা আমাদিগের

পূর্ব্ববর্ত্তিগণের দানস্বরূপ পাইয়াছি। সুতরাং এ গুলির উন্নতি এবং অধিকতর পরিপুষ্টি বিধান করিয়া আমাদিগের পরবর্ত্তিগণকে দান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তিনি বলেন, আমাদের কি শিক্ষা, কি রক্ষা, কি ভরণপোষণ, কি সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাবিধান—সর্ব্ববিষয়েই পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নিকট ঋণী। যখন আমরা অতীতের সঞ্চিত সম্পদ্ হইতেই এ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি, তখন আমাদের জীবনব্যাপী প্রযত্নের ফল ও অতীতের সেই সুবিশাল ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরবর্ত্তিগণকে অধিকতর ঐশ্বর্য্য প্রদান করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি ভবিষ্যতের জন্য কার্য্য না করেন, যিনি অতীতের ঋণ পরিশোধে প্রযত্নপর না হয়েন, তিনি অতীতের অত্যুজ্জ্বল সম্পদের অতি অযোগ্য উত্তরাধিকারী। এই ওজস্বিনী বাণী উদারচরিত মহাত্মগণের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবুদ্ধ করে; কিন্তু আমাদের সমকালবর্ত্তী জনসাধারণের হৃদয়ে অতি ক্ষীণ কল্পনাও উত্থাপিত করে না। এই বিষয় সম্বন্ধে একদা চার্লস্ ব্রাড্‌ল (Charles Bradlaugh) হৃদয়োন্মাদিনী ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমার মনে আছে। "পরকালে অনন্ত সুখ বা এতদ্রূপ কোন ব্যক্তিগত পুরস্কারের প্রলোভন ব্যতীত মানব কখনও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না—এই কথার উত্তরে তিনি বলেন, মনুষ্যকে মহৎকর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে ব্যক্তিগত সুখের প্রলোভনের আবশ্যকতা আদৌ নাই। সত্যের সুরক্ষিত দুর্গে আমার প্রবেশলাভ দুর্ঘট হইতে পারে, কিন্তু আমার চেষ্টার ফলে যদি বিশ্বমানবের পক্ষে উহা কিঞ্চিন্মাত্র সুগম হয়, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট; আমার দেহ-দুর্গ পরিখায় পতিত হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার ফলে আমার অনুবর্ত্তিগণ সহজে পরিখা পার হইয়া জয়শ্রী করগত করিতে পারে, তবেই আমি সন্তুষ্ট।"

কি মহীয়ান্ মনোভাব যে মহাপুরুষ আপনার স্বার্থসুখ তুচ্ছ করিয়া কেবল তাঁহার অনুবর্ত্তী মানবমণ্ডলী সুখের পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

আনন্দময়ের আরতি।

গান—"কেরে হৃদয়ে জাগে শান্তশীতল রাগে"—সুর।

——:•:——

আয় সবে দলে দলে, হরষ কুতূহলে
মধুর কলরোলে বিভুগুণ করি গান।
নিত্য যাহার তরে, বিশ্ব চরাচরে
সুমিলিত সুস্বরে, উঠে ললিত তান॥
হাসিতেছে দশদিশি, গ্রহতারা দিবানিশি
হাসে কুসুমরাশি মাতায়ে মানব প্রাণ।
সে সঙ্গীত পিছু হায়, ভূধর সাগর ধায়
অসীম গগন গায় করি দূরে অবস্থান॥
আনন্দে উথলিয়া, প্রতি রেণু কাঁপাইয়া
চলে ধরা নাচিয়া সুনিয়ত তাল মান।
যে গানে মাতিল মহী, আমরা বিমুখ রহি,
কেন দুখজ্বালা সহি বৃথা করি অভিমান॥
হে বিভু, হে ভগবান্, তোমার বিভূতি গান
গাহি স'পি' মনপ্রাণ, প্রেমসুধা করি পান।
সাধন শকতি দাও, কৃপা আঁখি কোণে চাও,
দীন ভকতে কর স্নেহবারিকণা দান॥
তোমার আরতি শাঁক, বিশ্ব বাজায়ে যা'ক্
শ্রবণে লাগিয়া থাক্ জাগাইয়া তনু খান।
জড় দেহদ্বার খুলি! এস প্রভু নিরিবিলি,
মরমে মরমে মিলি, কর সদা অধিষ্ঠান॥

শ্রীশশধর মৈত্র বি, এ,

আবাহন ।

—:০:—

এস গো এস এস, মরত মরুতে এস
পাপতাপ শোক নাশ, অসুর-দলনি, বলদাত্রি !
এস শক্তি, এস ভক্তি, এস মুক্তি
এস প্রীতি বিধায়িনী, ধাত্রি !

এস বরিষা প্লাবিত রঙ্গে, এস দুস্তর বিপদ্ তরঙ্গে
এস অনশন ক্লিষ্টে, আশ্রয় শূন্যে,
দুর্গতে পতিতে রাখিতে মা—
(এস) দুর্গে দুখহরা, দুর্গতি নাশ করা
অন্নদায়িনী জগদ্ধাত্রি ।

এস, হিংসা প্রপীড়িত, যুদ্ধ—বিধ্বস্ত
আর্ত্তি প্রপূরিত পশ্চিম জগত
(সেথা) শুধু শোক দৈন্য, কোটি কোটি সৈন্য,
কালের গরাসে পড়িছে মা—
এস মশানের শান্তা, এস হর—কান্তা
শান্তি বিতর ক্ষমা-ধাত্রি ।

ব্যবসা অবনত, ব্যাহত শিল্প
কত নরনারী হত মৃত কল্প
আধি ব্যাধি ক্লিষ্টে, চাহ কৃপা দৃষ্টে
কাতরে করুণা কর্গো মা—
এস সুধাধার নিয়ে, স্নেহধারা বরষিয়ে
রাখ ধরা বরাভয় দাত্রি ।

শ্রীশশধর মৈত্র বি, এ ।

আমি।

স্বপনে দেখিনু যেন
খুলে গেছে জ্ঞানের কপাট,
দূর ব্যোম পথে বসি
হেরিতেছি ব্রহ্মাণ্ড বিরাট্।
একটী মুহূর্ত্ত মাত্র
শূন্যে যেন বসিয়া একেলা,
সবিস্ময়ে হেরিতেছি
ব্রহ্মাণ্ডের প্রহেলিকা খেলা।
রবি, শশী, গ্রহ, তারা,
ছুটিতেছে, পাইতেছে লয়,
নব সৃষ্ট হইতেছে
পুনঃ তারা হতেছে বিলয়।
সাগর শুকায়ে গিয়া
হইতেছে গিরি মনোহর,
পুনঃ তাহা আচম্বিতে
হইতেছে মহান্ সাগর।
স্থাবর জঙ্গম কত
জন্মিতেছে হইতেছে লীন,
ধ্বংস-গর্ভ হতে পুনঃ
লভিতেছে জীবন নবীন।
আসিতেছে যাইতেছে
কত ঋতু কত বর্ষ মাস,
মৃত্যুর সমাধি হতে
জাগিতেছে ফেলিয়া নিশ্বাস।
আমার দৃষ্টির পথে
শিশু যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ আঁকা,

ঘুরিতেছে দ্রুতগতি
একখানি ক্ষুদ্র যবনিকা।
অঙ্কিত সে চিত্র পটে
শিশুর ক্রন্দন আর খেলা,
যুবকের হাসি প্রেম
প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের যত লীলা।
নরে নরে করিতেছে
মারামারি আর কাটাকাটি,
নিমেষে তাঁহার মাঝে
প্রেমশান্তি উঠিতেছে ফুটি।
হরণ করিছে কেহ,
জীবন নিতেছে কোন জন,
হাসিতে হাসিতে কেহ,
মরণেরে করিছে বরণ।
হঠাৎ উঠিল কোথা
অভ্রভেদী একটী প্রাসাদ,
নৃত্য, বাদ্য, হাসি গান,
চলিতেছে, নাহি অবসাদ
পলকে পাইল লয়
সৌধ চূড়া হ'ল ভূমিসাৎ,
হাসির দুয়ারে শুনি
বিলাপের দারুণ আঘাত।
হাসি যেন হাসি নয়
বিষাদের পূর্ণ পরকাশ,
বিষাদ, বিষাদ নয়,
আনন্দের যেন পূর্ব্বাভাষ।
শিশু যেন শিশু নয়,
বার্দ্ধক্যের নাম মাত্র ভেদ,
বৃদ্ধ যেন বৃদ্ধ নয়,
শৈশবের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ।

কোথাও নূতন সৃষ্টি,
ঘটিতেছে কোথাও প্রলয়,
সৃষ্টি লয়, লয় সৃষ্টি
চলিতেছে সারা বিশ্বময়।
অসাড় মরণ কোথা
এ ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় ত নাই,
অনাদি জীবন্ত মৃত্যু
অমৃত ছড়ায় সব ঠাঁই।
যে উদক যে সময়ে
ভীষ্মদেব করিলেন পান,
যে সলিলে আর্য্য ঋষি
করিতেন তর্পণ সিনান।
কোথা সে গঙ্গার বারি
কোথা গেল গতি সে গঙ্গার,
নব বারি, নব গতি
তবু গঙ্গা, কিছু নহে আর।
সেইরূপ এই বিশ্ব
পলে পলে, নূতন নূতন,
অথচ প্রশান্ত ধীর
আদিহীন নিত্য পুরাতন।
আমা পানে চেয়ে দেখি
পলে পলে নব নব বেশে,
বিকসিত হইতেছি
একই আমি নিমেষে নিমেষে।
আমি শত্রু আমি মিত্র হই
আমি ভ্রাতা আবার ভগিনী।
আমি পুত্র আমি কন্যা আর
আমি পত্নী জনক জননী
ভূলোক দ্যুলোক আমি
আমি স্বর্গ, আমি নিরয়,

আমি যে বিরাট্ আমি
আমি ব্যপ্ত চরাচর ময়।

নির্ঝরিণী

"God is some and one what vays you follow, you stick to is and c can gt saluation."

"একো ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি"

অতি মনোরম স্থান। চারিদিকে অরণ্যময় প্রদেশ। বৃক্ষের ঘনপত্রাবলীর মধ্য দিয়া কোথাও কোথাও দুই একটি সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতেছে, কোথাও আর আলো নাই। সংসার অতি মনোরম স্থান। চারিদিক কাম ক্রোধ লোভ হিংসা মদ মাৎসর্য্যরূপ বৃক্ষাবলীতে সমাচ্ছন্ন, কোথাও একটু পরার্থপরতার—স্বার্থহীনতার আলো নাই। চারিদিক নিবিড় ঘন অধর্ম্মাচরণে আবৃত। এখানে দিবসেও যেন তামসাময়ী রজনী। নিকটে এক পাহাড় উঠিয়াছে, তাহা অসীম অনন্ত স্থির নিস্পন্দ। জনমানবের চিহ্ন নাই; সব নীরব; সবই মনোরম বিহঙ্গমের কলকণ্ঠ ও বৃক্ষপত্রের মধুময় মর্ম্মর শব্দ। মধ্যে মধ্যে সেই গভীর নিস্তব্ধতাভঙ্গ করিয়া এক একটি মধুরধ্বনি শোনা যায়, সেটা নির্ঝরিণীর কলগীতি। পর্ব্বতগাত্র হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া স্রোত বহিতেছে—সেই বহুমুখী স্রোত একমুখী হইয়া নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। নির্ঝরিণীর বহুমুখী স্রোতোরূপী নানাবিধ ধর্ম্মপ্রবাহ এই সংসারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সনাতন ধর্ম্মগুলি বিধ্বস্ত করিয়া "সেই পথ" ধরিয়া চলিতেছে। পর্ব্বত কিন্তু এক, ব্রহ্মাও সেই এক। "godis one"

আমি একদিন দৈবাৎ সেই নির্ঝরিণীর উৎপত্তিস্থানে উপস্থিত হইলাম, একমনে চলিতে চলিতে শীতল শিলাতল দেখিতে পাইয়া বসিলাম। দেখিলাম বহুমুখী স্রোত হইয়া উন্মাদগতিতে চলিতেছে। আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। পর্ব্বত হইতে নামিয়া নির্ঝরিণীর স্রোত ধরিয়া চলিলাম। স্রোত বেশ আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে। বহুদূর যাইবার পর নদী বহুমুখী হইয়া বহিয়া চলিল। আমিও বহু বাধাবিঘ্ন ক্লেশ প্রভৃতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে সমুদ্রতীরে পৌঁছিলাম। কি অনির্ব্বচনীয় স্থান! কি অদ্বৈত মত এইস্থানে বিরাজিত!! এইস্থানে হিংসা দ্বেষ শূন্য সদা শান্তি স্বর্ণময় সিংহাসনে অধিষ্ঠান।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের তীব্রালোকে সেই নির্ঝরিণীর জল বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। চারিদিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া সেই পর্ব্বত শৈত্যসংস্পর্শে আবার বহুমুখী স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। "যে ভাবে ভজ মন অনিত্য নিরথ নয়ন।" স্রোতের ন্যায় নানা ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া মানব সেই অনিত্য ধ্যানে মত্ত থাকিলে অনিত্য পরম পুরুষকে পাইয়া থাকে। আবার যেমন সূর্য্যালোকে জল বাষ্প হইয়াছিল তেমনই মানব সেই অনিত্য হইতে আবার পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া সংসারের আবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে। ইহাই মানবের স্রোতোমুখী জীবন। সংসার-নদীরূপী প্রবাহ।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

সতী।

সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ॥

অভ্রভেদী হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গসমূহপরিবৃত কৈলাসগিরি জগতে অতুল শোভা ও শান্তির আবাসস্থল চতুর্দ্দিক অত্যুচ্চ পর্ব্বত প্রাচীরে বেষ্টিত থাকাতে দুঃখদ তুষার-পাত ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে অক্ষম। সুতরাং ইহার কানন-শোভা সর্ব্বদাই নব-বসন্ত লিঙ্গিত কুঞ্জকাননের ন্যায় সুপ্রসন্ন। ফলতঃ কৈলাস ভূধর শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুসমূহের প্রবল আক্রমণ হইতে নিয়ত মুক্ত থাকাতে তপঃ পরায়ণ মুনিঋষিগণ ইহার চিরহরিৎ দেবদারু-কানন-খচিত উপত্যকাসমূহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। সকল ঋতুর পুষ্পফলশোভিত মন্দাকিনীর কূলভূমিতে স্বচ্ছন্দ-বিহারী দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, চারণগণ নিয়ত বিহার করিতেছে। স্থৈর্য্যের গাম্ভীর্য্যে ও কানন-ভূমির প্রশান্ত শোভা-সম্পদে গিরিরাজ সমাধিমগ্ন যোগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। বাহিরের শোভা-সম্পদে যেন তাঁহার অন্তর্নিহিত আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে। স্বচ্ছন্দে বনবিহগগণের কাকলি ও সিদ্ধঋষিগণের জগৎপাবন বেদমন্ত্রের সহিত সুরধুনীর নির্ঝর কল্লোল ও কিন্নরগণের মৃদঙ্গমুরলীধ্বনিসম্বলিত সুমধুর সঙ্গীতরব মিলিত হইয়া প্রণব-ঝঙ্কারের ন্যায় কি এক অব্যক্ত আনন্দময় মধুর ধ্বনিতে দিক্ সকল স্পন্দিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই আনন্দপূর্ণ শ্রুতিসুখদ

শব্দমাধুর্য্যে মন্দাকিনী-শীকরস্নাত দেবদারুবনবিকম্পি স্নিগ্ধ মন্দমারুত-প্রবাহের উন্মাদক স্পর্শে ধূর্জ্জটীর জটান্তপ্রবাহিনী সুরতরঙ্গিণীর সুধাস্নিগ্ধ সলিলরসে ও যুগপৎ সেবাপরায়ণ সর্ব্ব ঋতুর উজ্জ্বল কুসুমরাজির বর্ণ-সৌন্দর্য্যে ও সুস্নিগ্ধ ঘ্রাণমাধুর্য্যে গিরিবর যেন বিধাতার মনোময়ীমূর্ত্তির সাকার প্রতিমার শোভা ধারণ করিয়াছে। পরন্তু যাহার তুঙ্গশৃঙ্গান্তবিস্তৃত বিদূরভূমিতে জগতের পরা জননী মূর্ত্তিমতি হইয়া দক্ষদুহিতা সতীরূপে বিশ্বাত্মা শিবের সহিত স্থূলদেহ ধারণ করত সংসারের আদর্শ দম্পতিরূপে বিহার করিতেছেন, অপ্রাকৃত পরম পিতা মাতা জীবানুকম্পাবশতঃ যেখানে প্রাকৃত সংসারীর ন্যায় বাস করিতেছেন, তাহার শোভাসম্পদ ঐশ্বর্য্য গাম্ভীর্য্য যে বর্ণনাতীত ও পরম মহিমান্বিত হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? যে সদানন্দভবনে কখনও নিরানন্দের ছায়াপাত হয় না, যেখানে হিংস্রক প্রাণিগণের হৃদয়েও স্বভাবসিদ্ধ হিংসার স্থলে প্রীতি পরিলক্ষিত হয়, যাহার শান্তিপূর্ণ সত্যের মহিমামণ্ডিত ভূমিকায় অসত্যের ছায়াপাত একান্ত অসম্ভব, তাহার মহিমা একাগ্রমানসে যে ধ্যানপরায়ণ ভাবুক কবির হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইলেও বাক্যে তাহা পরিস্ফুট করা যায় না।

নিরন্তর আত্মতৃপ্ত শিব সতীর দাম্পত্যমিলনের দৃষ্টান্তস্থলও শিব-সতীই। নিরবচ্ছিন্ন প্রেমপরিতৃপ্তহৃদয়ে সতী পরমদেবতা মহাদেবের সেবায় আত্মবিস্মৃতা। সর্ব্বদেবের অধীশ্বর আশুতোষ নিস্পৃহ, শ্মশানবাসী। সন্ন্যাসের আদর্শমূর্ত্তি শঙ্কর সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও জগতে যাহা কিছু ভোগ্য ও স্পৃহণীয় আছে সমস্তই সর্ব্বভূতের ভোগের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন। জীবগণ মরণের ভয়ে নিয়ত শঙ্কিত, তাই সর্ব্বমঙ্গলালয় শঙ্কর মরণের লীলাভূমি শ্মশানভবনে থাকিয়া সর্ব্বজীবের অভয়দান করিতেছেন। দক্ষরাজনন্দিনী সতী শিবের আনন্দে আনন্দিতা। শিবের যাহা প্রিয় তাঁহারও তাহাই প্রিয়। তাই সেই রাজনন্দিনী শ্মশানবাসিনী। জগতের ধনাধীশ্বর কুবের তাহার সর্ব্বস্ব দান করত তাঁহাদিগের সেবাপ্রার্থী হইলেও, এক দিনের জন্যও তাঁহারা তাহার ধন গ্রহণের স্পৃহা করেন নাই। ভক্তের বাঞ্ছা পূরণের জন্য ভক্তবৎসলা সতী কখনও কখনও কেবলমাত্র অনায়াসলভ্য রক্তজবাকুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিতেন; ভক্তদত্ত করবীর, অপরাজিতা, বা তদ্বৎ কোনও সহজলভ্য কুসুমহার পরিধান করত সেবকের সাধ পূর্ণ করিতেন। অপরাপর দেবদেবীগণ নানাবিধ আভরণে বিভূষিত ও অলৌকিক সম্পদের অধিপতি হইয়াও শিব-সতীর নিরাভরণ-সৌন্দর্য্য ও মহিমার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নিঃস্বতার নিকট অবনত

থাকিতেন। বিশ্বস্রষ্টাগণের অধিনায়ক বিশ্বকর্ম্মা বিনিদ্র হইয়া যাঁহার সেবায় রত, সেই বিশ্বনাথ কখনও নিজের ব্যবহারের জন্য তাহার বিনির্ম্মিত কোনও পুরী গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাঁহার ভক্তদিগের জন্যই সেই সকল উৎকৃষ্ট পুরীতে নিবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলতঃ সেই আনন্দময়ের রাজ্যের সকল বিধানই জাগতিক ব্যবস্থা বিধানের বিপরীত। সেখানে মৃত্যুই অমৃতের রূপ ধারণ করে; সেখানে 'আমিব' অর্থ 'পর', 'ভোগের' অর্থ 'ত্যাগ'।

শিবের অনুচর নন্দী তাঁহার আনন্দের মূর্ত্তিমান্ প্রতিকৃতির ন্যায় নিয়ত তাঁহাদের সেবায় রত, আর ভৃঙ্গী ভূতগণের সহিত নানাবিধ ক্রিড়া-কৌতুকের মধ্যে শিবের আনন্দামৃতরূপ সিদ্ধি বিতরণে তৎপর। দেবীর সহচরী জয়া ও বিজয়া ভবের গৃহস্থালীতে ব্যাপৃত গৃহহীন-শ্মশান-বাসী শঙ্করের গৃহ না থাকিলেও তাঁহার গৃহস্থালীর অভাব নাই। সেই গৃহস্থালীর অভাব নাই বলিয়াই তিনি 'ভব' নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ জগতের সর্ব্ব গৃহই আত্মপরবোধবিহীন শঙ্করের নিজগৃহ। জীবানুকম্পাপরায়ণা সতীর প্রধান কার্য্য সর্ব্বভূতের মঙ্গলসাধন। এই ব্যাপারে জয়া বিজয়া ও নন্দী ভৃঙ্গী তাঁহার সহায় আর দেবাদিদেব তাঁহার উপদেষ্টা গুরু। তাই যখনই যাঁহার ভাগ্যে শিব-সতীর যুগল মূর্ত্তির দর্শন ঘটিয়াছে তখনই তাঁহারা তাঁহাদিগকে বিল্ব-মূলে উপবিষ্ট দেখিয়াছেন। শিবসন্নিধানে সতী শিষ্যার ন্যায় উপাসীনা আর জগদ্গুরু তাঁহার নিকট সরহস্য তত্ত্বসকল বিবৃত করিতেছেন। সংসার-সুখক্লেশহীন শিবের সংসার এইরূপে নির্ব্বাহ হইতেছিল। এই সংসারে বাসনা ভোগের অভাব থাকিলেও আনন্দবিলাসের অভাব কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত না।

(২)

কৈলাসের কুসুমবিভূষিত কাননের উপকণ্ঠে বসিয়া যখন বিশ্বপ্রকৃতি কুসুমকলিকাগুলিকে ফুটাইতে ছিলেন ও স্ফুটনোন্মুখ পিয়াল-দ্রুম-মঞ্জরীর অঞ্জলিসম্ভারে ঋতুপতির অর্চ্চনার আয়োজন করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে চকিতের ন্যায় বিরল-সূক্ষ্ম জলদাম্বরের অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া অনুরাগস্নিগ্ধ অরুণ নয়নে কি-যেন-কাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর হাসির ছটায় জগৎকে সুহাসপ্রসন্ন করিতেছিলেন, তখন একদা দেবদারুদ্রুমদলশোভিত কৈলাস-উপত্যকায় যদৃচ্ছাপদচারণপরায়ণা সতী গগনপথে জ্যোতিষ্মান্ দৈববিমানাবলী অবলোকন করত কৌতূহলবশে তাহাদিগের গতি বিধি লক্ষ্য করিতে লাগি-

লেন। তিনি সেই বিমান-বিহারী দেবতা-গন্ধর্ব্ব-চারণগণের প্রমুখাৎ স্বীয় জনকের অদ্ভুত বার্হস্পত্য যজ্ঞের বার্ত্তা অবগত হইলেন। কিন্তু পিতৃযজ্ঞে তাঁহাদিগের আমন্ত্রণ না হওয়াতে স্বীয় জনককর্তৃক অনাদৃতা বিবেচনায় কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণা ও বিমনা হইয়া শিবসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবি, যিনি সদানন্দের আনন্দদায়িনী, শ্মশানবাসীর একমাত্র অবলম্বন, আজ তাঁহাকে এত বিমনা দেখিতেছি কেন?" শঙ্করের প্রীতি-মধুর-সম্ভাষণ-তৃপ্তা সতী পতিচরণে তাঁহার ঔদাস্যের কারণ নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে দেবাদিদেব ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন—"দেবি, বিশ্বসৃগ্‌যজ্ঞে সমাগত সমগ্র দেবতা ও ঋষিগণ যথোচিত সামাজিক বিধানে দক্ষ প্রজাপতিকে অভিবাদন করিলেন, কেবল আমি ও চতুরানন তাঁহাকে তথাবিধ অভিবাদন করি নাই। স্থূলতঃ তিনি তোমার পিতা ও আমার শ্বশুর স্বরূপে মাননীয় হইলেও আমি যখন আমার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকি—বিশেষতঃ যজ্ঞভূমিতে—আমার আর কেহ পূজনীয় নাই। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমার তথাবিধ অভিনন্দন প্রাপ্ত না হইয়া—জামাতা বোধে আমার প্রতি অতিশয় রোষপরবশ হইয়াছিলেন, এবং সভামধ্যে আমার বহু নিন্দাবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই পরন্তু দেখিতেছি তিনি এই শিবহীন বার্হস্পত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই যজ্ঞে শিবের আহ্বান তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু দেবি, আমি সর্ব্বসহ যজ্ঞভাগ গ্রহণ না করিলে কোন যজ্ঞই সুসম্পন্ন হইতে পারে না বরং তাহা সকলের অমঙ্গলজনক ও অমেধ্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যথাবিধি আহূত না হইলে আমিও তথায় গমন করিতে পারি না। কারণ তাহা হইলে এই যজ্ঞের বিধানক্রমে হোতার দেহ-পাত অবশ্যম্ভাবী।"

"প্রিয়ে, তুমি দক্ষরাজতনয়া হইলেও আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী সুতরাং তোমার গমনও আমার গমনেরই তুল্য। অতএব যে স্থলে তোমার গমন তোমার জনকের অকল্যাণকর সেই ক্ষেত্রে গমনের ইচ্ছা পোষণ না করাই কর্ত্তব্য।"

শিবসীমন্তিনী সতী দেবাদিদেবের বচনে পরিতুষ্ট হইলেন ও শান্তিলাভ করিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে জনকের প্রতি বিতশ্রদ্ধার সহিত জীবের অমঙ্গলাশঙ্কার একটী ক্ষীণ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তাঁহার সম্যক্ প্রসন্নতা লাভের অন্তরায় ঘটিতেছে দেখিয়া তদীয় মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মহাদেব কহিলেন—

"দেবি বিশ্বব্যাপারে কালই সকলের নিয়ন্তা। কালে যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে সেই জন্য ব্যথিত হওয়াই মোহের লক্ষণ।" দেবী মহাদেবের এই সারগর্ভ উপদেশবাক্য শ্রবণে প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

এদিকে শিবরহিত বার্হস্পত্যযজ্ঞে দক্ষের অভিমানবশতঃ কুফলের উদ্ভব ও তজ্জনিত জগতের ক্লেশ আশঙ্কায় ঋষিগণ ও বিশ্বসৃক্‌ দেবগণ সমবেত হইয়া শিবের আগমন আকাঙ্ক্ষায় দেবর্ষি নারদকে দূতস্বরূপে কৈলাসে প্রেরণ করিলেন। কারণ শিবাগমন ব্যতিরেকে দক্ষের দেহ পতন হইবে না ও তাঁহার এই দেহ পতন ব্যতিরেকে মোহান্ধতাও দূরীভূত হইবে না; অপিচ পরম অহঙ্কারতত্ত্বরূপী শিব সর্ব্বভূতের সহিত মিলিত হইয়া যথাযোগ্য যজ্ঞভাগ গ্রহণ না করিলে সৃষ্টিও সুরক্ষিত হইতে পারিতেছে না। অথচ আনন্দস্বরূপিণী পরাপ্রকৃতি সতীরূপিণী মূল বিদ্যার সঙ্গ বিচ্যুত না হইলে সেই আত্মতৃপ্ত সদানন্দ কখনও সর্ব্বের সহিত মিলিত হইবেন না। মহর্ষিগণ ঈদৃশ বিচার করত দাক্ষায়ণীকে পিত্রালয়ে আনয়নের উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইলেন।

দ্বন্দ্বপ্রিয় কামচারী দেবর্ষি নারদ বিশ্বস্রষ্টা ও মহর্ষিগণের মুখপাত্রস্বরূপ দূতরূপে কৈলাসভবনে উপনীত হইলেন। তথায় ভব-ভবানীর দ্বন্দ্বরূপ বিলোকন করত তাঁহাদিগের যুগলরূপের স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের স্বরূপ বর্ণনই তাঁহাদের স্তুতি। দেবর্ষি পুলকপূরিতহৃদয়ে সুমধুর বীণা বাদন-পূর্ব্বক গাহিতে লাগিলেন।

মহর্ষির স্তুতিগাথা শ্রবণে ভবানী-মহেশ পরিতুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে যথা-যোগ্য আসনে উপবেশনের অনুমতি প্রদান করিলেন। দেবর্ষি সুখাসীন হইলে মহেশ্বর তদীয় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নারদ বিশ্বস্রষ্টাগণের অভিলাষ ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করত কহিলেন—হে মহাত্মন্, হে শম্ভো! আপনি সতীবিরহিত না হইলে সংসারে জীবসৃষ্টি হইতে পারিতেছে না। জীবগণ ভবদীয় শিবতম অহং ভাবের সত্তাতে স্থির হইতে না পারিলে জীব সৃষ্ট হইয়াও স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছে না। জগজ্জননী সতীরূপে আপনাতে উপরতা আছেন সুতরাং সর্ব্বভূত তাঁহার অনুকম্পার অভাবে অস্থির হইয়াছে। অতএব আপনাকে সর্ব্বভূতহিতার্থে এই শিবরহিত দক্ষযজ্ঞে সতীকে ত্যাগ করিতে হইতেছে। মা দাক্ষায়ণি, তোমারও এই লীলা সম্বরণের উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত। অতএব জগদম্বে! তুমি তোমার এই সতীরূপ বিসর্জ্জন

করত জগজ্জননীরূপে পুনরায় আবির্ভূতা হও। তুমি এই অশিব-যজ্ঞে আত্মাহুতি দান না করিলে ইহা শিবযুক্ত হইতে পারিতেছে না, জীবকুল সুস্থির হইতেছে না; জীবসমূহ বাতাহত তরণীর ন্যায় কালসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

সতী। দেবর্ষি তুমি সাধু। দেবাদিদেবপ্রমুখাৎ বিশ্বসৃক্‌যজ্ঞে দক্ষকর্ত্তৃক শিবনিন্দা বিবরণ শ্রবণে আমি সাতিশয় বিমনা হইয়াছি। এক্ষণে এই দাক্ষায়ণী কলেবর আমার অতিশয় নিন্দনীয় বোধ হইতেছে। শিবদ্রোহী হইতে সমুদ্ভূত এই কলেবর বহন করিতে আমি অতিশয় কলঙ্কানুভব করিতেছি। সেই নিন্দুকের রচিত এই অশুচি দেহ তাহারই অশিবযজ্ঞে আহুতিদানের যোগ্য বোধ হইতেছে। এক্ষণে মহেশ্বরের অনুমতি হইলেই আমি দক্ষালয়ে গমনপূর্ব্বক এই দেহভার বর্জ্জন করত শুচি হইতে পারি।

শিব। দেবি, তুমি চিরশুচি। তোমার সংসর্গে আমি পরমানন্দে নিত্য তৃপ্ত আছি। আমার নিন্দা করিতে পারে দক্ষের এমন কি ক্ষমতা আছে? তুমি কি জাননা যে কিছুতেই আমার নিন্দা বা স্তুতি হয় না। অনুজীবিগণ উত্তমের নিন্দাবাদ দ্বারা নিজেরাই নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তাহাদের নিন্দাবাদ উচ্চকে স্পর্শ করে না, বরঞ্চ তাহারাই নিন্দুক বলিয়া জনসমাজে আখ্যাত হয়। বিশেষতঃ আমি যখন সর্ব্ব-বিমুখ হইয়া তোমাকে অবলম্বন করত নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দে অবস্থিত থাকি, নিন্দা বা স্তুতি তখন আমা হইতে অতি দূরে পড়িয়া থাকে। আমাদিগের কাহারও দক্ষালয়ে গমন যে দক্ষের সমূহ সঙ্কটের কারণ তাহা কি তুমি একেবারে বিস্মৃত হইলে?

সতী। না প্রভো; আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই। দক্ষপ্রজাপতি আমার জনক ও অতিশয় প্রিয় বলিয়াইত তাঁহার এই মোহান্ধতা দর্শনে আমি সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তাঁহার এই শিবদ্বেষী দেহবুদ্ধির বিনাশ যেমন তাঁহার পক্ষে তেমনই জগতের পক্ষেও মঙ্গলকর। পরন্তু আমি আপনার অর্দ্ধাঙ্গসঙ্গলাভে যে আনন্দে আপনার সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছি এই তুচ্ছ দেহের নাশে তাহা কখনই বিকৃত হইতে পারে না। হে অধিকারী মহাত্মন, আপনার দেহ স্থূলবৎ প্রতীয়মান হইলেও ইহা মায়াগন্ধবিহীন নিত্য ও শুদ্ধ। আপনি চিরস্থবির ও চিরযুবক। পক্ষান্তরে মায়াই আমার দেহ। এই ক্ষণভঙ্গুর মায়াময় দেহ জীর্ণ বা অশুচি বহির্ব্বাস সদৃশ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। হে অদেহি ঈশান, আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে এই মায়াময় তনুত্যাগ আমার আয়ত্ত নহে, সুতরাং আপনি আমাকে দক্ষালয়ে গমনপূর্ব্বক এই দেহ ত্যাগের অনুমতি করুন।

নিত্যশুদ্ধ নির্ম্মল শশাঙ্কশেখর, সতীর শুদ্ধ প্রীতিতে নিরন্তর অভিনিবিষ্ট থাকিলেও তদীয় স্থূল দাক্ষায়ণী কলেবরসঙ্গ ত্যাগে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পরন্তু যাহা ত্যাজ্য তাহা পরিত্যাগ করা বিহিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পিত্রালয়ে গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

চন্দ্রচূড়ভামিনী দাক্ষায়ণী পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। শঙ্কর-প্রীতির অভিমান ব্যতিরেকে মণিকাঞ্চনাদি অন্য কোনও আভরণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গসঙ্গলাভ করিতে পারে নাই। শিবের প্রীতি রক্তবসনরূপে তাঁহার দেহ আবরণ করিয়াছিল। ভক্তবৎসলা ভবানী কুবেরপত্নীর দত্ত অম্লান জবাকুসুমহার কণ্ঠে ধারণ করিতে কোনও আপত্তি করেন নাই। মূর্ত্তিমান্ চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপী বৃষ যে শঙ্করকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে, আজ সতীকে পৃষ্ঠে ধারণ করত তাহার সেই আনন্দপুলক প্রবাহরূপে পয়ঃপথে নিঃসৃত হইতে থাকিলেও শিবদ্বেষী দক্ষভবনাভিমুখে গমন-জনিত মন্থর পাদক্ষেপ, করুণ দীন দৃষ্টি ও অনাগত বিরহকাতর দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহা শোকাশ্রুর আকার ধারণ করিল। সহচরী জয়া বিজয়া বিষাদশীতল প্রশান্ত বদনে তাঁহার অনুগমন করিলেন। শিবের নিরাতঙ্ক আনন্দ নন্দীরূপে দক্ষালয় পর্য্যন্ত সতীর অনুগমন করিল। সতীবিরহিত কৈলাসভবন গতচৈতন্য দেহের ন্যায় ভৃঙ্গী-ভূত-সনাথ শিবের সহিত বিষাদকালিমাবৃত তুষারশীতলবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

(৪)

যজ্ঞ-কোলাহলমুখরিত দক্ষভবনের সর্ব্বত্রই আনন্দের অভিনয় দেদীপ্যমান। ঋষিগণের গ্রামত্রয়সংবাদিনী মধুর প্রণবধ্বনিসম্পুটিত বেদগান ও মন্ত্র জগতের জাবতীয় জীবকুলের স্বজাতীয় ভাষার অস্ফুট কলরবের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ যাত্রীর ঐকতান বাদনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার সহিত মৃদঙ্গ-মন্দিরা-মুরজমন্দ্রসমন্বিত গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীতধ্বনি, নৃত্যপরায়ণা কিন্নরীগণের নূপুরঝঙ্কার ও যদৃচ্ছাবিক্ষিপ্ত দেব-দেবীগণের কঙ্কণ-কুণ্ডলবলয়াদির বিক্ষেপ শব্দে জড় প্রকৃতি কি এক অভিনব স্বরে শব্দায়মান। ধূপ ধুনা ও আজ্যগন্ধের সহিত ত্রিদশগণের নিশ্বাস মধুর মরুৎ প্রবাহে দিক্ সমুদয় আমোদিত। নির্জ্জরগণের অঙ্গজ্যোতি ও অপাঙ্গবিক্ষিপ্ত নেত্রদৃষ্টিচ্ছটায় দক্ষপুরী দ্যোতিত। সর্ব্বত্র দিয়তাং ভোজ্যতাং ও গৃহ্যতাং রবের সহিত ক্ষুন্নিবৃত্ত ভোক্তাগণের জয়ধ্বনির মধুরতা অতীব চিত্তাকর্ষক। কিন্তু দক্ষপুরে সর্ব্বব্যাপী আনন্দ অভিনয়ের মধ্যে কিজানি কেন আনন্দের মূর্ত্তিমান্ স্বরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সকল ঐশ্বর্য্য

ও সম্পদ্ সম্ভারের অন্তরালে কি-যেন-কেমন একটী অমঙ্গলের মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘ নিশ্বাসের ন্যায় কি-জানি কি ব'হিয়া যাইতেছে। তাই যজ্ঞবেদীতে সমাসীন প্রজাপতি মাঝে মাঝে উন্মনার ন্যায় কি-যেন-কাহাকে দেখিবেন ভাবিয়া সচকিত দৃষ্টিপাত করিতেছেন; যেন কাহারও চরণশব্দে সহসা চমকিত হইয়া উঠিতেছেন, যেন কাহার মৃদুল স্পর্শ সহসা তাঁহার দেহ শিহরিত হইয়া উঠিতেছে। ফলতঃ তিনি যেন সর্ব্বেন্দ্রিয়পথে কাহার অপ্রত্যক্ষ অশিব স্বত্বানুভব করত নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হইতেছেন। যাজ্ঞিক ঋত্বিক্‌গণ ও যজ্ঞভাক্ দেবগণও যেন সেই অপরিজ্ঞাত সত্ত্বার অনুভবে ক্ষিপ্ত ও বিমন। তাই কখনও বা কোনও যাজ্ঞিক স্বাহা মন্ত্রের স্থলে স্বধা, বৌষট্ স্থলে বষট্‌কার উচ্চারণ করত বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক বিভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। কোনও ঋত্বিক্ সমিতের পরিবর্ত্তে স্রুব, হবির পরিবর্ত্তে সলিলধারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া বিস্মিতের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেছেন।

অন্তঃপুরে দক্ষরাজমহিষী স্বীয় দুহিতা ও দৌহিত্রীগণ ও অসংখ্য দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাঙ্গনাগণে পরিবৃতা থাকিয়াও একমাত্র সতীর অভাবে অনন্তকুসুমসমুজ্জ্বল বাসন্তিবিতানে চূতমুকুলবিরহিত মধুকরের ন্যায় ঔদাস্যবিধুরা। তাই যখন শশাঙ্ক-সঙ্গিনী রোহিণী সপ্তবিংশ সহোদরা সমভিব্যাহারে আসিয়া জননীর চরণ বন্দনা করিলেন, সহসা সতীভ্রমে প্রসূতি চমকিয়া উঠিলেন। অবশেষে একটী মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শিরাঘ্রাণ ও কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। সুধাকরকান্তা দক্ষ-দুহিতাগণ পিতামাতার ঈদৃশ বৈমনস্য প্রত্যক্ষ করত কনিষ্ঠা সতীর ও শিবের অনাহ্বানসংবাদ শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণা ও ব্যথিতা হইলেন। সতী-জননী প্রসূতি শিব-সতীর অনিমন্ত্রণে যজ্ঞে অমঙ্গলাশঙ্কায় যতদূর কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহার নয়নপুতলী পরম অভিমানিনী সতী যে তাঁহার পতীর অবমাননা সহ্য করিয়া দেহধারণ করিতে পারিবেন না সেই ভাবনা তাঁহাকে ততোধিক কাতর করিয়াছিল। তদুপরি মহারাজের শিবদ্বেষী বুদ্ধি ও অশিব যজ্ঞাদি সকল ব্যাপারই রাজমহিষীকে যৎপরোনাস্তি ব্যথিতা করিয়াছিল। বস্তুতঃ যজ্ঞালয়ে সমাগত আপামর সাধারণ সকলেই অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের অন্তস্থলে বার্হস্পত্য যজ্ঞের অশিবত্ব অনুভব করিতেছিলেন।

আজ যজ্ঞের শেষ দিন। দেবগুরু বৃহস্পতি স্বয়ং হোতা, স্বয়ং বিধাতা পুরোধা। মন্ত্রদ্রষ্টা দেবগুরু মন্ত্রদ্বারা বোধশক্তির আহ্বান করিতে যাইয়া শেষে মায়া-বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন। দেবীর ধ্যান করিতে যাইয়া জৃম্ভণ

মোচনপূর্ব্বক তন্দ্রার আবেশে কাতর হইয়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতামহ, এই অশিব যজ্ঞে কাহার ধ্যান করিয়া পূর্ণাহুতির আয়োজন করিব ?" বিধাতা তাহার বিধি দিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন "তোমার নামেই এই অশিব বার্হস্পত্যযজ্ঞ সঙ্কলিত হইয়াছে ; সুতরাং এই যজ্ঞাগ্রভাগ প্রদানে তোমারই অধিকার। তুমি যদৃচ্ছা প্রচলিত হইয়া যাহাকে আহ্বান করিবে তিনিই যজ্ঞাগ্রভাগ গ্রহণ করিবেন।" বিধাতার আদেশ-ক্রমে দেবগুরু একাগ্রহৃদয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য সমাগত দেববৃন্দ অশিবাশঙ্কায় কেহই স্থির হইতে পারিতেছেন না, কি এক অজ্ঞাত অশুভ যেন সর্ব্বদিক হইতে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তাহার অদৃষ্ট ব্যাদিতাননের নিদারুণ তাপে যেন আর তাঁহারা স্থির হইতে পারিতেছেন না। পাবক বহু যত্নেও দক্ষিণাবর্ত্তে প্রজ্বলিত হইতে পারিতেছে না। সন্নিহিত মারুত বিকম্পিত হইতেছে, মরুৎ কি-জানি-কেন সহসা অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তন্দ্রাকুল আপদেবতা অশিব স্বপ্নে বিহ্বল ; ধরিত্রী থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইতেছে। প্রজাপতি স্বয়ং ক্রোধ ও আশঙ্কান্দোলিত হৃদয়ে উন্মত্তের ন্যায় কি করিতে কি করিতেছেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

এমন সময়ে জয়া-বিজয়াসঙ্গিনী বৃষভাসনারূঢ়া সরস্বতীরূপিণী সতী বাহনসহ নন্দীকে বহির্দ্বারে পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞাসন অতিক্রম করত একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ও সহোদরাগণপরিবেষ্টিতা জননীর পাদবন্দনা করিলেন। জননী চিরাকাঙ্ক্ষিত তনয়াকে শিরাঘ্রাণ ও আলিঙ্গনে অভিনন্দিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দর্শনে তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত সুখসাধের তৃপ্তি হইল না। সতীকে রুদ্রাণীরূপে দর্শন করিয়া—

নহে সখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর-অম্বর-পড়ে শিরে ॥

তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অশ্রুহীন বিস্ফারিত নয়নে কহিলেন, "মা সতী তোর আজ একি রূপ দেখি মা ? তোর চাম্পার গৌর বর্ণ যে শঙ্খের ন্যায় শুভ্র হইয়া গিয়াছে ?"

সতী। মা তোমারা ত আর আমাদিগকে চাহ না। আমি আজ তোমার দ্বারে অনিমন্ত্রিতা রবাহূতা ; ভিখারিণীর আর কান্তি কোথায় ?

সতী-জননী প্রভৃতি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। ভগ্নীগণ সকলে সতীর

মুখাবলোকন করিতেছিল। সতী হর্ষামর্ষ বিক্ষোভবিহীন প্রকাণ্ড বদনে সকলের যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন এবং জননীর সহিত যজ্ঞস্থলে গমনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে পূর্ণাহুতির সময় উপস্থিত। প্রতিহারী আসিয়া পুরবাসিনীগণসহ রাজ্ঞীকে যজ্ঞাঙ্গনে গমনের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজ্ঞী স্বীয় পতিকে মোহান্ধ শিবদ্বেষী জানিয়াও সমূহ সঙ্কট সময়ে সতীপুরঃসর পুরবাসিনীগণসহ একান্ত শঙ্কিত-হৃদয়ে যজ্ঞাঙ্গনে গমন করিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ সতীর প্রথম দর্শনেই চমকিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার এই রৌদ্ররূপে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। সতী অবাতবিক্ষুব্ধা দীপশিখার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন একাগ্রহৃদয়ে শিবানুধ্যান-পরায়ণা সতীর দেহ মৃতদেহের বিভীষিকামণ্ডিত হইয়া অতীব ভয়াবহ হইয়াছিল। অনন্তর প্রজাপতি প্রসূতির নিকট সতীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সতীকে লক্ষ্য করিয়া শিবের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। সতী তখন শিবধ্যানে বিস্মৃতা।

দক্ষ কহিলেন—সতী তুমি এখানে কেন?

সতী। তোমার যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছি মহারাজ।

দক্ষ। আমি ত তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করি নাই।

সতী। তুমি ত্রিলোকেশ্বর দক্ষ প্রজাপতি। তুমি সকল ভুবনের রাজা? আমি তোমার অতিশয় দীন প্রজা। তোমারই রাজত্বের মধ্যে একটী সামান্য গিরিকন্দরে বাস করি মহারাজ! তুমি শিবরহিত বার্হস্পত্য যজ্ঞ করিতেছ শুনিয়া তোমাকে কিছু উপঢৌকন দিতে আসিয়াছি।

দক্ষ। শ্মশানবাসী ভিক্ষুকপত্নীর উপহার গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা দক্ষ প্রজাপতি রাখে না। ভাল তুই কি উপহার আনিয়াছিস্ বল।

সতী। মূর্খ তুই যাহার প্রসাদে বহুজন্ম তপস্যার ফলে প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়াছিস্ সেই ভবভামিনী তোকে অনুগৃহীত করিবার জন্য তোর তনয়া-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই গর্ব্বে মোহান্ধ হইয়া দেবাদিদেব শঙ্করের শ্বশুর পদবীর অবমাননা করত শিবের নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হস্ নাই। তাই তোর মত পাপিষ্ঠের দান—এই অশুচি কলেবর প্রত্যর্পণ করিবার জন্যই সতী তোর এই নিন্দনীয় যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিয়াছে।

দক্ষ। তৃণাদপি সুনীচ ভিক্ষুকপত্নীর গর্ব্বই তাহার একমাত্র সম্বল। মানাপমান বোধহীন ভিক্ষুক-বনিতার মুখে অনেক প্রহেলিকার কথা বেশ

শোভা পায়; কিন্তু এই সকল তোর ঐ ছোট মুখের অনেক বড় কথা বলিতেছিস। তোর ঐ দক্ষরাজনন্দিনী গর্ব্বই তোকে এতদূর প্রগল্ভা করিয়াছে, সেই দর্প চূর্ণ করিবার কৌশল দক্ষরাজ জানে। ইহাও সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিস্ আমার আত্মজা পরিচয়ে ক্ষমা পাইবার আশা তোর পক্ষে অতিশয় কম।

সতী। পরদেবতা মহেশ্বরের কেহই পর নাই; যিনি সর্ব্বতঃপূর্ণ তাঁহার আবার উচ্চতা নীচতা কি? যাঁহার দানে জগৎ পুষ্ট তাঁহার ভিক্ষুক উপাধি তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। যাক, তুমিও ইহা নিশ্চয় জানিও তোমাকে পিতৃসম্বোধনে অলঙ্কৃত করিতে ভবভাবিনী আজ তোমার দ্বারে উপস্থিত হয় নাই। তোমার অঙ্গজা অপমান বিসর্জ্জন করিতেই তাঁহার আগমন।

দক্ষ। যে শ্মশানবাসী জটাধারী নগ্ন দিগম্বর, নাগ-বিজড়িত কঙ্কালমালা যাহার কণ্ঠভূষণ, চিতাভস্ম যাহার অনুলেপন, বৃষভ যাহার বাহন, কতগুলি ভূত-প্রেত যাহার সঙ্গী সেই সিদ্ধিসেবনোন্মত্ত ভাঙ্গড়ের গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। তাহার গৌরব কাহিনী শোনাবার জন্য আমি তোমাকে ডেকে আনি নি। যদি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে যজ্ঞদ্বারে এসে থাকিস্, তবে অপর ভিক্ষুক ভিখারিণীগণের সঙ্গে বহির্দ্বারে যেয়ে অপেক্ষা কর্। আর যদি আমার কন্যা পরিচয়ে এখানে থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিধবার সাজ গ্রহণ করিয়া বিষ্ণু-আরাধনে কায়া, প্রাণ, মন নিয়োগ কর্—

সতী। কি দুর্ব্বৃত্ত কাহাকে কি বলিস্—

বলিতে বলিতে সতীমূর্ত্তি অপরিমেয় উজ্জ্বলতা ধারণ করিল। তখনই কম্পিত-কণ্ঠে দেবগুরু আশিকর নামোচ্চারণপূর্ব্বক স্বাহা মন্ত্রে যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গই সতীদেহ হোমকুণ্ডে নিপতিত হইল। সতীর তেজ শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। সতীর দেহ অনলপৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ভীত হব্যবাহন সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে সর্ব্বান্তকব্যাধিরূপ বীরভদ্র জ্বররূপে মহাকালী শক্তিসমন্বিত হইয়া উত্থিত হইল ও সকল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার প্রচণ্ড আক্রমণে প্রজাপতি নিহত হইলেন। সদ্য বৈধব্যসম্প্রাপ্তা রাজমহিষী পতিদেহ অঙ্গে ধারণ করত বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে যজ্ঞাঙ্গনে সমাগত সুরাসুর-নর-গন্ধর্ব্বগণ সকলেই কালভয়ে কম্পিতকলেবরে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যজ্ঞভূমি জনহীন হইল।

এদিকে সতীর নিধনবার্ত্তা লইয়া শতীশোকে কাতর নন্দী মুহূর্ত্তমধ্যে

কৈলাসে উপনীত হইলেন। নন্দীর কৈলাস গমনের পূর্ব্বেই মহাকালীর কলনাদ্দিত ঋষিসঙ্ঘ ধ্যানযোগে কৈলাশেশ্বরের সমীপে উপনীত হইয়া কলনরতা মহাকালী শক্তির সাম্যতা সম্পাদনের উপায় বিধান জন্য স্তুতি করিতে লাগিলেন। কালীর সর্ব্বসংহারক লীলাতে বিশ্বের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস অনুমান করত সমগ্র বিশ্বদেবগণসহ বিধাতা শিবের শরণাপন্ন হইলেন। পরমপুরুষ শঙ্কর তখন পরমৈশ্বর্য্য যোগাবলম্বনপূর্ব্বক মহাকালী শক্তিকে স্বীয় হৃদয়াধারে ধারণ করত সকলের অভয় বিধান করিলেন। সেই মহাকালী মহাবিদ্যা দ্বিধারূপে জীব ও বিশ্বে বিহার করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ভৈরবরূপে সেই মহাবিদ্যা দ্বয়ের আধারস্বরূপ হইয়া রহিলেন। ভগবান্ শঙ্কর কালী ও তারা রূপে পরা প্রকৃতি আদ্যারূপা সতীর মহাবিলাসের আভাস অনুভব করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে এই সময়ে আদ্যা প্রকৃতি দশমহাবিদ্যারূপে প্রকটিত হইলেন। শঙ্কর প্রকৃতির সেই সমস্ত বিলাসের মধ্যে আপনাকে বিতন্বত করিয়া মহারুদ্ররূপে বিশ্বকে ধারণ করিলেন। পরে শিবানুগৃহীত বিশ্বদেবগণ ও ঋষিগণ দশমহাবিদ্যার সাহায্যে স্থূল-সূক্ষ্মকারণাদি তত্ত্বে বিতন্বত অসংখ্য জীবের আবাসভূত বিশ্ব সৃজন করিয়া তাহাতে পরা-অপরা উভয় ভাবের সন্নিবেশ করিতে সক্ষম হইলেন।

মহাবিদ্যা দশধা বিশ্লিষ্ট হইয়া মঙ্গলময়ের সাহচর্য্যে বিশ্বের সৃজন বিধি সুব্যবস্থিত হইয়া আসিলে সকলেই দক্ষের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন, পরে শিব সর্ব্বসহ দক্ষপুরে উপনীত হইলেন। তথায় গতাসু দক্ষদেহ অঙ্গে ধারণ করত প্রসূতিকে বিলাপপরায়ণা অবলোকন করিয়া দয়াময় আশুতোষ দক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন। শিবনিন্দার ফলে নন্দীর শাপে দক্ষের স্বাভাবিক মুণ্ড বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি, পরম পুরুষ শঙ্করের প্রখ্যা হইতেও তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখন শঙ্কর দক্ষের কবন্ধ-দেহে অজোপাধিক মুণ্ড স্থাপন করত তাঁহাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পুনরুজ্জীবিত দক্ষ শঙ্করের বহুধা স্তুতি করিতে লাগিলেন ও শিবসন্নিধানে তাঁহার আরব্ধ বার্হস্পত্য যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করত সেই যজ্ঞ উদ্যাপন করিলেন। দেব দানব নর গন্ধর্ব্ব সর্ব্বজীব স্বস্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করত যথা স্থানে প্রস্থান করিল। সর্ব্বজগৎ আত্মাধারে জ্ঞানের আভাসে গুরুরূপী ভগবানের আনন্দামৃত লাভে পরিতৃপ্ত হইল।

শূলী শম্ভু যজ্ঞাঙ্গনে সতীর গতচেতন স্থূল দেহ দর্শন করত উচ্চ ত্রিশূলাগ্রে

ধারণ করিয়া সেই শবদেহ সমভিব্যাহারে সমস্ত ভুবন পর্যটন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে চক্রধারী নারায়ণ সেই শতীদেহ বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সংস্থাপিত করিলেন। সতীর অংশ বা পাদ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই এই ধরাতলে মহাতীর্থ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। পাংশুজাল-ধূসরিতা ধরিত্রীর ইহাই মহান্ সম্পদ। ধরিত্রীর এই মহান্ সম্পদ—এই তীর্থসম্পদ—ত্রৈলোক্যবাসীর পরম স্পৃহণীয়। এই অমূল্য সম্পদ আছে বলিয়াই ত্রিদশবাসিগণ এমন কি বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণও এই ধরাগৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় সতীতীর্থের সেবাতে পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ মনে করেন। তাই—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ॥
ওঁ তৎ সৎ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

ওগো শোন।

ওগো! শোন—একটীবার একটা কথা—আমার সারা জীবনের মথিত—দুঃখের বুক ফাটান একটা কথা—একটা আবেদন—একটা ভিক্ষা। কত বকিয়াছি, মিছামিছি তোমায় কত জ্বালাতন করিয়াছি, দিন নাই—দুপুর নাই—রাত নাই—সন্ধ্যা নাই—কত প্রার্থনা নিয়ে—কত যাচ্ঞা নিয়ে, কত দাবী নিয়ে, কত উদ্দীপনা নিয়ে, কত আশা নিয়ে, কত পাওনা নিয়ে, কত কি নিয়ে, কতবার তোমার দ্বারে আনাগোনা ক'রয়া'ছি, কত লুটালুটি ছুটাছুটি তোলপাড় ব্যাপার করে তুলে'ছি;—কত বার কত বুক ফাটা আর্ত্তনাদে কাঁসিবাঙ্গের কোলাহলে তোমার বিরাট্ মধুর শান্ত কক্ষ মুখরিত করে তুলেছি, সারা বিশ্ব জুড়ে একটা বিরাট মহামারি, একটা পাগলা গারদের মহা হুলস্থুল কাণ্ড করে তুলেছি, কিন্তু আজ বড় দুঃখে, বড় ব্যথিতহৃদয়ে, সারা সৃষ্টি ঘুরে পায়ের তলার সমস্ত জড়িত মাংস ছিন্ন করে, আজ শেষ একটীবার এ আর্ত্ত-হৃদয়ের একটীমাত্র শেষ কথা শুনাতে এসেছি,—শোন—একটীবার শোন। আর আসব না—কুণ্ঠিত হস্তের দান কেড়ে নিতে আর ফিরে আসব না। এ দগ্ধ-বুকের জ্বালা নিয়ে সারা বিশ্ব ছুটে এসেছি, দ্বারে দ্বারে ঘুরে সবারই পায়ের তলার মাটী বহন করে এসেছি; জগতের কেউই শুন্‌লে না, কেউই

ফিরে চাইল না। আর্ত্তের বুক-ফাটা ভাঙ্গাস্বরে কারও চোখ ফেটে এক ফোঁটা জল গলিয়ে পড়ল না। কেনই বা পড়্বে? দুর্ভাগ্যের তীব্র ভ্রূকুটী দিয়ে তুমিই যাকে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে রেখেছ, মরণ-ঝঞ্ঝার প্রলয়-গর্জ্জন রূপে তুমিই যার শিয়রে হুঙ্কার দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ, মায়ার দোলায় পৃথ্বীর মত যাকে তুমিই মহাশূন্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ—তার দিকে জগৎ কেন চেয়ে দেখ্বে? এ দগ্ধ বুকের প্রতি হাড়খানার প্রতি রন্ধ্রের দিকে চেয়ে দেখ—কত ব্যথা, কত অশ্রু, কত দাগ, কত আর্ত্তনাদ, কত শোক, কত হাহাকার, তোমার নিষ্ঠুর হাতের কত নির্ম্মম কষাঘাত তার প্রতি অঙ্গ জড়িয়ে আছে। তুমিই যাকে আপন হাতে দুঃখের মুকুট পরিয়ে দাও, তুমিই যাহার বিজয় বাদ্যের রক্ত নিশান পুড়িয়ে দাও, তুমিই যাহার ম্লান চক্ষের শেষ দীপ্তিটুকু নিভিয়ে দাও, জগৎ তাকে কেন আদর করবে? সে যে জগতের বিদ্রূপ, মানবের উপহাস, অদৃষ্টের ভ্রূভঙ্গি সহ্য কর্ত্তে জন্মেছে—ঝিল্লির রবের মত আপনার বুকের দগ্ধ জ্বালার অসহ্য উত্তাপে ডাক্ ছেড়ে আপনিই মরে যেতে এসেছে। তার বুকের বেদনার অশ্রান্ত ঝঙ্কার তার মর্ম্মজ্বালার উৎকট আর্ত্তনাদ, তারই বুক্ খুঁড়ে মরে, গলে, পচে তারই বুকে মিশে যাচ্ছে। জগতের তাতে কিছু যায় আসে না—জগৎ তাকে ফিরেও চেয়ে দেখে না। তুমি যাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে শত-চিতায় সাজাতে পার, তুমি যাকে অকম্পিত বক্ষে প্রলয়বহ্নির লেলিহান মুখে সঁপে দিতে পার, তার দিকে জগতের লোক কেন চেয়ে দেখ্বে? তার কথা জগতের কানে বিষের হল্কার ঝেঁজে দেয়, তার হাসি জগতের চোখে রক্ত ছোরা বসিয়ে দেয়—তার গান পচা আগুনের জ্বলন্ত হল্কা ছিটিয়ে দিয়ে যায়—তার ভালবাসা নিষ্ফল রোদনের আর্ত্তভেরী বাজায়ে যায়। উপাসনা তার শুধু শুষ্ক নৈরাশ্যে ভবে থাকে; নন্দনের আনন্দোচ্ছ্বাস, স্বরগের অমৃতাস্বাদ সে কেমন করে বুঝ্বে ভাই? আজ একদিন নয়—দুইদিন নয়—কত যুগ-যুগান্তর ধরে চলে এসেছি, এম্নি করে কত আবর্ত্তনের মাঝখান দিয়ে, কত ধ্বংসের দ্বার ঠেলে, এম্নি করে বুক খুঁটে কাঁদতে কাঁদতে এসেছি, আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতার প্রেম-চন্দন-চর্চ্চিত স্বরগের অমর-কান্তির স্বর্ণচূড়া লক্ষ্য করে—এম্নি করে শুধু তারই লক্ষ্য ধরে ছুটে এসেছি; আমার হৃদয়ের বাসনা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের আনন্দ, নয়নের উৎস, সমস্ত রোধ করে, সকলের টুটি চেপে ধরে এম্নি করে আমার শুষ্ক হাহাকার বহন কর্ত্তে কর্ত্তে এসেছি; ভেবেছিলাম, আমার দেবতা, আমার বন্ধু,

আমার সাধনা একদিন আমার হৃদয় অধিকার করে বসবে, একদিন আমার ভাঙ্গা মন্দিরের জীর্ণ প্রস্তরে তার স্বর্ণকিরণ ঠিক্‌রে পড়বে, একদিন তার নিবিড় আনন্দের উত্তাল ঢেউয়ে আমার সমস্ত প্রাণখানি দুলে উঠবে—কিন্তু কি করব—আমার অদৃষ্টগুণে আমার হৃদয়-দেবতা চিরকালই বিরূপ, চিরকালই নিষ্ঠুর। অতীতে কতদিন নুয়ে পড়ে গেছে, কালের বক্ষে কত বেলা চলে গেছে, কত মরু সাগর হ'য়ে ছেয়ে গেছে, কত নদী পথভুলে ঘুরে চলে গেছে কিন্তু আমি সেই একই আবর্ত্তে, সেই একই সুরে, সেই একই কোমল কঠিন অদৃষ্টের পাকে ঘুরে ফিরে, নিয়তির পেষণে তনু, মন, ভেঙ্গে, ক্ষয়ে, ছিঁড়ে ভগ্নসুরে সেই একই মর্ম্মবেদনা গেয়ে বেড়াচ্ছি। আমার অদৃষ্টের বোঝা আমি আপ্নিই ব'য়ে ব'য়ে জগতের কাণে আমার তিক্ত আর্ত্তনাদ ছিটিয়ে বেড়াচ্ছি। কি কর্ব্ব ভাই, এ তোমার সাধ করে দেওয়া বোঝা, আমার সখের ধন, আমার যত্নের ধন, আমার সাধনার ধন, আমার অশ্রুর ধন।

মনে পড়ে সেই একদিন—যেদিন কলধ্বনিময় বিশ্বের অতুল রহস্যের মাঝখানে স্বপ্নছাওয়া জ্যোৎস্নামাখা একখানি ছবি—আর কিছু নয় শুধু একখানি প্রভাতি দীপ্তির স্নিগ্ধ পবিত্রতায় ঢল ঢল, প্রেমে গদগদ দুটী উজ্জ্বল চক্ষু—বিগলিত করুণার একখানি জ্বলন্ত মূর্ত্তি—কোন্ এক অজ্ঞাত দেশের স্নিগ্ধ গৌরবে মণ্ডিত হয়ে ভেসে এসেছিল—একটা রুক্ষ কঠিন মায়া আস্তরের মলিন আবরণের অন্তরালে একখানি আনন্দকান্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত সুষুপ্তিময় একটা নিবিড় নির্নিমিখ শান্তি। সে কি মূর্ত্তি, প্রভাতসূর্য্যের চেয়েও ভাস্বর, সত্যের চেয়েও গম্ভীর, পাহাড়ের চেয়েও স্থির, উদধি থেকেও প্রশান্ত। জানিনা সে কি মুহূর্ত্ত—আর সে কি মূর্ত্তি। সেই এক মুহূর্ত্তে জগতের আবরণ সরে গিয়েছিল, চকিতে চম্‌কে উঠে জগতের শিরায় শিরায় একটা আত্মবিস্মৃতির অগাধ বিহ্বলতা জেগে উঠেছিল—একটা নূতন জগৎ, একটা নূতন সৃষ্টি, একটা নূতন সঙ্গীত আমার প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, জগতে একটা অভাবনীয় আনন্দোচ্ছ্বাস, একটা অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন, সৃষ্টি ও ধ্বংসের একটা তুমুল বিরাট শান্তি, প্রকৃতির বক্ষে বক্ষে একটা তড়িচ্ছটার স্থির ধীর অচঞ্চল স্বর্ণগ্রন্থি জেগে উঠেছিল। জীর্ণ তৃষিত উত্তপ্ত বিশ্বের বক্ষের উপর দিয়ে তৃপ্তিভরা গলিত কৌমুদীর স্বচ্ছ উচ্ছ্বাস আমার এ ক্ষুদ্র বক্ষের দ্বার ভেঙ্গে কোন এক অতীত পানে ছুটে গিয়েছিল, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়েছিলেম, আকণ্ঠ পরিপূরিত প্রেম ভক্তি ভালবাসা আমার অবশ অসাড় স্পন্দনহীন দেহ

থেকে উথলে পড়ে বাতাসের কণায় কণায় প্রবাহিত হয়েছিল। ওঃ কি সে আনন্দ! আজও সে কথা মনে পড়লে আমার চক্ষের জলে বক্ষ ভিজে যায়—আর সেই উন্মাদনা, সেই উৎকণ্ঠা, সেই আতঙ্ক, সেই বিহ্বলতা সবই যেন নূতন করে জেগে ওঠে, আমি অধীর হ'য়ে পড়ি।

ইচ্ছা করে যদি আর একদিন দেখতাম্, ঠিক তেম্নি করে, এই অনন্ত বিশ্ব রাজ্যের অনন্ত রহস্যের মাঝখানে শুধু আর একদিন আমার প্রাণের রুদ্ধ কক্ষে বদ্ধ সেই একখানি রহস্যময় ছবি, সেই অগাধ অবাধ বিপর্য্যয়ের মাঝখানে একখানি স্থির ধীর অচঞ্চল সৌম্য মূর্ত্তি, সেই অচেনা অজানা দেশের কোন একটা কুসুমগুচ্ছ—যদি ঠিক তেম্নি করে আর একবার দেখতাম, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, শুদ্ধ আপন মাধুরিমায় আপনি উন্মত্ত আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ, সেই একখানি মোহন যন্ত্রের মুগ্ধ সঙ্গীত, কোন গগনের বক্ষ থেকে ঝড়ে পড়ে বাতাসে ভেসে এসেছিল—যদি আর একবার ভাল করে দেখতে পারতেম, জীবনের শোধ মরণের শোধ, যদি আর একবার শুধু চোখ ভ'রে দেখে নিতে পারতেম, তা হ'লে ওগো তা হ'লে আমি শুধু সেই স্মৃতি বুকে ধরে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দুঃখের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তেম—হাস্‌তে হাস্‌তে আমার আত্মবলির মহান্ যজ্ঞে আমার বুকের র[illegible] ঢেলে দিয়ে তোমার চরণে পর্ণার্ঘ্য প্রদান করতেম। আমার জীবন সার্থক হ'ত, মরণ সার্থক হ'ত, বিপদও সার্থক হ'য়ে চলে যেত।

আয় ভাই! আমার এ জীবনের পূর্ণ গোধূলিলগ্নে একবার তোর রাঙ্গা পায়ে সোণার নূপুর বাজায়ে আয় ভাই। আমার বক্ষোরক্ত সেই তালে তালে দুলে উঠুক। সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সে সুর হাসির ফোয়ারায় ছিটিয়ে পড়ে একটা রঙ্গিন নেশায় বিভোর হ'য়ে থাক। তোর চূর্ণকুন্তলের ঢেউয়ের মত আমার হৃদয়ের শীর্ণ বৃত্তিগুলি তোর আনন্দে স্ফীত হ'য়ে তরঙ্গের তালে তালে ছুটে ছুটে কোন এক সুদূর নিলীমায় মিশে যাক, সমস্ত বিশ্বরাজ্যের বক্ষ জুড়ে তোর বাঁকা চাহনি বিগলিত করুণার অজস্র মহোৎসবে মত্ত হ'য়ে—সারা সৃষ্টিময় একটা ফেনিল-করা ফুলের রঙের মত রোমাঞ্চ সৃজন করুক। আকাশের তারা, গগনের চাঁদ, প্রভাতের সূর্য্য তোর বিরাট্ মহান রুদ্র মূর্ত্তির সম্মুখে জোড় হাতে নির্নিমিখ বিস্ময়ে চেয়ে থাক—আর আমি অনন্তকাল সে মূর্ত্তির চরণতলে নতমস্তকে অজস্র তপ্ত অশ্রুধারা বর্ষণ করি।

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

পাগলের প্রলাপ।

(২য়)

যাই বল, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে কিন্তু আমার হাসি পায়। অনেক সময় অন্যায় কাজ করে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি এবং হাত যোড় করে তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তোমাকে যখন ভাবি, তোমাকে মনে করি, তখন তোমার হৃদয়খানি দেখতে পাই, তাতে সে করুণার ইঙ্গিত আছে, সে দেখলে আর কেউ তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারে না। ক্ষমা ভিক্ষে করে আমার যে গৌরব কম্‌বে তা নয়, আমার আর গৌরব কি, কিন্তু এ'তে তোমার গৌরব লাঘব হয়, তোমার হৃদয় চেনা হয় না। তুমি কি দণ্ড দাও যে তার জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে। যদি সত্য সত্যই দণ্ড দিতে, বেশ হতো, কেমন তোমার হাতের বেত খেতাম, বেশ লাগতো; হ'ক না বেত, তবু তোমার হাতের তো? আর এযে পড়ে পড়ে মার খাই, এতো তুমি মার না, এতো আমি আমাকে আঘাত করি। তাই বুঝি এত লাগে, এবং লেগেও কোন ফল হয় না। বেতের ঘা শুকালেই আবার ভুলে যাই। নিজের জিব নিজে কামড়ে রক্তারক্তি করি। অথচ মজাটা এমনি যে নিজের মার খেয়ে নিজে এত চেঁচাই যে পাড়াশুদ্ধ লোক জড় হয়ে যায়, এবং সকলেই মনে করে বুঝি কেউ আমাকে মেরেছে।

মেঘগুলো ছুটে ছুটে বেড়ায়, মনে হয় এইবার সূর্য্যকে বুঝি ঢেকে ফেললো, কিন্তু সাধ্য কি, মেঘ সূর্য্যকে ঢাকে না, মেঘ ঢাকে আমার চক্ষের ক্ষুদ্র দৃষ্টিকে। তেমনি তোমার প্রকাশ তোমার আনন্দকে কি কেউ আমরা কখন হাহুতাশের মেঘে, কান্নাকাটির বারিধারায় এবং বাসনার উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় আচ্ছাদন করতে পারবো? কিছুতেই নয়। তোমার প্রকাশ কি কেউ কখন বন্ধ করতে পেরেছে? আমাদের অহঙ্কার পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলেও, তোমার প্রকাশের কাছে যে তাকে নতশির হতেই হবে। আমি নিজের চোখ নিজের হাতে ঢেকে রেখে অন্ধ হয়ে বসে আছি। লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলি অন্ধ হয়েছি, আর দেখতে পাই না। যারা আমায় জানে তারা হাসে, তারা আমার চোখের চেয়ে মাথাটাকেই বেশী খারাপ হয়েছে বলে মনে করে। আমার এত স্পর্দ্ধা, আমি কি না বলি সূর্য্য কোথায়? সূর্য্য থাকলে কি আর দেখতে পাই না? কিন্তু

যে দিন গালে চড় মেরে ওখানি হাত চোখ থেকে সরিয়ে দিলে, সে দিন এই চোখেতেই দেখি তোমার কি অপূর্ব্ব প্রকাশ, কি সুধাস্নিগ্ধ জ্যোতি। সে দিন বুঝলাম তোমার অপ্রকাশ এখনও নেই, কখনও ছিল না, আবার থাকিবেও না কখন। এই গালে চড়টি খেয়ে একটু হুঁস হয়েছে, আর চাক ঢোক থাকি না। এখন তাকিয়ে দেখি, তাই আর লোকের পায়ের শব্দ পেলে "অন্ধ জনে দয়া কর" বলে হাত পাতি না, তোমার কাছেও কিছু বড একটা প্রার্থনা করি না। এখন বসে বসে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখি তোমার ইচ্ছাটা জগৎ জুড়ে রয়েছে। আমি নিজেও যে তোমারই 'ইচ্ছে"। তাই আর নিজের পৃথক্ ইচ্ছার কথা ভাবলেই হাসি পায়। আমার ইচ্ছাকে আঁকড়ে ধরেই তো এত কষ্ট পেলাম, এখন "তোমার ইচ্ছাই সব" যেন নিশ্চিন্ত আছি, আজকাল নির্ভাবনায় দিন কেটে যাচ্চে। যতদিন এই নিজের "ইচ্ছা"ট ছিল, ততদিন কি জ্বালতনই করেছে। ততদিন "আমি এ করবো, আমি তা করবো, এটা আমায় পেতে হবে, ওটা আমার না হলেই নয়, আমি সবাইকে দেব থুবো, মারব, রাখব, আমার এটার এতটুকু চাই, ওটার সবটুকু চাই, আমার এ করলে চলবে না তা না করলে হবে না, আমাকে ধার্ম্মিক হতে হবে, ভদ্র হতে হবে, সাধু হতে হবে," ইত্যাদি কত ভাবনাই ছিল,—এখন দেখছি আমি যা তা, আমাকে যা হতে হবে, সে সব তোমারই ইচ্ছা। এখন দেখছি "কত বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।"

তোমার যা খুসী তাই কর, আমি কেন অনর্থক মাথা ঘামিয়ে কষ্ট পাই। মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? মাথা যত ঘেমে উঠে তত তোমাকে আর এই জগৎটাকে বুঝে উঠা শক্ত হয় দেখছি। বরং মাথা না ঘামালে বুঝা যায় ভাল। দেখি আবার বিনা চেষ্টায় সবই বেশ চলে যাচ্চে, কোনখানে এতটুকুও ত্রুটি থাকবে না। ওঃ হরি এই বুঝি আমার অভিমানের দৌড়।

তবে কি জান, মাথা ঘামানোটা এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে তাকে আর থামানো যায় না। কিন্তু যখন দেখি সব বোঝাই তোমার মাথার উপর, তুমি ঘামচও না অথচ হাসচ, এবং আমার ভয়েও ঘাড় করে বইচ, তখন আমার হাসি আসেঁ। এ রহস্যটা কিন্তু বুঝতে পারি না, বোঝা তো তুমি বও, আর আমি বসে বসে ঘামি কেন?

যদি বল তোমার লজ্জা না হয়ে হাসি আসে কেন? আমি তার এই উত্তর দিব:—পরকে দেখলে লজ্জা হয় কিন্তু তোমার কাছে লজ্জা হবে কেন? স্ত্রী-

লোকের গা খোলা থাকলে, কেউ পাছে দেখে, তার তাই লজ্জা হয়; কিন্তু সেই স্ত্রীলোকই আবার তার স্বামীর কাছে নিরাবরণ হয়ে থাকে কোন সঙ্কোচ আসে না। কেননা সে জানে যে সে তার স্বামীর। তেমনই "আমি"ও যে তোমার, তাই পাপই করি আর পুণ্যই করি "আমি যে তোমার"—এ জানি তাই আর ভয় হয় না, লজ্জাও আসে না।

এইটা কিন্তু সব সময়ে বুঝে উঠা যায় না বলেই কত আবল তাবল বকি, কল্পনার চড়ে কি গাছে চড়ে বন বন করে ঘুরে মরি আর দুঃখ পাই।

ভূপেন্দ্রনাথ।

বোধন।

শরতরাজনন্দিনী সন্ধ্যাসুন্দরী যখন তাঁহার বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র জলদ-বসনাঞ্চল উড়াইতে উড়াইতে অস্তাচলসীমায় দাঁড়াইয়া ধরণীর তাপিত বক্ষ-বল্লরীদিগকে মধুর চুম্বনে রঞ্জিত করত নদী হ্রদ তরাগাদি জলাশয়ে স্বীয় অনুরাগের রক্তিম আভাটুকু ভাসাইয়া রিক্তরাগে সন্তাপহারিণী যামিনীর অঙ্কে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, যখন জগতের যাবতীয় পশুপাখী রজনীর সিতকৃষ্ণ অঞ্চলান্তরালে থাকিয়া নিদ্রার ধাত্রী গাথায় অঙ্গ ঢালিয়া সকল সন্তাপের অতীতে যাত্রা করিয়াছিল—সেই সময়ে পল্লীপ্রান্তবাহিনী তটিনী-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন যে গ্রাম ছাড়িয়া প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা জানিতে পারি নাই। তখন শুক্লা পঞ্চমীর শশধর ক্ষীণতার অকলঙ্ক জ্যোতি লইয়া গগনের দিগ্‌বলয়াঙ্কের ঈষৎ উপরে উঠিয়া হাসির রজতছটায় ধরণীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। শারদীয় শিশির-সম্পৃক্ত শাদ্বল-তৃণ-পত্রাদির সরস হৃদয়ফলক প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকলা যখন কোটী খণ্ডে বিভক্ত অসংখ্য বিভিন্ন আয়তনের মধ্যেও সেই একই চন্দ্রমার অনন্ত বিভূতি প্রকটিত করিয়া হাসিতেছিল, তখন সহসা অদূরবর্ত্তী কোনও পল্লীভবনে কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খমণ্ডিত পটহ বাদ্যের সহিত কলকণ্ঠ পুররমণীগণের উচ্চ হুলুধ্বনি আসিয়া শ্রবণপথে প্রবেশ করিল।

স্মরণ হইল আজ জগদম্বার বোধন। নিদ্রিতা জননীকে কে জাগাইবে? আর কেনই বা জাগাইবে? জাগাইয়াই বা লাভ কি? তটিনীতীরবর্ত্তী বকুলের মূলে উপবেশন করত চাঁদের পানে চাহিয়া স্বদেশসেবকের উচ্চ আসনে আপ-

নাকে সমারূঢ় করত যখন কল্পনার চ'খে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকাদি বহু নৈতিক ঐতিহাসিকের চক্ষে নগাধিরাজতনয়া 'পার্ব্বতী' নামক জনৈকা সিংহবাহিনী কোনও 'নাগা' রমণীর একটা মহিষ শিকারের ছবি আঁকিতেছিলাম ও সেই 'পাহাড়ে' মেয়েটার পূজার জন্য দীন দুঃখী ভারতবাসীর এতগুলি টাকার অযথা ব্যয়ের বিরুদ্ধে দাতব্য চিকিৎসালয় বা ফি, কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব মনে মনে বেশ পাকাইয়া তুলিতে তুলিতে ঐ শাস্ত্র ও শাস্ত্রকার নামধারী কতকগুলি সেকেলে অলস প্রকৃতির টিকিধারীর অসার চিন্তার কথা ভাবিতে ভাবিতে বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম ভারতবাসীর মূর্খতা কি অগাধ! কোন সুদূর অতীত হইতে একটা ভিত্তিহীন প্রতারণার ধারাবাহিক স্রোতে প্রবঞ্চিত হইয়া, আজ এই সভ্যতার তুঙ্গশৃঙ্গসমারূঢ় উচ্চশিক্ষালোকে-সমুজ্জ্বল বিজ্ঞান দর্শনের দিনেও সেই প্রাচীন অজ্ঞতামূলক বর্ব্বরতার সেবায় আপনার সকল সুখ শান্তি অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া আসিতেছে। এই জাতির উন্নতি—এই জাতির অভ্যুদয় সুদূরপরাহত!

ভাবিতে লাগিলাম আজ যাঁহাকে জাগাইতে যাইয়া তোমরা এত ঢাক ঢোল বাজাইতেছ তোমাদের সেই জগন্মাতা কোথায়? আর জগন্মাতা হয়ে যদি ঘুমে অচেতন হয়েই থাকেন তবে তুমি তাঁকে কি করেই বা জাগাইবে। ইত্যাদি বহুল গবেষণাপূর্ণ চিন্তাস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া প্রান্তরপথে চলিতে লাগিলাম।

পঞ্চমীর চাঁদ কখন্ অস্তাচলে চলিয়া গিয়াছে। সিত পঞ্চমীর ক্ষণস্থায়ি জ্যোৎস্নাবসানে ধরণী ক্রমশঃ নিশিথের গাঢ়তর মসীময় আঁচলখানি গায়ে টানিয়া দিয়াছে। জীব ও জগৎ, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলে এক হইয়া যেন একখানি গাঢ় অন্ধকার হইয়া জগৎ হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। তখন কি জানি কেন নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া জগতের অন্ধকারের একটা তুলনার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তখন একটা অযাচিত বিভীষিকার শীতল নিশ্বাস প্রাণের ভিতরে প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে বিকম্পিত করিয়া তুলিল, সেই হৃদ্গত অন্ধকারের সূচীভেদ্য গাঢ়তা বহির্জ্জগতের অন্ধকার অপেক্ষাও শতগুণ বিভীষিকা সংগ্রহ ও অসংখ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভীতির অট্টহাস্যে টিট্‌কারী দিতে লাগিল। সেই বিশ্বদ্রাবিণী বিদ্রূপে বাহ্যচেতনা-শূন্য কম্পায়মান অন্তরাত্মা যখন আশ্রয়ের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল.তখন যেন কোন অনন্তের পরপার হইতে, অজ্ঞাতের মর্ম্ম ভেদ করিয়া একটী বড় মধুরবাণী,

বড় আশ্চর্য্যের ভাষা, সঙ্গীতের তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া হৃদয়ের মর্ম্মপুর আলোকিত করিয়া সুমধুর কটাক্ষে অভয়ের বাণী প্রচার করিয়া হাসিতে লাগিল। কোনও দক্ষ চিত্রকর যদি তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কনে সমর্থ হইতে পারে অনুমান করাযায়, তবে যেন বোধ হয় তাহার সেই বাঙ্ময়ীমূর্ত্তি "জাগো মা আনন্দময়ি" রূপে ফুটিয়া উঠে।

আহা কি আশ্বাশের বাণী! অভয়করের কি মধুর স্পর্শ! মাগো আমি ভীত, শঙ্কিত; মা তুমি জাগ। তোমার চ'খে নিদ্রা নাই জানি। যার সন্তান মায়ের অঙ্ক ছাড়িয়া দূরে পড়িয়া থাকে—দূরে? কোলের ছেলে মায়ের কোল ছাড়িয়া কোথায়, কোন্ দূরে পরিয়া থাকিবে? মায়ের কোলে থাকিয়াও যে মোহের ভ্রমে আপনাকে মাতৃহারা মনে করে—এমন ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের জননী কি কখনও নিদ্রাতুরা হইয়া থাকিতে পারেন? তবু তোমায় ডাকি "জাগো মা?"—"জাগো মা আনন্দময়ি, খোল মা কুটীর-দ্বার!" মাগো আমি মোহময় সংসারপ্রান্তরের বিভীষিকা দর্শনে ভীত! মাগো তোর বিপথগামী সন্তান এত কাল সংসারের খেলাঘরে ক্রীড়াবত ছিল, ভুলেও গৃহগমনের কথা ভাবে নাই—ধরণীর ধূলা-খেলাঘরে আত্মপ্রতিবিম্বসদৃশ দারা-পুত্র, ধন-জন, যশ-বিদ্যা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠানের ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। মাগো আমার এই জন্মদিবার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। পরমায়ুর মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড কখন অস্তমিত হইয়াছে, অপরাহ্নের স্বপ্নাবেশময়ি শশাঙ্ককিরণরাণীও আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ সূচীভেদ্য অন্ধকারের মসীময় মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল। এখন দেখিতেছি আমি একা আমি অসহায়, আমি পথহারা;—মা, আমার কি হবে? আমি কোথায় যাব? তোমার উদার অঙ্ক ব্যতিরেকে আমার আর আশ্রয় কোথা? আমার বলিতে আমার আর কেউ নাই, কিছু নাই। মা আমি যাদের আমার ভেবে, বড় আপন করিয়া লইয়াছিলাম,—যাহাদের আকর্ষণে 'তোঁতে বিসরি' তাহাতে মন সঁপিয়াছিলাম, তপ্ত সৈকতসম্পাতিত বারিবিন্দুর ন্যায়, চিহ্ন মাত্র না রাখিয়া, তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আমাকে "আমার" বলে ছিল এখন দেখছি তা'রা আমার নয়। আমি কাতরপ্রাণে চখের জলে বুক ভাসাইয়া, তাঁদের অনেক ডাকিয়াছি—যে বাসনা একদিন আমার বড় আপন ছিল, বড় আদরে আমাকে তাহার পঞ্চাশ্বযোজিত মনোময় রথে আরোহণ করাইয়া কত শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসগন্ধের পথ্যবিথিকায় লইয়া যাইত, আর যে মানসরূপী সঙ্কল্প বিকল্প নামে

চিরতরুণ যমজযুগল নিমিষের তরেও আমার সঙ্গছাড়া হইত না, আজ তাহারা কোথায়?—আজ দেখিতেছি আমার কেহই নাই, আমার ডাকের লক্ষ্যটি মাত্র নাই—মা গো তাহাদিগকেও অনেক ডাকিয়াছি কিন্তু মা—

ডাকলে তা'রা দেয়না সাড়া,
তাই মা এখন আমি সুধু আমায় নিয়ে
কাতর প্রাণে তোমায় ডাকি।

এখন আমার বলিতে—'আমিই সুধু রৈলে বাকি"—

মা তুমি যে হও সে হও আমার আর কেহ ডাকের লক্ষ্য নাই, আর কোনই আশ্রয় নাই—কে আজ আমার মর্ম্মের নিভৃত কক্ষ হইতে আশ্বাসের মধুর বাক্যে গাহিতেছে—

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি—

মা, তোর মোহান্ধকারে নিপতিত শঙ্কিত ভীত সন্তান বড় বিপদে পড়িয়া ডাকিতেছে—

উঠ মা আনন্দময়ি
খোল মা কুটীর-দ্বার—
আমি যে আঁধারে হেরিতে নারি
এ সংসার পারাবার।

মা আনন্দময়ি, নিভৃত মরম কক্ষার অজ্ঞাত কৌশলময় রুদ্ধদ্বারপথে পর-পারের জ্যোতি-রেখা ত দেখা যায় না! মা তোমার পরাবিদ্যা রূপের মঙ্গলময় অঙ্গুলীর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ ব্যতিরেকে বুদ্ধির অর্গলাবদ্ধ দ্বার ত উন্মুক্ত হইবে না। কাত্যায়নি মহামায়ে, তুমি পৌর্ণমাসি যোগমায়া রূপে নিভৃত নিকুঞ্জের পথ না দেখাইয়া দিলে, পরম পুরুষের রাসমণ্ডলের পথে হাত ধরিয়া না লইলে ত রসময় রাসেশ্বরের সমীপে উপনীত হইতে পারা যাইবে না! যে তুমি সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া রূপে শব্দিতা, যিনি সর্ব্বহৃদয়ে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা, যিনি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াও বিশ্বমাঝে ব্যাপ্তিরূপে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই তোমার—যিনি কামরূপিণী, যিনি কৌষিকীরূপে জগতের ও জীবের ইন্দ্রিয়, বাসনা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি সর্ব্বকোষে অধিষ্ঠিতা সেই তোমার অনুকম্পা ব্যতিরেকে পরমানন্দ মাধবের পদমূলে উপনীত হইবার পথ কোথায়! তাই কৃপাময়ি কৃপা করিয়া তোমার মায়াবদনের হিরণ্ময় অঞ্চল নিমিষের তরে সরাইয়া লও। সুধু নিমিষের তরে সেই সত্যস্বরূপের পরা জ্যোতি দেখিয়া লই, তাই মা তুমি যে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ
সত্যস্যা'পহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষণ অপাবৃণু
সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

আমার মাকে কে দেখবিরে, এমন ঢল ঢল, এমন ছল ছল মহিমাময় উচ্ছলিত রূপ আর কার? ঐ দেখ, মা যে আমার ধরা দিবার জন্যই ধরাসনে সকলের আধার হইয়া বসিয়া আছেন! সকলের সকল তৃষ্ণা মিটাইবার জন্যই যে লীলাময়ী জননী আমার সলিলে তৃপ্তিরূপে উছলিয়া উঠিতেছেন।

দেখ,—"হের তাঁরে অম্বরে?
ঐ দেখ নীলাকাশে নীলবরণী
কত রঙ্গে নৃত্য করে।

কখন জননী আমার নক্ষত্রমণিখচিত বসনে চারু অঙ্গ আবরিত করিয়া প্রশান্ত ললাটে শশিসূর্য্য তিলক পরিয়া ধরিত্রীর কানে ধাত্রী গাঁথায় মধুর স্বর-সঙ্কারে সন্তানদিগকে ঘুম পাড়াইতেছেন, কখন বা জননী আমার মেঘডম্বুর সাড়ীর জলদাঞ্চলে বদনকমল আবরিত করিয়া চঞ্চল হাসির ছটায় তাড়িৎ খেলাইতেছেন। শষ্পাকুল শ্যামধরণীর অঞ্চলান্তরালে সুপ্ত ক্ষুদ্রতম কুসুম-কলিকাটীকে মুহূর্ত্তরূপ মৃদুকরের মলয়-মারুত-পরশে ফুটাইতে ফুটাইতে, ডিম্ব-কোষান্তরালস্থ ক্ষীরাব্ধি-সুকোমল জড়ায়ুশয্যাশায়ি কোকিল-শিশুকে বায়সের বুকের তাপে জাগাইয়া তুলিতে তুলিতে রসময় বরষার বারিবিন্দুসিঞ্চনে তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গকে রেণুরূপে গলাইয়া কল্লোলমুখরা স্রোতোবেগচঞ্চল গিরিজার তরল প্রবাহে ভাসাইয়া দিতেছেন। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ের খেলার অন্ত নাই। মায়ের খেলা দেখিয়া মায়ের অপরিসীম করুণার কি বুঝা যাইবে? মা আমার সর্ব্বতোভাবে অসীম অনন্ত। তাই স্বীয় দৃষ্টিসমক্ষে যখনই যাহা দেখিতে পাও একবার তাহারই দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তাহাই মহৎ—তাহারই অন্তরালে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বৃংহণশীলতা জাগিয়া রহিয়াছে; সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুচ্ছাদপি তুচ্ছ নগণ্য বিন্দুর অন্তরালে সর্ব্ব ঔদার্য্য ও মহত্ত্বসম্পন্ন সিন্ধু নীরবে বিরাজমান রহিয়াছে—সেই খানেই আমার মায়ের বিভূতি; যে ভাবে যেখানে দেখ সেখানেই আমার মা; মা যে আমার সর্ব্বময়ি!!

মা আমার দয়াময়ী আশুতোষগৃহিণী শিবা—না চাহিতেই মা সব দেন। সুখের সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের সুখরূপে মায়ের অঙ্গবিজড়িত, পিপাসার সঙ্গে

মা আমার তৃপ্তিরূপে সুধামাখা সলিলপাত্র লইয়া দাঁড়ায়ে আছেন, ক্ষুধার সঙ্গে বৈশ্বানররূপে শান্তিময়ীর আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। আশাপূর্ণার দ্বারে বসিয়া আশার উদ্রেক হইতে বিলম্ব হয় কিন্তু উদ্রিক্ত আশা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না। যে মা আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার কতকাল পূর্ব্বাবধি মাতৃহৃদয়ে সুধাপূর্ণ ক্ষীরঘট স্থাপনপূর্ব্বক বাৎসল্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁর কাছে আর চাহিব কি? আমার আর প্রার্থনীয় আছে কি? মা যে আমার জনক-জননীতে স্নেহের, ভ্রাতা ভগ্নীতে বাৎসল্যের, সখাসখীতে প্রেমের ডালি সাজাইয়া, নন্দজায়া যশোমতির ন্যায় ক্ষীরসরনবনীত হাতে করিয়া ঐ শোন 'গোপাল আয় গোপাল আয়' রবে আমাকেই ডাকিতেছেন!! এই প্রীতির কলকণ্ঠরব আর কার? এ যে আমার মায়েরই।

এই যে মা আমার ক্রীড়াচত্বরে আমারই ক্রীড়া-কৌতুকের নিমিত্ত কত অভিনব মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! আকাশের নীলিমায়, শশিসূর্য্যের জ্যোতিতে লতিকার লাবণ্যে, শিশুর হাসিতে, মায়ের রূপের শোভা-সম্ভারই ঢল ঢল করিতেছে? পাখীর কাকলীতে, নদীর কল্লোলে ভ্রমরগুঞ্জনে বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে মানবের ভাষায়, ও কাহার কণ্ঠস্বর? উহাও ত আমার মায়েরই। মন্দ মলয়মারুৎ-হিল্লোল, প্রিয়জনের প্রেমালিঙ্গন কুসুমের কোমল স্পর্শ, আমারই মায়ের স্নেহমধুর চুম্বনে অনুপ্রাণিত।

জগন্ময়ী মা যে আমার
জগতেরই গায়ে গা।
জগতেরই মাঝে আবার
জগন্ময়ী ঢালে গা।

সর্ব্বানন্দময়ী জননী আমার সর্ব্বরূপের মাঝে আনন্দের অমৃত-মোদক হাতে লইয়া আমাকেই ত আহ্বান করিতেছেন।

মা যে আমার বিষয়ের আকর্ষণ, মনের মনন, বুদ্ধির বোধ, আমির আমি, চেতনার চৈতন্য! মা যে আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি, নিশ্বাসের বায়ু, জীবনের শান্তি, দেহের মৃত্যু, আশার আশ্রয়, নিরাশার আনন্দ! মা আমার পাপের ভয়, পুণ্যের জ্যোতি, দুরাশার লজ্জা, দুষ্কৃতির দুর্গতি, সুকৃতির সম্পদ, প্রাণের প্রতিষ্ঠা, চৈতন্যের গতি!

কালরূপিণী জননী আমার কলাকাষ্ঠা, মিনিট সেকেণ্ড, পলানুপলের তালে তালে কোমল করাঘাতপূর্ব্বক স্বীয় দোদুল্যমান অঙ্কে আরোহণ করাইয়া প্রতি

পুরাতনের পরিবর্ত্তে শত অভিনব নবীন সাজে সাজাইয়া কত নিত্যনূতন নাট্য রঙ্গ দেখাইতেছেন। পরা জননী আবার, আমার আমিরূপ অস্মিতারাগরঞ্জিত ক্ষুদ্রত্বটুকুকে কালিন্দির কাল সলিলে বিধৌত করিয়া শুদ্ধ পূত পরানুরাগে রঞ্জিত করত পৌর্ণমাসি যোগমায়ারূপে গোপবধূবেশে সাজাইয়া রসময় পরপুরুষের রাসমণ্ডলে লইয়া যাইতেছেন। আহা আমার মায়ের মত এত স্নেহ আর কার ?

ওগো—কার মা এমন দয়াময়ী
আমার মা গো তুমি যেমন।
তোমার বাহিরে আরক্ত আঁখি
স্নেহে সিক্ত প্রাণ মন।

জীবন-বসন্তের নবোন্মেষ দিবসে সিত পঞ্চমীর পূত মুহূর্ত্তে মা তোমারই বীণার ঝঙ্কার কি অপরূপ বাণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হৃদয়-মন্দিরে কি সঙ্গীত জাগাইয়াছিল, তখন যাহা দেখাইয়াছিলে সকলই সৌন্দর্য্য, সকলই জ্যোতি, সর্ব্বত্রই আকর্ষণময়ী কমনীয়তা! মর্ম্মমন্দিরের উচ্চতম শিখরের ঊর্দ্ধে মকরাঙ্কিত কেতনাশ্রিত আসনোপরি উপবিষ্ট হিন্দোললীলাপরায়ণ গোবিন্দের পদমূলে নিঃশেষে উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত যে রাগোজ্জ্বল সুলোহিত ফল্গুরঙ্গ ও কুঙ্কুমকণা-রাশিতে আমার পাত্র ভরিয়া দিয়াছিলে, আমি ত' তাহা গোবিন্দের পদারবিন্দে উৎসর্গ করিতে পারি নাই। সেই রঙ্গে আমার আমিকে রঞ্জিত করিয়া ছিলাম। তাই মা যখন তুমি দশপ্রহরণধারিণী, স্নেহালিঙ্গনোন্মুখ প্রসারিত দশভূজে আপনার অভয় অঙ্কে লইতে আসিয়াছিলে, তখন সেই পরিণত বসন্তের দিবালোকসমুজ্জ্বল ক্রীড়াক্ষেত্রে খেলার আমোদে মত্ত হইয়া ছিলাম মা এখন বেলা শেষ হইয়া আসিল, গ্রীষ্ম বর্ষা অতীত হইয়াছে বড় তাপে দগ্ধ হইয়াছি, বর্ষা প্রাবৃট্ ধারায় ভিজিয়া ভিজিয়া, কড়কাপাতে ক্ষতাঙ্গ হইয়া, আমি দারুণ অশনিসম্পাত-বিশ্লিষ্ট সহচরগণের সঙ্গ বিচ্যুত হইয়া আমি একা হইয়া পড়িয়াছি—শরতের সন্ধ্যা আসিয়াছে, অদূরে শিশিরের দারুণ কুহেলিকা যবনিকার দোদুল্যমান ধ্বজা দেখা যাইতেছে, মন্দমারুত তাহারই শীতল পরশে আমাকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছে আমার ভয় হইতেছে, এখন "জীবনে আমার নেমেছে সন্ধ্যা পরনে গেরুয়া সাজ!" আমি কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আমায় কি মা তোর অভয় কোলে তুলিয়া লইবি না? মা আমি বিমুখী সন্তান বটে, তুমি ত বিমুখী মাতা নও। তুমি ত চির করুণাময়ী! তাই ডাকি ওগো চিরকরুণাময়ি, তাই সাহসে ভর করিয়া ডাকি—"উঠমা আনন্দময়ি খোল মা কুটীর-দ্বার।"

মা তোমার অগণিত কৃতি সন্তান অসংখ্য উপচারে তোমায় অর্চ্চনা করে। কেহ ঘটে, কেহ পটে, কেহ সাললে, কেহ মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে তোমাকে আহ্বান করিয়া বলি নৈবেদ্যাদি সম্ভারে, ধূপ, দীপ, বাদ্য, বস্ত্রালঙ্কারে অর্চ্চনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিতেছে। কেহ বা মরমের অন্তঃপুরে প্রীতির পূত হোমানলে স্বাহামন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত প্রণবগুঞ্জনের মধুর সঙ্গীতে ত্রিজগৎ-উদ্ভাসিত করিয়া তোমার চরণতল সংলগ্ন অক্ষতের অহঙ্কারে আপনাকে ধন্য করিয়া লইতেছে। মাগো তোমার চরণতলেত' সকল হৃদয়ের সকল স্পন্দনই পরিগৃহীত হয়, কেহইত উপেক্ষিত হয় না। তোমার চরণতলে দেবতার দত্ত সৌন্দর্য্যের আধারভূত সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরসময় কমলদল যেখানে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, মাগো সেই খানেই আবার দানবদত্ত বৈরতার বহ্নিতাপ-প্রদীপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার স্থান লাভ করিতেছে। ওগো, আশিষের পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় জিঘাংসার শস্ত্রবর্ষণেও যে মায়ের অনুকম্পা অক্ষুণ্ণ! তাঁহার চরণতলে, তোমার সেই উদার প্রশান্ত পাদপদ্মে এই অকৃতি অধম সন্তানের মর্ম্মভেদি কাতর প্রার্থনা অবশ্য পঁহুছিবে, তবে আর ভয় কি? সাহস পাইয়াছি, আশায় বুক ভরিয়া উঠিল—

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
বড় আশা আছে পাব
জীবনে না হয় মরণে।

মা, তোমার চরণে আমি কি অর্ঘ্য দিব মা! আমার এমন কি আছে—যা আমি তোমার চরণে উপহার দিতে পারি! এই বিচিত্র বিতানভূষণ নানাবর্ণ সমুজ্জ্বল কুসুমদাম! মাগো এই প্রতি কুসুমদলের প্রতি রেখাই যে তোমারই স্বকরকমলধৃত তুলিকাঙ্কিত বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল, কোন্ সাহসে উহাকে বৃন্তচ্যুত করিব! এই কুসুমহার যে তোমারই বসুন্ধরা মূর্ত্তির কণ্ঠভূষণ! মা সর্ব্বাধার-ভূতা বসুন্ধরে, তোমার কুসুমহার তোমার কণ্ঠে থাকুক, আমার পূজা না হয় নাই হইল।

মা, তবে কি তোর এই দীন তনয় তোমার অর্চ্চনা করিতে পাইবে না! শৈবালে শাদ্বলে, তৃণে লতায় পাতায়, তরুশাখে সর্ব্বত্র এই যে তোমার, তোমারই কমলকরাঙ্ক অঙ্কিত রহিয়াছে?

—অনেক দিনের কথা, লোকপাবন দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র তোমার পদমূলে অষ্টোত্তরশত নীলোৎপলোৎসর্গের সঙ্কল্পে বিফলপ্রযত্ন হইয়া স্বীয় নয়নেন্দিবর

উৎপাটনপূর্ব্বক তোমার পদে প্রদান করিতে প্রয়াসপরায়ণ হইয়াছিলেন। এতার সেই তরল তত্ত্ব তুমিই স্বতন্ত্ররূপে আজ মানসে জাগরিত করিয়াছ। আমারও ত হৃদয়কমল আছে। একি, এ হৃদয় কাহার! এ হৃদয় কাহার আসন! এখানেও তোমারই পদচিহ্ন; তুমিই যে ঈশ্বররূপে সর্ব্বহৃদয়ে বাস করিতেছ। আমার বলিয়া যাহা কিছু সকলই যে তোমার স্নেহের দান! তুমিই যে একটী অতি ক্ষুদ্র জীবাণুকে জননীর জড়ায়ুকোষের গর্ভোদকে ভাসাইয়া এই দেহ গঠন করিয়া দিয়াছ। সকল বাসনার মধুময় আকর্ষণে যে তুমিই কামরূপে খেলা করিতেছ! তুমিই যে, মানসে মনন বুদ্ধির অবসান, আমির গতি, চিত্তের বৃত্তি! তবে আমি তোমায় কি দিয়ে পূজিব! আমি কিছুইবুঝি না, বুঝিতে পারি না, সকলই প্রহেলিকাময় কুহেলিকার তিমিরাচ্ছন্ন। ওগো গায়ত্রিরূপিণী আনন্দময়ি—"তন্নো ধিয়ো প্রচোদয়াৎ।"

তোমার আলোতে আমার 'আমি'কে সবার "আমি"কে,—"মহে রণায় চক্ষসে"—অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া দাও। ওই উঠ মা আনন্দময়ি, খোল মা খোল মা কুটীর-দ্বার। আমার 'আমি'—বিশ্বের আমির কণা আমি—অন্ধকারে কাতর। মা, আমার আমিকে তোমার আলোকে পথ দেখাও মা—

আমি আঁধারে হেরিতে নারি
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার।
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসীনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব।

একটী বৈদিক প্রার্থনা।

আব্রহ্মণ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্।
আরাষ্ট্রে রজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী
মহারথো জায়তাম্।
দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়ানড্বানাশুঃ সপ্তিঃ
পুরন্ধির্যোষা জিষ্ণু রথেষ্ঠাঃ।
স ভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাম্।
নিকামে নিকামে পর্জ্জন্যো বর্ষতু।
ফলবত্যো ন ঔষধয়ঃ পচ্যন্তাম্
যোগঃ ক্ষেমো নঃ কল্পতাম্॥
যজুর্ব্বেদঃ।

* যজুর্ব্বেদের কোন ঋষি যজমানের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সময় স্বদেশের হিতকামনায় এই প্রার্থনা করিতেছেন।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ"

৬ষ্ঠ ভাগ।] পৌষ ও মাঘ ১৩২৪ [৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

নাটুয়া।

(১)

আমার নিবিড় প্রাণের গোপন ঘরে
বাজে গো কার বীণ ;
সে যে ক'য়না কথা অলস মুখে
বাজায় রাত্রি দিন ॥
চায় না ফিরে আপন নেশায়,
মত্ত সে তার অচিন ভাষায় ;
জানি না সে কোন বিদেশী
এমন সংজ্ঞাহীন।
বাজায় আমায় পাগল ক'রে
বাজায় রাত্রি দিন ॥

(২)

আমার এবে কি দায় হ'ল
ঘরে থাকাই ভার,
সে যে লুকিয়ে আসে টেনে হেনে
গভীর অন্ধকার ॥

ডাক্‌লে তারে না দেয় সাড়া,
কোন্ বিদেশী এম্নি ধারা,
বাজায় আমার দোরের গোড়ায়,
বাজায় রাত্রি দিন।
ভোরের পাখী ক'য়না কথা
এমন গো তার বীণ॥

(৩)

আমি যতই কণ্ঠ ছিঁড়ে
বলি থামাও বীণ,
সবই যেন একি বালাই
হাওয়ায় হয় গো লীন॥
আপ্নিই সে সুর উচ্চে বাজে,
তরাস-লাগা কক্ষ মাঝে ,
বেদন-ভরা বঁধুর সাজে
বাজায় রাত্রি দিন।
(ওগো) এম্নি ক'রেও মজাল'রে
পাগলকরা বীণ॥

(৪)

দেখ্‌তে তারে যতই চাহি
ততই সে মুখ গুজে,
ছাড়্‌তে তারে যতই চাহি
ততই ধরে নিজে।
কেবল তাহার রূপের ঝলক,
চম্‌কে পোড়ায় চোখের পলক ;
আঁধার ঘেরা মায়ার কলক,
সকলে কর হীন
পাগলে আজ কর্লে পাগল
আকুল-করা বীণ॥

(৫)

(ওগো) প্রথম আলো রক্ত চোখে
ঝলক্ যখন হানে,
অসঙ্কোচে বীণটী তাহার
ঝালে আমার কাণে ॥
পরাণে মোর কাঁপন ধরে,
বক্ষে যেন কি ঝড় উড়ে ;
ব্যথায় কনক-স্বর্গ রাজে
সকল ক'রে লীন,
বীণে বুঝি কর্লে আমায়
দীনের সেরা দীন ॥

(৬)

আমার ঘরের সকল বেসাত
রইল গো অই পড়ে ;
এ পোড়া বীণ দিল'রে মোর
সবায় পাগল করে ॥
জানি না কোন্ আকর্ষণে,
সবাই ছোটে তারই পানে ;
আমার সকল আপন জনে
কর্লে উদাসীন ,
কি কুক্ষণে বেজেছেরে
এমন পোড়া বীণ ॥
ঘরে আমার নেইক' কিছু
সবই গেছে লুটে,
এখন যেন কে আসে গো
গভীর আঁধার টুটে ॥
নিঝুম শ্যামল সজীবতায়,
পরাণে মোর ঝিলিক্ দোলায় :

আমার কিছু নেইক' কিছু
বাজে রাত্রি দিন,
কি যাদু-জাল পেতেছেরে
আকুল করা বীণ॥

(৮

ও পিয়াসি! কে তুমি গো
একটু ফিরে চাও,
একটু চোখের আশীষ-কণায়
বুক জুড়িয়ে দাও॥
তাই পেয়ে এ সকল ছুড়ে,
ভাসি তোমার বীণের সুরে;
নিবিড় ঘরে সবায় ঘিরে
দীনের চেয়ে দীন,
শুনি তখন কেমন বাজে
কনক-হাতের বীণ॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

জীবতত্ত্ব।

জীব আজ আনন্দভিখারী। আনন্দ হইতে জীব জন্মিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত আছে, দেহান্তে আনন্দেই মিশিয়া যায়—আনন্দই সর্ব্বস্ব, আনন্দই জীবন, আনন্দই স্বরূপ, তাই জীব সতত আনন্দলাভপ্রয়াসী। যে মুহূর্ত্তে জীব আনন্দচ্যুত হয় তখনই উৎকণ্ঠাস্ফুটিতকণ্ঠে হা-হুতাশ করিতে করিতে চারিদিকে অন্বেষণ করে এবং যে পদার্থই চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হয় তাহাই আনন্দদায়ক মনে করিয়া গ্রহণ করে,—আনন্দহারা বা আত্মহারা হইয়া জীব তখন বিচারে অসমর্থ হয়। নিরানন্দকেও আনন্দখনি বলিয়া মনে করে, অসুখের আস্পদকে সুখের একমাত্র নিদান বোধ করে; আপাতরমণীয় ধন-জন পুত্রাদি-বিষয়কে সুখময় মনে করিয়া বিষয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, শেষে চিরাকাঙ্ক্ষিত বস্তুটী পর্য্যন্ত ভুলিয়া পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মরণাদি দুঃখসাগরে চিরনিমজ্জিত হয়। দুই

একটী সুকৃতিশালী সুবুদ্ধি জীব দুই চারিবার দুঃখের প্রবল তরঙ্গে নিতান্ত আহত হইয়া পূর্ব্বপুণ্যফলে শ্রীভগবৎপ্রসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়, ক্ষণিক বিষয়ান্বেষণে বিরত হয়। শাস্ত্র ও গুরূপদেশে নির্ম্মল আনন্দের একমাত্র খনি আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করিতে থাকে। তপঃস্বাধ্যায়াদি অবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কৃতের ফলে জীব তখন বিষম সন্দেহস্রোতে ভাসিতে থাকে। মনে উঠে, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, চিদানন্দময়, নির্গুণ আদ্যন্তহীন শাশ্বত পুরুষ। আমি যে অতি ক্ষুদ্র জীব, সান্ত ও গুণময়। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অতীত, নিখিল শব্দরাশি যাঁহার অণুমাত্রও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং যিনি, ক্ষুদ্র মনের দ্বারা ধ্যান-ধারণা-সমাধি অবলম্বনে জীব তাঁহাকে কিরূপে লাভ করিবে? যিনি শব্দের অতীত, বেদাদি শাস্ত্র তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষ", যিনি "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন বা" যিনি দুষ্প্রাপ্য; শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "যন্মনসা ন মনুতে", সেই নিষ্প্রপঞ্চ, জ্ঞানাতীত বাঙ্মনের অগোচর পরম পুরুষকে শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা কিরূপে জীব পাইবে? তপঃ-স্বাধ্যায়াদি যোগোক্ত ক্রিয়াই বা কিসের জন্য অনুষ্ঠেয়। সন্ধ্যাবন্দনাদি শাস্ত্রবিধিরই বা আবশ্যকতা কোথায়? সতত জীব এইরূপ সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতে থাকে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় জীব তখন প্রকৃতির বশীভূত হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। কোনও কোনও ভাগ্যবান্ সাধক অনন্যগতি হইয়া গুরূপদেশে করুণৈকমূর্ত্তি ভগবতী শ্রুতিদেবীর শরণাপন্ন হন। পরম করুণাময়ী জননী সেই শরণাপন্ন সংযমী সাধককে ধীরে ধীরে কর্ত্তব্যের গন্তব্যপথে হাত ধরিয়া অগ্রসর হয়েন। শ্রুতি তখন বলেন——

"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, সর্ব্বং মতং ভবতি, সর্ব্বং শ্রুতং ভবতি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম।" "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি। সেই চিদানন্দঘন সর্ব্বব্যাপী শাশ্বত পুরুষকেই জান। তুমি অনায়াসে শোকমোহসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দ-রাজ্যে গিয়া আনন্দময় হইয়া যাইবে।

যদি তিনি কোনওরূপেই জ্ঞানের বিষয় না হইতেন তবে তৎকর্ম্মক জ্ঞানোপদেশ আকাশকুসুমের দ্বারা পূজাবিধির ন্যায় নিরর্থক হইত। "তাঁহাকে জান" একথা বলিলে তিনি জ্ঞানের কর্ম্ম হয়েন। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী ভাব উপস্থিত হয়। একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রুতির অবসর থাকে না।

সুতরাং সর্ব্বাগ্রে "জানা বা পাওয়া" কথাটীর বিশ্লেষণ আবশ্যক। শ্রুতি বলিলেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। নুনের পুতুলের সমুদ্র পাওয়ার ন্যায় ব্রহ্মচৈতন্যসাগরে নিমজ্জিত জীব তৎস্বরূপই প্রাপ্ত হয়। 'জ্ঞান' এস্থলে ঘটপট-মঠাদির জ্ঞানের ন্যায় খণ্ডজ্ঞান নহে। অখণ্ড আত্মস্বরূপ জ্ঞান। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জ্ঞান। অস্মদাদির চিত্তদর্পণের বিষয়ীভূত জাগতিক কোনও পদার্থের ব্রহ্মাতিরিক্ত রূপে অস্তিত্ব জ্ঞানী পুরুষের নিকট থাকে না। তিনি সর্ব্বত্রই এক ব্রহ্মসত্তা অনুভব করেন।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্।
অজ্ঞানাদ্ ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ॥

এই জ্ঞান তাঁহার হয়। অথবা তাঁহার কিছুই জ্ঞান হয় না। জ্ঞান ও তাঁহাতে কিছুই ভেদ থাকে না। তিনিই জ্ঞানস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মেঘমুক্ত দিনকরের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইতে থাকেন।

অতএব আমিই সেই সর্ব্বব্যাপী চিদানন্দময় ব্রহ্ম, আমি ক্ষুদ্র জীব নহি। আমার বন্ধ নাই, মুক্তি নাই, উদ্বেগ নাই, অভাব নাই, চলন নাই; আমি চির শান্ত, নিত্যতৃপ্ত।

"নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিৎ।"
"দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্ব্বং একোঽহং চিদ্রসোঽহমলং॥"

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই পরমার্থতত্ত্বে উপনীত হইয়া নিজের যথার্থ স্বরূপাধিগমই "পাওয়া বা জানা" শব্দের প্রকৃত অর্থ।

ইহা ভিন্ন আরও পাওয়া আছে—বিশ্বাসী ভক্ত জীব কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সগুণ, অবতার ও জীবভাবকে তৎস্বরূপে পাইয়া থাকেন।

তিনি সর্ব্বত্রই মনুষ্য, পশু পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, আকাশ, বায়ু, জল, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিরূপে স্বমহিমায় সতত বর্ত্তমান। রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তিতে সেই চৈতন্যময় পরম পুরুষ সর্ব্বদাই অবস্থিত। শ্রুতিবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে সংসারদুঃখসন্তপ্ত নির্ব্বিণ্নচিত্ত জীব তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্ব্বত্রই সেই পরিপূর্ণ চৈতন্যের সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করেন; লয় বিক্ষেপ প্রতিষেধের জন্য স্বহৃদয়ের অষ্টদলস্থ রাম কৃষ্ণাদি যে কোন একটী ধ্যেয় চৈতন্যকে ধ্যান ধারণা দ্বারা উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হন। ক্রমে ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্তাবস্থা অপনীত হয়। সাধক একাগ্রভূমিতে উপনীত হন। তখনই পরমার্থস্বরূপ ধ্যেয় চৈতন্যটী

উপাসকের মনোভাবানুযায়ী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হয়েন। সাধক কৃতার্থ হন। এও "পাওয়া"। ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন—"যস্থেকাগ্রে চেতসি যদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি" "পরমার্থভূতং ধ্যেয়ং বস্তু" (ইতি বালানন্দ স্বামী)। "প্রদ্যোতয়তি সাক্ষাৎ-কারয়তীতি চ" স্বামী।

যেদিন স্বাধ্যায়াদির প্রযত্নানুসারে বিক্ষেপ কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হয়, রজস্তমোগুণ দুর্ব্বল করিয়া সত্ত্বগুণ জাগিয়া উঠে, সেইদিন যেন একটা অপূর্ব্ব আনন্দস্রোতে মন ভাসিতে থাকে ; হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধাদি দস্যুগণ দিবাভীত চোরের ন্যায় কোথায় লুকাইয়া যায়। প্রবল সত্ত্বের প্রকাশিনী শক্তির সামর্থ্যে চিত্ত কোনও কোনও বিষয় বেশ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ; তখন যে শান্তি চিত্তে জাগিয়া উঠে, কোটিকল্পকাল উপভোগ করিলেও বিষয়ে সে শান্তি মিলিবে না। বিষয় সে সুখ দিতে পারে না। সত্য সত্যই কণ্টক একটু দূর হইলেই তিনি আসেন, নতুবা শুষ্ক হৃদয়মরুতে আনন্দ কোথা হইতে আইসে? দুর্জ্জয় রিপুই বা কাহার ভয়ে লুকায়? এই নির্বিষয় আনন্দলাভ করাও তাঁহাকে "পাওয়া"। ইহা একাগ্রতার ফল।

এই সব পাওয়া হইতে হইতে প্রকৃত পাওয়া যে আত্মস্বরূপলাভ, নিরোধাবস্থাতেই তাহা হইয়া থাকে।

কর্ম্মাধীন ক্ষুদ্র জীবের এই আত্মস্বরূপাপত্তি কিরূপে হইতে পারে তাহাই আমাদের আলোচ্য।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"তং দুর্দর্শং গূঢমনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং, অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি"।

অদৃশ্যং বলেন নাই, বলিলেন "দুর্দর্শং" ; সেই অতিসূক্ষ্ম, প্রাকৃত বিজ্ঞানের অগোচর, পরমপুরুষকে অতিদুঃখে জানা যায় এই কথা বলিয়াই উপায় নির্দ্দেশ করিলেন—"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন"। জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া যথার্থ জ্ঞানপুরঃসর আত্মস্বরূপে চিত্ত সংস্থাপন দ্বারাই তিনি দৃশ্য। দৃশ্য বলিলে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই ত্রিবিধ জ্ঞান উপস্থিত হয়, অদ্বৈত হানি হয়— এই আশঙ্কাতে পুনরায় বলিলেন "হর্ষশোকৌ জহাতি"। স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মতত্ত্বটী তীক্ষ্ণাংশুর অংশুজালের ন্যায় সর্ব্বদাই প্রকাশমান। তিনি কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়ার অগোচর। এই জন্যই বলিলেন—তিনি সতত প্রকাশশীল হইলেও অজ্ঞানমেঘাবৃত জীব শোক-মোহাদিদ্বারা আবৃতচক্ষু হইয়া তাঁহাকে জানিতে অসমর্থ

হয়। অধ্যাত্মযোগদ্বারা অজ্ঞান-মেঘ অপসারিত হইবে ; শোকমোহাদি আবরণ দূর হইবে। তখন নির্ম্মলবুদ্ধি জীবের চিত্ত-দর্পণে আত্মরশ্মি সহজেই দিগন্ত উদ্‌ভাসিত করিয়া প্রতিফলিত হইবে।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে" বলিবার পরই শ্রুতি বলিতেছেন—

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"

তিনি অবিদ্যা দ্বারা যেন আচ্ছন্নমত হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়গুহায় বিরাজিত থাকিলেও কাহারও নিকট প্রকাশিত নহেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ"। কিন্তু সূক্ষ্মবস্তু দর্শনশীল বিবেকী ব্যক্তি রাগ-দ্বেষশূন্য নিষ্কাম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন।

শ্রুতি বলিলেন "যন্মনসা ন মনুতে"। পরেই বলিতেছেন—

"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং" ইত্যাদি।

অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি মলদুষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন অসংস্কৃত বুদ্ধির অগম্য হইলেও শোক মোহাদি কষায়শূন্য সংস্কৃত বুদ্ধি একাগ্র নিরোধশীল জীবের তিনি অতি সুলভ।

"ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মননিদিধ্যাসনসংস্কৃতং মন এব কারণং মনোঽগম্যত্ব শ্রুতিশ্চ অসংস্কৃতমনোবিষয়া" ইতি। (বেদান্তপরিভাষা)

শ্রুতি যেস্থানে নির্গুণব্রহ্মকে জ্ঞেয় বা দৃশ্য বলিয়াছেন সর্ব্বত্রই তাহা চিত্তশুদ্ধি-পর বুঝিতে হইবে। কারণ—

মায়া-মেঘাবৃত অশুদ্ধচিত্ত সেই স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তু জানিতে পারে না। কর্ম্ম ও সাধনা দ্বারা চিত্তগত অবিদ্যাদি অশুদ্ধি বিদূরিত হইলেই চিত্ত নির্ম্মল হয়। ক্রমে মায়ামুক্ত জীব আত্মস্বরূপাধিগমে সমর্থ হয়। সুতরাং "পশ্যতি" বা "পশ্যেৎ" বা "জানীয়াৎ", "বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যাদি স্থলে "চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ" (সুতরাং আত্মরূপেণ চিরস্থিতির্ভবেত) ইহাই তাৎপর্য্য।

কর্ম্ম বা ভক্তি স্বয়ং আত্মরাজ্যের সীমায়ও উপস্থিত হইতে পারে না। সর্ব্ব কামনা ত্যাগ হইলে একমাত্র "জ্ঞানের" দ্বারাই তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" (শ্রুতিঃ)

"ত্যাগেন বাসনাত্যাগেন" ইতি শঙ্করাচার্য্যঃ। এই স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানকে বা জ্ঞানস্বরূপকে অশুদ্ধচিত্ত জীব জানিতে পারে না।

আত্মস্বরূপ বিস্মরণেই স্বতঃশুদ্ধচিত্ত প্রধানতঃ অশুদ্ধ হয়। পাপই চিত্তকে

স্বরূপ চ্যুত করে। পাপক্ষয় হইলেই জীব স্বরূপাভ্যাসের সাহায্যে ক্রমে স্বরূপ লাভে সমর্থ হয়। তপঃ-স্বাধ্যায়াদি কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হয়।

"কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততোজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে" (স্মৃতিঃ)

কর্ম্মের দ্বারা রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধাদি কষায় অপনীত হইলে জ্ঞানভাস্কর চিত্তাকাশে সমুদিত হন।

কর্ম্ম ও ভক্তিদ্বারা যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মলাভ অসম্ভব, তথাপি স্বরূপলাভ-প্রতিবন্ধক মূল অজ্ঞান নষ্ট হয়, একজন্যই কর্ম্ম ও উপাসনা আত্মলাভের কারণ। অজ্ঞান হইতেই অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাদি ক্লেশ জন্মে। ক্রমে পাপরাশি সঞ্চিত হয়। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া পাপময় চিত্তের পরামর্শে আপাতসুখে উন্মত্ত হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। তাহার ফলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। আত্ম বিস্মৃতিকর কর্ম্মসমূহই পাপজনক। এবং যে কর্ম্মের ফলে চিত্তদর্পণে আত্মবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেই তপস্যা স্বাধ্যায় উপাসনাদি শুভ কর্ম্মগুলিই পুণ্যজনক বা অজ্ঞাননিবর্ত্তনের দ্বারা আত্মপ্রাপ্তির কারণ।

শ্রুতি যে অধ্যাত্মযোগের দ্বারা আত্মলাভের কথা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

বিষয়প্রতিসংহৃত চিত্তকে আত্মতত্ত্বে সংস্থাপিত করাই অধ্যাত্মযোগ। এস্থলে আপত্তি এই—"অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" যিনি, তাঁহাতে অন্যের সংযোগ অসম্ভব। বিশেষতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ং"। তিনি ভিন্ন চিত্তাদি কিছুই নাই। তবে অধ্যাত্মযোগ কিরূপে বা কাহার হইবে?

সর্ব্বজ্ঞা শ্রুতিই এ সংশয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। বলিয়াছেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম"

শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন—

"মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইতি।

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"।

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইত্যাদি।

সুতরাং যাবতীয় দৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ একমাত্র তিনিই। সেই কর্তৃত্বাদিশূন্য অসঙ্গপুরুষ কার্য্যকারণের অগোচর হইলেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-শালিনী জড়া প্রকৃতি স্বীয় ধর্ম্মগুলি তাঁহাতে আরোপিত করিয়াই নির্ধর্ম্মক পুরুষকে কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতাদিরূপে সজ্জিত করে। সর্ব্বত্রই একমাত্র সৎ চিৎ

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই। চন্দ্র সূর্য্য আকাশ জল বায়ু মনুষ্য সাগর পর্ব্বতাদি যাহা কিছু অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে দৃশ্য আছে, তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া।

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা"।

সর্গ স্থিতি বিনাশ প্রকৃতিরই হয়। প্রকৃতি সৃষ্টি করেন, প্রকৃতিতেই সব লীন হয়; আবার আত্যন্তিক প্রলয়ে এই প্রকৃতিরও লয় হয়। চুম্বকসন্নিধানে লৌহের স্পন্দনের ন্যায় পরমাত্মসন্নিধানে গুণময়ী প্রকৃতি স্বভাবতঃই কম্পিত হন। ইহাই সৃষ্টি। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, নিত্যতৃপ্ত সেই শান্ত পরমাত্মকর্তৃক যেন প্রেরিতা হইয়া চেতনায়মানা হইয়াই, প্রকৃতি বিচিত্র সৃষ্টি রূপে পরিণত হয়েন। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও খণ্ড মত প্রতীত হয়েন। যখন সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি বা প্রকৃতি বা মায়া স্বাভাবিক চাঞ্চল্যবশতঃ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে তখন চলনরহিত পরম শান্ত ব্রহ্ম হইতে উনি ভিন্নরূপে প্রতীতা হয়েন।

প্রলয়াবস্থায় যখন কৃতার্থ হইয়া পুরুষের পায়ে মিলিয়া যান আর কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি থাকে না সৃষ্টি হয় না, তখন "এক অদ্বিতীয়"।

গুণের চাঞ্চল্যসময়ে প্রাধান্যবশতঃ প্রথমেই সত্ত্বগুণ চঞ্চল হয়। অন্য দুইটী অভিভূত থাকে। পরে রজোগুণ, ক্রমে তমোগুণ চঞ্চল হইয়া তৎপ্রতিবিম্বিত অখণ্ড চৈতন্যকে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি উপাধিতে বিবর্ত্তিত করে।

"স চ পরমেশ্বর একোঽপি স্বোপাধিভূতসত্ত্বরজস্তমোগুণাভেদেন ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরাদি শব্দবাচ্যতাং ভজতে" (বেদান্তপরিভাষা)

সত্ত্বগুণ চঞ্চল ও প্রধান হইলেই ঐ গুণপ্রতিবিম্বিত গুণাভিমানী পুরুষ প্রথমেই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব বা সমষ্টিবুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য হিরণ্যগর্ভরূপ ধারণ করেন। তখন তিনি মায়ার ইচ্ছাক্রিয়াদি শক্তিতে অভিমান করিয়া ইচ্ছা করেন—"অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়"। আমি শরীরী হইব। চৈতন্য ও গুণশরীর ত্যাগ করিয়া ভূতময় শরীর গ্রহণ করিব। বহুরূপে বিবর্ত্তিত হইব। ইহা ইচ্ছা মাত্রেই আপেক্ষিকব্যাপী সত্ত্বগুণময় মন উৎপন্ন হইল। মন সৃষ্টি করিয়া ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি করেন, ক্রমে পঞ্চীকরণের দ্বারা তাহা স্থূল ভূতরূপে পরিণত করেন, পরে এই হিরণ্যগর্ভচৈতন্য স্থূলভূত-সমষ্টিতে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাট্ নাম ধারণ করেন, অনেন জীবেন ইত্যাদি।

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ "(শ্রুতিঃ)। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সত্তাবান্ বা চেতন প্রতি পাদার্থে ইনিই অনুপ্রাবিষ্ট হইয়া নামরূপশালী হইয়াছেন।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং নাম রূপঞ্চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপমতো দ্বয়ম্" ইতি।

সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। নাম ও রূপ জগৎ বা প্রকৃতির।

নাম ও রূপের অবগুণ্ঠনে আত্মস্বরূপ ঢাকিয়া যে পরমতত্ত্বটী সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান তিনিই অনুসন্ধেয়, তিনিই গন্তব্য। পদার্থদর্শনের সময় ঐ দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া দৃষ্টি যদি স্বরূপে পৌঁছায় তবেই প্রকৃত দর্শন হয়। ঐ কবচে প্রতিহত হইয়া দৃষ্টি যদি প্রত্যাবৃত্ত হয় তবেই জীব অমৃতাস্বাদনে চিরবঞ্চিত হইয়া অনন্তকাল নামরূপের আবরণের ভিতর দিয়া গতাগতি করিতে থাকে। এই আবরণমধ্যবর্ত্তী এক ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বদা ধ্যেয়রূপে অনুভব করিতে চেষ্টা করাই অধ্যাত্ম যোগ। সুতরাং জীবের অধ্যাত্ম হইবার আশঙ্কা আর রহিল না।

নির্গুণ নিরুপাধিক চৈতন্য বাঙ্মনের অগোচর হইলেও সগুণ সোপাধিক চৈতন্য হিরণ্যগর্ভাদি মননিদিধ্যাসনাদি দ্বারা জ্ঞেয়। হিরণ্যগর্ভ চৈতন্যই জীবোদ্ধারের জন্য রাম কৃষ্ণ কালী প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হয়েন। ভক্তের চিত্তগত ভাব অনুসারে ইনিই তত্তদ্রূপ:ধারণ করেন।

"ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ"।

জীবের কর্ম্মবন্ধনমোচনোদ্দেশ্যে উপাসনার সুবিধার জন্য যে রূপ তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই রূপের সাহায্যে ধ্যান ধারণা সমাধি দ্বারা চিত্ত তাঁহাতেই সংস্থাপিত করিতে হইবে। এ সংস্থাপন নামরূপ বাদ দিয়া বাহ্য পদার্থের মধ্যেও হইতে পারে এবং মধ্যে অনাহত কূটস্থাদি স্থানেও হইতে পারে। ইহাকেই অধ্যাত্মযোগ বলে। অর্থাৎ সগুণ আত্মায় চিত্তসংযোগ। এই অধ্যাত্মযোগের দ্বারাই সাধক ক্রমে স্বরূপে পৌঁছাইতে পারেন।

"উপাসকহিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"

"ব্রহ্মণঃ" ইতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য নিজেই নিজের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। যদিও নাম ও রূপ প্রকৃতির, তথাপি "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" (শ্রুতিঃ) অবিদ্যা স্বরূপ নাম ও রূপের সাহায্যে চিত্তের লয়-বিক্ষেপাদি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মস্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা জীব শাশ্বত ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ

জীবের স্বরূপাধিগমের জন্য তপস্যা স্বাধ্যায় ও উপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন। রাম কৃষ্ণ কালী প্রভৃতি হিরণ্যগর্ভ চৈতন্যই জীবরূপে দেহীর হৃদয়াকাশে সতত দেদীপ্যমান। হৃদয়কূটস্থাদি স্থানে ধ্যেয়চৈতন্যকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিবার অভ্যাসের নাম সাধনা। সাধনায় উপবিষ্ট সাধক তত্তৎস্থানে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তির সাহায্যে ঐ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মচৈতন্যকে ধ্যান করিতে করিতে যখন একাগ্র হন, তখন তাঁহার চিত্তে স্বতঃই বিচার আইসে এই জ্যোতির্ম্ময় পরমশান্ত পুরুষ ত এতটুকু ক্ষুদ্র নহেন, ইনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ভূরাদি সপ্তপাতাল ইঁহার পাদদ্বয়; অন্তরীক্ষ হইতে দ্যুলোক ইঁহার হৃদয়াদি মধ্যস্থান; মহ-আদি উর্দ্ধলোক মস্তক; ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি শিরোভূষণ; সূর্য্যদেব চক্ষু; গ্রহনক্ষত্রাদি কণ্ঠের সুশোভিত হারমালা; পূর্ণচন্দ্র তারমধ্যমণি; অষ্টদিক্ ইঁহার বসন; অনন্তরত্ন সমুজ্জ্বল রত্নাকর ইঁহার চন্দ্রহার; পাতালতলবাসী অষ্টনাগ নূপুর; সর্ব্বলোকস্থিত বনস্পতি ও পর্ব্বতসমূহ দীপ্যমান রোমরাজিরূপে ইঁহাকে সুশোভিত করিয়াছে; সপ্তর্ষিগণ হাতের বলয় ইত্যাদি। এইরূপে সর্ব্বসুষমার বিরাট্ চৈতন্যকে স্বহৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে উপাসকের ক্ষুদ্র হৃদয় চতুর্দ্দশ ভুবন ছাইয়া ফেলে, ক্ষুদ্র দেহেন্দ্রিয়ের আমিত্ব বোধ অপসৃত হয়। মনে হয় আমিই বিরাট্। বাস্তবিক ভাবনার দ্বারা তদ্রূপাপত্তি হয়। প্রত্যক্ষাদি স্থলে চিত্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্গত হইয়া তত্তৎ বস্তু-আকারে আকারিত হয়। জল যেমন নিজের আধারপাত্রের আকার ধারণ করে তদ্রূপ। পরে তদ্রূপাপন্ন চিত্ত ভিতরে গিয়া বুদ্ধিতে অর্পিত হয়, তখন বুদ্ধি বা বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য (জীব) বলেন—হাঁ আমি দেখিলাম ইত্যাদি। ভাবনাস্থলেও ঠিক এইরূপে চিত্ত তত্তৎ ভাব্যবস্তুর আকারে আকারিত হয়। চিত্ত তাহাই হইয়া যায়। ভাবনার দৃঢ়তা হইলেই তদ্রূপাপত্তি চিরস্থায়ী হয়। যোগার্থেও দেখা যায়—ভূধাতুর অর্থ হওয়া। ণিচের অর্থ প্রয়োজক। সুতরাং ভাবি—অর্থ হওয়ান। ভাববিহিত অনটের পৃথক্ অর্থ নাই। কাজেই ভাবনা অর্থে তদ্রূপে হওয়ান বা পরিণত করান। চিত্ত তদ্রূপে পরিণত হয়, বুদ্ধি চিত্তকে তদ্রূপে পরিণত করায়। ইহাই ভাবনা শব্দের ফলিতার্থ। বিরাট্ ভাবনায় জীব বিরাট্ হয়, হিরণ্য-গর্ভভাবনায় হিরণ্যগর্ভ হয়। আবার অশ্ব-মহিষাদি বা স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াদির ভাবনায় জীব ইহকালে না হয় পরকালে তাহাই হইয়া যায়।

এইরূপ ভাবনাভ্যাসের পরিপাকে মনে হয় জাগতিক দৃশ্যনিচয়ে এক মাত্র

আমিই বর্ত্তমান, আমার সত্তাতেই পদার্থের অস্তিত্ব, জীবের জীবভাব। তখন আর বিষয়বাসনা পিশাচী হৃদয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিতে পারে না; ক্ষুদ্রত্ব আমিত্ব দূর হয়, স্বতঃই বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত হয়। একের প্রতি অনুরক্তিই ইতরে বৈরাগ্যের কারণ। যতক্ষণ না ভগবানে কিছু না কিছু অনুরাগ জীব-হৃদয়ে আবির্ভূত হয় ততক্ষণ বিষয়ে বৈরাগ্য আসিতেই পারে না। ভগবানে অনুরাগের আধিক্য অনুসারে বিষয়ের অনুরাগ তত কমিতে থাকে। জীব যখন বহুজন্মবাঞ্ছিত আত্মরসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি-সুন্দরী ইহা অপেক্ষা কোন্ সুন্দরতম বস্তুর প্রলোভনে সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। ভোগবাসনা ততক্ষণ, যতক্ষণ সাধক আত্মরসে বঞ্চিত থাকে, আনন্দের আধার না পায়। একবার আত্মামৃতসাগরের কূলে উপস্থিত হইতে পারিলেই স্ত্রী পুত্র ঐশ্বর্য্য ভোগ বিলাস—এমন কি দুঃখাসংভিন্ন সুখবিশেষের আধার স্বর্গও অতি অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। তখন এই বিরাট্ চৈতন্য শরণাপন্ন সাধককে কোলে তুলিয়া নিজের সূক্ষ্ম পরম রমণীয় হিরণ্যগর্ভ চৈতন্যের নিকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। তাই প্রতিদিন জলরূপী বিরাট্ চৈতন্যকে বলা হয় "মহে রণায় চক্ষসে"। জীব সেই চৈতন্যামৃতসাগরে স্নান করিয়া রজস্তমো-রহিত বিমলবুদ্ধির সমুজ্জ্বল বসন পরিধান করিয়া পরম আপ্যায়িত হইতে হইতে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়। এত কাল জন্ম-মরণাদি অনন্তদুঃখসাগরে যে ডুবাইয়া নিয়া বেড়াইয়াছে সেই গুণময়ী প্রকৃতির উপর তখন বিতৃষ্ণা জন্মে, পরবৈরাগ্য উদিত হয়। কর্ম্ম ও তদ্বাসনাবিমুক্ত বিমল বুদ্ধি জীবের তখনই জড়-চৈতন্যবিচারে সামর্থ্য জন্মে। "প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ" এই বিচার তখনই ঠিক ঠিক হয়। এই বিচারের ফলে যোগী অচেতনা মালিন্যোপহত প্রকৃতির প্রতারণা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতিপাশ মুক্ত হইতে চেষ্টা করে। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধির বিমলতাহেতু চেষ্টা অতিশীঘ্রই ফল প্রসব করে, সাধক স্বরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়। মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন "যস্যোদয়ে প্রত্যুদিত খ্যাতিরেবং মন্যতে, প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ"।

'পরবৈরাগ্য উদিত হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নত্বজ্ঞানবান্ যোগী মনে করেন, লব্ধব্যবস্তু লাভ করিলাম, অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষয় হইল, সংসারগতাগতি অপনীত হইল। কৈবল্য বা আত্মস্বরূপে চিরস্থিতি ইহার অবশ্যম্ভাবী পরবর্ত্তী ফল। শ্রুতি বলেন—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

পরমাত্মতত্ত্বদর্শনাভ্যাসশীল বিবেকী মহাজনের হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা অন্য কাম্যবস্তুর বা কামনাশ্রয় বুদ্ধির অভাবে যখন নিঃশেষে অপনীত হয় তখন তিনি মায়াপাশ মুক্ত হইয়া ইহলোকেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মলাভ করেন।

পরিশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মচৈতন্য নিরুপাধিক অনাদ্যনন্ত হইলেও মায়োপহিত হইয়া উপাধিবিশিষ্ট, সাদি ও সান্ত মত বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। জীব তাঁহারই বিবর্ত্ত। অবিদ্যাবশে জীব কর্ম্ম ও তৎফলের অধীন, চৈতন্য অনধীন। জীব খণ্ডমত, তিনি অখণ্ড। জীব স্বরূপজ্ঞান ভুলিয়া আছে, তিনি সততই স্বরূপে বর্ত্তমান। ইহাই উভয়ের ভেদ। এই ভেদ অপনয়নের জন্য জীবের কর্ম্ম ও তৎফল হইতে মুক্ত হইতে হইবে। স্বরূপজ্ঞানে পৌছিতে হইবে। জ্ঞানোদয়েই জীব কর্ম্ম ও বাসনামুক্ত হয়। জ্ঞানের জন্য সাধনা প্রয়োজন। তাঁহারই হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য যাহা হৃদয়ে অষ্টদলে সতত দীপ্যমান, তাঁহাকে তৎকল্পিত রাম-কৃষ্ণাদি মূর্ত্তির সাহায্যে স্বরূপানুভূতিপুরঃসর সম্যক্‌রূপে জানিবার অভ্যাসই সাধনা। এতদনুকূল যম নিয়ম আসন প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াকলাপই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম ও সাধনার দ্বারা চিত্তের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। মেঘান্তরিত প্রভাকরের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ প্রবোধচন্দ্রের উদয়ে জীব তখন আত্মস্বরূপে চিরস্থিতি লাভ করে। ইহাই মুক্তি। ইহাই কর্ম্মাধীন জীবের নির্গুণ কর্ম্মজ্ঞানাতীত চৈতন্যকে পাওয়া। ইতি

বিদ্যালয়—ধর্ম্মমন্দির।

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর বাহ্য উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে বটে। বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ও হইয়াছে, বিদ্যালয়ে দেশীয় শিক্ষকের সংখ্যাও অধিক। আবার তাঁহাদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই অধিক। কিন্তু তবু আমাদিগের সুশিক্ষা হইতেছে না কেন? শিক্ষকেরা আমাদিগকে নিরূপণ মত পাঠ্য পুস্তকের অর্থগ্রহণ ও ভাব সংগ্রহে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের বালকেরা স্বীয় পরিশ্রমদ্বারা এবং শিক্ষকের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ, বি-এ প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ উপাধিও প্রস্তুত হইতেছে

কিন্তু বালকেরা বিদ্যালয়ে থাকিয়া বা বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবার পর সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই বাস্তবিক কি শিক্ষার মধুময় ফল দেখাইতে পারে? বোধ হয় পারে না; বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই না। কারণ শিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের হইতেছে না। বাস্তবিক আজকালকার শিক্ষিত হিন্দুর ছেলেকে দেখিয়া অনেক সময়ে "চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে।"

আজকাল শিক্ষিত ছাত্র অপেক্ষা নিরক্ষর কৃষক-বালকদিগের চরিত্র বহুল পরিমাণে উন্নত বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুর ছেলের কেন এরূপ হইল? যাহাদের চরিত্র জগতে আদর্শনীয় ছিল সেই হিন্দুকুলের বংশধরদিগের কেন এমন হইল? তাহার অনেক কারণ আছে। সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, দেশের বালকগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে একেবারে শিক্ষা পায় না। মাত্র অর্থকরী বিদ্যা ব্যতীত আর কোন শিক্ষা এদেশে দেওয়া হয় না, সুতরাং পঠদ্দশার পর যৌবন অবস্থায় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু-যুবক স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের পথে চলিতে পারেন না। শুদ্ধ তাহাও নহে, নীতিবিহীন ধর্ম্মহীন শিক্ষার যতদূর বিষময় ফল ফলিতে পারে তাহা অনেক স্থলেই ফলিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সকলে না হউক অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি হিন্দু-নীতি ও হিন্দু-ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতিদ্বারা হৃদয়-মনকে আলোকিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই আমাদের দেশের এতদূর দুর্দ্দশা হইত না। এখনও আমাদের চৈতন্য হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে যে ভাবে গুরুগৃহে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত, নানা কারণে সে ভাবে শিক্ষা এখন আমাদের মধ্যে হইতে পারে না। তবে চেষ্টা করিলে যে যে উপায়ে এখনও তাহাদিগকে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারা যায়, এখনও তাহাদিগকে প্রকৃত উন্নতি-পথের পথিক করিতে পারা যায়, তাহা না করা হয় কেন? ইহার উত্তর কে দিবে তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

মানব-জীবনে মন ও হৃদয়ের উন্নতিই যথার্থ উন্নতি। ইংরাজী বর্ত্তমান সময়ে অর্থকরী বিদ্যা। মহামান্য ইংরাজ বাহাদুর এখন আমাদের রাজা বলিয়া তাঁহাদের সহিত কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য এক প্রকার বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে ইংরাজী শিখিতে হইতেছে। কিন্তু এই শিক্ষার সহিত যদি ধর্ম্ম ও নীতির মিশ্রণ না থাকে তাহা হইলে অতি বিপরীত হয়। তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্য। অর্থকরী বিদ্যার সহিত ধর্ম্ম ও নীতির মিশ্রণ না থাকাতেই দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। সেই জন্য অর্থকরী বিদ্যার সহিত যাহাতে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষায় সাফল্য লাভ করে তাহা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য

পাঠ্য পুস্তকের সহিত অনায়াসে দুই একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ছাত্রদিগকে পড়ান যাইতে পারে একথা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার মহাশয়গণের ইচ্ছা হইলেই পুস্তকের সংখ্যা বাড়াইয়া দিতেছেন, পাঠ্যবিষয়গুলি কঠিন হইতে কঠিনতর করিতেছেন, তাহাতেও কিন্তু শিক্ষকদিগের পড়াইবার এবং ছাত্রদিগের পড়িবার সময় ও সুবিধা হইতেছে। তাহা বাদে, কত স্কুলে গীত বাদ্য ও ব্যায়াম বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। আর "বোঝায় শাকের আটি ধরিতে পারে না ?" এক এক খানি ছোটখাট ধর্ম্মগ্রন্থ প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়াইবার নিয়ম করা যাইতে পারে না কি ? কিন্তু এ স্থলে একটি কথা আছে। একজন সচ্চরিত্র হিন্দু-ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুশাস্ত্রে সুশিক্ষিত লোক দ্বারা এই অধ্যাপনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এইরূপ একটি করিয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় বাদ দিয়া দেশীয় যে সকল মহাত্মাদিগের বিদ্যামন্দির আছে তাঁহারাও যদি এবিষয়ে একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলেও দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হয় ? শুধু ইংরাজী অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আমাদের বালক ও যুবকগণ বড়ই নীরস হইয়া সংসারে প্রবেশ করে। তাহাদিগকে দেখিলে অনেক সময়ে মনে হয় যেন তাহারাও বিদেশী ; এদেশ এবং এদেশ-বাসীর সহিত যেন তাহাদিগের কণামাত্র সহানুভূতি নাই। তাহারা যেন উদ্দেশ্যহীন। তাই বলি তাহাদিগের এই নিরাশ ভাব, তাঁহাদিগের এই উদ্দেশ্য-বিহীনতা, তাহাদিগের এই আপনার দেশে প্রবাসী সাজা, আপনার গৃহে পরের মত থাকা—এই অনুচিত ভাবগুলি দূর করিবার একমাত্র উপায়—এই বলিয়াই ত আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধহয় যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিলে দেশের প্রতি তাহাদিগের যত্ন হইবে, মায়া হইবে। "বিলাত আমাদের দেশ কি ভারত আমাদের দেশ", সন্দেহ-দোলায় আর তাহাদিগকে দুলিতে হইবে না। কিন্তু এ সকল কথা কি এখন দেশের লোকের শ্রবণবিবরে স্থান পাইবে ?

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয় মা কালী।

বরাভয়-অসি-করা মুণ্ডধরা করালী
মৃদুমধু হাসা মা ভৈঃ মা ভৈঃ ভাষা
রণাঙ্গনে দিগম্বরী ওঁকারওয়ালী।
আসব-উন্মত্ত ঘোরা বিভীষণা নৃত্যপরা
কামজিৎ-মনোহরা বাদ্য করতালি।
দিঠিতে দামিনী দোলে ঝঙ্কারে মেদিনী টলে
অসুরনাশিনী শ্যামা আঁধার বিজলী॥

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

রূপ।

এক দিন স্বপ্নের ঘনান্ধকার ছিন্ন করিয়া সংসারের অনিত্যত্বের ইঙ্গিত লইয়া সত্যের এক ঈষদবগুণ্ঠিত মনোহরমূর্ত্তি আমার নেত্রপথে পতিত। আমি কে? কিসের এই সংসার? রূপ আজ মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া দণ্ডায়মান, কাল হয়তো সেই রূপের অস্তিত্বের লোপ পাইবে। অর্থ? সে তো অনিত্য, আজ আছে কাল নাই;—আজ আমি অশেষ ধনপতি, কাল হয় তো জীর্ণ চীর-পরা ভিখারী। নাট্য মঞ্চে পরের করতালি সহকারে নৃত্যকরাই মানব জীবনের সার্থকতা! যে দিন আমি দীনহীন অবস্থায় শ্মশানমধ্যে চিতার আগুনে ভস্মীভূত হইব তখন এ সাধের বাসর কোথায় থাকিবে? "পরিণামে সুখ নাই—ঐশ্বর্য্যে শান্তি নাই—মোহে কল্যাণ নাই। জানিনা, পূর্ব্বজন্মের কোন্ কর্ম্মফলে—এই শাস্তি। আর নয়, এ ঘৃণিত জীবিকানির্ব্বাহের পথ পরিত্যাগ করিব। পশু পক্ষীরাও ত উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। তবে মানবে ও পশু-পক্ষীতে প্রভেদ কি?

বিলাসের মাথায় লাথি মারিয়া অনন্ত অনাবৃত সংসারসমুদ্রে জানি না কিসের সন্ধানে বাহির হইলাম। কত তীর্থ—কত দেশ—কত প্রদেশ ঘুরিলাম তবুও তো শান্তি পাইলাম না। কত সাধু কত সন্ন্যাসীর নিকট প্রাণের ব্যথা বলিলাম, কত দুঃখ জানাইলাম, শান্তি তো মিলিল না। ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে উন্মত্তের মত হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম এ দেহ ত্যাগ করিব। পতিতপাবন নিস্তারণ দেব ব্রহ্মপুত্র তোর কাছে ত আর পাপ পুণ্যের কোন প্রভেদ নাই। তোর

শীতল বক্ষ যেমন পুণ্যাত্মার জন্য তেমনই পাপাত্মার জন্য বিস্তৃত। তোর কলুষ-হর জলে মনের সব পাপ সব তাপ ধুইয়া এ অভাগা সন্তানকে বক্ষে ধর দেব পিতঃ। এইরূপ মনে করিয়া জলে নামিতে যাইতেছি এমন সময়ে পশ্চাতে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশস্বরে কে বলিল—"বৎস জীতা রহো।" চাহিয়া দেখিলাম সুন্দর এক সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসী আবার বলিলেন "জন্মিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর মরিলেই কি যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার আছে? পরকালের সম্বল মানব ইহকাল হইতে সঙ্গে লইয়া যায়। ধৈর্য্যের সহ সাধনা কর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আমি এতাদৃশ বিবেকবাণী শুনিয়া তাঁহার পদতলে লুটিয়া পড়িলাম।

এখন তাঁহার সঙ্গলাভে বুঝিয়াছি যে, এ সংসার খেলা। কেবলই খেলা। আমরা কে? তাঁহারই খেলার পুতুলমাত্র।

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি
সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণি গিরীশ-
রমণি কালি সকলং॥

প্রলয় সময়ে মহাকালকেও গ্রাস করেন বলিয়া ইনি কালী। আমি বলিলাম "গুরো, অন্তর্য্যামিন্ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

গুরু—"কামনাকলুষিত হৃদয় মোহান্ধনয়ন সংসারিক জীব বুঝিতে পারে না বলিয়া জীবনচক্রে ঘুরিয়া মরে। জীবন মৃত্যুর কোলে প্রতিষ্ঠিত। এ সংসার শ্মশানে সজ্জিত বাসরসজ্জা। মৃত্যুর উন্মত্ত তাণ্ডবে বিকট হুহুঙ্কারে সংসার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দলিত পিষ্ট হইতেছে। তবু সাংসারিক জীব মনে করে সে অমর—তার সাধের খেলা অনন্তকাল স্থায়ী—মানুষ মুখে মরণের কথা বলে কিন্তু বুঝিতে পারে না, জীবন থাকিতে বুঝিতে পারে না, মৃত্যু যথার্থ কি? তাহার সোণার দেহ জল বাতাস মাটি হইয়া পিণ্ডভাণ্ডে মিশিয়া যাইবে, এ কথা যথার্থ ভাবে কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? সেই মৃত্যুকে দেখিতে দেয় না। মৃত্যুকে দেখিলে মোহ কাটিয়া যায়। তাই আমাদের এ মরণ দেবতার উপাসনা, বালক যুবক বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সংসারী সন্ন্যাসী, ঐ শুন মৃত্যুর নিষ্ঠুর কোলাহল —ঐ ঐ দেখ, সংসার-সমরাঙ্গনের শোচনীয় পরিণাম, কিসের মোহ? কিসের শোক? কিসের ভয়?"

আমি—"মরণ দেবতার সাধনায় কি হবে প্রভু?"

সন্ন্যাসী—"পাপীর পাপে ঘৃণা হবে। অহঙ্কারী অহঙ্কার ভুলে যাবে, আমার

"আমিত্ব" দূর হবে। মানুষ মানুষ হবে। জগতের মৃত্যুভয় সব চেয়ে অধিক ভয়। মৃত্যুর উপাসনায় মানুষ দেখবে—মৃত্যু আশঙ্কার নহে—খুব উত্তম সুন্দর জ্যোৎস্নাসম আলোক, মৃত্যু ভয়াবহ নহে—জীবনের মূল প্রধান উদ্দেশ্য। মৃত্যুর বাম হস্ত অসিযুক্ত কিন্তু দক্ষিণ হস্তে বরাভয়। মূর্চ্ছাই মানুষকে ইহলোক পরলোক ভূলোক ও দ্যুলোক দেখায়। মরণ দেবতার উপাসনায় সেই মরণ মূর্চ্ছা দূর হয়। ভববন্ধন তাহাতেই কাটে। মৃত্যুর পরীক্ষাদ্বার পার হইয়া হাসিতে হাসিতে মার ছেলে মার কোলে যাইয়া বসে।

আমি—"এই কি মার রূপ?"

সন্ন্যাসী—হাঁ।"

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আহ্বান।

তর্ক :—

তোমার মনের কোণে কর স্থান দান
নহে এতটুকু মোর মনে নাও স্থান
ডাকি আমি শোন—তুমি নয় মোরে ডাক
কাছে কাছে থাক—নয় সদা কাছে রাখ
ভালবাসা দাও—নয় ভালবাসা নাও
আমি চাই দেখ চেয়ে—নয় তুমি চাও
নেবো না দেবো না বেশী—সে শকতি নাই
এতটুকু—এতটুকু দিতে—নিতে চাই।

প্রার্থনা :—

অনন্ত শকতি তব অনন্ত আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গায় মহিমা তোমার;
সিন্ধু সম তব কৃপা বিন্দুমাত্র নেবো
মোর বালুকণাসম প্রাণ পায় দেবো;
এ হ'তে অধিক কভু মন নাহি চায়
দিনান্তে ডাকিতে যেন পারিহে তোমায়।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

কোথা তুমি ?

কোথা তুমি ওহে পারাবার দয়াময়
পতিতে তরা'তে তুমি এসো এ ধরায়
তব নাম সাধে যোগী (হে) মহাদেব মহা যোগী
কত ব্যথা পাই আমি হৃদে তব লাগি।
তোমায় সকলে বলে করুণাসাগর
দীন জনে কৃপা কর ওহে শক্তিধর
সদা যেন হ'য়ে থাকি ভোর তব ভাবে
তুমিই গতি অগতির দেব এই ভবে।
সাধনের ধন তুমি, (তব) বিনা নাহি গতি
তোমাতেই লয় তোমা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি
দীন জনে কর কৃপা ওহে নিরঞ্জন
অন্তে যেন পাই তব ও রাঙা চরণ।

শ্রীমতী নলিনীলতা দেবী।

উপনিষৎ-চর্চ্চা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম মন্ত্রে সত্যপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় মন্ত্রে একমাত্র মুক্তির উপায় এবং তৃতীয় মন্ত্রে প্রাণ বা আত্মপ্রতিষ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মহন্ হইলে যতই কেন সাধনা করা যাউক, যতই কেন যোগ করা যাউক, মৃত্যুর পর অসূর্য্য লোক প্রাপ্তি অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। তাই নিন্দাচ্ছলে আত্মহন্ হইতে নিষেধ করিয়া সর্ব্বত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়া সেই আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন।—

অনেজদেকং মনসোজবীয়ো
নৈনৎ দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ
উদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি, তিষ্ঠাত্যস্মিন্নপো মাতরিশ্বাদধাতি।
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬

অনুবাদ—যিনি সমস্ত ভূতকে আপনাতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতে আপনাকে

অবস্থিত দেখেন, তিনি (সেই সর্ব্বাত্মদর্শী) আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না; অর্থাৎ তিনি মুক্তি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বোক্তরূপ উপলব্ধির পর অর্থাৎ যখন অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে, যখন বুদ্ধিযোগের সাহায্যে সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রণালী অবলম্বনে অগ্রসর হওয়ার ফলে প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হইবে, তখন দেখিতে পাইবে—"ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।"—আমাতেই সর্ব্বভূত উৎপন্ন এবং আমাতেই অবস্থিত। আমিই সর্ব্বভূতরূপে অবস্থিত আছি। এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে তোমার একটী লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পাইবে; সেটী—"ততো ন বিজুগুপ্সতে" তুমি আর কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না; এবং তখনই বুঝিবে তোমার মুক্তি লাভের অবস্থা আসিয়াছে।

সর্ব্বত্র আত্মদর্শী কেন কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারে না, তাহা বলিতেছি—কেহই আত্মপ্রাণকে জ্ঞানতঃ অবজ্ঞা করিতে চায় না; পরন্তু তাহাকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে ভালবাসিবার জন্যই সকলে প্রয়াসী। সর্ব্বদাই প্রাণের পরিরক্ষণ ও পরিপোষণে যত্নশীল; ইহার কারণ আমরা জানি—যতদিন প্রাণ আছে ততদিনই আমার সব আছে, প্রাণ চলিয়া গেলে আমার সব যাইবে। তাই আমরা প্রাণকে ভালবাসিতে ও ধরিয়া রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করি। অর্থ উপার্জ্জন, স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালন প্রভৃতি যাহা কিছু কার্য্য করি সকলই ঐ প্রাণের পরিতৃপ্তির জন্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—মানুষ স্ত্রীর জন্য স্ত্রীকে ভালবাসে না, আত্মার তৃপ্তির জন্যই স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে; পতির তৃপ্তির জন্য স্ত্রী পতিকে ভালবাসে না, প্রাণের তৃপ্তির জন্যই পতিকে ভালবাসিয়া থাকে; এইরূপ সর্ব্বত্র। আমরা যাহা কিছু করি ঐ আত্মার বা প্রাণের তৃপ্তির জন্যই করিয়া থাকি। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, কিংবা দয়া, প্রেম, ভালবাসা, যাহা দ্বারাই আমরা অভিভূত হই, ঐ প্রাণের পরিতৃপ্তিই তাহার হেতু। তাই জীবমাত্রই প্রাণের সংরক্ষণে ও পরিতৃপ্তি সাধনে সর্ব্বদা তৎপর। যখন দেখা যায়—সম্যক্ অনুভূত হয় যে, আমারই প্রাণ সর্ব্বভূতের ধারণকর্ত্তা, যখন দেখিতে পায় আমারই প্রাণ সর্ব্বভূতাকারে প্রকাশিত, যখন দেখিতে পায় আমারই প্রাণ সর্ব্বভূতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র প্রভু, তখন সে—আর কাহাকে ঘৃণা করিবে? সবই যে আমি গো! আমি কি কখনও আমার আমিকে ঘৃণা করিতে পারি? আমারই প্রাণ যে সর্ব্বভূতে প্রতিষ্ঠিত, আমি কাহাকে ঘৃণা

করিব। তাই শ্রীচৈতন্যদেব যবনকে আত্মবোধে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডালকে সখারূপে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এযুগেও অনেক মহাপুরুষের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায় যাঁহারা বিষ্ঠা ও চন্দনে তুল্য জ্ঞান করিতেন।

এইরূপ যতদিনে আমিত্ব সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগ্রাসী না হয় ততদিন কিছুতেই নিস্তার নাই। এ আমি বড় সর্ব্বনাশী আমি গো? এক বিন্দু ভেদজ্ঞান থাকিলেও ইনি ছাড়িবেন না। এ মানব-জমি কিছুতেই পতিত রাখিবেন না। ফসল না জন্মাইয়া পূর্ণ'ত না পৌঁছাইয়া তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি যে "কৃষ্ণ,"- আকর্ষণ বা কর্ষণই যে তাঁহার স্বভাব। যে আমিত্বকে পরিত্যাগ করিবার জন্য অধিকাংশ সাধক ও যোগিগণ নিয়ত যত্নশীল। যে আমিত্বই সাধনাপথের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, অহংজ্ঞান থাকিতে তাহাকে পাওয়া যায় না। তাহারা জানেন না যে ঐ আমি – ক্ষুদ্র আমিই একদিন অনন্ত জগতের ধারণকর্ত্তা আমিরূপে দাঁড়াইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অনন্তশাস্তির কোলে পৌঁছাইয়া দিবে। হায় মুগ্ধ জীব! তোমার ঐ ক্ষুদ্র বুকের ভিতর হৃদয়ের স্পন্দনরূপে যে "আমিটী" দীন বেশে রুগ্ন ক্লিষ্ট পাপপঙ্কিল বলিয়া আপনাকে ক্ষুদ্রতর চরমে পৌঁছাইয়া দিতেছে। ঐ আমির পায়েই কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর, উহাকে দীনহীন কাঙ্গাল না বলিয়া, বল – তুমি মহান্, তুমি বিশ্বরূপ, তুমিই বিশ্বনাথ। দেখিবে সত্যই একদিন তোমায় সর্ব্বভূতবিমণ্ডিত বিশ্বরূপ দেখাইয়া জীবন ধন্য করিয়া দিবে। উহাকে দীন বলিয়া – কাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করিও না। বড় দুঃখে বড় অভিমানে ভগবান্ বলিয়াছেন —"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্"; মানব-দেহ আশ্রিত আমাকে মূর্খ মানবগণ বড় অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাই বলি এতদিন তাঁহাকে বুঝিতে পার নাই, চিনিতে পার নাই বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছ—ক্ষতি নাই, কিন্তু এখন কুলশ্রেষ্ঠ মানবকুলে জন্ম লইয়াছ, আর অজ্ঞান শিশুর মত মাতৃবক্ষে পদাঘাত—মানুষ তুমি —তোমার পক্ষে সাজে না। তুমি আপনাকে ভালবাস ইহা সত্য, কিন্তু উহা পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষভাবে পুত্র ভার্য্যা ধন প্রভৃতিকেই ভালবাস। এই পরোক্ষ ভালবাসা – এই অজ্ঞানের ভালবাসা লইয়া আর কতদিন থাকিবে? আগে আপনাকে পূর্ণরূপে সজ্ঞানে ভালবাস, দেখিবে তুমি জগৎকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ, কেহই তোমার ঘৃণার পাত্র থাকিবে না। কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না, তখনই বুঝিবে যে "ততো ন বিজুগুপ্‌সতে" কথার অর্থ কি?

জগতে আমরা কাহাকে ভালবাসি? যাহার মধ্যে আমার আমিত্বের কতক ধর্ম্ম দেখিতে পাই, অর্থাৎ যে পদার্থ বা ব্যক্তি আমার আমিত্বের সহিত কতক পরিমাণে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাকেই আমরা ভালবাসি। আমার আমিত্বের ধর্ম্ম যেখানে যত বেশী সেইখানেই ভালবাসার পরিমাণ তত বেশী হইয়া থাকে। তাই আমরা জগতের জনসাধারণ অপেক্ষা পুত্র-কন্যাদির প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকি। কিন্তু জগতে পূর্ণ ভালবাসা একেবারেই অসম্ভব; কারণ, আমার আমিত্বের পূর্ণধর্ম্মবিশিষ্ট অপর একটী 'আমি' জগতে মিলে না। তাই জগতে পূর্ণ ভালবাসা সম্ভবে না; একমাত্র তিনি, একমাত্র আত্মা, একমাত্র পরমেশ্বরই আমার আমিত্বের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র। তাই আমার সমস্ত ভালবাসা ও পূর্ণ প্রেমের একমাত্র আধার তিনি। জাগতিক ভালবাসা দ্বারা সেই আমিত্বের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। এই আমিত্বের পুষ্টির জন্যই আমরা অনন্তজীবন মরণের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছি। জন্ম মৃত্যু আমাদের শাস্তি বা বন্ধন নহে, আমিত্বের পোষণমার্গের পান্থশালা মাত্র। এই জন্মমৃত্যুরূপ যবনিকা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া একই জগৎকে, একই আমিত্বকে, বিভিন্ন সাজে সজ্জিত দেখিয়া, বিভিন্ন রসে বিভিন্ন ভোগে বৈচিত্র্যময় সম্ভোগে মুগ্ধ হইয়া আমিত্বের পোষণ করিতেছি মাত্র। কখনও পাপীর সঙ্গে নরকের চিত্র অভিনয় করিয়া, কখনও বা পুণ্যবানের সঙ্গে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাইয়া, আমার আমিত্বকে পোষণ করিতেছি। পাপিন্! তুমি ভাবিও না যে তোমার জীবন ঘৃণিত। তুমি জগতের চক্ষুতে যতই নিন্দনীয় হও না কেন, তোমার ঐ নিন্দাযোগ্য কার্য্যগুলিই আমিত্বপূজার পুষ্পসম্ভার। আজ যে কার্য্যগুলি স্মরণ করিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেছ, নিজেকে পাপপঙ্কিল মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইতেছ, একদিন দেখিবে উহাই তোমাকে পবিত্রতাময় নিত্য সৌরভাকুলিত পূর্ণ আমিত্বের ক্ষেত্রে উপনীত করিয়াছে। যাহা হ'ক, এইরূপ আমিত্বের পোষণ করিতে করিতে যেদিন দেখিতে পাইব যে,—আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত এবং সর্ব্বভূতরূপে আমিই বিদ্যমান, সেই দিন। সেই দিন জন্মমৃত্যুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে, আমার আমিত্বের পূর্ণ প্রসার লাভ হইবে। তখনই আমি মুক্তিমন্দিরে উপনীত হইব। তাই অনন্তাচার্য্য-কৃত ঈশোপনিষদ্ভাষ্যে "ন জুগুপ্সতে" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "মুক্তো ভবতি"। জুগুপ্সা শব্দের অর্থ ঘৃণা। ঘৃণা ভেদবুদ্ধিমূলক। ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইলেই ঘৃণা তিরোহিত হয়। যতদিন সর্ব্বত্র এক রসের সন্ধান না

পাওয়া যায়, যতদিন আমার আমিকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে না পারা যায়, ততদিনই আমি ব্যতীত আরও কিছু আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, ততদিনই আমার আমিকে যত ভালবাসি অপরকে তত ভালবাসিতে পারি না। এই ভেদবুদ্ধি হইতেই ঘৃণা হইয়া থাকে। যতদিন না এই ভেদবুদ্ধি বা ঘৃণা সম্যগ্‌ভাবে অপগত হয় ততদিনই আমাকে জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পরিচালিত হইতে হইবে।

ভগবদ্গীতায়ও ঠিক এই অর্থবোধক "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। কেবল গীতায় কেন অধিকাংশ উপনিষদেই, এই একত্ব উপলব্ধির জন্য, এই একরস আস্বাদনের জন্য ভূয়ো-ভূয়ঃ উপদেশ রহিয়াছে—সেই একরসই আমি।

এক্ষণে এই মন্ত্রের সাধনাত্মক অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে—এইরূপ সর্ব্বভূতকে আপনাতে এবং আপনাকে সর্ব্বভূতে দর্শনরূপ আধার-আধেয়ভাবে, আত্মপ্রাণ ব্যবস্থাপন করার নাম—প্রাণায়াম। প্রত্যেক পদার্থে পদার্থে আত্মপ্রাণকে আরোপ করিয়া এবং প্রত্যেক পদার্থকে আত্মপ্রাণে আরোপিত করিয়া, ব্যষ্টিভাবে সাধনা আরম্ভ করিতে হয়, এইরূপ দর্শনের ফলেই প্রাণের যথার্থ আয়াম বা বিস্তার হইয়া থাকে। জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত হয়, সঙ্কোচ সংকীর্ণতা চিরদিনের জন্য অপসৃত হয়। ইহার বিশেষ ফল—প্রাণের বা আমিত্বের যথার্থ কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। নাসিকা বন্ধ করিয়া বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ করারূপ প্রাণায়াম হঠ-প্রাণায়াম মাত্র। উহা পরম্পরা সম্বন্ধে চিত্তশুদ্ধির জনক হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় না; বড় জোর দুই একটা সিদ্ধি পর্য্যন্ত আনিতে পারে। কিন্তু ইহা, এই প্রাণায়াম—বৈদিক সাধনা। ইহা সত্যযুগের অমৃত; সত্যযুগের ঋষিগণ, শুধু এইরূপ প্রাণায়ামের সাহায্যে, এইরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠার সাহায্যেই ঋষিত্বলাভ করিয়াছিলেন। এই সাধনার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মানুষ অমৃতলাভের অধিকারী হয়। সর্ব্বভূত আমাতেই অবস্থিত, এবং আমি সর্ব্বভূতাকারে বিরাজিত, সেই আমিই আত্মা, সেই আমি ব্রহ্ম, সেই আমি আমার প্রাণ, আমারই প্রাণ সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত। এইরূপ উপলব্ধি করিতে অভ্যাস কর, প্রত্যেক পদার্থে প্রাণকে লইয়া যাও, ও ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল, পূর্ব্বকথিত চারিটী পাদের আরোপ কর। দেখিবে, জড় বলিয়া আর কিছুই তোমার চক্ষে প্রতিভাসিত হইবে না, সর্ব্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা তোমার প্রত্যক্ষীভূত

হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, কিরূপে তিনি এক হইয়া বহু ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন।

ইহা প্রথমে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে আরম্ভ করিতে হয়; তাই ঋষি, অনুপশ্যতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। তোমার মন, তোমার বহিশ্চক্ষু দেখিবে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ঐ একটী বৃক্ষমাত্র। কিন্তু পশ্চাৎ ভাগ হইতে তোমার বুদ্ধি যেন দেখে—উহা ঈশ, উহাই পরমেশ্বর, উহাই আমার প্রাণ। এইরূপ অভ্যাস করিতে কোন কল-কৌশলের প্রয়োজন হয় না। শুধু সরল বিশ্বাসে ঋষিবাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে হয়। ঐ রূপভাবে জগতের সর্ব্বত্র, প্রাণ বা পরমেশ্বর বলিয়া দেখিতে অভ্যাস কর, তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। অথচ তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে। তুমি প্রাণময় হইবে, ঋষিত্ব লাভ করিবে।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—তিনি ক্রিয়াশীল, তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি দূরে, তিনি অতি নিকটে, তিনি পরিদৃশ্যমান এই সকলের অন্তরে, এবং বাহিরে (অবস্থিত)।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বমন্ত্রে পরমেশ্বরের মহান্ স্বরূপের বিষয় সম্যগ্‌ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে; এক্ষণে এইমন্ত্রে—তিনি যে মহান্ হইয়াও অণু, নিষ্ক্রিয় হইয়াও সক্রিয়, অতিদূরে থাকিয়াও অতি নিকটে, সকলের অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, ইহাই বলা হইতেছে। যাহারা কেবল জগৎ দর্শনে—কেবল ক্ষুদ্র ও পরিণাম দর্শনে অভ্যস্ত, তাহারা যেরূপ পরমেশ্বরের মহান্ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ যাঁহারা কেবল তাঁহার নিত্যস্থির অখণ্ড নিরঞ্জন স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা এ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই উভয় অবস্থার একত্র সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়াই জগতে মিথ্যাবাদের প্রচার হইয়াছে, এবং তাহারই ফলে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়া সাধারণের আধ্যাত্মিক গতির পথ অশেষ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদের ঋষি, "এজতি, ন এজতি; দূরে, অন্তিকে; অন্তরে বাহ্যতঃ।" এই পরস্পর বিরুদ্ধ যুগ্ম যুগ্ম পদ প্রয়োগে পূর্ব্বোক্তরূপ অসামঞ্জস্য ও পরস্পর বিরোধী জ্ঞানের সম্যক্ নিরাকরণ ও মীমাংসা করিয়াছেন।

প্রথমে বলিলেন "তৎ এজতি" ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল; (এজ্ কম্পনে) কম্পন অর্থাৎ স্পন্দন বা গতি। ব্রহ্মের একটী ধর্ম্ম বা একপ্রকারের আত্মপ্রকাশ। এই

এজতি” গতি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ও তাহার এক প্রকার আত্মপ্রকাশ মাত্র। তাঁহার এই কম্পন বা ক্রিয়াশক্তি কি? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তৃত্ব। ইহাই তাহার “এজৎ স্বরূপ”। পূর্ব্বে যে স্বরূপের আভাস দেওয়া হইয়াছে তিনি যদি কেবল সেই অনেজৎ স্বরূপই হইতেন অর্থাৎ বাক্য এবং মনের অতীত হইতেন; হায়! তাহা হইলে আর আমাদের মত ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তাহাকে লাভ করা কথনই সম্ভব হইত না।

কিন্তু ভয় নাই? হতাশের অবসর নাই? জীব! তুমি তাহাকে লাভ করিবার আশা হইতে বঞ্চিত হইও না। সাধক! তুমি যেরূপে তাঁহাকে পাইয়া যেরূপে তাঁহাতে আত্মকর্ত্তৃত্ব মিলাইয়া দিয়া, যেরূপে তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া, জন্ম ও জীবন সার্থক করিবে, যেরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুমি প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ হইবে উহা সেইরূপ; উহা ভাষায় বর্ণনার যোগ্য নহে, মনে কল্পনা করিবারও যোগ্য নহে; তবে তোমার আসক্তি বাড়াইবার জন্য, তোমার আধ্যাত্মিক গতি খরতর করিবার জন্য, ঐ অনেজৎ এবং মনসো জবীয় স্বরূপের আভাস দিয়াছি মাত্র। উহা তোমার লভ্য, উহা তোমার গম্য; এক কথায় তুমি উহাকে পাইবে অথবা তুমি উহাই হইবে, কিন্তু এখন তুমি সাধক, তুমি তাহাকে লাভ করিবার প্রয়াসী, এখন—তোমাকে কি করিতে হইবে—ঐ উভয় স্বরূপ—“এজৎ, অনেজৎ” এই উভয় স্বরূপ যুগপৎ উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। * বায়ুপ্রবাহ বিচঞ্চল মেঘমালার অন্তরালে সমুজ্জ্বল ভাস্কর-মূর্ত্তি দর্শনের ন্যায়, এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় কম্পন বা ক্রিয়াশক্তির অন্তরালে নিষ্ক্রিয় অনেজৎ স্বরূপ দর্শনের অভিলাষী হইতে হইবে। তিনি নিত্যস্থির হইয়া নিত্য একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও কি প্রকারে “এজতি” অর্থাৎ অনন্ত ক্রিয়াশক্তিময় হয়েন। কি প্রকারে অনন্ত স্পন্দনে আপনাকে স্পন্দিত করেন, কি প্রকারে তিনি প্রাণ হইয়া—আত্মা হইয়া, মনোরূপে প্রকটিত হন। কি প্রকারে তিনি চিন্ময় হইয়া জড়াকারে পরিণত হয়েন, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। এই উভয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তোমার সাধনার শাণিত শর নিক্ষেপ

---

* এই “অনেজৎ” শব্দে পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত “অনেজৎ”কে লক্ষ্য করা হয় নাই, ইহা এই মন্ত্র স্থিত “ন এজতি” শব্দপ্রতিপাদ্য “অনেজৎ”। ন এজতি বলিলে এজতি র অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির অভাব বুঝা যায়। সুতরাং ন এজতি শব্দ কারণাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। এজতি ন এজতি এই উভয়ের যুগপৎ দর্শনই অক্ষর পুরুষের সাধনা। জীব এই অক্ষরের বা কূটস্থ চৈতন্যেরই সাধক। পূর্ব্বোক্ত “অনেজৎ” সাধ্য নহে, উহা এই অবস্থা হইতে স্বতোলভ্য।

করিতে হইবে, তবে তোমার লক্ষ্য স্থির বিদ্ধ হইবে, এজৎ অনেজৎ এক হইবে। জড় চৈতন্যের সমস্যা দূর হইবে, সত্য মিথ্যার সংশয় মিটিবে। কেবল নির্গুণ সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিলে জড়ের বাঁধা মিটিবে না কেবল সগুণে আবদ্ধ থাকিলে অমৃতের সন্ধান পাইবে না। যাহা হোক, কিরূপে তিনি এই উভয় স্বরূপের সামঞ্জস্য করেন, এইবার আমরা মানববুদ্ধির মাপকাটি দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে কর তুমি জড় মৃৎপিণ্ড দর্শন করিতেছ। এস্থলে বাস্তবিক পক্ষে কি হইতেছে—তোমার অনেজৎ চৈতন্যে একটী কম্পন বা ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ হইল, যাহা সম্মুখবর্ত্তী মৃৎপিণ্ড আকারে উপলব্ধি করিয়া লইল। যতক্ষণ তোমার অনেজৎ চৈতন্য তাদৃশ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ এজৎ স্বরূপে প্রকাশ না হন, ততক্ষণ তোমার মৃৎপিণ্ড বিষয়ক জ্ঞানই হয় না। একটী অখণ্ড নিত্য স্থির জ্ঞান, যখন ব্যাপ্তি ও দূরত্বাদি সহকৃত বিষয়াকারে প্রকটিত হয় তখনই তিনি 'এজতি' বা দৃশ্য, এবং পরক্ষণেই তিনি 'ন এজতি' অর্থাৎ স্থির দ্রষ্টা বা উদাসীন। এই দৃশ্য ও দ্রষ্টার খেলাই এই জগৎ। প্রতিনিয়ত প্রতি পরমাণুতে এই লীলার অভিনয় হইতেছে। এই অব্যয় লীলা-তত্ত্ব প্রতিপাদন মন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। যখন তিনি দৃশ্য তখনই তিনি দূরে বাহিরে, যখন তিনি দ্রষ্টা তখন তিনি অতি নিকটে অন্তরে। দৃশ্যরূপে তিনিই প্রকৃতি আদ্যাশক্তি রাধা, আবার দ্রষ্টারূপে তিনিই পুরুষ, শক্তিমান্ কৃষ্ণ। দৃশ্যরূপে তিনি মায়া, দ্রষ্টারূপে তিনি ব্রহ্ম। হায় মুগ্ধ জীব! নয়ন উন্মীলন কর। প্রেমের পুরুষোত্তমের অখণ্ডৈকরসের, এই আনন্দময় লীলা-বিলাসপূর্ণ যুগল মূর্ত্তি দর্শন কর। তুমি ধন্য হইবে। দেখ! তোমারই মনোরূপে প্রতিনিয়ত দৃশ্যরূপে তিনিই সাজিয়া রহিয়াছেন, আবার প্রাণরূপে আত্মরূপে তিনিই দ্রষ্টার স্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন। যাও, আরও অগ্রসর হও—দেখিবে দ্রষ্টা দৃশ্য কিছুই নাই; কিছু নাই অথচ সবই আছে, ইহাই যথার্থ অনেজৎ স্বরূপ, দেখ! ধন্য হও। ইহা শুধু কল্পনা নহে, ভাষায় বা ভাবের উচ্ছ্বাস নহে। পূর্ণ উপলব্ধির বিষয়, পূর্ণ অনুভূতির জিনিষ। এ স্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে তিনি যদি প্রতিনিয়ত দৃশ্য ও দ্রষ্টার লীলার অভিনয়ই করেন তবে ত তিনি বড় চঞ্চল! তিনি যদি এত চঞ্চল হন তবে আমরা এ জগৎকে এত স্থিরভাবে দেখি কিরূপে? এবং যখন তিনি বিষয়াকার গ্রহণ করিলেন, তখন আর তিনি দেখেন না, আবার যখন দেখেন তখন আর বিষয় এইরূপ সংশয়ের উত্তরে অবতরণিকার লিখিত বহ্নি বিন্দু ও রেখার দৃষ্টান্ত গ্রহণীয়। আর এক কথা, অতি চঞ্চল জিনিষই দূর হইতে স্থির বোধ হয় এ জগতের স্থিরতাও সেইরূপ মাত্র।

এইবার সাধনার দিক্ হইতে দেখা যাউক—ঋষি বলিলেন—"তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে"। যতদিন তাঁহাকে সারথিরূপে গুরুরূপে, সখারূপে, প্রাণরূপে উপলব্ধি করা না যায়, ততদিনই তাঁহাকে দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। একথা সকলেই জানেন; কিন্তু আমার মনে হয়—যত তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া যায়, যতই তাঁহার অনন্ত বিকাশ দর্শনে আত্মহারা হইয়া তাঁহাতে সম্যগ্ভাবে মিলাইতে চেষ্টা করা যায়, যতই তাঁহাকে বুঝিবার প্রয়াস পাওয়া যায়, না না! যতই তিনি বড় আদরের সন্তান—অতিশয় স্নেহের পুতলী জীবের নিকট, স্বয়ং আসিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন, যতই তিনি স্নেহময় আলিঙ্গনে জীবকে ধন্য করিতে থাকেন, ততই জীব বুঝিতে পারে "দূরাৎ সুদূরে" তিনি দূর হইতেও দূরে। যে ব্যক্তি সমুদ্র হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে, তাহার নিকট সমুদ্র ত দূরবর্ত্তী হইবেই, সে যে সমুদ্রের দূরত্ব অনুভবই করিতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছে, শুধু সেই জানে সমুদ্র কতদূর ব্যাপী। সে যতই অগ্রসর হউক সমুদ্র তাহার নিকট ততই দূরব্যাপী বলিয়া প্রতীতি হয়। সমুদ্রের দূরত্ব শুধু তাহারই প্রতীতিযোগ্য। তাই সত্যযুগের ব্রহ্মদর্শি ঋষিও বলিয়াছেন "দূরাৎ সুদূরে"। তাই মহর্ষি গৌতমের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয় বহুদূরে, বহু দূরে, বহু নিম্নে তোমা হতে দাস, অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন, চাহিবার কিছু রাখ নাই, চাহিবার কিছু রাখি নাই, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে দেব লহ শুধু ক্ষুদ্রের প্রণাম।

তিনি সকলের নিকট হইতেও নিকটে, অন্তর হইতেও অন্তরে। সাধক! ঐ যে তোমার ক্ষুদ্র নিশ্বাসটী হইতে আরম্ভ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্য্যন্ত ক্রিয়াশক্তিরূপে, সঙ্কল্প বিকল্প আকারে মনোরূপে, কাম-ক্রোধাদি আকারে বৃত্তিরূপে, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদি আকারে অবস্থারূপে, এবং জন্ম-মৃত্যু রূপে মহা পরিবর্ত্তনের আকারে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ঐ যে উনিই যে তিনি। উহাই তাঁহার এজৎস্বরূপ। যাহাকে তুমি তোমার সাধনার অনন্ত অন্তরায়স্বরূপ মনে করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক কুটিল কটাক্ষে পরিহার করিতে উদ্যত হইয়া থাক, যাহাকে তুমি মায়া বলিয়া, বন্ধন বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিতে চেষ্টা কর, ঐ উনিই যে তিনি গো, যাঁহাকে তুমি চাও, যাঁহাকে তুমি অন্বেষণ কর। ঐ যে তিনি তোমাকে স্নেহময় আলিঙ্গনে প্রতিনিয়ত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ যে তোমার প্রকৃতিরূপে, তাঁহার এজৎস্বরূপ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। উহারই চরণে তোমার কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর।

উনি ঐ এজৎস্বরূপই তোমাকে মহান্ অনেজৎস্বরূপ দেখাইবেন। উঁহারই পূজা কর। ওরে! এত নিকটে, এত অন্তরে আর কে আছে রে! এত স্নিগ্ধ এত মধুর আলিঙ্গনে আর কে ধন্য করিবে র! তোমরা জগতে প্রিয়তমা ভার্য্যার সোহাগপূর্ণ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হও—আত্মহারা হও, সে আলিঙ্গন যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তাহাতে দেহের ব্যবধান থাকে, সম্যক্ মিলাইয়া যাইতে পারা যায় না। কিন্তু—তাঁহার সেই এজৎস্বরূপের—সেই প্রকৃতির মায়ের আমার আলিঙ্গনে কিছুরই ব্যবধান থাকে না। তিনি যে সর্ব্বতোভাবে আপনাকে হারাইয়া (অর্থাৎ অনেজৎস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া) তোমাতে মিলাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার এই স্নেহের আত্মহারা, আনন্দের নিগূঢ় আলিঙ্গন উপলব্ধি কর। ঐ দেখ! ঐ তোমার দেহের প্রত্যেক পরমাণুরূপে সম্বদ্ধ হইয়া তিনি তোমার "আমিত্ব"কে পূর্ণত্বে—ব্রহ্মত্বে পরিণত করিবার জন্য জন্মের পর জন্ম ধরিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। এত নিকটে কে আছে? এই সান্নিধ্য অনুভব কর! তোমার সাধনমার্গ সুগম হইবে, উপাসনা সরস হইবে। তাঁহার জন্য যাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তাহারা কখনও তাঁহাকে দূরে দেখিও না, দূরে অন্বেষণ করিতে যাইও না। গেলে তুমি দূরেই থাকিবে। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং বলিয়া বাহিরে প্রত্যেক পদার্থে তাঁহাকে সত্য প্রতিষ্ঠার সাহায্যে দর্শন কর। "তদন্তরস্য সর্ব্বস্য" বলিয়া অন্তরে প্রত্যেক ভাবের আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে তাঁহাকে অনুভব কর। তুমি যেমন তাঁহার আলিঙ্গনে সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ। তুমিও সেইরূপ অন্তর ও বাহিররূপ উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধর। তাঁহাকে পাইবে। আত্মহন্ হইও না।

প্রথমে 'ঈশাবাস্য'মন্ত্রের সাধনা বা সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় মন্ত্রপ্রতিপাদিত প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চতুর্থমন্ত্র-কল্পিত পাদ চতুষ্টয়ের আরোপরূপ সাধনা কিছুদিন করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে এবং প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তোমার চিদাকাশ বিকশিত হইয়াছে। উহার বিকাশ হইলে প্রাণে এমন একটা নির্ম্মল শান্তি উপস্থিত হইবে যাহা জীবনে কখনও ভোগ করিতে পার নাই। ক্রমে অভ্যস্ত হইলে উহাতে তোমার বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হইবে। তখন তোমার সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া এক ও অনন্ত শান্তি লাভ করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। জাগতিক সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, শোক, বিরহ আর তোমাকে ব্যাকুল করিতে পারিবে না। অনন্ত শান্তিময়ের শীতল করস্পর্শে তোমার মন প্রাণ চিরশীতল হইবে। তারপর যখন

ক্রমে প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হইবে তখনই দেখিতে পারিবে, "তদেজতি", "তন্নৈজতি" "তদ্দূরে" "তদন্তিকে" "তদন্ত সর্ব্বস্য অস্য:" "তৎসর্ব্বস্য অস্য বাহ্যত:" তখন প্রত্যক্ষ করিবে, তিনি স্থির হইয়াও অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপ ক্রিয়াশীল, তিনি তোমার অন্তরে বাহিরে পূর্ণভাবে বিরাজিত, অথবা অন্তর বাহির ভেদ বলিয়া কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না, এক অখণ্ড সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, এইমাত্র বুঝিতে পারিবে এবং উহা তোমারই প্রাণ! প্রাণের কেন্দ্র হইতে অতি দূর দূরান্তরে প্রসৃত হইয়াছে, ইহা মানুষ মাত্রেরই লভ্য। এই অবস্থায় আসিবার জন্য জীব অপেক্ষা পরমেশ্বরই অধিক প্রয়াসী, আমরা তো তাঁহাকে চাই না, কিন্তু তিনি যে আমাদিগকে ব্রহ্মত্বে পৌঁছাইবার জন্য সতত চেষ্টাশীল। আমরা যদি কখন তাঁহাকে চাই তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহারই চাওয়ার প্রতিধ্বনি আসিয়াছে মাত্র।

সাধনার চক্ষুতে দর্শন করিলে বেশ দেখা যায় ঋষি এই, "এজতি ন এজতি, দূরে অন্তিকে এবং অন্তরে বাহিরে," এই যুগ্ম শব্দত্রয় প্রয়োগ করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠার যৌগক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিরূপ যোগের সাহায্যে "প্রাণ প্রতিষ্ঠা" সহজে উপলব্ধি হয় তাহাই এই মন্ত্রের অন্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া পাছে ঐ প্রকৃষ্ট উপায়-সমূহ মাত্র বাক্যাকারে হাটে বাজারে বিক্রীত লাঞ্ছিত হইয়া গুরু ও বেদান্ত-বাক্যের অবমাননা হয়, এই জন্যই এইরূপ প্রকাশ শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ো নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা "বামনগুলোর বুজরুকী" নহে। গীতায় ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন "ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন"। আর বিশেষ কথা, পুস্তক পড়িয়া তাঁহাকে লাভ করা যায় না; ইহা যেন সকলেরই ধারণা থাকে। যাহা হৌক, এই মন্ত্রপ্রীতিপাদ্য যৌগিক প্রণালী বিনীত ও শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যের সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

নিয়তি।

অবতরণিকা

(১)

মধ্যাহ্ন আহারের পর দিবা-নিদ্রা সমাপন করিয়া শিবদাস গোস্বামী বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। বাম হস্তে হুঁকা, হুঁকার অগ্রভাগে পূর্ণগর্ভা কলিকা, বৈঠকখানার সম্মুখস্থিত একটী গললগ্নরজ্জু মৃৎ-ভাণ্ডের নিকটে আসিয়া বসিলেন। গ্রাম্য চলিত ভাষায় এই ভাণ্ডটীর নাম "বড়সী।" ইহাতে সুকৌশলে ধূমপানের প্রধান সহায় অগ্নিদেব সুরক্ষিত থাকেন। কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া তক্তাপোষে বসিতে যাইবেন এমন সময় হলধর মাঝি আসিয়া গললগ্নবাসে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। সহাস্যে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "এই যে হলধর বহুদিন পরে! বস, বস; ঐ কম্বল টা টানিয়া লও। ভাল আছ? ছেলেটী ভাল আছে?"

হল। আজ্ঞা আপনাদের চরণ কেরপায় শরালডা এক রকম আছে। দাদাগুঁসাই ত্যাবে ছুঁড়াডাকে লিয়ে বড্ডই মুস্কিলে পড়েছি। সেই যে জ্বরের কথা শুন্যাছিলেন সেডাত কোনুপেরকারে হটল। তারপর আজ বছর দুই হ'ল এমন কাহিল হ'ল যে, লবীন ডাক্তারের কত যে শিশি পার ক'ল্লে তার আর উল্লি নাই। কিছুতেই জ্বর হটল না। অমন যে সুনার বন্ন, কলীর ঠিকনী হ'য়ে গ্যাল। শ্যাষে একডা ভদ্দর লোক বুল্লে "হলধর এ আলুপাতার ওষুদে তোমার ছেল্যার জ্বর যাবে না, হুমোপাতার ওষুদ খা'তে হবে। তাই খেয়্যা জ্বর ডাও হটল, আর প্যাটের পিল্হ্যাডাও কম্‌ল। কালীমার ইচ্ছায় দুট্যা দুট্যা খাতেও পাচ্ছে। আচ্ছা দাদাগুঁসাই আলুপাতার অর্থিডা নাহি বুঝল্যাম। আর এই হুমোগাজডা কেমন বুলতে পারেন?

গো। আরে না না, হলধর তুমি বুঝতে পারনি; ওটা "আলুপাতা" নয়, ওর নাম "এলোপথ"; আসল নামটা "এলোমেলো পথ।" দেখ না পাঁচ শিশির ওষুদ এক শিশিতে ঢেলে এলেমেলো ক'রে দেয়। আর দ্যাখ ঐ ওষুদ খেলে জ্বরটাও এলোমেলো হ'য়ে যায়, পরে যখন খুব এলোমেলো হয় তখন হয় সেরে যায় না হয় নিয়েথুইই যায়। ও পাড়ার কবরাজ খুড়ো বলে, তা নয় ওটা আলের পথ থেকে "এলোপথ" হয়েছে। জমির আলের পথ নাকি খুব ঘুরফের, এ ওষুদে

জ্বরটাও তেমনি ঘুরফের ক'রে আসে। এই রকম ঘুরফের ক'রতে ক'রতে হয়ত সেরে যায় নাহয় দফা সেরেই যায়। তবে ঐ যে "হুমোপথ" বলচ ওটা "হুমোপথ" নয়, ওর নাম "হোমপথ।" অনেক দিন হ'ল এক বিশিষ্ট বৈদ্যরাজ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ দিয়া যজ্ঞি হোম করায়। সেই যজ্ঞির ফলে এই ওষুধ পাওয়া যায়, সেই জন্য ইহার নাম "হোমপথ।"

হল। ঠিক বুল্যাছেন দাদাগুঁসাই, ওষুধটাও দেখ্‌তে রবিকল পবিত্তির গঙ্গা জলের মুতন টল্‌টলে। (এইবার হলধর সতৃষ্ণ নয়নে কলিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারিলেন না।)

গো। কাজ কাম বেশ চল্‌চে ত ? (এবার হলধরের ঘন ঘন দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করিয়া কলিকা নামাইয়া দিলেন।)

হল। (কমলকোরকাকার করপুটে ধুম পান করত) আজ্ঞ্যা কাজ কামের কথা আর বুলেন না। দ্যাশে এল, ইষ্টিমার অ্যাসে আর আমাদের পেত্তুল নাই। তার উপর আবার ছুড়াটা ঐ রকম কাহিল, বড্ডই মুস্কিলে ঠেকেছি দাদাগুঁসাই।

গো। তাইত হলধর, তবে বড় কষ্টেই আছ।

হল। ত্যাবে আপনাদের চরণের কের্‌পায় দু'চার বিঘ্যা জ'মি কর‍্যাছিলাম তাই রক্ষা। কোন্ন পের্‌কারে চল্‌ছে। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) লিধিরাম লোক-ডাই আমার লক্ষ্মী ছিল। তার কথাডা মুনে হ'লে আমার জী দপ ক'রে উঠে। মায়ের কের্‌পা হওয়ায় বাঁ চোকডায় একটু কম দেখত, তবুও যত যে খাটত তার আর ওড় নাই।

গো। দেখ হলধর সবই ভগবানের হাত। তার জন্য আর দুঃখ ক'রে কি ক'রবে বল। তার জলে ডুবে মরাই নিয়তিতে লেখা ছিল, কে আর খণ্ডাবে। তবে খুঁজে খুঁজে আর একটা ঐ রকম লোক যোগাড় ক'রে নিলেনা কেন ?

হল। আর দাদাগুঁসাই আজ ১২।১৪ বচ্ছর লিধিরামকে হারাল্‌ছি ; কত লোক রাখল্যাম, কত লোক গ্যাল, লিধিরামের মুতন আর হ'ল না। কোন্ন কুন্ন ব্যাটা আমার দুচার টাকা মেরেই পালাল। হ্যাঁ, খোকাবাবুকে দেখছি না, পহড়তে গেল্‌ছে বুঝি।

গো। রমানাথের কথা বলচ—হ্যাঁ, পড়তেই গিয়েছেই বটে ; তবে সে আর এখানে পড়ে না, কলকাতায় পড়ে। কেশবপুরের পড়া সারা ক'রে সেখানকার পরীক্ষা দিয়ে ৫, পাঁচ টাকা ক'রে মাসিক জল পানী পেয়েছে।

হল। বেশ বেশ! মা কলী মুখ তুল্যা চাইলে খোকাবাবু একজন জামাদার কি দারোগাও হ'তে পারে।

(হলধরের ধারণা পুণ্যফলে দারোগাগিরি চাকুরী ঘটে। কারণ অনেক সময়ই হলধরকে, তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার ফল অনুভব করিতে হয়।)

গোস্বামী মহাশয় একটু হাঁসিয়া বলিলেন "ভগবান্ যা করেন তাই হবে। এখন বেঁচে বর্ত্তে থাক, এই তাঁর কাছে প্রার্থনা।"

হল। তা আর বল্‌ছেন দাদাগুঁসাই! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সেদিন ক্যার কথাডা মুনে হ'লে গাডা যেন কাঁ'পে উঠে। আর উয়ার বাপ্ মার কথা মুনে হ'লে বুকডা একেবারে চড় চড়্ ক'রে ফাট্যা যায়। এমনই মানুষ দদাগুঁসাই —আর ঝড়ডা কুন্ দিক্ হ'তে ক্যামন ক'রে এলো ট্যারই পালাম না। চোক্ষের নিমিষের মধ্যে স্বপনের মুতন সব সাফ।" এই বলিতে ব'লতে হলধরের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "দেখ হলধর, বার বার ও সব কথা মনে ক'রে কেন আর মিছামিছি কষ্ট পাও। যার যা নিয়তিতে আছে তা অবশ্যই ঘটবে।"

হল। (চোখ মুদিয়া) খোকাবাবু কলক্যাতায় কুন্ জায়গায় থাকে?

গো। আমাদের কাঞ্চনপুরের জমিদার ভায়ার ক৹কাতায় একটা বাঁশের গোলা আছে। একটা ছোট দোতলা বাসা ঘর। একজন কর্ম্মচারী, ঝি, চাকর ও একটী উড়ে রান্না বামুন সেই বাসায় থাকে। জমিদার ভায়ার ছেলে আশুতোষ বাবাজীও সেইখানে থাকিয়া পড়ে। সে নাকি গেলবার এণ্ট্রেন্সো পাশ ক'রেছে। বেশ ভাল ছেলে। রমানাথকে খুব ভালবাসে। কাঞ্চনপুরের মজুমদারদের বাড়ীর একটী ছেলেও সেখানে থাকিয়া পড়ে। তার নাম হরিদাস, সে ছেলেটীও বেশ। সেও ৫৲ পাঁচ টাকা ক'রে জলপানী পায়।

হল। আচ্ছা দাদাগুঁসাই আপনাদের জমিদার মহাশয় না শুন্যাছি খুব দুষ্ট লোক। আপন ছোট ভাইকেও বোলে বাড়ী হ'তে হাঁকিয়ে দিয়্যাছে।

গো। না না বল কি হলধর! হাঁকিয়ে দেবে কেন? নিজেই চলে' গিয়েছে। ছোঁড়াটাও কিছু একগুঁয়ে ছিল। রামকান্ত বলে ও পাড়ার একটা চুনরীর পো ছোট হ'তেই ঐ বাড়ীতে থাকত। জমিদার ভায়া কি দোষের জন্য সেই রামকান্তকে তিরস্কার করে। গুণের ভাই তার প্রতিবাদ ক'রে, এমন কি মুখমুখীও করে। জমিদার ভায়ার মেজাজটা কিছু কড়া, তবে খুবই যে কড়া তাও নয়; তবে তাঁর কথায় কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি বড় চটেন।

তিনি দুজনকেই খুব তিরস্কার করিলেন। সেই কারণে রামকান্তকে লইয়া চুপ্ করিয়া রাত্রিতে প্রস্থান। তবে যে দুষ্ট বল্ছ, তা—কৈ দুষ্টমীত কিছু দেখি না। তবে কথা কি জান বড়লোক পয়সা আছে—তাই ব'লে যে বিনা কারণে কারুর অনিষ্ট করে তা করে না। আবার গরীব দুঃখীকেও দুচার পয়সা দেয়। বাড়ীতে প্রায়ই ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। তবে সংসারে সবাই যে মুনি ঋষি হবে তারই বা মানে কি? কি বল?

হল। ত্যাবে দাদাগুঁসাই এখন উঠি।

গো। বল কি হলধর! তাকি হয়? অনেকদিন পরে এসেছ আজ রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া ক'রে তবে যেতে পাবে। নাও, ঐ তাকে বাঁশের চোঙ্গে তামাক আছে একবার তামাক খাও।

হল। (তামাক লইতে লইতে) না দাদাগুঁসাই থাকবার যো নাই। শুন্লেনিত ছুঁড়াডার আবস্থা ভাল নয়। তাথে আবার আজ দুদিন হ'ল বাড়ী ছাড়ে আস্যাছি।

গো। হ্যাঁ—দুপর বেলায় কোথায় খেলে তাত শুধইই নি। নৌকাতেই বুঝি রাঁধাবাড়া ক'রেছিলে।

হল। (তামাক সাজিতে সাজিতে) না দাদাগুঁসাই আমি দুফরে এইখানেই আজ পেসাদ পাব মুনে ক'রে আসছিল্যাম। সেই যে সেবার ছুড্যা মায়্যা ছেল্যাকে বহি লিয়ে খোকাবাবুর কাছে পহড়তে আস্তে দেখেছিল্যাম—এখন বেশ ডাঙ্গহাল হয়্যাছে। ত্যাবে শুনলাম এখনও বিহ্যা হয় নি। তা আপনাদের ভদ্র লোকের ঘরে, মায়্যা বড় ক'র‍্যাই বিহ্যা দ্যায়। তা না হ'লে বিহ্যার পর শ্বশুর বাড়ী গেলে শ্বশুর শাশড়ীর উপর চোক রাঙ্গাবে ক্যামন ক'রে। আমাদের ছোট লোকের ঘরে অত বড় মায়্যা আবিয়ে রাখ্লে দাদাগুঁসাই আমাদের কিন্তু জাত যায়। যা হ'ক মায়্যা ছুড্যার বুদ্ধি দ্যাখে আমার তাজ্জব লাগল। একটা, চুনরীর বোকে বাতাস ক'র্ছে আর একজনা তাকে ওষুদ খাওয়াছে। বোটার শুন্লাম নাকি ছেল্যা হওয়ার পর হ'তে জ্বর হয়েছে, সে জ্বর আর ছাড়ছে না। তার শাশুড়ী একবারও কাছে আস্ছে না। মায়্যা ছুড়াকে দেখে মুনে হ'ল বুঝি বামুনেরই মায়্যা। আমাকে দেখ্যা তারা কিছুতেই ছাড়লে না ঠাকুর বাড়ী লিয়ে গিয়ে পেসাদ খাওয়ালে। মায়্যা দুট্যা যেন লক্ষ্মী সরস্বতী।

গো। বেশ বেশ, শ্যামরায়ের প্রসাদ পেয়েছ এত সৌভাগ্যের কথা। তুমি

ঠিকই বলেছ, মেয়ে দুটী আমাদের ব্রাহ্মণেরই মেয়ে। ওদের একজন ঐ শ্যামরায়ের পূজক রামধন মুখুয্যের মেয়ে, নাম অন্নপূর্ণা। আর একজন বাগানের পাঠশালের বড় পণ্ডিত সুধাকর চাটুয্যের মেয়ে, এর নাম রাধারাণী। মেয়ে দুটী বেশ ঠাণ্ডা, দেখ্‌তেও মন্দ নয়। (হলধরকে কলিকা প্রদান)

হল। অমনি একটী মায়া দেখে আমাদের খোকাবাবুর বিয়েদিতে হ'বে দাদাগুঁসাই।

গোস্বামী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। পরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তাই হ'বে হলধর! বিয়ের সময় কিন্তু তোমাকে দুচারদিন আগেই আস্‌তে হ'বে।"

হল। তা আর আস্‌ব না, নিশ্চয় আসব। এই বলিয়া নতজানু প্রণাম করিয়া হলধর বিদায় হইল। গোস্বামী মহাশয় হুঁকাটী হাতে করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

কাঞ্চনপুর ও রতনপুর।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কাঞ্চনপুর ও রতনপুর নামে দুই খানি পাশাপাশি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। দূর হইতে দেখিলে একখানি গ্রাম বলিয়াই বোধ হয়। মধ্যে একখানি আমবাগান মাত্র ব্যবধান। বাগানের এক কোণে একটী পাঠশালা। ক্রমে সুবর্ণরেখার মুখ উচু হওয়ায় ইহার বেগ অনেক কমিয়া গিয়াছে। যখন ইহা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত তখন ইহার তীরে কালিকাপুর নামে একখানা গণ্ডগ্রাম ছিল। নদী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে খুব নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ইহার অধিবাসীরা কিছুদূর মাঠে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে কালিকাপুরে রামজয় মজুমদার নামে একজন সঙ্গতিপন্ন মাহিষ্য বাস করিতেন। তিনিও মাঠে আসিয়া বাড়ী করিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম গয়ারাম মজুমদার। গয়ারাম মজুমদারের প্রথমা স্ত্রী কাঞ্চনলতিকার অনেক বয়স পর্য্যন্ত কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁহার পিতা জোর করিয়া আবার তাঁহার বিবাহ দেন, কিন্তু নিয়তির কি অদ্ভুত খেলা অথবা সহজ কথায় বলে "ঝাণে ঝাঁঝি বিওয়" কথাটা এখানে বেশ খাটিয়া গেল। বিবাহের কিছু দিন পরেই কাঞ্চনলতিকা একটী সন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী রতনমণির আর সন্তান হইল না। কাঞ্চনলতিকার দেব-দ্বিজের প্রতি ভক্তি থাকিলেও তিনি গোড়াগোড়ী হিংসোপরায়ণা ছিলেন, তার উপর সন্তান হওয়ায় শ্বশুরের আদর ও সোহাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরও আবদার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। রতনমণির প্রকৃতি

স্বভাবতঃই ধীর। তিনি প্রিয়ভাষিণী। তাঁর সহিষ্ণুতাদি সদ্‌গুণের জন্যই সংসারে কোনরূপ গোলযোগ হইত না। গয়ারাম মজুমদার ধর্ম্মজ্ঞ ও সুচতুর লোক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দুইজনের ভবিষ্যতে একত্রে বাস নিতান্ত অসম্ভব। কারণ ছোট জনের সহিষ্ণুতা গুণে যদিও কোনরূপ গোলযোগ হইতেছে না, তবুও উহাদের মধ্যে যে দাবাগ্নি ধূমাইতেছে একবার তাহা জ্বলিয়া উঠিলেই সর্ব্বনাশ, একবার মুখ ফুটিলেই আর রক্ষা নাই। তখন তাহাদের অবস্থানের দূরত্বে কোন সুফল ফলিবে না। তবুও কি করেন পিতা কিছুতেই ইহাতে মত দিবেন না। তাই তিনি বাড়ী হইতে কিছুদূরে একখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া সেইখানে দু'চারজন বন্ধুবান্ধব লইয়া বসা রহা করিতেন। রামজয় মজুমদার মনে করিলেন গয়ারাম বুঝি বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ আহ্লাদ করা উচিত নয় ভাবিয়া, আমোদ আহ্লাদের জন্য ঐ বাড়ীটা করিয়াছে। 'তা করুক মানুষত আর সারা দিন বিষয় বিষয় করিয়া গাধার মত থাকিতে পারে না, একটু আমোদ আহ্লাদ খেলা ধূলা চাইবই কি ?' পরে পিতার স্বর্গারোহণের পর গয়ারাম মজুমদার নূতন বাড়ীতে রতনমণির বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইঁহাদেরই নামানুসারে গ্রাম দুইখানির নাম কাঞ্চনপুর ও রতনপুর হইয়াছে। রতনমণির সদাশয়তাগুণে কালিকাপুরের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ রতনপুরেই বাড়ী করিয়াছিলেন। তবে কাঞ্চনপুরে যে ব্রাহ্মণ একবারেই বসিলেন না তা নয়। তবে রতনপুরের তুলনায় অনেক কম। পৃথক্ হওয়ার প্রায় দুই তিন বৎসর পর রতনমণি একদিন জ্বরাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন—যেন ভগবান্ গোলোকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোড়ে বসিয়া বলিতেছেন,"মা তুমি সন্তানের জন্য ভাব্‌চ কেন ? এই যে আমি ত তোমার সন্তান। বড়-মা যেমন কৃষ্ণদাস দাদাকে ভালবাসে, তুমিও আমাকে তেমনই ভাল বাসিবেত ? আমি তা'হ'লে এইখানেই থাক্‌ব। এখন মা খেলিগে যাই।" রতনমণির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, গায়ে ঘাম ছুটিল। কি আশ্চর্য্য ! রতনমণির জ্বর ছাড়িয়া গেল, আর জ্বর আসিল না। তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। ভক্তি-পূর্ণহৃদয় মজুমদার মহাশয় স্বপ্নের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। অল্পদিন মধ্যে রতনমণির বাড়ীর নিকটে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইলে মহাধুমধামের সহিত সেই প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শ্যামরায়ের বিগ্রহ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। মজুমদার মহাশয় রাধাশ্যামের সেবা চালানর জন্য অনেক জমি তাঁহার নামে লিখিয়া দিলেন। অদ্যাবধিও রতনপুরে ইঁহার সেবা হইয়া থাকে। একবার

যিনি শ্যামরায়ের "পায়স-প্রসাদ" পাইয়াছেন, কোন কালে তিনি তাহার মাধুর্য্য ভুলিতে পারিবেন না।

মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক দিবস পরে একদিন বিকেল বেলায় রতনমণি ঘরের শয্যায় বসিয়া একমনে ঠাকুরুণের রেশমী কাপড়ে জড়ির পাড় সেলাই করিতেছিলেন, এমন সময় কামিনী ঝি দোকান হ'তে একপুরিয়া ধূপ ও একমুঠা পান হাতে করিয়া আসিয়া ব্যবস্তার সহিত বলিল 'বৌমা!' কামিনী ঝি বহুদিন হইতে মজুমদার-সংসারে কাজ করে, গয়ারাম মজুমদারকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করে, সেই জন্য সে বৌদিগকে "বৌমা" বলিয়া ডাকে, "বৌমা, আমি এক কথা ভুল করেছি, আর মা বুড়ো মানুষের কিছু মনেও থাকে না। আর আমার হরগোবিন্দ যাওয়ার পর থেকে কি যে করি, কি যে না করি কিছুই ঠিক থাকে না।" হরগোবিন্দ কামিনীর পুত্র, বহুদিন হইল সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তবে কোন কাজে ভুলচুক্ হ'লে কামিনী ওজরটা করিতে ছাড়ে না। 'তা বাছা আমাদের মতন লোকের আর বেঁচে থাকা মিছে। ভগবান্ আর কত দিনই যে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন?" রতনমণি বলিলেন "বালাই, বাঁচ্‌বে বই কি?" এই আশীর্ব্বাদবচনে কামিনী মনে মনে খুসি হইয়া স্মিত বদনে বলিল "তা আর বলিস্‌নে মা; এখন গেলেই বাঁচি।" কথায় কথায় আসল কথা চাপা পড়িল। কিন্তু রতনমণি বিরক্ত হইলেন না। তিনি জানিতেন সহজে তার কাছে আসল কথা পাওয়া যায় না। তখন বলিলেন "অনেক দুর ঘুরে ফিরে এসেছ বাছা একটু বস।"

"হ্যাঁ মা বসি" এই বলিয়া কামিনী পৌরায় পা ছড়াইয়া শয্যার উপর বসিল। "আর বাছা বুড়ো মানুষ দোড়ে-ঝেপে হাঁটবার কি আর যো আছে? মানুষ বুড়োলেই ছাই আর কোন পদার্থই থাকে না?" এবার আর রতনমণি কোন উত্তর করিলেন না। পরে নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া কামিনী বলিল, "দেখ বৌমা, বড় বৌমা আজ বিকালে এ বাড়ী আস্‌তে চেয়েছেন। তুমি কি মা তাঁকে আসতে বলেছ?" রতনমণির শরীরে তাড়িৎবেগ প্রবাহিত হইল। কিন্তু কামিনীকে সে ভাব জানিতে দিলেন না। রতনমণি ভাবিলেন "এখন যদি কামিনীকে কোন কাজে না পাঠাই তবে হয়ত. দিদির নিন্দা গাহিতে বসিবে, নিন্দা আমার ভাল লাগে না।" তাই তিনি বলিলেন "দেখ বাছা এ ভুলে আর কি হয়েছে, তুমি আর একটা খুব ভুল করেছ। ঠাকুর-ভোগের আতপ চা'লগুলো ঝাড়া হয়নি!" "হ্যাঁমা বড়ই ভুল হয়েছে," এই বলিয়া কামিনী

চলিয়া গেল। তখন রতনমণি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "একি! দিদিত এ বাড়ী কখনও আসে না। তবে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠার দিন এসেছিল, তাও অল্পক্ষণ ছিল। তবে কি কোন অনিষ্টচিন্তা ক'রে আস্‌ছে! তা অনিষ্ট আর কি কর্ব্বে? তবে বল্‌তে পারে উনি এ বাড়ীতে আর আস্‌তে পাবেন না? সেটা বড়ই মর্ম্মান্তিক! তা কি কর্‌ব, শ্যামরায়ের যদি তাই ইচ্ছা হয় তবে তাই হবে!" রতনমণি এবার নয়ন মুদিয়া যোড়করে বলিলেন, "শ্যামরায়, বাবা, তুমি সবই জান, তোমার দুঃখিনী জননীকে আর যেন কষ্ট দিও না।" বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয় যেন এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইল। বলিতে লাগিলেন, "একি! আমি মিছামিছি কি ভাবছি? দিদিত কোন দিনই আমার কোন অনিষ্ট করেনি! কৈ একত্র থাকার সময়ও একদিনও সে স্বামি-সেবায় বাধা দেয়নি!" তাইত মানুষ নিতান্তই স্বার্থপর। স্বার্থের দ্বারা অন্ধ হইয় অপরের অল্প দোষ-কেও বেশী বলিয়া জ্ঞান করে, এমন কি নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও দোষী মনে করে। রতনমণিকে আর ভাবিতে হইল না। কাঞ্চনলতিকা পুত্র কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। রতনমণি ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণ-দাসের বয়স তখন প্রায় ৬ বৎসর। বৎসর দুই বয়সের সময় "ছোত মার কোলে যাব" বলিয়া ধুন ধরিলে রতনমণির কোলে না আসিয়া আর থামিত না। এখনও মায়ের ভয়ে চুপ করিয়া ছোট মায়ের কাছে আসিত। কৃষ্ণদাস আজ মায়ের সঙ্গে ছোট মার বাড়ী আসিয়াছে, ভারি খুসি। তাড়াতাড়ি গিয়া ছোট মার কাছে দাঁড়াইল। শঙ্কিতহস্তে রতনমণি ক্রোড়ে তুলিয়া বদন চুম্বন করিলেন। কৃষ্ণদাস ছোট মার কোল হইতে মাএর দিকে ফিরিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল। কাঞ্চনলতিকা ক্ষণকাল ধীর ভাবে রতনমণির দিকে চাহিয়া রহিলেন। "রতন!" রতনমণি আজ একি শুনিলেন! এরূপ স্নেহপূর্ণ সোহাগের ডাক অনেক দিন ত তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। দিদি কি তবে ছল করিয়া এরূপ ভাব ধরিয়াছেন! না না কখনই নয়, মানুষ ছল করিয়া এরূপ সরল মধুর কথা কখনই বলিতে পারে না। তিলেকের মধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া রতনমণি বলিলেন, "দিদি আজ আমার বড় সুদিন, আমি—" কাঞ্চনলতিকা বাধা দিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বলিতে পারিলেন না। চোখের জলে গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল। রতনমণি এবার বড়ই ব্যাকুল হইলেন, ভাবিলেন "কি না জানি অমঙ্গল ঘটিয়াছে?" ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "দিদি! দিদি! শীঘ্র বল বাড়ীতে কোন অমঙ্গল ত ঘটে নি? তিনি কোথায়? তোমার ভাব দেখিয়া

আমার বড় ভয় হইতেছে! শীঘ্র বল!" কাঞ্চনলতিকার হৃদয়ের বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি বলিলেন, "রতন! রতন! আমি তোমার দিদির যোগ্য নই, রতন তুমি আমার দিদি; ভাই আমার একটী প্রার্থনা আছে শুনবে কি?"

রতন। সেকি দিদি আমি কোন্ কথা তোমার শুনি নাই? আমি কোন দিনই ত তোমার অবাধ্য নই।

কাঞ্চন। রতন! আমি পাপিনী, হিংসাপরায়ণা; তোমার ভক্তিপূর্ণ সরল হৃদয়ে কত না যাতনা দিয়েছি। আমি হতভাগিনী, তোমার হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন ভক্তবৎসল শ্যামরায় তোমার অচলা ভক্তিতে তোমাকে "মা" বলিয়া ডাকিয়াছেন, আর আমি রাক্ষসী তোমার আপন কৃষ্ণদাসকে তোমার কাছে যাইতে দিই না। আমায় ক্ষমা কর রতন। রতন, তুমি সত্য সত্যই রতন, অমূল্য রতন; তুমি মানবী নও তুমি দেবী।" রতনমণি আর শুনিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে কৃষ্ণদাসকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া, কাঞ্চনলতিকার দুইটী হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "দিদি! দিদি! অমন কথা বলো না, আমি ত তোমার দাসী" আর বলিতে পারিলেন না। উভয়েই নীরব। উভয়েরই চোখের জলে বুক ভাসিতে লাগিল। কৃষ্ণদাস সজলনয়নে একবার মার মুখের দিকে একবার ছোটমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ভাবিল একি? কামিনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তারও চোখে দু'এক ফোঁটা জল দেখা দিল। এই ঘটনার পর হইতে যতদিন জীবিত ছিলেন, দু'জনের মধ্যে বেশ গাঢ় প্রণয়ভাব লক্ষিত হইত। আমাদের পূর্ব্বকথিত হরিদাস এই ভক্তিপূর্ণহৃদয় কৃষ্ণদাসেরই পুত্র। কৃষ্ণদাস হরিদাসকে রাখিয়া অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। কাঞ্চনপুরের দেবেন্দ্রকুমার গোস্বামীর পিতা রামানন্দ গোস্বামী যখন কালিকাপুরে বাস করিতেন, তখন তাঁ'র অনেক শিষ্য সেবক ছিল। তদুপলক্ষে তাঁ'র বিস্তর অর্থ সঞ্চিত হয়। তবে তাঁ'র অর্থের পরিমাণ প্রায় লোকে জানিত না। তাই ব'লে তিনি কৃপণ ছিলেন না। তিনি অনেক সৎকার্য্যেই ব্যয় করিতেন। অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতেন। তবে তাঁ'র দানের কথা হয়ত অনেকেই জানিতে পারিত না। তিনি জ্ঞানী ও বিদ্বান্ বলিয়া সকলের নিকট পূজিত ছিলেন। তাঁ'র পরলোক গমনের পর দেবেন্দ্র বাবু জমিদারী কিনিবার বাসনা করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি ৪।৫ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী ক্রয় করিলেন। কাজেই তিনি পাড়াগাঁয়ের মধ্যে একজন জমিদার বলিয়া গণ্য

হইলেন। ক্রমেই তাঁ'র প্রতাপ বাড়িতে লাগিল। গুরুগিরি ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল। জ্ঞাতিরা যিনি যেমনে পাইলেন, শিষ্য সেবক অধিকার করিয়া লইলেন। আমাদের রতনপুরের শিবদাস গোস্বামী ইঁহার জ্ঞাতি ভাই। তিনি এই দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে যতই বলুন না কেন, ইনি প্রজাদিগের প্রতি বড়ই অত্যাচার করেন। সামান্য কারণেও তাদের প্রতি উৎপীড়ন করেন। তাঁ'র আদেশ পালনের কেহ অন্যথা করিলে আর রক্ষা নাই। তবে কেশবপুরের মেজবাবুর মত তোষামদপ্রিয় নন। নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করেন। কেশবপুরের মেজ বাবুরা চার ভাই। বড় ভাই মারা গিয়াছেন, মেজভাই বাড়ীর তত্ত্বাবধান করেন, ছোট দুই ভাই কর্ম্মস্থানে থাকেন; পূজার সময় বাড়ী আসেন। একদিন একজন ভদ্রলোক আসিয়া মেজবাবুকে বলেন "আপনাদের স্কুলের—" মেজবাবু একেবারে অগ্নি-শর্ম্মা—দুই চোখ রক্তবর্ণ। অমনি মোসাহেবপ্রবর বাবাধন মিত্র বলিলেন, "মহাশয় আপনার দেখি ব্যাকরণে আদৌ জ্ঞান নাই, আপনাদের! 'আপনার' বলুন।" ভদ্রলোকটী ত অবাক্। দ্বিরুক্তি না করিয়া অমনি প্রণামান্তে প্রস্থান। আমাদের দেবেন্দ্র বাবুর কাছে তোষামুদেরা বড় কিছু করিতে পারেন না। যাহা হউক, দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রী দয়াময়ী সত্য সত্যই দয়াময়ী। তিনি অনেক সময় অনেক প্রজাকে তাঁর অযথা অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। দেবেন্দ্রবাবু যতক্ষণ দয়াময়ী নিকেটে থাকেন ততক্ষণ নিজের অন্যায় সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন কিন্তু কাছারীতে গেলেই আবার সব ভুলিয়া যান। দেবেন্দ্র বাবুর সহোদরের নাম শৈলেন্দ্রকুমার। বাল্যকাল হইতেই শৈলেন্দ্রকুমার ন্যায়পরায়ণ। রামকান্ত রতনপুরের চুনুরীপাড়ার ঘনশ্যাম চৌধুরীর পুত্র। ঘনশ্যাম কবিরাজী করেন। দেবেন্দ্র বাবুর সমবয়সী সকলেই তাঁকে কবিরাজ খুড় বলে। বাস্তবিকই রামকান্তকে সামান্য দোষের জন্য প্রহার করেন। শৈলেনের মনে বিষম আঘাতও লাগে। সে তার প্রতিবাদ করে। তখন দেবেন্দ্র বাবুও রাগের মুখে তাহাকে খুব তিরস্কার করেন। ইহাই শৈলেনের গৃহত্যাগের কারণ। শৈলেন যখন গৃহত্যাগ করে তখন দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র আশুতোষের বয়স বৎসর আষ্টেক মাত্র। কাঞ্চনপুরের জমিদারবাবুর বাড়ী আকারে বড় হইলেও বাহিরে তত জাঁকজমক নাই। বাড়ীসংলগ্নই কাছারী বাড়ী। কাছারী বাড়ীর সম্মুখে কতকটা খোলা যায়গা। তা'র একদিকে একটি ফুলের বাগান, অন্যদিকে একটী বড় আম গাছ। সকালে বিকালে এই গাছের তলায় বেঞ্চ পাতা থাকে। কোন কোন দিন জমিদার বাবু তথায় বসিয়া গ্রামের

ভদ্রলোকদের সহিত নানা বিষয়ের গল্প গুজব করেন। জায়গাটীর তিনদিকে পাকা প্রাচীর; কাছারী হইতে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা। রাস্তার মুখে প্রাচীরসংলগ্ন একটী নহবৎ ঘর। প্রাচীরের অনতিদূরে একটী পাকা চণ্ডীমণ্ডপ; প্রতি বৎসর এখানে মাএর পূজা হইয়া থাকে।

"যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল;"

৩

আশ্বিন মাস। এখনও খাল বিল জলে টাবটুব করিতেছে। পদ্মার বিশাল বক্ষ বাহিয়া বারিরাশি গড়াইয়া চলিতেছে। মাণিক নগরের উপকণ্ঠস্থ কালিকা-মন্দিরের সন্ধ্যা-আরতি সমাপন করিয়া পূজারী ঠাকুর প্রস্থান করিয়াছেন। শুক্ল পক্ষের তৃতীয়ার চন্দ্র দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগনে লুকাইয়া গেল। জনৈক কঠিনহৃদয় কৃষক কতিপয় বংশাগ্র স্কন্ধ হইতে ক্ষিপ্রহস্তে ভূতলে রাখিয়া এবং তন্মধ্য হইতে একখানির অগ্রলম্বিত রজ্জুপ্রান্তসংলগ্ন লৌহযন্ত্রে একটী ভেকের পৃষ্ঠদেশ অতি সন্তর্পণে বিদ্ধ করিল। পরে জলে ভাসাইয়া দিয়া বংশাগ্রটা তীরে পুতিয়া দিল। কৃষকের সঙ্গে একটী বালকের বামহস্তে একটী মাটীর কলসী। কলসীর মুখে একখানি নারিকেল-খোলা। কলসীটি ভেকে পরিপূর্ণ। বগলে কতকগুলি কোষ্টা-কাঠি, দক্ষিণহস্তে একটি কোষ্টা-কাঠির মশাল। এক একবার মশালটী মাটিতে ঠুকিতেছে। কৃষকপ্রবর এইরূপে এক একটী করিয়া বংশাগ্র-গুলি পুতিতে পুতিতে অদৃশ্য হইল। অন্ধকারময়ী রজনী—সুকেশিনীর সুচিক্কণ কেশপাশসংবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজত-কুসুমের ন্যায় খদ্যোতমালায় বিভূষিতা। চতুর্দ্দিক্ নীরব। কেবল ঝিল্লিকুলের নিরুপদ্রব ঝিঁঝিরব নদীর কুল-কুল রবের সহিত মিশিয়া নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার ভীষণ মূর্ত্তিটীকে কিছু মোলায়েম করিতেছে। নিকটে কোন লোকালয় নাই। স্বভাবতঃই স্থানটী ভয়ঙ্কর। পরিত্যক্ত গৃহের তৃণলতাচ্ছাদিত অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীরগুলি পথভ্রান্ত পথিকের মনে ভীতি উৎপাদন করিবার জন্যই যেন অসুরের ন্যায় দণ্ডায়মান। কেবল মন্দিরের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র আলয়। একটী ক্ষুদ্র খড়ের ঘর। বাঁশের ছাঁচায় ঘেরা। বাঁশের ছাঁচারই একটী দুয়ার। ঘরটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাণিকনগরের মহাজন রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসামীপত্র আসিয়া কখনও কখনও এই ঘরে বাস করে। ঘরের মেঝেটী সিমেণ্ট করা। একটী মৃন্ময় প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। নিকটে একটি যুবতী উপবিষ্টা। যুবতীর বয়স প্রায় পঞ্চদশ বর্ষের কিছু বেশী। সম্মুখে একটী সুন্দরমূর্ত্তির যুবক অজ্ঞানাবস্থায়

মৃত্তিকাসনে শায়িত। যুবকের গাত্রস্থিত কামিজটী অর্দ্ধমুক্ত, পরিধেয় বসন বিশৃঙ্খল। যুবতী কখনও কখনও একদৃষ্টে তাহার বদনের দিকে চাহিতেছে। রমণীর মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন নাই। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন এই অল্প বয়সেই অনেকবার ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ জয়লাভ করিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে এক একবার ললাট কুঞ্চিত করিতেছে। বোধ করি ভাবিতেছে, "এ ত অন্যদিন এরূপভাবে এতক্ষণ অজ্ঞান হইয়া থাকে না।" অমনি তাড়াতাড়ি গায় হাত দিয়া দেখিতেছে। আবার নির্ভীক নয়নে বদন নিরীক্ষণ করিতেছে। হঠাৎ কচ্‌মচ্‌ শব্দে রমণী চমকাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রৌঢ়া রমণী সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পূর্ব্বোক্ত রমণী সাগ্রহে বলিল "বামা গিন্নি, রাত্রিতে কি মনে করে?"

বামা। কেন হেমলতা! কিছু অন্যায় ক'রেছি কি?"

হেম। না, না অন্যায় হ'বে কেন? বস বস।

বামা শয্যায় বসিতে যাইয়া যেন কিছুই জানে না এই ভাবে বলিল, "ওঃ বাবু মদ খান?" এই বলিয়া নাকে কাপড় দিয়া সরিয়া বসিল। হেমলতার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। কিন্তু বামাকে সে ভাব জানিতে দিল না। বামা ক্ষণকালের মধ্যে তাহার অগ্রসরের নির্দ্দিষ্ট পথ ভাবিয়া লইল। তাহার পরিধানে একখানা সাদাপেড়ে ধুতি। হাতে একটি মালার ঝোল। কপালে নাসিকার অগ্রভাগ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিলক। ললাটে কিম্বা হস্তে কোনরূপ সধবার চিহ্ন না থাকিলেও ওষ্ঠদ্বয় তাম্বুলরাগরঞ্জিত। বামগণ্ড ঈষৎ স্ফীত। অনুমান একটা অর্দ্ধচর্ব্বিত তাম্বুল এখনও বদনগহ্বরে বিরাজিত। চেহারাটা দেখিলে বোধ হয় যৌবনকালে মন্দ ছিল না। তবে বর্ণটা খুব কালও নয়, আবার ধব্‌ধবে গৌরও নয়, ঐ একরূপ মাঝামাঝি। তবে আকারটা কিছু স্থুল। ধীরে ধীরে মুদ্রিতনয়নে মালা-ঝোলাটি মাথায় রাখিয়া পরে কাপড়ের ভিতর হাত দিয়া গলার মালায় ঝুলাইয়া দিল। এবার বলিতে লাগিল "দেখ মা, আমি তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। একখানি ডুলিও আনিয়াছি। বাবুদের বাড়ীতে আজ কীর্ত্তন হইবে, তাই মেয়েরা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে।"

হেম। সে কি বামা গিন্নি! তুমি না আজ সকালে বল্লে বাবুদের বাড়ী মেয়ে ছেলে নাই।

বামা। তুমি মা বুঝতে পার নি। বাবুর গিন্নীরা যেন নাই। কিন্তু তাঁর

ভগ্নী কি ভাগ্নী থাক্‌তে নাই কি? ঁার ভগ্নী ত নিজেই আস্‌ছিলেন, আমি তাঁকে বারণ ক'রে এলাম।

হেম। দেখ মা, আমি কেমন ক'রে যাই? ওঁকে এ রকম অবস্থায় রেখে—

বামা। তা তার জন্য চিন্তা কি? আমরা গিয়াই হরের মাকে পাঠিয়ে দেব। (হরের মা বাড়ীর অন্যতম ঝি—গোয়াল গোবর করে) বাবু জাগিলে সব সে করতে পারবে। আর যতক্ষণ না জাগেন বসে পাহারা দিবে। আর সে বড় মানুষ তোমার চেয়ে ভালই যত্ন করিতে পারিবে। এই সময় বাহিরে একটি শব্দ হইল। শব্দটী সাঙ্কেতিক। বামা কাণ পাতিবার ভাণ করিয়া বলিল, "দেখলে মা আমি বার বার বারণ ক'রে এলাম তাও দিদিমণি মান্‌লেন না। বোধ করি বাবু আছেন ব'লে বাড়ীর ভিতর এলেন না।

হেম। সে কি? বাবুর ভগ্নী নিজে হেঁটে আমাকে নিতে এসেছেন!

বামা। তাতে কি? তিনি ত বাপের বাড়ীর ঝি, এ দেখচ্ না আলো। সত্য সত্যই সেই সময়ে বাহিরে একটি হারিকেনে আলো দেখা যাচ্ছিল।

সরলমতি হেমলতার বামার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। যদিও সে তার স্বামীকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া কখনই কীর্ত্তন শুনিতে যাইবে না, তথাপি ভাবিল "আশ্রয়দাতার ভগ্নী স্বয়ং আমাকে নিতে এসেছেন, একবার বাহিরে গিয়ে অভ্যর্থনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।" তাই সে তাড়াতাড়ি বাহিরে এল। বামাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দুয়ারটি ঠেলিয়া দিল। পরে একটু বিস্ময়ভাব দেখাইয়া বলিল "এই যে কর্ত্তাবাবু, আমি ভাবিয়াছিলাম দিদিমণি—

কর্ত্তা। কেন আমি আসিয়া কি কোন অপরাধ করিয়াছি?

হেমলতা লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল। নিম্নস্বরে বামাকে বলিল "একটু সর, আমি ভিতরে যাই।" বামা অচল খণ্ডিকার ন্যায় দুয়ার চাপিয়া দণ্ডায়মানা রহিল। পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন, আমরা কি বাঘ? তাই তোমাকে গপ্ করিয়া গিলিয়া খাব?" হেমলতা কাতর কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি বলচ আমি বুঝতে পার্‌ছি না।" বামা বলিল, "চাঁদ বুঝবে কেমন করে, তুমি যে বোকা খুকি!" হেমলতা ছল ছল নেত্রে বামার দিকে চাহিয়া রহিল। বামা আর সে বামা নাই, এখন নিজ মূর্ত্তি ধরিয়াছে। সয়তানী-হাসি হাসিয়া বলিল "আ মোলো ছুঁড়ী,—তোর কি কপালে চোক নাই, দেখ দেখি কর্ত্তাবাবুর কেমন কার্ত্তিকের মত চেহারা।"

সত্য সত্যই বাবু আজ কার্ত্তিক সাজিয়াছেন। শুধু কার্ত্তিক কেন সোণার কার্ত্তিক! যেহেতু বর্ণটী বেশ নিখুঁত গৌর। পরিধানে একখানি কুঞ্চিত শান্তিপুরে ধুতি। গায়ে একটী আদ্দির পাঞ্জাবী। আস্তিন দুইটী সযত্নে কুঞ্চিত। গলদেশে সূক্ষ্ম চাদর রজ্জ্বাকারে লম্বিত। হাতে চাঁদি বাধান একখানা ছড়ি। চরণদ্বয়ে ডসন্-নির্ম্মিত' মচমচ্কারিণী পাদুকা। বয়স অর্দ্ধশতাব্দির কাছাকাছি হইলেও বৃদ্ধত্বের একতম নিদর্শন রজতশুভ্র বদন-কেশের বিনাশ সাধন করিয়া বেশ সুন্দর হইয়াছেন। তবে বুঝি শিরস্কেশের বিনাশে সৌন্দর্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিবার আশঙ্কায় সেগুলির বিচিত্র বিন্যাসের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তুষারধবলা বিরলতৃণগুল্ম অনুচ্চ শৈলশ্রেণীর মধ্য প্রবাহিতা সংকীর্ণায়তনা গিরিনদী হর্ষোদ্বেগতরঙ্গমালায় ঈষদালোড়িতা ললাটসমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে।— "আহা কেমন হাসি, কত পুণ্যি কল্লে তবে এমন মানুষ মিলে।" হেমলতা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তবুও সকাতরে বলিল "বামা গিন্নি, তোমার পায়ে পড়ি আর ব্যাঙ্গ করোনা, ও রূপ ব্যঙ্গ আমাকে ভাল লাগে না।" বামা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "আরে ছুঁড়ী বলে কি; হ্যাঁ লো আমার কি আর রঙ্গ ব্যাঙ্গ ক'র্‌বার সময় আছে? তোদেরই এখন রঙ্গ ব্যাঙ্গ ক'রবার সময়। দেখ দেখি একবার—চোকটা তুলেই দেখ, কোথায় চাঁদ আর কোথায় কি! সোয়ামী সোয়ামী ক'রে মরিস্ ও সোয়ামী ত হতচ্ছাড়া নেশাখোর"। হেমলতার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল যেন ধরণীতল ক্রমে নীচু হইয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি বামার পায়ের কাছে পড়িয়া বলিল "বামা বামা, রক্ষা কর আমাকে; ভিতরে যাইতে দাও।" বামা মুখবিকৃতির সহিত বলিল "কেন, ঐ হাবাতে মড়াটার কাছে যাবে বুঝি?" হেমলতার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। সে এখন উন্মত্তা, লজ্জা সরম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। ব্যাকুলতার সহিত যুক্তকরে বলিল "বলুন বলুন—আপনি আশ্রয়দাতা, আপনি পিতা—বলুন পিতা, উনি কি আর বাঁচিবেন না?" কোন উত্তর না পাইয়া বামার দিকে চাহিয়া বলিল "দেখ বামা, তুমি আমার মা—সত্য সত্যই আমার মাতৃসদৃশা, বল বল শীঘ্র বল"—

বামা। দেখুন! দেখুন কর্ত্তাবাবু ব্যাঙ্গ দেখুন; আমি ওর মা আর আপনি ওর পিতা?

হেমলতা বুঝিল বামা যথার্থই নিষ্ঠুরা। করযোড়ে আবার কর্ত্তা বাবুকে

বলিল "পিতঃ পিতঃ! শীঘ্র বলুন—শীঘ্র বলুন—একবার বলুন তাঁর জীবনের কোন আশা নাই—" হেমলতার কণ্ঠরোধ হইল, সজল নির্নিমেষ নেত্রে কর্ত্তা-বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া র'হল। কর্ত্তাবাবু নির্ব্বাক্। ক্ষণকালের জন্য তিনি কোথায় আসিয়াছেন, উদ্দেশ্য কি, সব ভুলিয়া গেলেন। হৃদয়ের মধ্যে অজ্ঞানিত ভাবে যেন কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। চোক দুটাও ছল ছল করিয়া উঠিল। বামা ভারি ব্যস্ত হইল। তার উদ্দেশ্য বুঝি বিফল হয়। তখন সুরট কিছু নামাইয়া বলিল "ওমা! আমি মড়া বাললাম তাই বুঝি ছুঁড়ী ভাবলে ওর স্বোয়ামী মরেছে। আমর্ পাগলা, সা'ধে কি আর আমি বোকা বলেছি। বলি হ্যাঁলা, তোর স্বোয়ামী—তোর গুণের স্বোয়ামী মরবে কেন লো? বালাই! আমি সত্যি ক'রে বল্‌তে পারি তোর স্বোয়ামী তিন পুরুষ বেঁচে থাক্‌বে। অমন হাড় হাবাতে হতচ্ছাড়া মাতালগুল যদি এত শীগ্‌গির শীগ্‌গির মরে তবে যমরাজার কলঙ্ক হবে যে! লক্ষ্মী—তোমার স্বোয়ামীর বাঁচা মরার দায়ী আমি থাকলাম, এখন সুড় সুড় ক'রে ডুলিতে ঢুকে পড় দেখি। বেশীক্ষণ ত আর নয়? এই বাগানবাড়ী যাবে আর ঘুরে আসবে, এই ত।" কর্ত্তাবাবুর হৃদয়ে আবার পাপকামনা জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "বামা আর দেরী কর্লে কার্য্য সিদ্ধি হ'বে না।" হেমলতা এখন বেশ বুঝিতে পারিল, ইহাদের করুণার আশা বৃথা। তখন যুক্তকরে মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "মা মা কাত্যায়নি! তুই না মা অন্তর্য্যামী? সন্তানের প্রতি এইরূপ অত্যাচার, আর তুই হাস্‌তে হাস্‌তে দেখ্‌ছিস্? তোর কি কিছু মাত্র দয়া নেই মা? ও বুঝেছি তুই দুরাচার সন্তানগুলকেই বেশী ভালবাসিস্, তা না হ'লে দুষ্ট দশাননের দুরাচারের প্রশ্রয় দিবি কেন? পাষাণের মেয়ে তুই সত্য সত্যই পাষাণী। না না, তুইত মা দয়াময়ী সংকটবারিণী—অসুরনাশিনী—অভয়দায়িনী জগদম্বা—মা—মা" হেমলতার অশ্রুপূর্ণ নিশ্চল নয়নযুগল মন্দিরে নিবদ্ধ, বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন নিস্পন্দ দেহটীকে তদবস্থ রাখিয়া তার আত্মা কোন অচেনা অজানা রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ইঙ্গিত মাত্র কর্ত্তাবাবু নিকটে আসিলে বামা মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল "কর্ত্তাবাবু! আর কোন্ চিন্তা নাই, আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। আমি ঠিক ঠাওর করেছি। আমি যদি সতী মায়ের সতী ঝি হই তবে আমার কথা কোন রকমেই অন্যথা হইবে না। এ ছুঁড়ী নিশ্চয়ই কোন যাত্রাদলের বক্তৃ, বক্তিমা করে। আমি যখন গেরস্ত কুল ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণব কুলে আসি সেই সময়ে কিছুদিন একটী বড়লোকের

আশ্রয় ছিলাম। লোকটা আমাকে বেশ আদর ক'রত। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এবং কপাল কুঞ্চিত করিয়া, কর্ত্তাবাবুর দিকে চাহিয়া) সে দিনের কথা মনে হ'লে এখনও আমার মনটা কেমন করে উঠে। যাক্ সে অনেক কথা, সেই বাড়ীতে একদিন মেয়ে-যাত্রা হয়। সেই দলের একটা ছুঁড়ীও ঐরূপ বক্তিমা করেছিল। দু তিনবার ঐ রকম বক্তিমা ক'রে ধপ্ করে প'ড়ে গেল; ছুঁড়ীটা নাকি অন্তঃসত্ত্বাও ছিল। আমি ত ভাবলাম কম্ম ফ়ঃসা। ও যেই সাদা কাল আল খাল্লা পরা মিন্‌সেগুল—অ বশ্যি দুট মোটা মোটা মেয়েও তার মধ্যে ছিল—হো হো ক'রে ডাকাতের মত গান গেয়ে উঠল অমনি ছুঁড়ীটা ঝোড়ে ঝুড়ে উঠে আশরের এক পাশ দিয়ে চুপে চুপে সটানে চম্পট! তাই বল্‌ছি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, এও যেমন ধপ্ ক'রে পড়বে আমনি থপ্ ক'রে ডুলিতে তুলে—জানছেন আর কি?" এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এইরূপ পৈশাচিক অট্ট হাস্যে হেমলতা চম্‌কাইয়া উঠিল। আবার ঊর্দ্ধ মুখে যুক্তকরে বলিতে লাগিল—"হরি দয়াময়, পিতার কিট শুনিয়াছি কায়মনে স্বামি-সেবা করিলে তুমি তার সহায় হও—অন্তর্য্যামী আমি জ্ঞানে কখনও ত স্বামি-সেবার ক্রুটী করি নাই। আরও শুনিয়াছি, যে তোমার উপর সকল ভার করিতে পারে তুমি তাকে সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। বিপদ্‌ভঞ্জন, তুমি না সেই প্রহ্লাদের ভক্তবৎসল হরি। প্রহ্লাদকে সকল বিপদ্ হ'তেই উদ্ধার ক'রেছিলে। তুমিই না ধ্রুবের সেই পদ্মপলাশলোচন! হরি! তুমিই না দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ অর্জ্জুনসখা—রাধিকারমণ তুমিই ত সেই কালভয়হরণ কালিয়-দমন সঙ্কটনাশন—তুমিই না জটীলের সেই দীনবন্ধুদাদা—আমি অসহায়া দীন-হীনা বড়ই সঙ্কটে পড়েছি। একবার দেখা দাও—ঐ আবার লুকালে—হরি—" হেমলতা আবার নীরব—গণ্ড বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বদনমণ্ডল উজ্জ্বল তেজঃপূর্ণ। কর্ত্তাবাবু এবার বড়ই অস্থির হইলেন, ভাবিলেন আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। বামা মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তীব্রস্বরে বলিল "ভিক্ষু, রামা, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? ডুলির কাপড় তোল"। কথার ভাবে জ্ঞান হইল, যেন দেরীর সমস্ত দোষই উহাদের। রামা ও ভিক্ষু দুইজন ডুলির বেহারা। তাহাদের হাত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এতক্ষণ তারা অনেকবারই মনে করিয়াছে যে দুরাচারদ্বয়ের মুণ্ড দুইটী ছিঁড়িয়া পদ্মার জলে ভাসাইয়া দিয়া কোন দূরদেশে পলায়ন করে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেলে পিলের ভাবী বিপদ ভাবিয়া নিরস্ত হইয়াছে। পাঠক এইখানে একবার নিরক্ষর

বাহকদ্বয়ের মনের প্রতি এবং অর্দ্ধদগ্ধরম্ভাসদৃশ অল্প শিক্ষিত ভদ্রনামধারী অর্দ্ধবৃদ্ধ কুলতিলকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। বামা এবার দৃঢ়স্বরে বলিল "কর্ত্তাবাবু আর কেন? ধরুন ধরুন"—এই সময় যেন অর্দ্ধচেতনাবস্থায় হেমলতা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল "হরি হরি রক্ষা কর রক্ষা কর—আমার সেবার সর্ব্বস্বধন এই মন্দিরে রহিল। হরি মধুসূদন"! এই হৃদয়বিদারক, হৃদয়গ্রাহী আহ্বান আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিল। মন্দিরের কোণে প্রতিধ্বনিত হইল।—একি! একি! অকস্মাৎ বিষম মুষ্ট্যাঘাতে কর্ত্তাবাবু মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূতলে পতিত, হেমলতাও মূর্চ্ছিতা। দুইটী যুবক তিলেকের মধ্যে গৃহে প্রবেশ করিয়া হেমলতার সেবার সামগ্রী হাতাহাতি করিয়া নৌকায় লইয়া গেল। ইত্যবসরে রামা ও ভিক্ষু কোথায় লুকাইয়া পড়িল। হেমলতা ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিল তিনটী যুবক তাহার নিকট দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। সে চৈতন্য লাভ করিলে একজন বলিল "আপনি কোনরূপ চিন্তা করিবেন না। আর বিলম্ব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শীঘ্র নৌকায় চলুন।" হেমলতা সতৃষ্ণ নয়নে গৃহটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই আর একজন বলিল "আপনি কিছু ভাবিবেন না। আপনার সেবার ধন নৌকায়। আপনার জিনিসপত্রও সব নৌকায় উঠিয়াছে, আর দেরী করিবেন না"। তখন নীরবে হেমলতা তাঁহাদের অনুসরণ করিল। পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন এরা আর কেহ নয়, সেই কাঞ্চনপুর ও রতনপুরের ছাত্রত্রয়—আশুতোষ, রমানাথ ও হরিদাস; সঙ্গে সিপাহী লছমন্ সিংও আছে। পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিতেছে। রেল হইতে নামিয়া নৌকা করিয়া বাড়ী যাইতেছে। প্রতি বারই এইরূপে যাইয়া থাকে। হা'লের কাতাটা খসিয়া যাওয়ায় মাঝি যখন হা'ল মেরামত করিবার জন্য কালীঘাটে নৌকা লাগাইল, ঠিক সেই সময়ে হেমলতার হৃদয়ভেদী আহ্বান তাহাদের কর্ণগোচর হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইল। পরে আশুতোষ প্রথমে গিয়াই কর্ত্তাবাবুকে মুষ্ট্যাঘাত ও ভূপাতিত করিল, তার পর পূর্ব্ব কথিতানুযায়ী তারা নৌকায় চলিয়া গেলে রামা ও ভিক্ষু বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া তড়িৎ মন্দিরের পশ্চাতে আসিল। পরে চাপা গলায় রামা বলিল "দেখ্ ভাই বেশ হ'য়েছে"।

ভিক্ষু। হবে না, দেবতা কি নাই? ব্যাটা যেমন চুয়াড়। আর, ছুঁড়ীটা যেন দেবকন্যা। তার উপ'র জুলুম। ব্যাটার সর্ব্বনাশ হ'বে ভিটেয় ঘুঘু চ'র্‌বে। দেখ ঠ্যালা।

রামা। দেখতে আর বুঝি হ'বে না! হয় ত অক্কা পেয়েছে।

ভিক্ষু। চুপ্, চুপ্, ও কথা বলিস্ না, তা'হ'লে সর্ব্বনাশ হবে, বড় মুস্কিল ঘটবে।

রামা। আরে রেখে দে তোর সর্ব্বনাশ। ও পাপিষ্টিটা মলেই ভাল। আর বামা সুন্দরীর হয়ত পদ্মার জলে ওকর্ম্ম। আরে বাপরে যেন যমদূতের ছোট ভাই! যখন চুলের মুঠি ধরে হিড়্‌হিড়িয়ে টেনে নিয়ে গেল তখনই হয়ত তার দফা ঠাণ্ডা। তারপরে আর কি, বুঝতেই পা'চ্ছস্।

ভিক্ষু। আরে না না, ও মাগী ভারি ধড়িবাজ! ও সিপাইএর হাত থেকে নিশ্চয় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। ও মাগী কি জানে। সে দিন দেখ্‌লি না কেমন পালাল। ও মাগী মরুক আর বাঁচুক তাতে কোন ভয় নাই। তবে কর্ত্তা মলে যে হাতে দড়ি পড়বে। মাগী পা'লয়ে থাকে ত উল্‌টা গাইবে।

রামা। ঠিক বলেছিস্, তাই ত; তবে আর বাবুর মরে কাজ নাই ভাই ও বাঁচুক। চল্‌না দেখি গে।

ভিক্ষু। তুই নেহাৎ বোকা। অত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? চুপ্ করে দেখ্‌না নৌকাখান কোন দিকে যায়।

রামা। কেন, বাবুকে ব'লে এক হাত মারবি নাকি?

ভিক্ষু। তোর যেমন বুদ্ধি। আরে জা'নস্‌নে আমাদের বাবু যে টাকার কুমীর, না হয় কালকেই বলবে 'ধরে নিয়া আয় বেটাদের" তার দফা আগেই ঠাণ্ডা করব। যদি দেখি পূবে যায়—তবে বলব "পশ্চিমে"।

রামা। ঠিক বলে'ছিস্। তোর বুদ্ধি যেমন ক্ষুরের ধার।

ভিক্ষু। ঐ দেখ্ নাখানা ভেটিয়ে যাচ্ছে। যাক্ কলকেটা এনেছিস্ ত? একবার তামাক খা।

তখন রামা পেটের কাপড় খুলিয়া একটী টিনের চোঙ্গ বাহির করিল। তার ভিতরে তামাকের সরঞ্জাম সবই ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রস্তুত করিয়া উভয়ে ধূমপান করিতে লাগিল।

এদিকে নৌকা স্রোতোমুখে চলিতেছে। নৌকায় একখানা সতরঞ্চ পাতা, হেমলতার স্বামী সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় তদুপরি শায়িত। আশুতোষ, রমানাথ ও হরিদাস মাথার নিকটে বসিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদনের জন্য যত্ন করিতেছে। মাঝে মাঝে আশুতোষ তাহার মস্তকে অডিকলোন প্রয়োগ করিতেছে। পায়ের নিকটে অবগুণ্ঠনবতী হেমলতা উপবিষ্টা। নৌকার গলোএর

দিকে পা ছড়াইয়া পোর্টমেণ্টে ঠেস দিয়া, লছমন সিং রাত্রির ঘটনাটী চিন্তা করিতে করিতে ঝিমাইতে আরম্ভ করিল। হরিদাস সসম্ভ্রমে বিনীতবচনে হেমলতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেখুন বাবু ত এখনও চৈতন্য লাভ করি-লেন না। এইরূপ আকস্মিক ঘটনার কারণ এবং আপনাদের পরিচয়ের জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত। আমরা অপরিচিত, কাজেই আপনিও বাক্যালাপ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন। আমার বোধ হয় আপনি লিখিতে পড়িতে জানেন।" হেমলতা এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিল। বোধ করি এখনও আমার পরীক্ষায় শেষ হয় নাই তাই, চক্রধারী আবার কোন বিশেষ পরীক্ষার জন্য এই চক্রে ফেলিলেন। আবার ভাবিল, তিনি ইচ্ছাময়। তিনিই বিপদে ফেলিবেন আবার তিনিই রক্ষা করিবেন। এইরূপ নানাবিধ চিন্তার তরঙ্গে তার মন ভাসিতেছিল, এমন সময় হরিদাসের স্নেহপূর্ণ মধুর বচনে তাহার সন্দেহ অপসারিত হইল। সে চিন্তাসাগরে কূল পাইল। ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া বলিল "দেখুন আপনারা আমাকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আপনারা পিতৃতুল্য, আপনাদের সম্মুখে কথা কহিতে আমার লজ্জা কি? তবে আপনারা আমাকে আপনি আপনি করিলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব।" এবার রমানাথ বলিল "তোমাকে আমরা সেইরূপ ভাবেই সম্বোধন করিব। কিন্তু আমরা এখনও পিতার কর্ত্তব্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ কাজেই তুমি আমাদিগকে বড় ভাইয়ের ন্যায় জ্ঞান করিলে আমরা সুখী হইব।" হেমলতার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ চোক ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। মৃদুস্বরে বলিল "আপনাদের স্নেহের বলে সাহসী হইয়া একটী প্রার্থনা করিতে চাই। ইতিপূর্ব্বে আপনারা আমাদের পরিচয় জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেটী আমার সাধ্যাতীত, যে হেতু স্বামীর নিষেধ। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে স্থান হইতে আপনারা আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন আমরা তিন দিন পূর্ব্বে সে স্থানে আসিয়াছিলাম। আরও আমার একটী প্রার্থনা এই যে, যেন আমার সম্মুখে উঁহার নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা না করেন। কারণ উনি নিশ্চয়ই সত্য পরিচয় গোপন করিবেন। কাজেই আমার সম্মুখে মিথ্যা পরিচয় দিলে আমার সেটী ভাল লাগিবে না।" হেমলতার এইরূপ যুক্তিপূর্ণ কথায় ও তার সরল ভাব দেখিয়া তারা মুগ্ধ হইল। হেমলতা আবার বলিল "আমার যথার্থ নাম বলিতে তাঁর অনুমতি আছে। আমার নাম—হেমলতা।" এইরূপ ভাবে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় লছমন সিং ঘুমের ঘোরে দাঁত কড়্মড়্ করিয়া

রূঢ় ভাবে বলিল "চল্ মাউগি"। সকলেই হাসিয়া উঠিল। আশুতোষ বলিল "লছ্মন্ সিং স্বপ্নেও সেই স্থূলকায় পিশাচীর শাস্তি বিধান করিতেছে"।

এদিকে বামা ও ভিক্ষু ধূমপান শেষ করিয়া যখন বুঝিল নৌকা অনেক দূর অতিক্রম করিয়াছে তখন ধীরে ধীরে শঙ্কিত পদে কর্ত্তাবাবুর কাছে আসিয়া হাজির হইল। কর্ত্তাবাবু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু পাছে আবার কোন বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় কোন সাড়া দিলেন না। তাঁর হস্ত পদ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ। ক্ষিপ্রহস্তে বামা ও ভিক্ষু কর্ত্তাবাবুর বন্ধন মোচন করিয়া দেখিল কপালের একপাশ খুব ফুলিয়াছে এবং বাঁ পায়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। উভয়ে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল। লাঠির উপর ভর দিয়া তিনি অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া বলিলেন "তোদের কি আক্কেল আমাকে মেরে গেল আর তোরা পালিয়ে গেলি ?"

ভিক্ষু। (যোড়হাতে) কত্তা আমার কোন দোষ নাই। সেই যমদুতটা—ওরে বাপ্‌রে এখনও যেমন মনে পড়ছে আর অমনি আমার হাত পা য্যান প্যাটের মধ্যি ঢুকে যাচ্ছে। কি বল্‌ব কত্তাবাবুর যেমন দেখা আর অমনি আমার হাত থেকে লাঠি পড়েগেল। হাত থেকে লাঠি না পড়্‌লে কি আর রক্ষা ছিল, না আপনাকেই মার্‌তে পারে ?

রামা। কত্তা কার কথা শুন্‌ছেন আপনি ? ওটা আবার মানুষ, ওত ভাতমরা। হাত থেকে লাঠি প'ল, ভারি বাহাদুরি। যেন কচি খুকী আর কি। আর ওটাত আলোচেলে ভট্‌চায্‌। নেশাটা নাই, ভাঙটা নাই, ওত মায়ের গন্ডেই আছে। হ্যাঁ আমি একদিন বল্‌তে পারি যে আপনাদের অনুগেরহে যদি দো এক গিলাস আমার প্যাটে পড়ে ; কিবলব কত্তা আমি ত পাট স'াটিয়ে ছিলাম আর কি। যমদুতই হো'ক আর ফম্‌দুতই হোক এই বামা বাগ্‌তির হাতের একঘা খেলেই আর সে জন্মে ভুল্‌ত না। কি করব, আর দুবেটা এসেইত সব গোল কল্লে। ভাবলাম কতই লোক আছে। এখন পিট্‌টান দেওয়াই ভাল।

কর্ত্তা। তা বেশ করেছিলি! খুব বাহাদুর! এখন বামা কোথায় জানিস্ ?

রামা। আর বামা সে এতক্ষণ হয় ত যমের কাছারিতে।

ভিক্ষু। আরে হ্যাঁ। তুই ছোঁড়া যেমন বোকা—ওয়ার নাম বামা—ওই কতজনাকে যমের কাছারি পাঠাতে পারে, ও আবার যাবে যমের কাছারি।

এমন সময় মন্দিরের পাশে একটী গোঁ গোঁ শব্দ হইল। তিনজনেই থর্ থর্

করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কর্ত্তা কাঁপিতে কাঁপিতে কেবল মাত্র বলিলেন—ঐ আবার—আবার—আর বলিতে পারিলেন না, চোক বুঁজিয়া বসিয়া পড়িলেন।

রামা। ক—ক—কর্ত্তা—ভ—ভ—ভয়--কি আ—আ—মি আছি—

ভিক্ষু। ভূ—ভূ—ভূ—

আবার—শব্দ—এবার কিছু স্পষ্ট—রা—মা—

রামা।—"ক—ক—কর্ত্তা—আ—আ—মি—ম—ম—" বলিতে বলিতে পতিত।

এবার পূর্ব্বের চেয়ে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত—"রামা—রামা—বোকারা আমি বামা"। সকলেই তখন অবাক্। রামা তাড়াতাড়ি উঠিয়া লাঠি হাতে করিয়া বলিল "তাইত বলি কত্তা ভূত কি আর আছে? তবে ঐ ভয়টাই ভূত।" লছমন সিং বামার চুল ধরিয়া কালীমন্দিরের উঠানে গড়াইতে গড়াইতে চালাঘরে লইয়া গিয়া তাহার বস্ত্রার্দ্ধ দিয়া একটী খুঁটীর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মুখটা বাঁধিতেও সে ভুলে নাই। বামা অনেক কষ্টে মুখ ঘসিয়া কাপড় কিছু সরাইয়া প্রথমে গোঁ গোঁ শব্দ পরে রামার নাম। শেষে কর্ত্তাবাবু রামা ও ভিক্ষু গিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিল। বামা তখন "হতচ্ছাড়া পাজি" ইত্যাদি এবং অপরাপর অশ্রাব্য ও অকথ্য ভাষায় উদ্দেশ্যে লছমন সিংএর অনন্ত পুরুষ উদ্ধার সাধন করিতে করিতে চলিল। কারুদিকে দৃষ্টিপাত নাই, সকলেই যেন তার দুষমন। কিছু দূর যাইলে রামা বলিল "কত্তা আমি বামাদিদিকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি" বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া বামার নিকটবর্ত্তী হইল, পরে একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অগ্রবর্ত্তী হইলে বামা ক্রোধভরে বলিল "কেরে নচ্ছাড় আমার সঙ্গে তামাসা কচ্ছিস্?"

রামা। না দিদি আমি কখনও তোমার সঙ্গে তামাসা করি? এইটুকু দৌড়ে আসাতে আমার পা মচ্‌কে গেল।

বামা। কেন আমার কাছে আসার কি দরকার?

রামা। এই তুমি একা এই জঙ্গল দিয়া যাবে?

বামা। একবার পৈশাচিক হসি হাসিয়া বলিল "রামা তুই কি বুঝবি। আমার মনের ভেতর যা আছে তার কাছে এ জঙ্গল অতি তুচ্ছ জিনিস। ভয়ও আমাকে দেখে ভয় পায়। তুই যা—আমার জন্য ভাবতে হ'বে না।

রামা। বামা দিদি আর একটা কথাও ছিল। বলি দিদি এখন বুঝলেত "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

বামা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) অনেক দিনই বুঝেচিরে রামা আমি অনেকদিনই বুঝেচি। তবে এরূপ ফলের হাত থেকে এড়ান আমার হাত নয়। যা যা তোদের কত্তাবাবুকে নিয়ে বাড়ী যা। আমি চল্লেম। এই বলিয়া বামা দ্রুত পদে প্রস্থান করিল। রামা একদৌড়ে কর্ত্তার কাছে আসিয়া হাজির। কর্ত্তা বলিলেন "উঃ এতদূর অপমান! কি অন্যায়!!"

ভিক্ষু। তাইত কত্তা এতদূর অপমান! অন্যায় বলে অন্যায় পঞ্চাশবার অন্যায়।

রামা। পঞ্চাশবার! ভিক্ষে তোর বড্ডই ছোট নজর। পঞ্চাশ কিরে হাজার বল। কেমন অন্যায় কাজ—কত্তাবাবুর এতদূর অপমান!

কর্ত্তা। আচ্ছা এর কি কোন প্রতিকার নাই?

ভিক্ষু। বলেন কি কত্তা পিত্তিকার—খুব পিত্তিকার আছে। বলুন ত এখনই তার পিত্তিকার কত্তে পারি। তবে ঐ যমদূতটাকে নিয়েই যা গোল। দেখুন না গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। (হাত দেখান)

রামা। কত্তা যা কত্তে হবে আমাকে বলুন। ও ভাতড়েটাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। আপনি হুকুম কল্লে আমি কি না কত্তে পারি? জানেন ত?

কর্ত্তা। এরা কোন্ দিকে গেল বল্‌তে পারিস?

রামা। হা! হা! তাকি আর না জেনে ছেড়েছি কত্তা। লা বেয়ে একদম্ পচ্ছিমে চলে গেল।

কর্ত্তা। তা বেশ হ'য়েছে উজনে আর বেশীদূর যেতে পারবে না। তোরা খুব ভোরে উঠেই বেরুবি। খুঁজে আনতেই হ'বে।

রামা। নিশ্চয় খুঁজে আন্‌তেই হ'বে।

ভিক্ষু। যেক্‌খানে পাব সেক্‌খান থেকে খুঁজে আনতেই হ'বে।

তখন কত্তাবাবু ট্যাঁক হইতে চারিটি টাকা বাহির করিয়া দুটী এর কাছে দুটী ওর কাছে ফেলিয়া দিলেন। ভিক্ষু নিজের দুইটী কুড়াইয়া লইয়া রামার দুইটী লইতে গেল। কিন্তু রামা ইতিমধ্যে একটী তুলিয়া লইল। ভিক্ষু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল। রামা মৃদু হাসিয়া প্রার্থনাসূচক দৃষ্টিপাত করিল। আসল কথা রামার স্ত্রী ভিক্ষুর দূর সম্পর্কে ভগিনী হয়। রামা যা কিছু উপায় করে তার অধিকাংশই মদ কিম্বা তাড়ির দোকানে জমা দেয়। সেই জন্য ভিক্ষু তক্কেই থকে সুবিধা পাইলেই তার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। রামা ও ভিক্ষু টাকা ট্যাঁকে গুঁজিয়া কর্ত্তাকে ডুলিতে লইয়া যাইবার সময় উভয়েই মনে মনে বলিতে লাগি "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল"।

মাণিক নগর।

(৪)

আমাদের মাণিক নগরের কর্ত্তাবাবু শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পরম বৈষ্ণব। দশখানা গাঁয়ের মধ্যে সকলেই তাঁকে মহা বৈষ্ণব বলিয়া জানিত। বৈষ্ণব দেখিলেই মাথা নোয়াইতেন। পরন্তু একে ব্রাহ্মণ তাতে বৈষ্ণব—সোনায় সোহাগা। বাড়ীতে প্রতি একাদশীতেই হরিবাসর হইত। একাদশীর রাত্রে বাড়ুয্যে মহাশয় গ্রামের আর আর ভক্ত লইয়া নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে রজনী যাপন করিতেন। অবশ্য শাস্ত্রের অর্থ লইয়া কোন গোলযোগ হইত না। তবে সকলেই একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিত। কারু কারু বা চোখে জল দেখা দিত। কেহ কোন মীমাংসা উত্থাপন করিলে তিনি বলিতেন, এখন সিদ্ধান্তের সময় নয় অন্য সময়ে সিদ্ধান্ত হইবে। বাস্তবিক প্রথম প্রথম তাঁর বৈঠকখানাতে খুব শ্লোক সিদ্ধান্ত হইত। কিন্তু বিষয় কর্ম্মের বাধা হওয়ার পরে হরিবাসরের ঘরেই শ্লোক সিদ্ধান্ত হইত। আমাদের রমাপ্রসাদ বাবু এখন একাদশীর দিন দু'দণ্ড খোল কর্ত্তাল বাজাইয়া পিতার কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। বাড়ুয্যে মহাশয়ের আচার-পদ্ধতিও বৈষ্ণবোচিত ছিল। মস্তক মুণ্ডিত শিখামাত্র অবশিষ্ট। গায়ে সর্ব্বদা নামাবলী পড়া, পায়ে কাপড়ের জুতা, গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা। আধুনিক বৈষ্ণবদিগের যেমন তিলকের সুচিক্কণ পারিপাট্য ও মস্তকের সুবিন্যস্ত কেশের চাকচিক্য এই উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়, তাঁর সেরূপ না থাকিলেও তিনি যথাস্থানে তিলক পরিতেন। মস্তকে ত কেশেরই অভাব। হাতের মালা বিশেষ কার্য্য ব্যতীত কোন সময়েই ত্যাগ করিতেন না। শুনিয়াছি, কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে কামিনীর প্রতি আসক্তি তিনি অল্প বয়স হইতেই দমন করিয়াছিলেন। তার মানে তিনি অল্প বয়সেই বিপত্নীক হন। তাঁহার গৃহিণী একমাত্র রমাপ্রসাদকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন। পত্নী বিয়োগের পর বাড়ুয্যে মহাশয়ের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। তিনি আর বিবাহ করেন নি, মেয়ে ছেলেরা বলে নূতন বৌ আসিয়া ছেলেকে দেখিতে পারিবে না বলিয়া, আবার অন্যে কিন্তু অন্য প্রকার বলেন। তিনি বলেন, তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ হইলে তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে বিবাহ করিয়া তিনি যে অর্থ পাইবেন, নূতন গৃহিণীর মনোরঞ্জনার্থ গহনা গাটী ও আস্‌বাব পত্রে তাঁর ততোধিক অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভব। কাজেই তিনি এ কার্য্যে বিরত হইলেন। তাঁরা আরও বলেন যে

কামিনী ও কাঞ্চন এই দুয়ের মধ্যে একটীর আসক্তি অন্যথাভাবে কমাইলে অন্যটীর আসক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ব একটীর প্রতি অপরিমিত আসক্তি বাড়াইলে স্বতঃই অন্যটীর আসক্তি কমিয়া যায়; তবে মূল কথা এই তিনি যে শুধু সঞ্চয়ের জন্যই অর্থ সঞ্চয় করিতেন; ইহার নামই অত্যাসক্তি। যে কোন কারণেই হউক তিনি কামিনীর কুটিল কটাক্ষের সুখকর কুসুমাঘাত হইতে বঞ্চিত বা রক্ষিত ছিলেন। তাঁর প্রধান উপজীবিকা মহাজনী। এ বিষয়ে তাঁর এরূপ ক্ষমতা ছিল যে তিনি যত টাকার যে হিসাবে যতদিনে সুদ হ'ক অল্প সময়ের মধ্যেই করা ক্রান্তি হিসাবে বলিয়া দিতে পারিতেন। আসামীরা সুদের পয়সা ফরাসে ফেলিয়া দিলে তাহার দক্ষিণ হস্তের মালাও ঘুরিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম হস্তে এরূপ ভাবে পয়সাগুলি গুণিয়া লইতেন যে দেখিয়া বোধ হইত কেন সুদক্ষ সেতারীর অঙ্গুলি সঞ্চালনও ইহার নিকট পরাজিত। আসামী আসিয়া প্রণাম করিলেই তিনি "হরে হরে" বলিয়া উঠিতেন। পরে আলাপ আপ্যায়িতের পর সুদের হিসাব হইত। তা সুদের হিসাব করিয়া ৵২ গণ্ডা হইলে তাহার স্থানে ৵৫ গণ্ডা, বাগে পাইলে কখনও ৵১০ গণ্ডা লইতেও ছাড়িতেন না। কখনও ভুলিয়া ৵০ আনা লইতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম প্রথম শ্লোক সিদ্ধান্ত বৈঠকখানাতে বসিয়াই হইত। একদিন কতকগুলি আসামী আসিয়া সুদের হিসাব করিতেছে এমন সময়ে শ্রবণ দাস আসিয়া উপস্থিত। মাণিকনগরেই শ্রবণদাসের আখড়া। বাড়ুয্যে মহাশয় তার বিশেষ আদর করিতেন। শ্রবণ দাস ভিক্ষার পাত্রটী নীচে রাখিয়া ফরাসের এক পার্শ্বে বসিলেন, পরে হাই তুলিতে তুলিতে তুড়ি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পৃকিতি হইয়া করে" অমনি গোমস্তা নরহরি মিত্র যোড় করে বলিলেন, "দাদাগোঁসাই একটু অপেক্ষা করুন।" বাড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন, "শ্রবণ দাদা একটু বস, হিসাবটা সেরে নিই।" শ্রবণ দাস বলিলেন, "না ভাই আমার আর বস্‌বার যো নেই, জানইত তার বার মাসে তের উপসগগ। আসল কথা শ্রবণ দাস বাবাজীর একটী প্রকৃতি ছিলেন, তিনি প্রায়ই অপ্রকৃতিস্থা থাকিতেন। আখড়ার সেবার কার্য্য তার উপর ন্যস্ত থাকিলেও প্রায় শ্রবণ দাসকে সে ভার চালাইতে হইত। তবে প্রকৃতির সেবার অর্থাৎ ভোজনের কোন দিনই ন্যূনতা লক্ষিত হয় নাই। একদিন শ্রবণ দাস সভয়রঙ্গে বলিয়াছিলেন, "রঙ্গিণী! রঙ্গিণী প্রকৃতির নাম—তোমার অসুখ কেমন বুঝিতে পারি না। কৈ ভোজনের ত কোন তারতম্য দেখি না!" রঙ্গিণী ঈষৎ হসিয়া উত্তর করিলেন, "জানেন গোঁসাই, ওটা আমার অভ্যাস। যখন

গেরেস্ত কুলে ছিলাম তখন আমার শাশুড়ী আমার জন্য রাত্রিতে খাবার ঢাকিয়া রাখিতেন। আমি সকালে উঠিয়া আগে আহারটী সারিয়া অন্য কাজে যাইতাম। তা আপনারাই ত বলেন, "স্বভাব যায় ম'লে" "স্বভাবে করায় কর্ম্ম আমার কি দোষ।" রঙ্গিণীর এই প্রমাণসমান্বিত উত্তরে মনে মনে শ্রবণ দাস যাই ভাবুন বাহিরে কিন্তু তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইল। বাড়ুয্যে মহাশয় আর জেদ করিলেন না, তিনি বুঝিলেন আর কোথাও ভিক্ষা করিতেও যাইতে পারিবে না। তখন "গণেশ! গণেশ' বলিয়া ডাকিলেন, একি এযে সত্য সত্যই গণেশ আসিয়া উঠিল! কেবল শুণ্ডটী নাই এই প্রভেদ। গণেশের উদর মল দেহ হইতে অনেক দূর অগ্রবর্ত্তী তার উপর ত্রিশূলাকারে চিতার দাগ। গলার মালার সঙ্গে বলয়াকার একটী বড়ি লম্বিত। গলাটী সরু দেখিলেই সোলার ছবির কথা মনে পড়িত। পাদুখানাও তদ্রূপ, মাথাটা ছোট তবে পশ্চাতে বিরাশিসিক্কা একটী দোদুল্যমান তার অগ্রভাগটী বড় সুপারীর আকারে বান্ধা। দেখিলেই মনে হইত দেহের ভারকেন্দ্রটী ঠিক রাখিবার জন্যই যেন এই শিক্ষাগুচ্ছ রক্ষিত। গণেশের হাতে কলিকা। কারণ বাড়ুয্যে মহাশয় ডাকিলেই সে যেখানেই থাক্ কলিকাটী হাতে করিয়া উপস্থিত হইত। তিনি বলিলেন, "কলিকা রাখ্! বাড়ীর ভিতর গিয়ে বৌমার কাছে একসের চাল ও চারটে পয়সা চেয়ে এনে শ্রবণ দাদাকে দে।" গণেশ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। বাড়ুয্যে মহাশয় তখন বলিলেন, "দেখ দেখি শ্রবণ দাদা আমার কি এখন টাকা কড়ি নিয়ে এ রকম ভাবনা চিন্তা করার সময়। কি বলব রমা মানুষ হ'ল না। প্রথম প্রথম তার কিছু পয়সার হিসাব দেখে মনে করেছিলাম 'বাপকে বেটা ঘোড়া" সংসারটা রাখতে পারবে কিন্তু তা হ'ল না, আজ কাল মামার বাড়ীতেই থাকে। বৌমাটীও খঙ্গবাহিনী" —এমন সময়ে গণেশ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত।

বাড়ুয্যে।—কিরে কাঁদ্‌ছিস্ কেন? না আর পারিনে!

গণেশ।—আমাকে বৌদিদি ঠাকুরাণ গাল দিলে।

(ক্রমশঃ)

স্বায়ত্ত-শাসন।

প্রবন্ধের প্রথম পরিচয়েই "পন্থার" পাঠক-পাঠিকা বিচলিত হইতে পারেন এই আশঙ্কায় আমাকেও প্রথমেই শেষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হইতেছে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি বা তথাকথিত অপর কোন নীতিশাস্ত্র যে আদর্শ অদ্যাবধি স্পষ্টীভূত করিতে পারিল না—এই কামনাকণ্টকাকীর্ণ সংসারগহনের কোন গভীরতম প্রদেশে চিরশান্তির আকর ভগবৎ-প্রেমরূপ অম্লান কুসুম বিকসিত রহিয়াছে তাহার সন্ধান দিতে পারিল না, সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত আদর্শ স্পষ্টীভূত করা—সেই পরম প্রেমিকের প্রেমোদ্যানে যাইবার সুপথ নির্দ্দেশ করাই "পন্থার" চরম উদ্দেশ্য। সুতরাং বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে যে "স্বায়ত্ত-শাসনে"র তুমুল কোলাহল উঠিয়াছে তাহা "পন্থা"-নির্দ্দিষ্ট পথের পথিকের পক্ষে শ্রুতিসুখকর হইবে কিনা তাহার বিচার তাঁহারাই করুন। আমার বক্তব্য এই যে, অধমের এই অকিঞ্চিৎকর উদ্যমের সহিত রাজনীতির সংশ্রব আছে মনে করিয়া কেহ যেন প্রারম্ভেই ইহার সংশ্রব পরিহার না করেন। রাজনীতির স্বরূপ কি তাহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত না হইলেও ইহা আমার স্থির বিশ্বাস যে যাহাতে শঠের সহিত শাঠ্য করিতে শিক্ষা দেয়—অবস্থা ভেদে সাম, দান, দণ্ড প্রভৃতি উপায়ভেদ নির্দ্দেশ করে তাহা রাজনীতি নামে আখ্যাত হইলেও তত্ত্বতঃ নীতি-পদবাচ্য নহে; এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। অধুনা স্বায়ত্তশাসন বলিতে আমরা কি বুঝি এবং সেই বোধ যথার্থ কি না তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য।

স্বায়ত্ত-শাসন সংজ্ঞাটী যে ইংরাজী Home Rule বা Self-Government শব্দের প্রতিধ্বনি সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। আর ইংরাজেরা এই দুইটী শব্দের কিরূপ অর্থ করিয়া থাকেন এবং আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা বর্ত্তমানে ঐ শব্দদ্বয়ের কিরূপ অর্থ স্বীকার করিতেছেন সংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেরই সুবিদিত। সুতরাং এ স্থানে তাহার পুনরালোচনা দ্বারা পাঠক পাঠিকার বিরাগ বৃদ্ধি করিতে সাহস করি না। যাহা পাইবার জন্য এই যে বিপুল উদ্যম সে স্বায়ত্ত-শাসনের ফল কি?—আমরা স্বায়ত্ত-শাসন বলিয়া যাহা প্রার্থনা করিতেছি, তদ্দ্বারা সেই অভীষ্ট ফল লাভ হইবে কি না?—যদি না হয় তবে অপর কোন উপায়ে তাহা হইতে পারে?—স্থূলতঃ এই তিনটী প্রশ্নের সদুত্তর লাভের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

কোন বিখ্যাত সংবাদ পত্রে দেখিলাম স্বায়ত্ত-শাসনের মূলসূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে —"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" বেশ কথা। বস্তুতঃ সুখলাভের বা সুখবৃদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন প্রযত্নই এই বিরাট্ বিশ্বব্যাপারের মূলীভূত—ইংরাজীতে যাহাকে বলে main spring. জীবমাত্রই সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীব-লীলা সমাপ্ত করিতেছে; আর সেই সুখের কাঙ্গাল সন্তান সকলকে বুকে লইয়া ভূতধাত্রী বসুধা দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন সুখের সন্ধান করিতেছেন তাহা তিনি বা তাঁহার স্রষ্টাই বলিতে পারেন। বস্তুতঃ সুখান্বেষণপ্রবৃত্তি যে সহজাত, সুখলাভপ্রযত্ন যে সার্ব্বজনীন তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। অপিচ ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সুখলাভই জীবনের মুখ্যব্রত;—এবং যে সকল কর্ম্ম আপাত দৃষ্টিতে অবান্তর বা নিঃস্বার্থ বলিয়া প্রতীত হয় সে সকল প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একমাত্র সুখলাভ-চেষ্টার অঙ্গীভূত বা অনুকূল।

স্থূলদৃষ্টিতে এই সুখ নানামূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে;—যোগীর সুখ আর ভোগীর সুখ, পরহিতব্রতীর সুখ আর পরপীড়নপ্রিয়ের সুখ, দাতার সুখ আর যাচকের সুখ সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির বলিয়াই বোধ হয়। ফলতঃ প্রকৃতি, শিক্ষা, শক্তি ও সঙ্গ ভেদে সুখের প্রকৃতিভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সুখ কি যথার্থই বহুবিধ? তাহা যদি হয় তবে যেখানে বহুত্ব সেইখানেই বিরোধ নিশ্চিত; যেখানে বিরোধ সেইখানেই অশান্তি; আর যেখানে অশান্তি সেখানে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? বাস্তবিক সংসারে নিত্য ঘটিতেছেও তাহাই; জীবসকল সুখের বিভিন্ন আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়া প্রতিনিয়ত বিষম সংঘর্ষ উৎপাদন করিতেছে এবং তাহার ফলে সুখের পরিবর্ত্তে অসুখেরই উদ্ভব হইতেছে। লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্নতাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করাইতেছে। তজ্জন্য অনেকেরই লক্ষ্যবস্তু লাভ হইতেছে না অথবা হইলেও তাহা আশানুরূপ ফল দিতে পারিতেছে না—অর্থাৎ যাহা পাইলে সুখাভিলাষ চরিতার্থ হইবে আশা ছিল—প্রাণপণ প্রযত্নের বিনিময়ে তাহা করায়ত্ত হইলেও প্রকৃত সুখ ত হইতেছে না। শিশু যেমন কোন নূতন ক্রীড়নক পাইলে দুই চারি দিন তাহাতেই অনুরক্ত—তাহা লইয়াই সুখী বোধ হয়, কোনরূপ অভীষ্ট প্রাপ্তিতে সাধারণতঃ সেইরূপ অনুরক্তি বা অচিরস্থায়ী সুখানুভূতি হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন, যে নিঃস্ব সে ভাবে শত মুদ্রা পাইলেই তাহার সুখ হইবে, যাহার শতমুদ্রা আছে সে ভাবে সহস্র মুদ্রা-

লাভেই তাহার সুখ হইবে—ইত্যাদি। তিনি এ শ্লোকের উপসংহারে বলিয়াছেন —"আশাবধিং কো গতঃ?" কিন্তু এ কিসের আশা? নিশ্চয়ই ধনের নহে;— কারণ তাহা হইলে আশানুরূপ ধনলাভে তাহার পরিতৃপ্তি হইত। এ আশা সুখের—ধন বা ঐশ্বর্য্য তাহার সাধন মাত্র। বাস্তবিক আমরা ধন বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে কোন দিন কাহারও প্রকৃত সুখলাভ হইয়াছে কি? অপিচ প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নানারূপ অসুখ বা অশান্তির কারণই হইয়া থাকে। কেহ যেন না মনে করেন যে আমি আচার্য্যপ্রবর শঙ্করের—"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং" ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সে স্পর্দ্ধাও আমার নাই—এবং সাংসারিক ব্যাপারে অর্থের আবশ্যকতাও আমি অস্বীকার করিতে সমর্থ হই নাই। ছাত্রজীবনে বিষ্ণুশর্ম্মার প্রসাদে অবগত হইয়াছিলাম—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্। পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্॥" আমার মনে হয় ইহাতে ধন ও সুখের সম্পর্ক স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধন পরিমিত বা প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহাই হউক না কেন তাহা উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত না হইলে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই প্রসব করে। জগতে ইহার দৃষ্টান্তও কখন বিরল নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পাত্রতাই সুখলাভের সাধন, ধন তাহার সহায় মাত্র।

ধনের সম্বন্ধে যে কথা, বিদ্যা পদমর্য্যাদা প্রভুত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও কি তাহাই নহে? বিদ্যায় যদি সুখলাভের উপায় হইত তাহা হইলে নিরক্ষরের জীবনধারণ নিষ্প্রয়োজন হইত না কি? পদমর্য্যাদা বা প্রভুত্ব যে সুখের প্রভব নহে তাহার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই প্রচুর। বস্তুতঃ সংসারে যে দিকে চাহি সেই দিকেই দেখিতে পাই সহস্র—লক্ষ—কোটি কোটি ব্যক্তি সুখের আশায় ধন ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব প্রভৃতির পশ্চাতে ছুটিতেছে; অনেকের অভীষ্ট প্রাপ্তিও হইতেছে কিন্তু সুখ মিলিতেছে কয়জনের? পক্ষান্তরে সুখের আশায় সারাজীবন ঘুরিয়া অনেকেই প্রলোভিত পথিকের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির, উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়েন। ঐশ্বর্য্যের শিখরে সমাসীন হইয়া, সুদীর্ঘকাল যথেচ্ছ উপভোগ করিয়াও যখন তৃপ্তি হইল না—সুখের মুখ দেখা গেল না তখনই যযাতি বুঝিতে পারিলেন—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং॥"

ইহা কেবল সে কালের কথা নহে; অদ্যাপি অনেক আজীবন-কর্ম্মক্লান্তের শেষ-জীবনে এইরূপ হতাশের আক্ষেপই শুনিতে পাওয়া যায়।

যযাতি বুঝিয়াছেন যে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়; কারণ সুখতৃষ্ণা তাঁহাকে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাতে তাঁহার সুখলাভ হয় নাই, কেবল তৃষ্ণাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সংসারে লোকে যাহা চায় সেই বহুবাঞ্ছিত ধন ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব ভোগবিলাস প্রভৃতি কোন বস্তুই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই। তাহাই তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"তস্মাদেনামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসং।
নির্দ্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥"

তাহার পর যযাতি কি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরিণামে সুখলাভ হইয়াছিল কি না পুরাণ তাহার সাক্ষী। সে বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আপাততঃ আছে বলিয়া মনে করি না। আমরা দেখাইতে চাহি যে স্মরণাতীত কাল হইতে নানা জনে নানারূপে সুখলাভেরই চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সুখলাভার্থ সাধারণতঃ যে সকল উপায় অবলম্বিত হয় তদ্দ্বারা কেহই প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হইতে পারেন নাই,—পরিণামে হতাশের দীর্ঘশ্বাসই সম্বল হইয়াছে। ধন ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি কিন্তু সেকালেও যেমন একালেও তেমনই সুখলাভের উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। এই যে "স্বায়ত্ত-শাসন" পাইবার জন্য এত আগ্রহ, এমন উদ্যম—ইহারও লক্ষ্য অন্য কিছুই নহে। স্বায়ত্ত-শাসন লাভে অধিকতর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ হইবে; তাহার ফলে ধনৈশ্বর্য্যাদি বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিণামে সুখের সন্ধান মিলিবে।

আমরা দেখিলাম কেবল ধনৈশ্বর্য্যাদি বৃদ্ধি সুখলাভের উপায় নহে অপিচ ধনৈশ্বর্য্য অপাত্রে ন্যস্ত হইলে সমূহ অসুখ উৎপন্ন করে।

আমরা বর্ত্তমানে "স্বায়ত্ত-শাসন" বলিতে যাহা বুঝি তদ্দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে কি? দেশবাসীর সুখলাভ হইবে কি? দস্যু তস্করেও ত ধনী হইতে পারে, অত্যাচারীও ত প্রভুত্বের তুঙ্গশিখরে সমারূঢ় হইতে পারে, অতি দুর্ম্মতি ব্যক্তিও ত নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারে—কিন্তু এরূপ ধনে পদে বা বিদ্যায় সুখলাভ কখন সম্ভব হইয়াছে কি? তাহা যদি না হইয়া থাকে তবে স্বাধীন জাতি সকলের আদর্শে দেশের শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সাধিত হইলেও "স্বায়ত্ত-শাসন" পাইলাম মনে করিলে চলিবে না; কারণ তাহাতে সুখ

হইবে না। তাহা Self-Government হইতে পারে কিন্তু তদ্দারা সুখ শান্তি বা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইবে না ;-ইয়ুরোপের বর্ত্তমান বিপ্লবই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব দেখিতে হইবে যে পরিণামে সুখলাভই যদি স্বায়ত্ত-শাসনের চরম লক্ষ্য হয় তবে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ সুখের প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। আমরা সুখ বলিতে অভীষ্টপ্রাপ্তি এবং দুঃখ বা অসুখ বলিতে তাহার অপ্রাপ্তি অথবা বিনাশ বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ হইলে সুখ ও দুঃখের প্রকৃতিগত কোন প্রভেদই থাকে না, যাহা থাকে তাহা মাত্রাগত ; এবং রুচি, অবস্থা, শিক্ষা, সঙ্গ প্রভৃতি কারণে একই বস্তু বা অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার—সুখ বা দুঃখকর হইয়া থাকে।

"ইন্দ্রস্যাশুচিশূকরস্য চ সুখে দুঃখে নাস্ত্যন্তরং।
স্বেচ্ছাকল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনং॥
রম্ভা চাশুচি-শূকরী চ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ।
সংত্রাসোঽপি সমঃ স্বকর্ম্মগতিভিশ্চান্যোন্যভাবঃ সমঃ॥"

—শিহ্লন মিশ্র।

অপিচ—

ভূঃ পর্য্যঙ্কো নিজভুজলতা কন্দুকঃ খং বিতানং।
দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতালব্ধসঙ্গপ্রমোদঃ।
দিকান্তাভিঃ পবনচমরৈর্বীজ্যমানঃ সমন্তাৎ।
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপ ইব ভুবি ত্যক্ত সর্ব্বস্পৃহোঽপি॥—ভর্তৃহরি।

প্রকৃত কথাই বটে। একের যাহাতে সুখ, অন্যের তাহাতে অসুখ—ইহা ত প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। তাহা যদি হইল তবে সুখ ও দুঃখ দুইটী পৃথক সত্তা বা অনুভূতি বা যাহাই হউক না কেন কে বলিবে? বস্তুতঃ সুখ দুঃখের ভেদ কল্পনামূলক ব্যতীত কিছুই নহে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।"

অর্জ্জুন কি বুঝিয়াছিলেন জানি না ; মানবজাতি কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই শুনিয়া দেখিয়া ঠেকিয়া আসিতেছে—অদ্যাপি শিখিল না। বুঝিল না যে আঁধার যেখানে আলোর অস্তিত্বও সেইখানে—কেবল আলো বা কেবল অন্ধকার কোথাও মিলিবে না ; যে একটী পাইতে চাহে তাহাকে অপরটীকে একেবারে ছাড়িলে চলিবে না। দ্বন্দ্বের প্রভাব ঘুচিবে না, সুখশান্তিও মিলিবে না। সুখদুঃখের সম্বন্ধেও একই কথা—অর্থাৎ সংসারে আমরা সুখ বলিয়া যাহা চাহি দুঃখ তাহার

চিরসঙ্গী। চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক, কমলে যেমন কণ্টক, তেমনই পার্থিব বিষয় ভোগে যে সুখ তাহাতে দুঃখের সংশ্রব অবশ্যম্ভাবী।

তবে কি পার্থিব উন্নতিলাভে—ধনৈশ্বর্য্য প্রভুত্বপাণ্ডিত্য প্রভৃতির অর্জ্জনে কোন সার্থকতা নাই? এ সংসার কি তবে কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট? তাহা কখনই হইতে পারে না। দুঃখ ব্যতীত সুখ যেমন অসম্ভব, গৃহী ব্যতীত সন্ন্যাসীও তেমন। মনুসংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, যেমন মাতাকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণিগণ বর্ত্তমান থাকে, তেমনই গার্হস্থ্যের আশ্রয়েই অপর তিনটী আশ্রম উৎপত্তি ও পরিণতি লাভ করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

যখন ভৌতিক সংসারে পঞ্চভূতময় দেহের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেই হইবে তখন কর্ম্ম পরিত্যাগ কিরূপে সম্ভব? বস্তুতঃ এক্ষেত্রে সম্ভব অসম্ভব বিচারের অবসরই নাই; কারণ—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"

কর্ম্ম করিতেই হইবে—যথাসাধ্য বিদ্যাধনাদি উপার্জ্জনে উদাসীন হইলে চলিবে না, কারণ শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এ সকল আবশ্যক। আপনার জন্য যেমন অপর সকলের জন্যও তেমনই আবশ্যক; কারণ সংসার একজনের নহে। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়াই মহাসমুদ্র; তাহার একটী আন্দোলিত হইলে অপর সকলও স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং সংসারীকে সংসারের হিতার্থে যথাসাধ্য কর্ম্ম করিতেই হইবে—বিদ্যাধনাদি উপার্জ্জনে এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবহারে আত্মপরহিতের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। করিতে হইবে সবই —কর্ত্তব্য বলিয়া, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া নহে; আহার করিতে হইবে জীবন ধারণের জন্য—জীবনধারণ আহার করিবার জন্য নহে। অপিচ—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম তাহা সুসম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব—কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইব। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের সাফল্যে উল্লসিত অথবা বৈফল্যে বিমনা হইলে চলিবে না, তাহা হইতে সাংসারিক সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যেই চিরকাল ঘুরিয়া মরিতে হইবে—প্রকৃত সুখলাভ ঘটিয়া উঠিবে না। অভিমানবশে আসক্তির উত্তেজনায় কর্ম্মপরায়ণ হইলে সুখদুঃখের দ্বন্দ্বাতীত হইবার উপায় নাই। আমি ইহা করিব, আমি অপরের প্রভু হইব

ইত্যাকারভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না—দেখিবে সাংসারিক সুখদুঃখ তোমার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু এইরূপ নিরভিমান ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা কি সম্ভব? পার্থিব দৃষ্টান্ত হইতে এ প্রশ্নের উত্তর হইবে 'কখনই না; ফলের প্রতি স্থিরলক্ষ্য না থাকিলে কর্ম্মের সুসম্পাদন অসম্ভব'। বটে—আমরা কি না প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল প্রাপ্তিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তাই অভিমান বা আসক্তি ব্যতিরেকেও যে সর্ব্বকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইতে পারে এ ধারণা আমাদের আসক্তিমলিন হৃদয়ে আদৌ উদিত হয় না। কিন্তু আমরা যদি বিস্মৃত না হইতাম যে এই অসীম ঘনকৃষ্ণ কর্ম্ম-যবনিকার অন্তরালে সেই সর্ব্বকর্ম্মনিয়ন্তা অনাবিল আনন্দের অক্ষয়ভাণ্ড হস্তে লইয়া আমাদেরই জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা হইলে কি এই দু'দিনের জন্য রচিত খেলাঘরের ধূলামাটি 'খোলাম কুচি' লইয়া আপনা ভুলিতে পারিতাম? কোন ব্যক্তির অহিফেন সেবনের অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে যেমন লোকে বলে—"অমুক ব্যক্তিকে অহিফেনে খাইয়াছে," আমাদিগকেও তেমনই কর্ম্মাসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষায় গ্রাস করিয়াছে; কোথায় আমরা কর্ম্মের উপর প্রভুত্ব করিব, না কর্ম্মই আমাদের প্রভু হইয়া বসিয়াছে। ভগবান্ বলিয়া দিলেন - 'মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ" আমরা তাহা না শুনিয়া কর্ম্মের কর্তৃত্ব ও তাহার সাফল্যবৈফল্যের দায়িত্ব এই দুইটী গুরুভারই নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম—ফলে আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না।

"ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"

আমরাও জীবনসংগ্রামে বার বার হারিয়াছি, আমাদেরও বহু ভ্রমপ্রমাদ হইয়াছে। মানুষ মাত্রেরই এরূপ পরাজয়, এবম্বিধ ভ্রম হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাতে আমাদের দুঃখ লজ্জা বা নৈরাশ্যের কারণ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমরা যতই হারিতেছি, যতই ভুল করিতেছি, ততই ভুলিয়া যাইতেছি যে আমরা সেই চির-অপরিচিত চির-অভ্রান্তেরই আত্মজ।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥" কঠোপনিষৎ।

এ মারাত্মক ভ্রম পরিহার করিতে হইবে, এ সর্ব্বনাশী আত্মবিস্মৃতি বিস্মৃত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? কেন?—রত্নাকর মরা মরা করিয়া রামকে পাইয়াছিল, আর আমরা এতকাল "সঃ" আর "অহং" লইয়া আছি—ঐ দুটা কি একদিন "সোঽহং" হইয়া যাইবে না? যাইবে বৈকি! আমরাই ত জোর করিয়া একুকে দুইখানি করিয়া রাখিয়াছি!

পাঠক-পাঠিকা সম্ভবতঃ মনে করিতেছেন যে আমরা আলোচ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু তাহা নহে। আমরা দেখাইলাম যে যদি সুখলাভই স্বায়ত্ত-শাসন লাভের উদ্দেশ্য হয় তবে কেবল দেশের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহা হইবে না; কারণ ধনধান্যে সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধিতে য সুখ তাহা স্বপ্নানুভূতিবৎ অলীক। দেশের বা জাতির সুখশান্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যক্তিমাত্রেরই সুখশান্তির ব্যবস্থা করণীয়—ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। আর তাহা রাজবিধি বা সমাজবিধির সুপরিচালনে বা পরিচালনে হইতে পারে না। কারণ "সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"—সুখ বাহিরের বস্তু নয়, অন্তরের। যে স্বায়ত্ত-শাসন আমরা চাহিতেছি তাহাতে কি আমার অন্তরের গ্লানি ঘুচাইয়া দিতে পারিবে? কর্ম্মের বশ্যতাপাশ মুক্ত করিয়া কি আত্মবশে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? যদি না পারে তবে এমন স্বায়ত্ত-শাসনের কি প্রয়োজন? স্বাস্থোন্নতি, শিল্পের প্রসার, ধনবৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা ভারতবাসী সুখী হইবে? ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষ কিন্তু এমন সুখকে সুখ বলিয়া মানে নাই।

তাই বলিতেছি য়ুরোপীয় আদর্শ সর্ব্বথা অনুকরণীয় নহে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, দেশের স্বাস্থ্যসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে যদি য়ুরোপ-প্রণীত বিধিই অনুকূল হয় তবে তাহা গ্রহণ কর। কিন্তু সেই উন্নতি অন্তরালে যে জীবনের চরম লক্ষ্য লুকায়িত আছে তাহা যাহাতে অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে তাহারও

সুব্যবস্থা কর। নতুবা কেবল সাদায়-কালোয়, ধনী-দরিদ্রে, মূর্খ-পণ্ডিতে, বাবুতে চাষায় প্রভেদ আর বাড়াইও না। যেখানে ভেদ, সেইখানেই বিরোধ; যেখানে বিরোধ সেইখানেই অশান্তি; যেখানে অশান্তি সেইখানেই অসুখ।

ভাই ভারতসন্তান! যদি দেশের জন্য, আত্মোন্নতির জন্য প্রাণ প্রকৃতই কাঁদিয়া থাকে তবে কেবল বিলাতী Self-Governmentকে ধুতি চাদর বা পাগড়ী পাজামা পরাইয়া স্বায়ত্ত-শাসন করিয়া লইলে চলিবে না; দেশের বা জেলার প্রতিনিধি হইয়া শাসন-পরিষদে বসিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছ কেন? এ পদের যোগ্যতা তোমার আছে কি? যাঁহার প্রতিনিধি হইয়া তুমি সংসারে আসিয়াছিলে সেই চিরানুগ্রহপরায়ণ প্রভুর কথা বিস্মৃত হইয়া যে নিজেই প্রভু সাজিয়া বসিয়াছ! যাহা তোমার হস্তে ন্যাসস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা আমার আমার করিয়া শান্তিময়ের সংসারে তুমি অশেষ অনর্থ ঘটাইয়াছ। তুমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট, তুমি বিশ্বাসঘাতক! তুমি আবার প্রতিনিধির দায়িত্ব লইতে চাও? তোমার অভিমান, তোমার অহঙ্কার তোমাকে বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ অস্বীকার করাইয়াছে। তুমি গৌরবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যকে পশুতুল্য বিবেচনা কর; তুমি ধনী বলিয়া দরিদ্রকে অবমাননার চক্ষে দেখ, তুমি বিদ্বান বলিয়া নিরক্ষরকে ঘৃণা কর, তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া চণ্ডালকে স্পর্শ কর না। তুমি 'স' আর 'অহং' এর প্রভেদ বাড়াইতেই তৎপর,—তুমি যাইতেছ দুঃখের সাগর মন্থন করিয়া সুখের অমৃত উত্তোলন করিতে? তুমি জান কি?—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

এখনও সাবধান হও! অযথা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার জন্য এতাদৃশ ব্যস্ত হওয়া তোমার শোভা পায় না। মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া উপকরণের আড়ম্বর দ্বারাই অভীষ্টলাভ হইবে ভাবিও না। এখনও উদ্বুদ্ধ হও—অসত্যের আবরণ সবলে অপসারিত কর! ক্ষমতায় না কুলায় একমনে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদকে ডাক—বল,—

"অসতো মা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়।"

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ,

IMPERIAL LIBRARY

বিশেষ নিবেদন।

এতদ্দ্বারা গ্রাহক মহোদয়গণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ 'পন্থা' অফিস ৫ নং রামকিষণ দাস লেন হইতে ১৯ নং ঝামাপুকুর লেনে স্থানান্তরিত হইল। এখন হইতে মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক টাকা কড়ি ও বিনিময়-পত্রাদি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
পন্থা।

শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ, বি এল্ প্রণীত পুস্তকাবলী

(নূতন উপন্যাস)

১লা আশ্বিনে প্রকাশিত হইবে।

অরণ্য-বাস।

সুন্দর বাঁধাই। প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা।

সফল জীবন-সংগ্রামের অতি অপূর্ব্ব চিত্র। বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ও অপূর্ব্ব সামগ্রী।

সকলেরই, বিশেষতঃ প্রত্যেক ছাত্র ও যুবকের পড়া উচিত।

"সীতা" (সচিত্র) সুন্দর বাঁধাই, মূল্য পাঁচ সিকা।

"পলাশ-বন" (উপন্যাস) সুন্দর বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

"কুমারী" (উপন্যাস) সুন্দর বাঁধাই মূল্য দুই টাকা।

"গাথা" (কবিতা পুস্তক) মূল্য বার আনা।

"The Vaisya Caste" (Cloth) মূল্য পাঁচ সিকা।

"সীতা" (স্কুলপাঠ্য) ।/০, "সুকথা" ৵০, "সাহিত্য-বোধ" (শিশুপাঠ্য) সচিত্র /০ ; মোট আট আনায় তিনখানি পুস্তক পাইবেন।

সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারী,

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা, ১৯, ঝামাপুকুর লেন,

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস দ্বারা মুদ্রিত।

অনেক জ্বরের ঔষধ ত ব্যবহার করিলেন, বলিতে পারেন—কোন বিশেষ কিছু ফল পাইয়াছেন? আমাদের বিশেষ অনুরোধ একবার আমাদের শিবসুধা ব্যবহার করুন।

কে, এন্ সাধু এণ্ড কোং'র

শিবসুধা

সর্ব্ববিধ জ্বরের একমাত্র অব্যর্থ আশুফলপ্রদ মহৌষধ।



ম্যালেরিয়া জ্বরের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। দুইদিন সেবনেই, জ্বর যেরূপ হউক না কেন, উপশম হইবে। জ্বরান্তে কিছুদিন ব্যবহার করিলে আর টনিক ব্যবহার করিতে হয় না।

ইহা বিশুদ্ধ গাছ-গাছড়ায় প্রস্তুত।

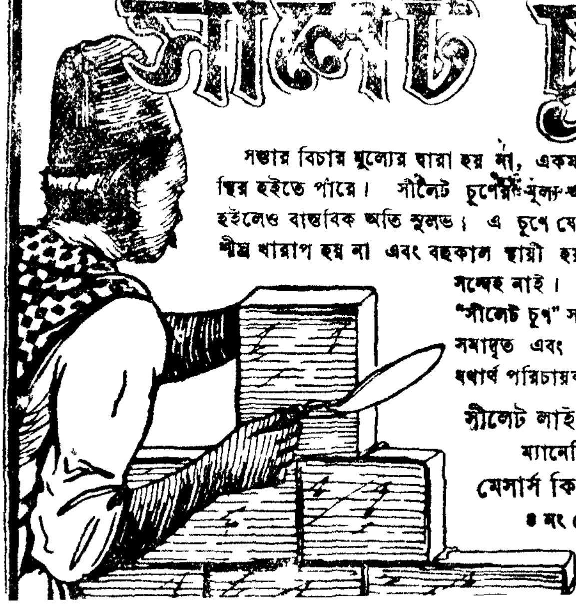
মূল্য প্রতি শিশি আট আনা।

প্রত রবিবারে গরীবদিগকে বিতরণ করা হয়—

অফিস—৯ নং মদন চাটুজ্যের লেন, কলিকাতা।

সোল এজেণ্ট—এম্ ভট্টাচার্য্য ১০ নং বনফিল্ড্‌স লেন, কলিকাতা।

সীলেট চূণ



সস্তায় বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড্।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—

মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং।

৪ নং কেয়ারলি প্লেস,

কলিকাতা।